ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা

বিচারের মূল নথী

বিষ্ণুচরণ ঘোষ
শিশির পৈতণ্ডী

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

মুখপত্র

মাননীয় শ্রী বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার নিম্নলিখিত মুখপত্র লিখিতেছি —

১৯৩২ সনে আমার পিতা শ্রী পান্নালাল বসু যখন ফরিদপুরে Sub Judge ছিলেন হাইকোর্ট হইতে এক order এ ঢাকায় বদলী হইলেন — তিনি তখনও জানতেন না যে ঢাকায় ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস এক সাধু file করিয়াছেন সে বাদী ভাওয়াল স্টেট রাজার মেজ ছেলে শ্রী রমেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীও মৃত নন — দার্জিলিং এ মৃত হন না — এই অভিনব case ঢাকায় বিচারের জন্য ১২ বৎসর বাদে সন্ন্যাসী ঢাকায় আসে বর্তমান বাংলাদেশ — নিজেকে ভাওয়াল স্টেটের মেজকুমার শ্রীরমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী পিতা রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ভাওয়াল ষ্টেট, ঢাকা। গভর্নমেন্ট তার দাবী অগ্রাহ্য করায় ঢাকায় ডি. জজের আদালতে declaration Suit মামলা file করেন।

এই মামলা আড়াই বৎসর চলে। উভয় পক্ষ মি. A. N. Chowdhury .... উকিল গণ Mr. B. C. Chattarjee, Bar. At. law ও অন্যান্য উকিলগণ এই মামলা লড়েন। এই মামলায় স্বনামধন্য Barristor গণ জজ বাহাদুর পান্নালাল বসুর নিকট নানা আইন ঘটনা চর্চা করেন। জজ বাহাদুর প্রত্যেক বিষয় ও সাক্ষী বিশ্লষণ করিয়া এই সন্ন্যাসীকে ভাওয়াল ষ্টেটের মধ্যম কুমার বলিয়া ঘোষণা করেন। ঢাকা বাসীরা জজবাহাদুরকে ঁধে করে জয়ধ্বনি করিয়া ঘুরিবার প্রস্তাব করেন ও সাদা পাথরের মুর্তি বসাইবার কথা বলেন। কিন্তু জজ বাহাদুর তা অগ্রাহ্য করেন। শেষে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। একটি ঘটনা বলি যে দিন judgment -এর দিন আমার পিতা ·পান্নালাল বসু ফনিবাবুর গাড়িতে মোটরে আসিতেছিলেন ফনিবাবু জিজ্ঞাসা করেন জজবাহাদুর পান্নালালকে "কি judgment হলো"। পান্নালাল বাবু উত্তরে বলেন একটু পরেই শুনিতে পাবেন অর্থাৎ কোর্টে।"

হাইকোর্টে আপীলে জজবাহাদুর Justice Coltello, C. C. Biswas, ... যখন শুনানী হইতেছিল Justic Costello A. N. Chowdhuri কে

remark করেন "Judgment right or wrong is a monumental Work" "Judgement within an admirable language" A. N. Chowduri lost the case. By majority the Bench dismissed the appeal. Privy council (London) এ .. appeal হয়।

Privy Council-ও আইনের ভুল আছে কি না দেখাতে পারে নাই। Dismissed the motion on the ground - "no ground of law could be shown"

That was the end of the case, পান্নালাল বসুর judgement মাননীয় বিষ্ণু ঘোষ যথাযথভাবে উপস্থাপিত করেছেন। পান্নালাল বাবু প্রমাণ করেছিলেন "Dead man came to life" unheard of ......

নাথ বসু

নিবেদন

সমাজের বহুলাংশ মানুষ থেকে দূরে সম্পর্কহীন আমাদের জীবন। অনেকে ভাবেন যে আমরা যারা আইন পেশায় আছি, বেশ আত্মকেন্দ্রিক, সাফল্যের আত্মতুষ্টি আর নিজেদের আয় উপার্জন নিয়ে সারা জীবনটা কাটাই। সম্পর্ক আমাদের এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আদালতের চার দেওয়ালের মধ্যে আসে কত ঘটনা, কত চরিত্র। সাহিত্য তো মানুষ ও তার জীবন নিয়ে। অনেক সাহিত্যিক আইন পেশায় না এসেও আদালতের কাহিনী উপহার দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্য কীর্ত্তির মধ্য দিয়ে। আমাদের কাছে আসে সাহিত্যের অনেক উপাদান। কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তি নেই এই দোহাই দিয়ে সেই উপাদানকে মাধুর্য দিয়ে পরিবেশন করি না, সাহিত্য সৃষ্টি করি না। এটাও সত্যি যে সময়েরও যেমন অভাব তেমনি যে মন যখন সাহিত্য সাধনা করতে চায় তখনই আসে ক্ষুধা নিবৃত্তির তাড়না। তারই মাঝে প্রচেষ্টা যতটুকু সার্থকতার কামনা বাসনা না রেখেই।

ভাওয়াল রাজা বা পাকুড় রাজা ভারতের বিচার কাহিনী হিসেবে জানা বহু পাঠকের। তাঁদের নিয়ে এ অব্দি লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু আইনজীবীর দৃষ্টি ও মানসিকতা নিয়ে প্রয়াস নিয়েছি ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলাকে আবার পাঠক সমাজে পেশ করতে। চলচ্চিত্রের সুবাদে মহানায়ক উত্তম কুমারের মুখটা ভেসে ওঠে মনে — সন্ন্যাসী রাজা না রাজা সন্ন্যাসী? আদালতের নথিতে কি আছে? যতটুকু এর আগে জেনেছি সেটাই কি সব? আইনজীবীরা সে যুগে কি ভাবে সেই বিখ্যাত মামলা পরিচালনা করেছিলেন? বিচারক কি রায় দিয়েছিলেন? কি প্রমাণ এসেছিল? সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। কৌতূহলী পাঠকের কথা চিন্তা করে শত শত ব্যস্ততার মধ্যেও পেশার বাইরের মানুষের জন্য যে টুকু ভেবেছি তাতে কতখানি তৃপ্তি আসবে পাঠকের তা জানা নেই কিন্তু ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা পাবে এই কারণেই আমরা কেউই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক নই। হবার স্পর্ধাও রাখি না। পাঠককুল প্রতিষ্ঠিত কোনো সাহিত্যিকের কাছে যা আশা করেন সেই আশা নিয়ে হয়তো আমাদের এই প্রচেষ্টাকে দেখবেন না।

শ্রীসুধাংশুশেখর দে আমাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করেছেন প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে এবং তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া কিছুই সম্ভব হত না।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না

শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ

মে ১৯৯৮ — শ্রীশিশির পৈতণ্ডী

লেখকদ্বয়ের অন্য বই

মাননীয় বিচারক

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা

বিচারের মূল নথি

প্রথম অতিরিক্ত বিচারক, ঢাকা আদালত, পান্নালাল বসু

১৯৩৬ খ্রীঃ ২৪ আগস্ট

মোকদ্দমা সংখ্যা ৩৮-(১৯৩৫ খ্রীঃ)

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় -- বাদী

বিপক্ষে/প্রতিবাদী

১. শ্রীমতী বিভাবতী দেবী, — প্রধান প্রতিবাদিনী-এর প্রতিনিধি রায়সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ম্যানেজার, কোর্ট অব ওয়ার্ড।

২. সরযূবালা দেবী — প্রতিনিধি (ঐ)

৩. রামনারায়ণ রায়, কনিষ্ঠ — প্রতিনিধি (ঐ)

৪. আনন্দকুমারী দেবী — প্রতিনিধি (ঐ)

এই মামলায় প্রধান যে প্রশ্নটি উত্থাপিত আছে তা হচ্ছে প্রকৃত ঘটনাটা কি। এটা নজিরবিহীন মামলা নয়, কিন্তু অত্যন্ত অসাধারণ মামলা এটি এবং সম্পত্তির বিশালতা থেকেও গুরুত্ব উদ্ভূত হয়েছে।

বিশেষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে এর বিষয়টি হচ্ছে বাদী নিজেকে জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলে পরিচয় দিয়েছে এবং তিনিই প্রকৃত কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলে মামলায় উল্লিখিত অবিভক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিকারী বলে ঘোষণা করে ডিক্রি-র জন্য আবেদন করেছে। এই এস্টেটের সংক্ষিপ্ত নাম ভাওয়াল রাজ। তিনি আরো প্রার্থনা করেছেন, যে সম্পত্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান, তার উপর তার অধিকার সমর্থন ও অনুমোদন করা যেতে পারে অথবা আদালত যদি সিদ্ধান্ত নেয় এর অস্তিত্ব নেই তাহলে ক্ষতিপূরণ করতে পাবে।

অন্যদিকে প্রতিবাদীর মতে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ মৃত এবং বাদী হচ্ছে একজন প্রতারক।

এখন আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পারিবারিক ইতিহাসটি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কিছু ঘটনা আছে, যার মধ্যে গোলমাল নেই, কিন্তু সওয়াল-জবাবকে প্রকৃত উপলব্ধি করার জন্য এগুলি অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে বিবৃত করতে হবে এবং কোন পরিস্থিতিতে বর্তমান দাবি এসেছে তার নির্ণয় করতে হবে।

ভাওয়ালের জমিদার রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় পূব বাঙলার এক বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯০১ সালের ২৬ এপ্রিল। এদের পদবীটি ছিল ব্যক্তিগত, কিন্তু পরিবারটি ছিল প্রাচীন। যদিও খুব একটা বিখ্যাত ছিলেন না, তবে ঢাকার প্রথম হিন্দু জমিদার-পরিবার রূপে সম্মানিত ছিলেন। ঢাকার থেকে ২০ মাইল দূরে জয়দেবপুর নামে একটি গ্রামে পরিবারটি বসতি স্থাপন করে। এটি অবস্থিত ছিল ভাওয়াল পরগনার মধ্যবর্তী স্থানে। এদের এস্টেটটি ছিল বিশাল এবং সৌন্দর্যে ভরা। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা জুড়ে ছড়িয়ে। ঢাকায় রাজার একটি বাসস্থান ছিল। কিন্তু তিনি সাধারণত পারিবারিক গৃহে বসবাস করতেন এবং সেই অঞ্চলের মহৎ ব্যক্তি হিসাবে নিঃসন্দেহে তার স্থান ও প্রভাব ছিল সর্বোচ্চ। ১৯০১ সালে তার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ৬,৪৮,৩৫৩ টাকা। সেই আমলে এই আয় খুব একটা অল্প ছিল না।

রাজা মৃত্যুর পর রেখে গেলেন বিধবা পত্নী রানী বিলাসমতী, তিনপুত্র ও তিন কন্যাকে। পুত্ররা হলো রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং রবীন্দ্রনারায়ণ রায়। বয়ঃক্রম অনুসারে এরা পরিচিত ছিলো বড় কুমার, মেজ কুমার ও ছোট কুমার হিসাবে। কন্যারা হলেন ইন্দুময়ী, জ্যোতির্ময়ী ও তারিণীময়ী। ইন্দুময়ী ছিলো সবচেয়ে বড় সন্তান। জ্যোতির্ময়ী হচ্ছে দ্বিতীয়, তারপর এসেছিল পুত্ররা এবং সবচেয়ে ছোট ছিল তারিণীময়ী দেবী।

রাজা মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি ও উইলের একটি দলিল সম্পাদন করেছিলেন। যদিও এর প্রকৃত শর্তাদি জানা যায়নি। যতদূর জানা যায় সবার সম্মতিক্রমে এই এস্টেটে রাজার মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নী রানীর অধিকার কায়েম হবে তিন পুত্রের অছি হিসাবে। ১৮৯৭ সালের ২১ জানুয়ারিতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অছি হিসাবে এই এস্টেট পরিচালনা করলেন। এই ঘটনার পর আইনত ন্যায়বিচার প্রাপ্ত হয়ে তিনপুত্র সম্পত্তির মালিক হলো এবং তখন সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক হিসাবে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল না এবং এখনও মালিক থাকতেন। যদি জীবিত থাকতে অথবা তিনি যদি সংসার ত্যাগ না করতেন এবং মারা যেতেন — তাহলে হিন্দু আইন অনুসারে এটি হত সামাজিক মৃত্যু।

মায়ের মৃত্যুর পর তিনজন কুমার পূর্বের মত অবিভক্ত যৌথ হিন্দুপরিবারে বাস করতে লাগল। তারা ছিল একান্নবর্তী পরিবার। তারা পূর্বেই বিবাহিত ছিল। ১৯০০ সালে বড় কুমারের বিবাহ হয়েছিল সরযূবালা দেবীর সাথে, তিনি ছিলেন এই মামলাব দ্বিতীয় প্রতিবাদী। মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়েছিল ১৯০২ সালে প্রথম প্রতিবাদী বিভাবতী দেবীর সাথে। এবং মামলার চতুর্থ প্রতিবাদী আনন্দকুমারী দেবীর সাথে ১৯০৪ সালে তৃতীয় কুমারের বিবাহ হয়েছিল। পরিবারটি জয়দেবপুরে বাস করত এবং বিবাহিত তিন কন্যা পরিবারেব সদস্য হিসাবে বাস করত। পরিবারের আরেকজন সদস্য ছিলেন পিতামহী রানী সত্যভামা দেবী, যিনি পুত্র রাজা রাজেন্দ্রকে হারিয়েছিলেন। রাজার একটি বোন ছিলেন, তাঁর নাম কৃপাময়ী। যিনি প্রকৃতপক্ষে পরিবারের সদস্য হলেও বাস করতেন স্বামীর সঙ্গে বাড়ির অন্য একটি অংশে।

সালটা ছিল ১৯০৯। ঐ বছরের ১৮ এপ্রিল মেজকুমার দার্জিলিঙের উদ্দেশে বাড়ি থেকে রওনা হলেন। তিনি প্রথম প্রতিবাদিনী তাঁর স্ত্রী-সহ দার্জিলিয়ে পৌঁছলেন ২০ তারিখে। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর ভাই বাবু (পরবর্তীকালে রায়বাহাদুর) সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং কেরানি ও ডাক্তার-সহ একদল কর্মচারী। ৮ মে বলা হল স্বল্পক্ষণের অসুস্থতায় কুমারের মৃত্যু হয়েছে এবং ১১ তারিখ রাতে তার সঙ্গীসাথীগণ জয়দেবপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রথম প্রতিবাদী, তাঁর বিধবা স্ত্রী ছিলো সন্তানহীনা। সে এস্টেটে তার স্বামীর সম্পত্তির অংশ অধিকার করতে সফল হয়েছিলো। মাত্র ২৮ বছর বয়সে ১৯১০ সালে বড় কুমারের

মৃত্যু হয়। ১৯১৩ সালে প্রায় ২৭ বছর বয়সে তৃতীয় কুমারের মৃত্যু হয়। তাদের বিধবারা ছিল দুজনেই সন্তানহীনা এবং এই বিধবারা সম্পত্তি অধিগ্রহণ করল। এবং তখন থেকে তাদের স্বামীদের অংশের অধিকারী হল। প্রথম প্রতিবাদী রানীও কুমারের সংশয়াচ্ছন্ন মৃত্যুর পর থেকে তার অংশের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো. ১৯১১ সালে Court of Words দ্বিতীয় রানী ও জীবিত তৃতীয় কুমার যোগ্যতাহীনতার জন্য সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করল এবং ১৯১২ সালে প্রথম রানীর সম্পত্তি তারা অধিগ্রহণ করল। এই দুই রানী কলকাতায় বসবাসের জন্য গমন করলো। তখন থেকে সেখানেই তারা বাস করতে লাগলো এবং এস্টেটের আয়ের একটা মোটা অংশ court of word এর কাছে গ্রহণ করতো। তৃতীয় রানী তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই ঢাকা ত্যাগ করলো বটে কিন্তু কয়েকবছর পর ঢাকা ফিরে সেখানেই বসবাস করতে লাগলো স্থায়ীভাবে। ১৯১৯ সালে সে একটি পুত্রকে দত্তক নিলো এবং এই পুত্রটিই তৃতীয় প্রতিবাদী রামনারায়ণ রায়। একটি চুক্তির ফলস্বরূপ এই দত্তক গৃহীত হল এবং সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার পরিবর্তে একটি অংশ ত্যাগ করতে হল. যদিও বাইরের সমস্ত দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে আদালতের দ্বারা court of word কর্তৃক পরিচালিত হতে লাগল. সম্পত্তির বাদবাকি অংশও এদের দায়িত্বে ছিল। সুতরাং ১৯২০ সালে যে পরিস্থিতির উদয় হল, তা হল - এস্টেট court of words এর দায়িত্বে, তিন রানী ও দত্তক পুত্রটি তাদের সম্পত্তির অধিকারী।

এই ঘটনার পর ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে বা ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে ঢাকায় আবির্ভূত হলো এক সন্ন্যাসী। সে দিবারাত্র এক জ্বলন্ত ধুনির সামনে মুখ করে বসে থাকতো বাকল্যান্ড বাঁধের ওপর একই স্থানে। এই বাঁধ ছিল ঢাকার বুড়িগঙ্গার কিনারায়, জনসাধারণের বেড়াবার জায়গা. যেখানে লোকে সকাল-সন্ধ্যায় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য হাওয়া খেতে আসত। লোকটি দেখতে ছিল সন্ন্যাসীর মত, একটি লেঙটি ছাড়া আর তার পরনে কিছু ছিল না। সারা গা ভস্মাচ্ছাদিত, দীর্ঘ দাড়ি, দীর্ঘ জটা মাদুর বোনা দড়ির মত পিঠের উপর পড়ে থাকত। এই সন্ন্যাসীই ছিল বাদী।

বাদীর মামলার নালিশপত্রে বলা হয়েছে তিনিই মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রথম প্রতিবাদিনী বিভাবতী দেবীর স্বামী। সওয়ালে তিনি বলেছেন --- ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে সে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য স্ত্রী ও অন্যান্য সঙ্গীসাথীসহ দার্জিলিঙে গমন করে ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার চিকিৎসা চলাকালীন তাকে বিষ দেওয়া হয়. সে অচেতন হয়ে পড়ে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং রাতে তাকে একটি শ্মশানে নিয়ে আসা হয় দাহের জন্য। তারপর আরম্ভ হয় ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি এবং যে সব লোক তাকে বহন করে এসেছিল তারা মৃতদেহ ফেলে অন্য কোথাও আশ্রয় নেয়। যখন তারা ফিরে আসে তখন তারা মৃতদেহকে দেখতে পায় না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাদীর জ্ঞান ফিরে আসে এবং সে নিজেকে একদল নাগাসন্ন্যাসীর মধ্যে আবিষ্কার করে -- যারা তার সেবাযত্ন করে তার স্বাস্থ্য কিছুটা ফিরিয়ে দিয়েছিল। সে নাগাদের সঙ্গে বাস করতে লাগলো, বিষের প্রভাব

তার অতীত স্মৃতি মুছে দিয়েছিল। সে নাগাসন্ন্যাসীদের একজন হিসাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তাদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলো, পার্থিব আকর্ষণ হারিয়ে ফেললো। তার পরিভ্রমণের অধ্যায়ে ১৯২০ সালের শেষদিকে বা ১৯২১ সালের প্রথম দিকে সে ঢাকায় এলো এবং সন্ন্যাসীর বেশে বাকল্যান্ড বাঁধের উপর অবস্থান করতে আরম্ভ করলো।

সেখানে অবস্থানকালীন তার গল্প ছড়িয়ে পড়ল। তাকে অনেক লোক মেজকুমার হিসাবে শনাক্ত করল। আঞ্চলিক জমিদারগণ তাকে বোঝাল যে সে হচ্ছে কুমার এবং তার পরিচয় ঘোষণার জন্য তাকে চাপ দিল। বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে না পেরে সে আত্মপ্রকাশ করলো এবং তার লোকজন তাকে জাগতিক বিষয়ে যুক্ত হতে পরামর্শ দান করলো। প্রজাগণ তাকে গ্রহণ করল এবং তাকে খাজনা ও 'নজর' দিতে আরম্ভ করল। ১৬ মে, ১৯২১ জয়দেবপুরে অনুষ্ঠিত একটি বড় সভায় তাকে মেজকুমার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল এবং এস্টেটের খাজনার অংশ সংগ্রহ করতে শুরু করলো সে। কিন্তু মেজকুমারের স্ত্রী ও তার ভাই ষড়যন্ত্র করে ঢাকায় তৎকালীন কালেক্টর মিঃ লিন্ডসেকে মেজকুমারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করল। কালেক্টর ১৯২১ সালের ৩ জুন মেজকুমারকে ঠগ, প্রতারক ঘোষণা করে একটি নোটিশ জারি করলো। ১৯২৬ সালের ৮ ডিসেম্বর বাদী শুল্কসভার (Board of Revenue) নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করে। কিন্তু ১৯২৭ সালের ৩০ শে মার্চ এটি প্রত্যাখাত হয়। ১৯২৯ সালে, Criminal procedure code এর ১৪৪ ধারার অন্তর্গত এক আদেশ জারি হয় তার উপর, বলা হয় যে জনৈক সুন্দর দাস নামে ব্যক্তিকে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর বেশে জয়দেবপুর থানার চৌহদ্দীর মধ্যে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়। যদিও এই আদেশকে ঠিকমত পালন করা হয়নি, বাদী আশঙ্কা করেছিল যে যদি সে জয়দেবপুরে যায়, পথের মধ্যে বাধা দেওয়া হবে। সে দাবি করে যে সে খাজনা গ্রহণের অধিকারী, প্রথম প্রতিবাদিনীও তার হয়ে Court of words-এর পরিচালক প্রজাদের বিরুদ্ধে বেআইনি স্বীকৃতিপত্র দাখিল করছে। কিন্তু তার অধিকার বিদ্যমান আছে।

তার স্ত্রী অসৎ পরামর্শে প্রণোদিত হয়ে তাকে আদৌ না দেখে তার ব্যক্তিগত পরিচিতিকে অস্বীকার করেছে এবং তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে নানারকম কুৎসা আরোপ করছে। দ্বিতীয় প্রতিবাদিনী বড় রানী ব্যক্তিগতভাবে মেজকুমারের পরিচিতিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কিন্তু court of words-এর ম্যানেজার, যে বড়রানীর সম্পত্তির অংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল বাদীর প্রতি ছিল প্রতিকূল, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিবাদীও একই রকম শত্রুতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, যদিও তাদের আচরণে স্পষ্টভাবে তারা কিছু বলেনি। তৃতীয় প্রতিবাদিনী ছোট রানীর দত্তক পুত্রের ক্ষেত্রে, বাদী জানত না এই দত্তক আদৌ কার্যকরী কি না, কিন্তু সে এস্টেটের সম্পত্তির একটি অংশের অধিকারী এবং সেজন্য একটি পক্ষ হিসাবে বিবেচ্য।

এটি একটি অভিযোগের মামলা: বলা হয়েছে যে বাদী হচ্ছে ভাওয়ালের মেজকুমার এবং সেহেতু এস্টেটের তৃতীয় অংশের উত্তরাধিকারী, যাতে তার অধিকার আছে বলে সে অভিযোগ করেছে। আসলে বাদীর প্রার্থনা ছিল তার সম্মানের পক্ষে একটি ঘোষণা এবং আদালতের হুকুমনামা জারি করা, কিন্তু পরবর্তীকালে, পাকাপাকি স্বীকৃতির জন্য আরেকটি আবেদন পেশ করা হয়।

ইতিমধ্যে প্রতিবাদীদের চিহ্নিত করা হয়েছে; (১) বিভাবতী দেবী — মেজকুমারের বিধবা পত্নী; (২) সরযূবালা দেবী — বড়কুমারের বিধবা পত্নী: এবং (৩) রামনারায়ণ, তৃতীয় কুমারের দত্তক পুত্র; (৪) আনন্দকুমারী দেবী, তৃতীয় কুমারের বিধবা পত্নী। প্রথম তিনজন প্রতিবাদী কোর্ট অফ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে এদের প্রতিনিধি ছিল এস্টেটের ম্যানেজার।

এই মামলা হয়েছিল প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রতিবাদীর দ্বারা। প্রথম ও তৃতীয় প্রতিবাদী একটি লিখিত বিবৃতি নথিভুক্ত করে এবং ৪র্থ প্রতিবাদিনী অন্য একটি। ২য় প্রতিবাদী বড় রানী এই প্রতিযোগিতায় ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে সে শপথ করে ভাওয়ালের মেজকুমার হিসাবে বাদীর পরিচিতির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে রমেন্দ্রর ১৯০৯ সালের ৮ মে মৃত্যু হয়েছিল দার্জিলিঙে এবং বাদী হচ্ছে একজন ঠগ।

বলা হয়েছে যে বাদী সম্পত্তির অধিকারী ছিল না বা তাকে কেউ মেজকুমার হিসাবে শনাক্ত করেনি। সে আদৌ বাঙালি নয়, এবং কখনো বাঙলা জানত না। এবং কিছু ফন্দিবাজ লোকের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল। চতুর্থ প্রতিবাদিনী তৃতীয় রানী অভিযোগ করেছিলো যে কুমারের যে তিনজন বোন প্রাসাদে পরিবারের সদস্য হিসাবে কুমারের সাথে বসবাস করছিলো তারা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল এবং এই বোনেরা যারা আদালতের সঙ্গে মামলা করেছিল তারা পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীকে মেজকুমার হিসাবে সাজিয়ে পাঠিয়েছিল। কারণ তারা দেখল যে তাদের সমস্ত আশা ১৯১৯ সালের দত্তক গ্রহণের ফলে মাটিতে মিশে গেছে।

প্রজাদের কাছে কোর্ট অব্ ওয়ার্ড কুখ্যাত হয়ে ওঠে, যেমন রাজপরিবারের সম্পর্ক এবং অভিযোগে বর্ণিত কুমারের মৃত্যুর সপক্ষে সাক্ষ্যকে সমর্থন ইত্যাদি।

মামলার সূত্রগুলি যেভাবে সাজানো হয়েছিল —

১. বাদীর কাজের কোন কারণ আছে কি?
২. মামলা কি তামাদি দোষে দুষ্ট (পরিত্যক্ত)?
৩. বর্তমানে যেভাবে মামলা সাজানো হয়েছে, তা কি ৪২ ধারার অন্তর্গত বিশেষ নির্দিষ্ট মুক্তি 'আইনে' তামাদি?
৪. মেজ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় কি জীবিত ?
৫. বর্তমান বাদীই কি ভাওয়ালের মেজ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়?
৬. মামলাটি কি সঠিক মূল্যায়িত ও যথেষ্টভাবে বৈশিষ্ট্যসূচক?

৭. বাদী কি ভাওয়াল এস্টেটের সম্পত্তির কোন অংশের চিরকালীন উত্তরাধিকারী ছিলেন?

৮. বাদী কি মামলার শেষ অংশের ২য় অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভিযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে দাবিকৃত সম্পত্তির জন্য যোগ্য?

(বিচারকের মন্তব্য)

সূত্র ১

মামলা চলবে। আমি কার্যকারণ খুঁজছি।

সূত্র ৩

সূত্রটির সওয়াল জবাব হয়নি এবং অবশ্যই প্রসঙ্গ ওঠে না। মামলাটি ঘোষণামূলক মামলা নয়। বিশেষ নির্দিষ্ট মুক্তি আইনের ৪২ ধারা বাধা সৃষ্টি করে না।

সূত্র ২,৬,৭,৮

আমি ৪ ও ৫ নং সূত্র নিয়ে কাজ করার পর প্রত্যেকটি সূত্র সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজখবর নথিভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

সূত্র ৪ ও ৫

প্রথম এবং সর্বাগ্রবর্তী প্রশ্ন হল বাদীই ভাওয়ালের মেজকুমার কি না।

আমি সূত্র ৫ বিষয়ে প্রতিযোগিতাকারী প্রতিবাদীগণের বিভিন্ন মতামতকে উপস্থিত করাতে অনুমতি দিয়েছি যা হতে পারত। এই দুটি সূত্রের অধীনে যে ধারণা আছে তা হল, বাদী অবশ্যই প্রমাণ করে মেজকুমার জীবিত, এবং সেই হচ্ছে মেজকুমার। যদি সে প্রমাণ করতে পারে যে সে-ই হচ্ছে মেজকুমার, তাহলে সে জীবিত। যদি সে প্রমাণ করতে না পারে যে সে মেজকুমার নয় তাহলে এই মামলার এখানেই শেষ, সে মেজকুমার জীবিত বা মৃত যাই হোক না কেন, কিন্তু এই দাবিতে মৃত্যু হবে একটা রায়। বাদীর মামলা মৃত্যুর অত্যন্ত কাছাকাছি যায় এবং এই গোলমেলে মৃত্যুকে অনুসরণ করে ১৯২১ পর্যন্ত সম্পাদিত কর্ম অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল সে প্রমাণ করেছে যে সে আর কুমার একই ব্যক্তি, মৃত্যু স্থানচ্যুত হয়েছে। যদি তুমি তোমার বন্ধুকে খোঁজ, তাকে চিনতে যদি ভুল না কর, সেইক্ষণের জন্য, সে জীবিত এবং সে মরেনি। যাইহোক, প্রশ্ন হচ্ছে বাদীই ভাওয়ালের মেজকুমার কি না।

বিষয়টি ছোট এবং সহজ, কিন্তু বিচার শুরু হয় ১৯৩৩ সালের ২৭ নভেম্বর। দিনের পর দিন চলে, ছুটির দিন ছাড়া, এবং ১৫ দিন ধরে আমি (বিচারক) যার সাথে যুক্ত ছিলাম। বাদীর পক্ষে ১০৪২ জন সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রতিবাদীদের ৪৩৩ জন সাক্ষীকে। উভয় পক্ষই অসংখ্য তথ্য দাখিল করেছে। শুধু একজন নয় বাদীকে অনেকে সুশৃঙ্খলভাবে শপথপূর্বক শনাক্ত করল এবং অন্যান্য অনেকে সুশৃঙ্খলভাবে শপথপূর্বক শনাক্ত করল না। প্রতিবাদীদের মতে বাদীকে কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানুষের দ্বারা সাজানো হয়েছে এবং এই মামলার বিচারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। অন্যথা

মেজকুমারের সাথে বাদীর কোন সাদৃশ্য নেই। এটা সাক্ষীদের অত্যুক্তি নয়, বিশেষত যারা তার পরিচিতিকে অস্বীকার করেছিল তাদের বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতার দ্বারা এটা বোঝানো হয়েছিল।

বাদীকে পারিবারিক ইতিহাসের ব্যাপক ঘটনাকে প্রমাণ করতে হয়েছিল এবং কুমারের গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ খানিকটা পরিমাণ প্রমাণ দাখিল করতে হয়েছিল, কোন পরিবেশে সে বাস করত ও চলাফেরা করত, তার শিক্ষা, তার অভ্যাস, তার বৃত্তি বা পেশা, তার বৈশিষ্ট্য, তার নৈতিকতা, তার সঙ্গ, তার অসুখ, স্ত্রী ও বোনেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং অন্যান্য সংযোগ, কি ধরনের বাড়িতে সে বাস করত, কোন ধরনের পরিবেশে সে মিশত, কি ধরনের কাপড় সে পরিধান করত, কি রীতিনীতির দ্বারা সে প্রভাবিত ছিল, এবং এমনকি কি ধরনের জিনিস দিয়ে সে খেত, কি ভঙ্গিতে সে খেত। যে কোন মামলায় এই ধরনের প্রশ্ন করতে এগুলি প্রয়োজনীয়, জেরা করার জন্য আরো প্রয়োজনীয় — বাদীকে যা করা হয়েছিল। এর অধিকাংশ মেজকুমারের স্মৃতিতে ছিল না, কিন্তু তার সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে ছিল।

আমাকে বিস্তৃতভাবে এই জেরাকে পরীক্ষা করতে হবে এবং এখানে যা বিবৃত হয়েছে তাই হচ্ছে একমাত্র দিকনির্দেশক যে অনুসন্ধান স্থির সিদ্ধান্তে আসতে কতদূর যেতে বাধ্য। যেমন কুমার 'ক্রুইট' (নুন, লঙ্কার গুঁড়ো ইত্যাদি রাখবার শিশি বা পাত্র) শব্দটি জানত কি না। এটা কেবল শিক্ষার বা ইংরাজি জ্ঞানের প্রশ্ন নয়, দেখা যাচ্ছে বাদী সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত, ব্যতিক্রম হচ্ছে সে হচ্ছে সে মেজকুমার হওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরাজী ও বাংলা স্বাক্ষর করতে পারে, কিন্তু পুরো প্রশ্নটার মধ্যে আসছে জীবনধারণের রীতি যেমন ক্রুইট, মেনু, ফর্ক বা লাউঞ্জ সুট বা মিস্ হন বাঙ্ক্ এর মত শব্দ শিখে নেওয়া এবং ক্রীড়া ও বৃত্তির প্রশ্ন যা কুমার খেলত ও অনুসরণ করত এবং কতখানি সে জিনিসগুলি সম্বন্ধে নয়, তার ইংরাজি নাম সম্বন্ধেও জানে?

পারিবারিক ইতিহাস ও পরিবেশের কথা বাদ দিলেও শিক্ষার প্রশ্নটি স্বয়ং একটি ব্যাপক বিষয়, বাদীর ঢাকায় আগমনের সময় থেকে তার আচরণবিধির-যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই সাক্ষ্য তার আচরণ প্রকাশ করেছে এবং অস্পষ্টতা খুব অল্পই থেকে গেছে। আরেকটি সাক্ষীর দল কুমারের সাথে দার্জিলিং ভ্রমণে গিয়েছিল এবং এই পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত ছিল কুমারের অসুস্থতা, চিকিৎসা, সন্দেহজনক মৃত্যু ও শবদাহ। আরেকটি সম্প্রদায়ের প্রশ্ন ছিল বাদী কি হিন্দুস্থানী অথবা সে কী অউজলার মাল সিংহ? পাঞ্জাবের একটি গ্রাম, যে তার বাল্যকালে ছিল একজন রাখাল, সন্ন্যাস নেবার পর তার নাম হয় সুন্দর দাস, বিচারের সময় এরকম একটা রটনার সৃষ্টি হয় কিন্তু সওয়াল জবাবে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় না। অভিযোগে বর্ণিত বাদীর অন্তর্ধানের সময় কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা থেকে ধারণা করা হয় সে কুমার। দুতরফ থেকেই বিশেষজ্ঞদের আহ্বান করা হয় হাতের লেখা শনাক্তকরণের জন্য, ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত অসুস্থতার জন্য এবং

সন্দেহজনক মৃত্যুর জন্য। বাদী তার সওয়াল জবাবে বলেছিল যে তার অন্তর্ধানের সময় সে স্মৃতিশক্তি হারিয়েছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য যতদূর সম্ভব এগুলি ফোটো থেকে নির্ণিত হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই পরিচিতির বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নিয়ে উভয় পক্ষের সাক্ষীগণ দ্বন্দ্বরত হয়ে ওঠে। মামলার একটি স্তরে প্রতিবাদীদের বিশেষজ্ঞ উকিল ক্রমাগত বাদীকে আটক করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছে। বিতর্কিত সূত্রগুলির উপর সাক্ষ্য নিতে অস্বীকার করায় আদালত বসতে পারেনি। যদিও আদালতের স্বেচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা ছিল। মামলা বিনাবাধায় যতদূর চলা সম্ভব চলেছিল। সাক্ষীদের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। বাদী সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসতে প্রস্তুত ছিল। সে চূড়ান্ত স্বীকৃতির কথা বলেছিল কারণ বাদীর বিশেষজ্ঞ উকিল একটি নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখ করেছিল যে দিন সে আশা করেছিল মামলা স্থগিত হবে। এটা নিশ্চিত যে আদালত সাক্ষীদের জেরা করতে অস্বীকার করতে পারেনি, যতদিন তারা বাস্তব সূত্রের উপর কথা বলে যাচ্ছিল এবং যতদিন তারা আদালতের পদ্ধতির অপব্যবহার করেনি।

এখন এটা সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার যে জনসাধারণের পক্ষপাতিত্ব বাদীর উপর। এটা আদালতের মামলা শুনতে আসা ভিড় দেখে যে কেউ ধারণা করতে পারে। তবে এটা বাদীর পক্ষে কোনরূপ সহায়ক হয়নি। আদালতকে সাক্ষ্যের উপরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, জনসাধারণ বা অন্য কারোর মতামতের উপর নয়। বাদীর পক্ষে জনসমর্থন প্রকারান্তরে বাদীর পক্ষে প্রতিকূল এই কারণে যে আদালতকে সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে খুব কাছ থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে যারা বাদীর পরিচিতি সম্পর্কে কথা বলেছিল। প্রতিবাদী পক্ষের মি. চৌধুরী প্রায়ই বলত যদিও এটা মেনে নেওয়া কষ্ট যে জনসাধারণের মতামত বাদীর পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতি। একটা স্তরে যে মতামত ছিল যে এই যুবক, কুমার হল এক গর্বিত, নিস্পৃহ অভিজাত যাকে সাধারণ মানুষ কোন উৎসবের সময় দেখতে পেত। বাদীর গল্প এই ধরনের রোমান্টিক অলীক গল্প। কিন্তু কয়েকশত মানুষ, সব স্তরের এবং অবস্থার, সমস্ত রকমের প্রতিবাদীদের ছয়জন ছাড়া শপথপূর্বক বাদীকে শনাক্ত করেছিল। এই সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত ছিল কুমারের বোন, জ্যোতির্ময়ী দেবী, ভ্রাতৃবধূ, বড় রানী এবং এমনকি সরোজিনী দেবী, একজন সম্মানিতা স্ত্রীলোক এবং দ্বিতীয় রানীর আপন পিসি। যাইহোক, এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের মামলা যাতে একজনকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অনুসন্ধানের শক্তিসহকারে অগ্রসর হতে হবে এবং নজিরস্বরূপ উল্লিখিত সাক্ষ্যের থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

এখন শনাক্তকরণের বিষয়ে ফিরে, যেভাবে অগ্রসর হতে হবে সেটা আমি প্রস্তাব করছি। যে পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ করা হল সেগুলি মূল text এর।

(১) পরিবার: পরিবারের স্থান; পারিবারিক ইতিহাস ১৯০৯ সালের ৮ মে তারিখে মেজকুমারের সন্দেহজনক মৃত্যুর ফলে নিম্নগামী। এই তারিখের পূর্বে যেমন ছিল, তার শিক্ষা, অভ্যাস, পেশা, বক্তব্য, নীতি, স্ত্রী ও বোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক, শুধু তার শিক্ষা এবং ইংরেজি ও খেলাধুলার জ্ঞান ছাড়া পাতা - ১৪-৬২।

(২) ১৯০৯ সালের মে মাস থেকে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যখন বাদী ঢাকায় উপস্থিত হয়েছিল, সেই সব ঘটনার সংক্ষিপ্তকরণ। পাতা ৬৩-৮৫

(৩) বাদী ও প্রতিবাদীদের মামলার পরিণতির দিকে অগ্রসর। পৃ৮৩-১৬২

(৪) শনাক্তকরণের উপর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। পৃ: ১৬৩-২৪১

(৫) কুমারের সাথে বাদীর দেহের তুলনা। পৃ: ২৩৪-২৩৫

(৬) ফটো থেকে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য। পৃ: ২৬৫-২৮৫।

(৭) বাদীর চিহ্ন। পৃ: ২৮৫-৩০৯।

(৮) চলনভঙ্গি, আচরণ, স্বর। পৃ: ৩০৯-৩১১

(৯) শনাক্তরকণ অবস্থার সংক্ষিপ্তসার। পৃ: ৩১১-৩১৩

(১০) বাদীর হৃদয়। পৃ: ৩১৩ - ৩৪৬

(১১) কুমার কি অশিক্ষিত? পৃ: ৩৪৬-৩৭৭

(১২) প্রবেশ ও পরিচালনা। পৃ: ৩৭৭-৩৮৩

(১৩) দার্জিলিং। পৃ: ৩৮৩-৪৮৯

(১৪) বাদী কি অজলার মাল সিং? সে কী অবাঙালি? পৃ:৪৯৫-৫২৩

(১৫) শনাক্তকরণ সম্পর্কিত উপসংহার। পৃ: ৫২৩-৫২৫।

পূর্বপুরুষ গোলক চন্দ্র সম্পর্কে সাক্ষ্যে খুব অল্পই পাওয়া যায়। তার কন্যা স্বর্ণময়ী রাজা কালীনারায়ণের সৎ বোন এবং তারা বাস করত পারিবারিক বসতবাড়িতে, বলা হত রামবাড়ি, যদিও স্বর্ণময়ী বিবাহিতা ছিলেন। পরিবারটি ছিল ব্রাহ্মণ-পরিবার, ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এই পরিবারের প্রথা ছিল পরিবারের কন্যাদের কুলীনবংশজাত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যারা ঘরজামাই হতে রাজি থাকত। স্বর্ণময়ীর পরিবারের শাখাটি ছিল — সে এবং তার দুই কন্যা এবং তাদের ছেলেমেয়ে পরবর্তীকালে অন্য একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় তারা। কিন্তু এটা হয়েছিল ১৩০০ অথবা ১৩০৩ সালে, কুমারের জন্মের পর। স্বর্ণময়ী ১৯১৭ সালে মৃতুবরণ করে। কমলকামিনী, তার কন্যা, বাদীর জন্য গদিচ্যুত হয়। তার আরেক কন্যা মোক্ষদা ছিল মৃত। তার কন্যার পুত্র ফণিবাবু ও কন্যা শৈবলিনী প্রতিবাদীদের জন্য গদিচ্যুত হয়। এই সাক্ষীরা রাজবাড়িতে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৩০০ বা ১৩০৩ সাল পর্যন্ত রাজপরিবারের সদস্য ছিল, যদিও কিছু সময় পূর্বে, স্বর্ণময়ী খাদ্য ও বাসস্থানগত বিষয়ে অন্য একটি অংশে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ফণিবাবু ছোটকুমারের জন্মের ২৬ দিন পরে জন্মগ্রহণ করে।

পরিবারের এই শাখাকে একপাশে সরিয়ে রেখে, আমরা রাজা কালীনারায়ণ রায়কে লক্ষ্য করি। যে সব সাক্ষী তাকে প্রত্যক্ষ দেখেছে তারা বর্ণনা করে তার গায়ের রঙ ছিল লালচে আভাযুক্ত অত্যন্ত পরিষ্কার অথবা একজন সাক্ষী বলেছে, "চুল পিঙ্গলাবর্ণ, চোখ কটা।"অথবা একজন সাক্ষী বলেছে, "কালো নয়।" উমানাথ ঘোষাল নামে নামে একজন ৮০ বছরের বৃদ্ধ বর্ণনা করেছে, "তার চোখ ও চুল, পিঙ্গলা এবং গায়ের রঙ অতি ফরসা।

পিঙ্গলা কথাটি এই অঞ্চলে সাধারণ শব্দ এবং এর অর্থ বাদামী বা বাদামী ধরনের যদিও এক সময়ে প্রতিবাদীদের বিশেষজ্ঞ উকিল মতামত দিয়েছিল যে পিঙ্গলা শব্দটি মামলার কারণে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এই সন্দেহের শেষ হলো যখন প্রতিবাদীদের সাক্ষীরা এই শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করল। নথির একটি ফটোতে আছে রাজা কালীনারায়ণ কেমন করে তাকাত। সে দেখতে ছিল একজন বৈশিষ্ট্যমূলক বাঙালির মত, বিচক্ষণ ও সতর্ক এবং তার শরীরে একটি চিহ্ন ছিল, গাত্রবর্ণের উজ্জ্বলতা এব 'পিঙ্গলা' চুল ছাড়া, মতামত দেওয়া হয় যেটা মেজকুমারের শরীরে পুনরায় দেখা গেছে।

রাজা কালীনারায়ণ—রাজার উপাধি ১৮৭৮ খ্রীঃ লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক প্রদত্ত হয় ঢাকার থিয়েটার হল-এ। তাঁকে বলা হত পূর্ব বাংলার গর্ব। সে ১৮৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করে।

রাজা কালীনারায়ণ মৃত্যুকালে রেখে যায় দুই বিধবা পত্নী — জয়মণি এবং সত্যভামা দেবী, এক পুত্র রাজা রাজেন্দ্র এবং একটি কন্যা — কৃপাময়ী। দুই পত্নী ছাড়া রাজার তৃতীয় পত্নী ছিল — ব্রহ্মময়ী এবং এটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয় যে তার কি হয়েছিল জয়মণি ছিল বড়পত্নী, এবং সত্যভামা ছোট, সুতরাং পরের জনকে বলা হত ছোট ঠাকুরমা। এই মহিলা অথবা তার নাম বহুবার এই মামলায় এসেছে। সে ছিল রাজা রাজেন্দ্রর মাতা এবং কুমারদের ঠাকুমা। বাদী যখন এল তখন সে জীবিত এবং তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সাক্ষ্য অনুসারে সে বাদীকে শনাক্ত করেছিল। ঢাকাতে তার সাথে বাস করতে এসেছিল এবং মারা যায় ১৫/১২/২২ তারিখে একই বাড়িতে।

রাজা রাজেন্দ্র তার এস্টেটে সাফল্য লাভ করেছিল। তখন তার বয়স ২১ বছর। সে মারা যায় ৪৪ বছর বয়সে। সে ১৪ বছর বয়স্কা এক বালিকা রানী বিলাসমণিকে বিবাহ করে। ১৯০৭ সালের ২১ জানুয়ারি ৪৩ বছর বয়সে বিলাসমণি মৃত্যুবরণ করে। এই মহিলা বরিশাল জেলার বানারীপাড়ার এক দরিদ্র কুলীন পরিবারের কন্যা। তার দুই বোন ও দুই ভাই জীবিত আছে। দুই বোন ও এক ভাই বাদীর জন্য পদচ্যুত হয়েছে। অন্য ভাই বসন্ত ভট্টাচার্য রাজবাড়িতে বাস করে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে। কোন পক্ষ থেকেই তাকে ডাকা হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে রাজা কালীনারায়ণ রায় এস্টেটে একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন এবং এই ব্যক্তি রাজা রাজেন্দ্রর মৃত্যুর পর কিছু সময় পর্যন্ত ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত ছিল। তার নাম ছিল কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর। বিচারের সময়ে নামটি প্রায়ই উঠত। সে ছিল একজন বিখ্যাত লেখক, তার কর্মকর্তাদের চেয়েও বিখ্যাত।

রাজার পুত্রকন্যা নিম্নলিখিত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিল—

১. ইন্দুময়ী দেবী (অক্টো - নভেম্বর ১৮৭৮)

২. জ্যোতির্ময়ী দেবী ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র

৩. বড়কুমার রণেন্দ্র (১৯.৯ ১৮৮২)

৪. মেজকুমার রমেন্দ্র (২৮.৭. ১৮৮৪)

৫. তৃতীয় কুমার রবীন্দ্র (১৩.৮.১৮৮৭)

৬. ছোট কন্যা তারিণীময়ী (১৮৯৩)

এই সব তারিখের মধ্যে কোন গোলমাল নেই, এযাবৎ প্রদত্ত তথ্যের কোন অংশেও।

রাজা তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ঢাকা থেকে ১০ মাইল দূরবর্তী জয়দেবপুর গ্রামের রাজবাড়িতে বাস করত। যে বাড়িতে রাজার পুত্রকন্যারা আনীত হয়েছিল তার একটি বর্ণনা অবশ্যই দেওয়া হবে যাতে যেখানে তারা বড় হয়েছিল তাদের অনুসৃত জীবনধারা, যে শিক্ষা তারা গ্রহণ করেছিল, তাদের স্মৃতির বিষয় যে সব জিনিস তারা জানত এবং যে সব জিনিস তারা জানত না তার পরিবেশকে উপলব্ধি করতে পারা যায়। যাতে কেউ অনুভব করতে পারে যে বাদীর প্রতি অভিযোগেব জেরা কি তাকে একজন প্রতারক হিসাবে সাজানোর জন্য অথবা কুমারকে পরাজিত করার জন্য।

জয়দেবপুর একটু বড় ধরমের গ্রাম। ঢাকা থেকে রেলযোগে একঘণ্টার সফর। নথিতে গ্রামের একটি মানচিত্র আছে — রাজবাড়ি ছিল রেলওয়ে লাইনের পূর্বদিকে, যেটা গ্রামের মধ্যবর্তী স্থান ভেদ করে গেছে প্রায় এক মাইল! রেলওয়ে স্টেশনটি ছিল প্রায় আধমাইল রাস্তা। এই অঞ্চলে সংঘটিত কিছু ঘটনাকে বুঝতে হলে এখানকার ভৌগোলিকত্ব সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। আপনি স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে এ রাস্তায় প্রবেশ করুন, এই রাস্তা ধরে উত্তর দিকে যান এবং আর একটি রাস্তায় প্রবেশ করুন যেটা রাজবাড়ি সড়ক বা গ্রামের প্রধান রাস্তা বলে পরিচিত। এটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত, এবং আপনি এই রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে যান, সিকি মাইলের একটু বেশি, যতক্ষণ না আপনি বাম দিকে রাজবাড়িতে পৌঁছুচ্ছেন।

প্রাসাদের বিশদ বর্ণনা, অর্থাৎ রাজবাড়ির অন্দরমহল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ সাক্ষ্যকে বোঝার জন্য প্রদত্ত হবে, কিন্তু গ্রামের অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় প্রথমে বর্ণনা করা যাক। রাজবাড়ির পূর্বদিকে একটি রাস্তা আছে যেটা উত্তরদিকে গেছে, তারপর পূর্বদিকে বাঁক নিয়েছে এবং উত্তর-পূর্বদিকে যেতে যেতে অন্য একটি রাস্তার সাথে মিলেছে, এবং এই দুটি রাস্তা এই রূপে একত্র হয়ে শ্মশানবাড়ি পর্যন্ত গিয়েছে, যেটা ছিল 'চিল্লাই' নদীর ঘাটে পারিবারিক শ্মশানঘাট। যে স্থানে দুটি রাস্তা মিলেছে, সেখানে আছে 'নয়াবাড়ি' — স্বর্ণময়ীর বাড়ি। তার কন্যার পুত্র ফণিভূষণ ব্যানার্জির বাড়ি এবং তার প্রতিবেশীগণ। এটি রাজবাড়ি থেকে আধমাইলের একটু বেশি দূরে অবস্থিত এবং শ্মশানবাড়ি থেকে ১২০ গজ দূরে। চিল্লাই নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে, নদী থেকে রাজবাড়ির উত্তরের সবচেয়ে নিকটতম স্থানটি হচ্ছে সিকিমাইল দূরবর্তী এবং স্থানটির নাম হল কলাই সিকদারের ঘাট। নদীটি ৫০ গজ চওড়া, বর্ষার সময়ে এখানে নৌকা চলে। অন্যান্য ঋতুতে নৌকাকে হয়ত বা দড়ির দ্বারা টেনে নিয়ে যেতে হয়।

জমিসহ রাজবাড়ি প্রায় ১৩½ চেইন (১ চেইন ৬৬ ফুট) লম্বা ও ৫ চেইন চওড়া। মধ্যবর্তী স্থান একটু বেশি চওড়া। রাজার আমলে প্রাসাদের দশটি অংশ ছিল, এটি ছিল

দোতলা, যদিও কেতাদুরস্ত নয়, কিন্তু অসংখ্য ঘর সমন্বিত ও বারান্দাযুক্ত, দু-তলাতেই, তোরণ থেকে দৃষ্ট সামনের অংশটি সবচেয়ে মনোরম। এটি এখনো পর্যন্ত 'বড় দালান' নামে পরিচিত। যেই আপনি রাস্তা থেকে রাজবাড়িতে প্রবেশ করবেন, দেখবেন আপনার সম্মুখে 'বড় দালান' দুপাশে দুটি ছোট ডিম্বাকৃতি বাগান। রাজপরিবার এই বড় দালানে বসবাস করত না। বাদীর জেরার সঙ্গে সম্পর্কিত এই বাড়ির উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হবে। ইউরোপিয়ান অতিথিরা রাজবাড়ি পরিদর্শনে আসত। সাধারণ, রাজার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত জঙ্গলে শিকারের জন্য, তখন এই বাড়িতে তারা বিশ্রাম করত স্বল্পদিনের জন্য। কিন্তু এটি ১৯০১ থেকে ম্যানেজারের কোয়ার্টার হয়ে উঠল। রাজার মৃত্যুর পর এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হল মিঃ মেয়ার।

বড় দালানের পেছনে একটি অঙ্গন ছিল যেটি কাঠের ছাদের উপর ঢেউতোলা লৌহপাত দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এর নাম ছিল 'ন্যাটমন্দির' যেখানে নাচ এবং নৃত্যাভিনয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান— যাত্রা বা কবিগান অনুষ্ঠিত হত। সাক্ষীরা এসব অনুষ্ঠানকে উল্লেখ করেছে 'গণ' হিসাবে। নাটমন্দিরের দুপাশে একটি দোতলা বাড়ি আছে। দুটি তলাতেই আছে বেশ কিছু ঘর— বারান্দাসহ, যেখানে মহিলারা বসে অনুষ্ঠান দেখে। নাটমন্দিরের উত্তরে আছে আরেকটি দোতলা বাড়ি। এর তিনটি ঘরের একটিতে আছে 'ঠাকুর ঘর' যেখানে বছরে একবার 'জগদ্ধাত্রী' মূর্তি স্থাপিত হত পূজার জন্য এবং এটা 'গণ' উৎসবের সময় অনুষ্ঠিত হত। অন্য উৎসবটি ছিল 'পূণ্যাহ' — জমিদারীর পত্তন ও নতুন খাতা চালু করার দিন। এই দিনে উঁচু-নীচু সকল শ্রেণীর প্রজা একত্র হত খাজনা দিতো, 'গণ' উৎসব শুনতো। অন্য দুটি ঘরের মধ্যে একটি ছিল সবুজ ঘর এবং অন্য ঘরটি প্রতিমা সংরক্ষণের ঘর।

এই বাড়ির পেছনের অংশ ছিল 'অন্দরমহল' অথবা মহিলাদের জন্য আভ্যন্তরীণ কক্ষ। এগুলির বর্তমানে যা পুরানোবাড়ি নামে পরিচিত, অস্তিত্ব বিদ্যমান। এর পশ্চিমাংশে আছে আরেকটি অংশ বলা হয় 'পশ্চিমখণ্ড' যেটা ইতিপূর্বে উল্লিখিত, রাজা কালীনারায়ণের বোন স্বর্ণময়ী বসবাসের জন্য ব্যবহার করত।

রাজবাড়ির পেছনে একটি বাগান ছিল। পূর্বদিকে একটা রাস্তা গেছে নদী পর্যন্ত। পশ্চিমে আছে একটি সুন্দর 'দীঘি' — এক মাইলের ৫ ভাগের এক ভাগ লম্বা এবং ৬৬ গজ চওড়া। মহিলারা বাগানের উত্তর দিকের একটা দরজা খুলে দীঘিতে যেতে পারত এবং এর পূর্বতীরে, বাড়ির অভ্যন্তরে বড়দালানের থেকে ৩০ গজ দূরে অবস্থিত ছিল 'মাধববাড়ি' — গৃহদেবতার মন্দির। 'মাধববাড়ির' মুখ হয় দক্ষিণ দিকে, এর একটি ছোট্ট অঙ্গন ছিল, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, দক্ষিণে একটি দরজা ছিল। সেখানে অবস্থিত বর্তমান মূর্তিটি হল মাধবের। একটি পশুর মূর্তি, এবং অন্য মূর্তিটি ছিল জয়দুর্গার। মিশ্র ধাতুর দ্বারা নির্মিত। তৃতীয় মূর্তিটি ছিল তারার, যার মন্দির ছিল মাধববাড়ির উত্তর-পশ্চিমে। একটি পথ দীঘির পূর্বতীরে গিয়েছিল। এই মাধববাড়ির একটি অংশ ছিল বিহ্বলজনক।

মাধববাড়ির পেছনে একটি উন্মুক্ত স্থান ছিল, যার অন্যপাশে 'রাজবিলাস' নামে একটি আধুনিক বাড়ি, ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর থেকে নির্মিত হচ্ছিল তারপর রাজা মৃত্যুবরণ করলো। রাজার মৃত্যুর পর পরিবারটি 'রামবিলাস' এ বসবাস করতে লাগলো। এর কিছু অংশ গোলমেলে ছিল, কিন্তু মামলার এই স্তরে এ বিষয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

একটি ঘরে রাজা কিছুদিন বাস করেছিল এবং যেখানে তার ছেলেমেয়েরা জন্মেছিল ও বড় হয়েছিল। এই ঘরের আনুষঙ্গিক ছিল অসংখ্য দরদালান এবং চাকর ও কর্মচারীর ইয়ত্তা ছিল না। রাজবাড়ির অভ্যন্তরে একটি ঘরে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় ছিল। যেটি নাটমন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত এবং সেখানে একজন্য চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন। রাজবাড়ির অভ্যন্তরে একটি খাজাঞ্চীখানাও ছিল। নাটমন্দিরের পূর্বদিকের একটা ঘরের নাম ফরাসখানা। অন্দরমহলের সাধারণ রান্নাঘর ছাড়াও বড়দালানের উত্তর-পূর্ব অংশে একটি 'বাবুর্চিখানা' ছিল এবং রাজার আমলে অন্ততপক্ষে একজন অহিন্দু রাঁধুনি ধনঞ্জয় সেখানে কাজ করত। বলা হয় এটা বিশেষ করে ইউরোপীয় বা অ্যাংলোইন্ডিয়ান অতিথিব জন্য। বাড়িব বহির্ভাগে একটি স্টুডিয়ো ছিল এবং পরবর্তীকালে পুরানোবাড়ির ছাদে এবং নাটমন্দিরে নাচগান অভিনয়েব জন্য একটি মঞ্চ ছিল। রাজবাড়ির তোরণদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে চোখে পড়বে একটি ময়দান, আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'চাতান', একটি উন্মুক্ত অঞ্চল। রাজার সময়ে এটি ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও অসমতল, পরবর্তীকালে এটিকে পরিষ্কার করে সমতলভূমিতে পরিণত করা হয় পোলো খেলার জন্য। এই ময়দানের উত্তরে রাজবাড়ি রোড এবং পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণেও রাস্তা। ১৯২১ সালের ১৫ মে তারিখে এখানেই হয়েছিল সেই 'বিশাল সমাবেশ'। প্রচুর লোকের আগমন ঘটেছিল। প্রতিবাদী পক্ষ এই সমাবেশের আয়োজন করতে চেয়েছিল জয়দেবপুরে বাদীর আগমনের পরে তাকে জনগণের সম্মুখে পেশ করতে।

রাজবাড়ির অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি হল -- ম্যানেজারের অফিস, একেবারে রাজবাড়ির ঠিক পূর্বে, রাস্তার ওপারে। পশ্চিমদিকের 'দেওয়ানখানা' দীঘির দক্ষিণে যেটা পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালে আঞ্চলিক এম. ভি. স্কুল কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। সরাসরি এটা উচ্চবিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল এবং নামকরণ করা হয় রাণী বিলাসমণি স্কুল হিসাবে। 'চাতান' এর দক্ষিণে রাজার মৃত্যুর পর মেজকুমার আরেকটি আস্তাবল নির্মাণ করেছিল। সেখানে চল্লিশটি বিভিন্ন রকমের ঘোড়া ও গাড়ি ছিল, তৎসহ ছিল একটি রৌপ্যখচিত গাড়ি। চাতানেব পূর্বে রাস্তাব একটি অংশে ছিল 'ডিহি' অফিস, দীঘির পশ্চিমপাড়ে ছিল 'খাস' অফিস। যেখানে রাজার আমলে ম্যানেজার রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাস করতো। রেল স্টেশনের কাছে দাতব্য ঔষধালয় ছিল, হাটের দক্ষিণে রেললাইনের অপর পার্শ্বে ছিল অতিথিশালা, এটাও ছিল রাজাব সম্পত্তি, হাট বসত সোম ও শুক্রবার। এখানে ছিল সাধারণ দোকান-বাজার, হোটেল, আবগারী ও থানা,

পারিবারিক শ্মশানঘাট। শ্মশানবাড়িতে উপাস্যদেবী রাজরাজেশ্বরীর পূজা হত। 'বুড়াবুড়ী' নামে একজোড়া গাছের কাছে ছিল রাজবাড়ির নিজস্ব জলবণ্টনের জন্য একটি পাম্প, যেটি দীঘি থেকে জল তুলে পুরানোবাড়ির ছাতে সাতটি জলাধারে প্রেরণ করত। রাজবাড়ি থেকে দুমাইল দূরে যে পিলখানাটি রাজার মৃত্যুর আগে ব্যবহৃত হত, পরবর্তীকালে চাতানের দক্ষিণ পশ্চিমে এটি নিয়ে আসা হয়েছিল। পিলখানার কাছে ছিল মাহুতদের বাসস্থান। ১৯০৪ সালে এখানে ছিল ২০ টি হাতি, ১৯০৯ সালে মেজকুমার দার্জিলিংয়ে যাওয়ার সময় ছিল ১৬টি হাতি। প্রত্যেক হাতির নাম দেওয়া হত এবং প্রত্যেকের জন্য ছিল 'মাহুত', 'চাকর' ও দুটি ঘাস কাটিয়ে। রেলস্টেশনের দক্ষিণপূর্বে ছিল রাজার সম্পত্তি হিসাবে একটি চা-বাগান, যার তত্ত্বধায়ক ছিল কোন একজন মিঃ ট্রানস্‌বেরী এবং আর একটি বাগান ছিল ২ মাইল দূরে।

এগুলিই ছিল পারিবারিক সম্পত্তির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রদত্ত হিসাবে সাক্ষ্য থেকে যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হয়েছে। এখানে খণ্ডন করার কিছুই নেই বা এখানে গোলমালেরও কিছু নেই। প্রতিবাদীপক্ষ বাদীকে সমস্ত কিছু প্রমাণাদি দাখিল করতে বলেছিল এবং এটা বলা হয়েছিল শুধুমাত্র সমস্ত হিসাবে সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হবার পর। তারা রাজবাড়ির একটি মানচিত্র দাখিল করেছিল এবং ৯৭৭নং সাক্ষীর কাছে পেশ করেছিল তার কাছ থেকে ঘরের সংশ্লিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে জানতে মানচিত্রে উপরতলা ও একতলা প্রমাণিত হয়নি। এই মানচিত্রে কোন সহি ছিল না, কোন তারিখ ছিল না, এটি অজ্ঞাতপরিচয় কর্তৃক নির্মিত, আপাতদৃষ্টিতে সাম্প্রতিক, দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে এটির মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছিল।

সম্পত্তি নির্দেশ করে জয়দেবপুরে কত সংখ্যক কর্মী ছিল, মফস্বলের কর্মী এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এখানে ছিল প্রচুর কেরানি, ভৃত্য, রক্ষী, আর্দালী, দারোয়ান, পাচক, অতিথি, পাম্পার কর্মী, বড় দালানের কর্মী, চিকিৎসালয়ের কর্মী, ফরাসখানার কর্মী, সঙ্গীতের ওস্তাদ। রাজা সঙ্গীতের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, পালোয়ান, মাহুত, পুরোহিত, শিক্ষক, ডাক্তার এবং আরো অসংখ্য কর্মী। মফস্বলে ছিল ৪৪টি 'ডিহী' বা করবিভাগ, প্রত্যেকটির দায়িত্বে ছিল একজন নায়েব, একজন কেরানি এবং মাঝে মাঝে একজন ঠিকা কেরানি ও একজন বা দুজন পিওন নিযুক্ত হত। সেখানে এমন প্রচুর মানুষ ছিল যারা কুমারদের জানত এবং এইসব সাক্ষীরা এসেছিল তাদের মধ্যে থেকে। নিঃসন্দেহে আরো বেশি সংখ্যক আসতে পারত যদি না উদ্দেশ্যপূর্বক তাদের সংখ্যাকে সীমিত করা হত। হয়ত তারা সত্যি কথা বলেছিল — এটা অন্য বিষয়, কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষের শিক্ষিত কৌসুলি সমস্ত মামলার শুনানির পরেও সাক্ষী প্রজাদের জেরার সময়েও এই মতামতের পুনরাবৃত্তি করেন যে মেজকুমার ছিলেন একজন 'ডুমুরের ফুল' বা অদৃশ্য অভিজাত ব্যক্তি, বড়জোর যাকে কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে দেখা যায়।

নলগোলাতে এই পরিবারের একটি বাসস্থান ছিল, বুড়ীগঙ্গাব উত্তরে, এবং রাজা তার মৃত্যুর পর কুমারগণ শহরে এলে এখানে প্রায়ই আশ্রয় নিত। বাড়িটি ছিল উত্তরমূখী, নদী বাড়ির পেছনে এবং কাছেই বাড়ির উল্টোদিকে ছিল একটি আস্তাবল, একটি অফিস-নাম ছিল 'মেক্তার দপ্তর', পরিবারের আইনি-দপ্তর। নদীতে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হত একটি সবুজ-নৌকা, একটি বাষ্পীয় লঞ্চ — নাম ছিল 'মতিয়া'। এই বাড়ির কথা সাক্ষ্যতে বিশেষভাবে এসেছে।

কুমারগণ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই ঘরের কথাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কুমারদের পিতার সম্বন্ধে কিছু কথা বলা এখানে প্রয়োজনীয় এবং ১৯০৯ সাল পর্যন্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণও। Ex. 8 এবং ৩৯-এ রাজার দুটি আলোকচিত্র নথিভুক্ত করা হয়েছে। তার বর্ণ উজ্জ্বল ছিল না, বরঞ্চ শ্যামলা, বা যাকে বলা হয় 'শ্যামবর্ণ'। মনে হয় তিনি তার জ্যেষ্ঠপুত্র বড়কুমারের চেয়েও শ্যামবর্ণ ছিলেন।

রাজার দাড়ি ছিল। সে ছিলো রাশভারী ও সম্ভ্রান্ত চেহারার। শরীরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল মেজকুমারের — তার কান। যখন পরবর্তীকালে মেজকুমারের শরীরের প্রসঙ্গে আসা হবে তখন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু এটা বলা যথেষ্ট হবে না যে আর কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। রাজা, যাকে বলা যায় শিক্ষিত তা ছিলেন না, যদিও একজন সাক্ষী তাকে শিক্ষিত বলে অভিহিত করেছিল, কিন্তু সে ইউরোপীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে ও মিশতে পারতো। তার কন্যা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতে, 'তার বাবা ছিলেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু বেশি নয়, কর্মচারীদের সঙ্গে মেশার পক্ষে যথেষ্ট।' তার কিছু চিঠিপত্র দেখলে বোঝা যায় সে অবশ্যই ইংরাজী লিখতে পারতো। যাইহোক এটা মনে করা ভুল হবে যে সে একজন ইংরেজের মত ছিলো বা তার গৃহ ইংরেজদের ধরনের অথবা তার জীবনধারা ইংরেজদের মতন। একটি ফটোতেও সে উন্মুক্ত গাত্র, সে ছিলো হিন্দু ও ব্রাহ্মণ। যদিও সে উৎসব অনুষ্ঠানে অপ্রচলিত খাদ্যাদি গ্রহণ করতে পারতো, তথাপি সে ছিলো বাঙালি ও বাঙালির মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তার বাসগৃহের কথা ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে। 'বড়দালান' অবশ্যই ইউরোপীয় ধাঁচে সাজানো হয়েছিল, কিন্তু বাড়ির বাকি অংশে কেউ আদৌ ইউরোপীয় রীতি দেখতে পাবে না। কিছু বিষয়ে বাদীর অজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে যেমন — কাপবোর্ড বা সাইডবোর্ড রাজবাড়ির আসবাবপত্রের মধ্যে এবং কুমার বা অন্যান্যদের কাছে এই সমস্ত আসবাবপত্রের ইংরেজী নাম পরিচিত ছিল। এই সূত্রকে বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু এটা বলা যথেষ্ট হবে যে উভয় পক্ষই রাজবাড়ির আসবাবপত্রের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে দ্বিমত পোষণ করেনি। ধর্মীয় উৎসব — দুর্গাপূজা, কার্তিক পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, বাসন্তী পূজা, রথযাত্রায় যখন উপাস্যদেবতা মহাদেব 'মাধববাড়ি' থেকে পিলখানার কাছে একটি স্থানে চিরাচরিত ভাবে যাত্রা সম্পন্ন করতেন। রাজবাড়ির মহিলারা 'অন্দরে' বাস করতেন এবং পর্দানসীন বা 'অসূর্যম্পশ্যা' ধরনের ছিলেন। রেলে যাতায়াত করার সময় তাদের জন্য

পর্দা টাঙানো হত এবং তারা স্টিমারের মধ্যে প্রবেশ করতেন পালকীর মাধ্যমে। এমনকি দার্জিলিঙে, যেখানে পর্দার শাসন আলগা ছিল, সেখানেও মেজরানী মাঝে মাঝে রিকশা করে রাতে ছাড়া বাইরে বেরোতেন না। বড়কুমার ও ছোটকুমার, উভয়েই উন্মুক্তগাত্রে ছবি এক্সিবিট-এ১৭তে দেখানো হয়েছে। কন্যাদের বিবাহ হয়েছে কুলীনদের ঘরে ১২ বছরের নীচে। শিশুদের শিক্ষা শুরু হয়েছে ফরাসের উপর জোড়াসনে বসে সামনের বাক্সের উপর কলাপাতায় হাতে লেখা অভ্যাসের মাধ্যমে। পরিবারটি সাধারণ হিন্দু ভদ্রলোকদের মত জীবনযাপন করত, যেমন করত পুরনো দেওয়ান রসিক রায় (সাক্ষী নং ৯০৭)। বিলু (সাক্ষী নং ৯৩৮), ইন্দুময়ী দেবীর এক পুত্র, জ্যোতির্ময়ী দেবী, এমনকি মেজরানী এবং প্রত্যেকটি সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়েছে, উভয় দিক থেকে তা বিচার করে পারিবারিক খুঁটিনাটি ঘটনা সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে। পরিবারে বাবুর্চি রাখার চল ছিল কেননা রাজা বা তার মৃত্যুর পর কুমারগণ সাহেবদের সাথে সাক্ষাৎ করার সময় ইংরেজী পোশাক পরিধান করত অথবা কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে বা শিকারে যাওয়ার সময় তারা রেশমী পোশাক ব্যবহার করত। ফণীবাবু, স্বর্ণময়ী দেবীর পতি, প্রতিবাদী পক্ষের ৯২ নং সাক্ষী, ১৮৯৩ বা ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত রাজবাড়িতে বাস করত এবং যে অবশ্যই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল, সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে যে কুমারগণ যতদিন সেখানে বাস করেছে ততদিন রাজা সাধারণত ইউরোপীয় পোশাক, এবং মাঝে মাঝে বাঙালি পোশাক পরিধান করতো। এটাই ছিল তার জীবনধারা, রীতি আদর্শ ও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইউরোপীয়। এই মামলার জন্য বিষয়টি একটি ভিত্তি স্থাপন করেছিল যার উপর নির্ভর করে বাদীকে জেরার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সাক্ষী হিসাবে ফণীবাবুর যতটা অপযশ হয়েছিল, ততটা আর কারো হয়নি। পরবর্তীকালে এটা বলা হবে।

দুটি বৈশিষ্ট্য রাজার মধ্যে দৃষ্ট হত — যে বৈশিষ্ট্যদ্বয় মেজকুমারের মধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছিল। সে ছিলো একজন দক্ষ এবং এমনকি মহান শিকারী, আরেকটি হল সে ছিল সঙ্গীতানুরাগী। এর মানে নয় যে গাইতে পারতো। কিন্তু সে খুব ভাল 'তবলা' বাজাতে পারত এবং অল্পস্বল্প সেতার ও ক্ল্যারিওনেটও বাজাত এবং পেশাদার বাদ্যযন্ত্রীও রাখা হত। যেমন এদের একজন ইন্দ্র সেতারী (বাদী সাক্ষী নং ৬৫১)। রাজার স্বভাব ছিল অসংযমী এবং এটাই ছিল মাত্র ৪৪ বছর বয়সে তার অকালমৃত্যুর কারণ।

তার মৃত্যুর পূর্বে তার পরিবারে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল তা হল নিম্নরূপ:

জ্যোতির্ময়ী দেবী ও ইন্দুময়ী দেবী — এই দুজন কন্যার বিবাহ হয় ১২২৬ সনের ২৫শে /২৬শে ফাল্গুন (ইং ১৮৯০ সাল /৮ই/৯ই মার্চ)। জ্যোতির্ময়ীদেবীর বয়স তখন ছিল ৯ বছরের সামান্য বেশি এবং ইন্দুময়ীর ২ বছরের বেশি। জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাথে বিবাহ হয় জগদীশচন্দ্র মুখার্জির। জগদীশচন্দ্র মুখার্জি ছিল একজন ছাত্র, কিন্তু কুলীন বংশের, তার বাড়ি ছিল এই জেলার রোয়েল গ্রামে। ইন্দুময়ীর বিবাহ হয় গোবিন্দচন্দ্র

মুখার্জির সাথে। কোন কন্যাই তাদের স্বামীগৃহে বসবাস করত না। ১৩০৭ সালের ৩১ শ্রাবণ জ্যোতির্ময়ী দেবী বিধবা হয়। এই মামলায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর ভূমিকা মুখ্য। জয়দেবপুরে বাদী যে দিন দ্বিতীয়বার পদার্পণ করে, সে দিন থেকে ৩৭ দিন সে এখানে বসবাস করে তারপরে ঢাকায়। জ্যোতির্ময়ীদেবীও এই গৃহে বসবাস করতো, যদিও সম্পূর্ণ সময়ের জন্য নয়। প্রতিবাদীর জবানবন্দী ছিল এই মহিলাই মামলা রুজ্জু করে।

যখন জ্যোতির্ময়ীদেবী বিধবা হয়, তখন তার এক ছেলে, নাম জলাদ, বুধুবাবু বলে সুপরিচিত, বর্তমান ও দুই কন্যা প্রমোদবালা ও বিভূবালা, যথাক্রমে মণি ও হেণী বলে সুপরিচিত। বিচার আরম্ভ হবার পূর্বে ১৯৩৩ সালে বুধুবাবুর মৃত্যু হয়।

১৮৯০ সালের ৮ বা ৯ মার্চ রাজার দুই কন্যার বিবাহ হয়। পরবর্তী ঘটনা হল জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্বামীর মৃত্যু এবং তারপরে ১৩০৭ সনের (ইং ১৯০৭ সালের ফেব্রু/মার্চ) ফাল্গুন মাসে জ্যেষ্ঠ কুমারের বিবাহ হয়। তার স্ত্রীর নাম ছিল সরযূবালা দেবী। সরযূবালার বাপের বাড়ি ছিল কোলকাতায়। সে ছিল এই মামলার ২য় প্রতিবাদী। বিবাহের সময় বড়কুমারের বয়স ছিল ১৮ বছরের কিছু বেশি এবং তার স্ত্রীর বয়স ছিল ১২ বছর। সরযূবালার পিতা সুরেন্দ্রলাল মতিলাল ছিলো কলিকাতা হাইকোর্টে একজন উকিল। সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় এই ব্যক্তির সামান্য সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে, যা সাক্ষ্য দেয় যে সে নিজেকে রাজপরিবারের সমতুল অবস্থাপন্ন বলে বিবেচনা করত না। এই বিবাহের পূর্বে 'রাজবিলাসের' নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পরে। এটা সম্পন্ন হবার প্রাক্কালে রাজা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ঢাকায় গমন করে এবং লালগোলার বাড়িতে মৃত্যুবরণ করে। তারিখটি ছিল ১৯০১ সালের ২৬ এপ্রিল। বিশেষ ট্রেনে করে তার দেহ জয়দেবপুরে আনীত হয় এবং 'শ্মশানবাড়ি' ঘাটে পোড়ানো হয়।

রাজার মৃত্যুতে রানী বিলাসমণি এস্টেটের অছি (ট্রাস্টি) হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। বড়কুমারের বয়স তখন ১৮ বছর ৭মাস ৭ দিন। মেজকুমারের বয়স ১৬বছর ৮মাস ২১দিন। তৃতীয় কুমারের বয়স ১৪ বছর ৮ মাস ১৪ দিন। বলা বাহুল্য তারা ছিল সকলেই বালক। বড়কুমারের মৃত্যু হয় ১৯১০ সালে ২৮ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে। বয়সের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করলে সহজেই বোঝা যায় তাদের বয়সের জন্ম অবশ্যই কল্পনায়।

কুমারদের পিতার মৃত্যুর আগে তাদের জন্য ছিল দুজন শিক্ষক যাদের কাজ ছিল তাদের শিক্ষা দেওয়া। যেটুকু শিক্ষা কুমাররা গ্রহণ করেছিল, তা পেয়েছিল বাড়িতেই শুধুমাত্র গোলমালের সময় ছাড়া ১৫দিন বা একবছরের কম সময় যুক্ত ছিল ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলের সাথে। এখন দেখতে হবে কি শিক্ষা কুমারগণ গ্রহণ করেছিল তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে। কুমারের ভাগ্নে বিলুর সাক্ষ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, তার মন্তব্য যে বড়কুমার ১৩০৭ সালের কিছু পূর্বে শিক্ষকদের কাছে পড়া বন্ধ করেছিল। তাদের শিক্ষক ছিল দ্বারিকানাথ মুখার্জি ও অনুকূলবাবু। তাদের চেষ্টার ফলাফলের একটি

গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে। বাদীর ক্ষেত্রে এটা ছিল যে সে ও তৃতীয়কুমার বাংলা, ইংরাজী অক্ষর এবং সরল বানানের দিকে মনোযোগ দিতো না এবং তাদের শিক্ষার অবশিষ্ট ফল হচ্ছে যে তাদের স্বাক্ষর করার যোগ্যতা ছিল। বাদীর মামলায়, বিচারে যা প্রকাশিত হয়েছে, এমনকি ইংরাজী স্বাক্ষরে অক্ষরের জ্ঞানও দেখা যায় না, তর্কের খাতিরে শুধু ইংরেজি এন' অক্ষর জাহির করে সে মেজকুমার। প্রতিবাদীর মামলা কৌঁসুলি ব্যারিস্টার এম ঘোষালের কাছে তোলা হয়েছিল, যিনি কমিশনে বিচারকালীন বাদীর পরিচিতিকে শনাক্ত করেছিলেন। তিনি এজাহার দিয়েছিলেন ১৯০৪ বা ১৯০৫ সালে তিনি কুমারের সাথে কলিকাতায় সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাকে যথোচিত মর্যাদার লোকেদের যেরূপ আচার-আচরণ ও কথাবার্তা হওয়া উচিত সেরূপই দেখেছিলেন। কৌঁসুলি মিঃ চৌধুরী তার মামলা এইভাবে পরিবেশন করেছিলেন—

"কথা হচ্ছে, আপনি তাকে সুশিক্ষিত, সুবেশধারী তরুণ বাঙালি অভিজাত হিসাবে দেখেছিলেন।" বিচারপর্বে এই ব্যাপারটিকে গৌণ করা হয়েছে। যখন আমি শিক্ষার প্রশ্নে আসব যেটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে আবশ্যই পৃথকভাবে দেখা হবে, অবশ্য বর্তমান বিষয়বস্তুর মাঝখানে নয়। কিন্তু প্রতিবাদী এই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে একমত যে মেজকুমার ইংরাজী ও বাংলা লিখতে ও পড়তে পারত এবং ইংরাজীতে কথাবার্তা চালাতে পারত। যদি মেজকুমার এমন করতে পারত এবং যদি তার শিক্ষা এমন একটি স্থানে পৌঁছেছিল তাহলে বলা যেতে পারে বাদী মেজকুমার নয়। অন্যদিকে, যদি সে ইংরেজী না জানতো এবং যদি সে ইংরেজী সম্বন্ধে অজ্ঞ হত তাহলে জেরায় জেরায় উত্থাপিত কিছু নির্দিষ্ট ইংরেজী শব্দের সাথে পরিচিত নয় বলে প্রচার করতো সে তার সামনে উত্থাপিত সমস্ত জেরার নাগাল এড়াতো, ভান করত সে-ই মেজকুমার।

মামলার এই পর্বে এটা বলা যথেষ্ট যে কুমারদের শিক্ষা, যেরূপ তারা গ্রহণ করছিল, সেটা তাদের পিতার মৃত্যুর পূর্বে ১৩০৭ সালে ব্যাহত হয়, যতক্ষণ না আরেকজন শিক্ষক মিঃ হোয়ারটন্ তাদের কথোপকথন মূলক ইংরেজী শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হন, এই ব্যক্তি কুমারদের জন্য সবকিছু করতে পারতো। কুমারদের শিক্ষা একসাথে নিবৃত্ত হয় তাদের পিতার মৃত্যুর সাথে, তখন তারা বালক। এই ঘটনার পর কিছু ঘটতে শুরু করে। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বরের সামান্য কিছু পূর্বে একজন মিঃ হেয়ারটন কুমারদের কথ্য ইংরেজী শেখাবার জন্য নিযুক্ত হয়। তারপর, সেই সময়ই বাদী বিলাসমণি ম্যানেজার রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বরখাস্ত করেন। সে রাজা কুমারনারায়ণ রায়ের আমল থেকে এখানকার ম্যানেজার এবং তার বরখাস্তের দিনটির সম্বন্ধে কোন গোলমাল ছিল না। এটা প্রতিপন্ন হয় তার ছেলে রায়বাহাদুর সারদাপ্রসন্ন ঘোষের সাক্ষ্য থেকে, যে বাংলাদেশের একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সে প্রতিবাদীদের জন্য কমিশনের কাছে এজাহার দিয়েছিলো। ১৯০২ সালের ৩১ জুলাই মিঃ হোয়ারটন ইস্তফা দিয়েছিল। ১৯০২ সালের ২৫ জুলাই প্রদত্ত তার ইস্তফা পত্রে সে বলেছে —

প্রিয় মহাশয়া,

আমি পরবর্তী ১লা আগস্ট থেকে আপনার চাকরীর ইস্তেফাপত্র পাঠাতে দুঃখিত হতে বাধ্য, কিন্তু যখন থেকে আপনার চাকরীতে প্রবেশ করেছি, যে আচরণ আমার সাথে করা হয়েছে, তাতে আমার উদ্দেশ্য শুনে আপনি সম্ভবত আশ্চর্য হবেন না, ভদ্রলোক হিসাবে আমার কাছে এটি ব্যতীত অন্য কোন সম্ভাব্য পন্থা ছিল না।

আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দি, প্রথমক্ষেত্রে যে যখন আমাকে ডিভিশনাল কমিশনার ও মিঃ গার্থ আপনার অধীনে চাকরি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিল তখন আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে আপনার তিনপুত্র সম্পূর্ণভাবে আমার দায়িত্বে থাকবে এবং সেহেতু আমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত ছিল তাদের কাজের উপর এবং সাধারণ দৈনন্দিন আচার-আচরণের উপর। আমাকে এও বলা হয়েছিল যে আমাকে আপনার ম্যানেজার রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের আদেশের অধীনে থাকা উচিত। এই সমস্ত শর্তের অধীনে আমি আমার নিয়োগপত্র গ্রহণ করি। আপনি হয়তো জানেন, আমার যোগদানের স্বল্পকাল পরে আপনি আপনার কাজ থেকে রায়বাহাদুরকে বরখাস্ত করেন এবং শুধুমাত্র মিঃ স্যাভেজের অনুরোধেই আমি এই আশায় বালকদের দায়িত্ব নিতে রাজি হই যে হয়তো তাদের পড়াশুনায় উৎসাহ যোগাতে সক্ষম হবো এবং এটা শেখাতে পারবো যে কি করে একজন ভদ্রলোকের সাথে ব্যবহার করতে হয়। এটাও ডিভিশনাল কমিশনারের অনুরোধ ছিল যাতে আপনার আস্তাবলের উন্নতির জন্য এর দায়িত্ব নিতে আমি রাজি হয়েছিলাম। কেননা আপনার ঘোড়া ও গাভীগুলি সর্বদা এক নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্যে রক্ষিত হত এবং এক পরিষ্কার বোঝাপড়ার মধ্যে আমি এই কাজ নিয়েছিলাম যে আমাকে আস্তাবলের সাধারণ দেখাশোনার জন্য প্রতি মাসে ৯০০ টাকা প্রদান করা হবে।

আপনার পুত্ররা শুধুমাত্র সমস্ত রকম সম্ভাব্য উপায়ে তাদের শিক্ষার প্রতিই অবহেলা করেনি, অতি জঘন্য অভ্যাসকে শোধরাবার জন্য তাদের অন্য কোন উপায়ও ছিল না এবং আমার কাছে এর সাক্ষী আছে যে আমার উপদেশ বা আমার শিক্ষা গ্রহণ করার কোন অভিপ্রায় তাদের ছিল না।" চিঠির বাদবাকি অংশে বেতন সংক্রান্ত ও এই রকম বিষয় উল্লিখিত। সুতরাং এটা সঠিকভাবে পরিষ্কার যে মিঃ হোয়ারটন্ রাজার মৃত্যুর পরেই নিযুক্ত হয়েছিল রানীর দ্বারা এবং সেটা প্রতিবাদীগণ এই চিঠির উল্লেখের পূর্বে প্রমাণ করেছে, যে রাজা তাকে কুমারদের কথ্য ইংরেজী শেখানোর জন্য নিয়োগ করেছিলো। বাদীর ৩৫ নং সাক্ষী বলে যে এই সাহেব রানী বা বড়কুমারের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু কুমারদের শিক্ষার পরিবর্তে সে পিলখানা বা এই রকম কিছু দেখাশোনা করত। মিঃ হোয়ারটনের চিঠি বা অন্যান্য সাক্ষ্য অনুসারে হোয়ারটনের আস্তাবল দেখাশোনার ব্যাপারটি মনে হয় সত্যি।

রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কাছাকাছি বরখাস্ত হয় এবং অর্থের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়। তার স্থানে ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হয় বাবু সুরেন্দ্রলাল মতিলাল এবং সে ১৯০২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ম্যানেজারি করে যতদিন না মিঃ মেয়ের ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হন। মিঃ মতিলাল ছিল বড়কুমারের শ্যালক।

ইতিমধ্যে ১৩০৯ সনের ৬ই জ্যৈষ্ঠ্য মেজকুমারের বিবাহ হয়। ১নং প্রতিবাদীর মায়ের লোকেদের কাছে প্রেরিত টেলিগ্রাম ও বিধি অনুসারে বিবাহের তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিবাদীর মায়ের উল্লিখিত তারিখ হল ১৭ জৈষ্ঠ, কিন্তু জেরার মুখে এর যথার্থতার উত্তরে সে বলে ঐ তারিখ হল ৮ আষাঢ়। সে এটা অস্বীকার করে না যেহেতু ১৭ জৈষ্ঠ্যের কথা তার স্মৃতিতে অস্পষ্ট হয়ে আছে এবং তার উপর ঐ টেলিগ্রাম ও চিঠির বিষয়। ৮ আষাঢ়ের দিনটি হয়ত সঠিক এবং নির্দিষ্ট উত্তরের ভিত্তিতে দেখা যায় ১৭ জ্যৈষ্ঠ তারিখটি ঠিক ভাবে সংগৃহীত হয়নি। এটা কিছুটা বিসদৃশ যে তার পক্ষে নিজের বিয়ের তারিখটি ভুলে যাওয়া উচিত হয়েছে কি না এবং এটা এই মন্তব্যকেই মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে যে সে পিসি সরোজিনী দেবীর কথা অস্বীকার করে নিজের বিবাহের দিনকে একটু এগিয়ে বলেছিল। সরোজিনী দেবী কনে যাত্রীদের সাথে এসেছিল এবং ২২ দিনের মত জয়দেবপুরে কাটিয়েছিল বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল। এটা নয় যে সে শুধুমাত্র তখনি মেজকুমারকে দেখেছিল। সে কতদিন এই উৎসবের জন্য অবস্থান করেছিল এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তার বিবৃতিকে সন্দেহ করার পেছনে কোন কারণ নেই যে সে ২২ দিনের মত এই উৎসবে যোগদান করেছিল। প্রতিবাদী নং১-এর বক্তব্যে, বরকনে তার বাড়িতে যায়নি, কিন্তু তাকে আসতে হয়েছিল, বিবাহের দিন স্থির হওয়ার পর এবং তার সাথে এসেছিল তার মামা-প্রতাপনারায়ণ রায়, তার স্ত্রী, পূর্বোক্ত সরোজিনী দেবী, তার নিজের ভাই, ফুলকুমারী দেবী, ভাই সত্যেন্দ্র, এবং কতিপয় চাকর। বিবাহের সময় তার বয়স ছিল প্রায় ১৩ বছর এবং তার ভাই সত্যেন্দ্র যার ভূমিকা এই মামলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনার একটি অংশ, তার বয়স প্রায় ১৭ বছর অর্থাৎ মেজকুমারের চেয়ে প্রায় একবছর ছোট। এই ভদ্রলোক বর্তমানে ধনী। এবং বাদীর বক্তব্য হল যে এই ব্যক্তিই ভাওয়াল এস্টেটের তৃতীয় ভাগ প্রকৃতভাবে ভোগ করছে, অর্থাৎ মেজরানীর কোন উইল নেই।

এবার এই মহিলার অর্থাৎ মেজরানীর পরিবার সম্বন্ধে কিছু তথ্য যে পরিবার থেকে সে এসেছিল, তা বিবেচনা করতে হবে। সে তার মায়ের চার সন্তানের একজন। তার মা ফুলকুমারী, যে বাবু নবকৃষ্ট মুখার্জির কন্যা, যিনি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার পরিবারের সন্তান। উক্ত মহিলার বাবা বিষ্ণুপদ ব্যানার্জি ঐ একই জেলার নোয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী। মেয়ের যখন ছয় বছর বয়স তখন তিনি মারা যান। তার মা ছেলেমেয়ে-সহ ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তার ভাই প্রতাপনারায়ণের বাড়ি বাস করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং তার পরে অন্য ভাই রামনারায়ণের বাড়িতে বাস করেছে। প্রথম প্রতিবাদী বলেছে যে তার মা ও পুত্রকন্যারা মায়ের ভাইয়ের বাড়িতে বাস করত তার বিধবা

হবার পর এবং তার ভাই সত্যেন্দ্রও এই রকম উক্তি করেছে এবং আরো বলেছে যে তার বাবার কিছু সম্পত্তি ছিল। এটা পরিষ্কার যে তার বিশাল কিছু সম্পত্তি ছিল না। দেখা যাচ্ছে সত্যেন্দ্রর শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল, তাকে স্কুলে দাখিল করা হয়েছিল, যতদূর জানা যায় উত্তরপাড়ার স্কুলে সে ভর্তি হয়েছিল। শ্যামাপদ ব্যানার্জির মা ছিল তার মায়ের সম্পর্কিত বোন যাকে কমিশনের সামনে জেরা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে ফুলকুমারী সারাজীবন তার ভাইয়ের কাছে বাস করেছে এবং মাঝে মাঝে স্বামীকে দেখতে গেছে। একজন সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যাক্তির স্ত্রী সারাজীবন তার ভাইয়ের বাড়িতে অবশ্যই নির্ভরশীল হয়ে বাস করে না। সত্যেন্দ্র সাক্ষ্য অনুসারে তার পিতা সম্পত্তি ত্যাগ করেছিল এবং যদিও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তার মা মৃত্যুকালে কিছু অর্থ তার কাছে রেখে যায়। এটা দেখতে হবে এই অর্থ নিজস্ব আয়ের থেকে সঞ্চয় কিনা। ১-১২-০৮ তারিখে লিখিত এক চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেছেন যে তার পুত্র জয়দেবপুরে সময় নষ্ট করছে এবং জিজ্ঞাসা করেছেন যে সে কিভাবে জীবনকে গড়তে চায়, সে পড়াশুনায় অবহেলা করছে কেন? (এক্সিঃ২৯৩ (৬)), কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এটা খাতায়-কলমে সত্য।

১ নং প্রতিবাদী তার চার ভাইবোনের পরিবারেব একজন সদস্য। তাকে তাদের মামার বাড়িতে আনা হয়। এই সত্যেন্দ্রবাবু তার অপর তিনবোনের মধ্যে একমাত্র ভাই। মলিনা জয়পুরের প্রধানমন্ত্রীর পুত্র কান্তিচন্দ্র মুখার্জিকে বিবাহ করে, বিভাবতী মেজকুমারকে বিবাহ করেন প্রভাবতী বিবাহ করে হাইকোর্টের উকিল উমাকালী মুখার্জির পুত্র সুশীলকে। কোন সন্দেহ নেই যে তাদের মামা ছিল উচ্চপর্যায়ের। এই ঘটনার সঙ্গে তাদের 'কুলীনত্ব', কন্যাদের সৌন্দর্য অবশ্যই আরোপিত করতে হবে। একটি বিশেষ আবেদনে ২ নং প্রতিবাদী শুল্ক দপ্তরের কাছে এস্টেটের সম্পত্তিতে তার অধিকারের দাবি ধরে নিয়ে আবেদন করে যে সে উত্তরপাড়ার মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এই একটা কারণে তাকে আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন বলে মনে করা উচিত। সে তার পিতার প্রসঙ্গ আনেনি।

তার তিনজন মামার মধ্যে প্রতাপনারায়ণ জ্যেষ্ঠ, যে ভাগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে জয়দেবপুরে এসেছিল, এবং তার সাথে এসেছিল, তার স্ত্রী অর্থাৎ কনের মামী, কনের ভাই সত্য। সত্য তখন ছাত্র। বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। কনেযাত্রীরা বিদায় নিল এবং কনে সেখানে থেকে গেল। মিঃ সুরেন্দ্র মতিলাল ছিল তখন ম্যানেজার, সময়টা হচ্ছে ১৯০২ সালের মে মাস। রানী অর্থাৎ শাশুড়ী তখন জীবিত ও গৃহের কর্ত্রী, কিন্তু সীমিত অধিকারের। তাহলে দেখা যাচ্ছে রানী সত্যভামা দেবী ও তার সপত্নী জয়মণি দেবীও তখন জীবিত।

বিবাহের একমাস পরে স্ববিবেচনায় মেজরানী কলিকাতায় গমন করে, সঙ্গে যায় বড়কুমার, রানী সত্যভামা, জয়মণি ও কৃপাময়ী এবং সেখান থেকে সে উত্তরপাড়ায় মায়ের কাছে গমন করে, বাড়ি ফেরার পথে কলিকাতায় ১ সপ্তাহ কাটায়। এটাও তার স্ববিবেচনায়, সম্ভবত ৭ই শ্রাবণে। ১০-৮-০২ তারিখে মেজকুমার বাংলায় তাকে একটি চিঠি লেখে, এটি তার মোট ৯ টি চিঠির মধ্যে একটি, এগুলির মধ্যে একটি চিঠি মেজকুমার শুধু তার বোন

প্রভাবতীকে লিখেছিল। বাদীর দ্বারা এইসব চিঠির সত্যতা অস্বীকার করা হয়েছে তার সেই শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে শিক্ষার অধিকারী মেজকুমার কখনো ছিল না। এই প্রশ্ন বিবেচিত হবে কুমারের ' শিক্ষা' এই শিরোনামে।

জয়দেবপুরে ফেরার পর ১ম প্রতিবাদী, যাকে ২য় রানী হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে, ১৩১১ সনের আশ্বিন (১৯০৪, Oct) পর্যন্ত বসবাস করেন। এই সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে মিঃ মেয়ের ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হন, যিনি কমিশনের সামনে প্রতিবাদীদের জন্য এজাহার দেন। বড়কুমারের একটি পুত্র জন্মায়, তিনমাস বয়সে তার মৃত্যু হয়। ২য় রানীর মায়ের কাছে এক চিঠিতে (১৩০৯ সন, পৌষ, ১৯০২ ডিসেঃ) তার দুঃখ প্রকাশ করে। এই সন্তানকে জকি বলে ডাকা হত, জয়দেবপুরে তার নামে ' জকি প্রাইমারী স্কুল' বলে একটি স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল।

১৯০৩ সালের জানুয়ারিমাসে জ্যেষ্ঠ কুমার দিল্লী দরবারে যোগদান করেন। ১৯০৯ সালের ২৪ জানুয়ারি একই দিনে ছোটকুমার ও ছোট মেয়ের বিবাহ হয়। ছোট মেয়ের নাম ছিল তারিণীময়ী, সংক্ষেপে ডাকা হত মাতর। ৪ নং প্রতিবাদিনী আনন্দকুমারীর সাথে ছোট কুমারের বিবাহ হয়। আনন্দকুমারীর বয়স তখন ১২ বছরের কিছু বেশি এবং এই জেলার হবিয়া গ্রামের অভাবী পরিবারের কন্যা ছিল সে। তিনজন রানীর মধ্যে ছিল, একমাত্র ঢাকার মেয়ে, অন্য দুইজন রানীর মধ্যে একজন কলিকাতার মেয়ে একজন আরেকজন বৃহত্তর কলিকাতার মেয়ে। অর্থাৎ উত্তরপাড়ার মেয়ে। মাতর, ছোট মেযের বিবাহ হয়েছিল বাবু ব্রজলাল ব্যানার্জির সাথে, যে ছিল তখন ঢাকার উকিল। সে ছিল আধা 'ঘর জামাই'। দেখা যাচ্ছে সে বারেবারে যাতায়াত করত। যদিও পরবর্তীকালে মাতর তার সাথে ঢাকায় বসবাস করতে বলে এসেছিল, যেখান ব্রজলাল উকিল হিসাবে প্র্যাকটিস শুরু করে। ১৩০৪ সনের ১০ফাল্গুন (১৯১০) ইন্দুময়ীর কন্যা মণির সাথে বিবাহ হয় সাগরের (বাদী সাক্ষী নং ৯৭৭)।

১৯০৪ সালের প্রারম্ভে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল তিন কুমার, তাদের বোন, পুত্র কন্যা ও স্বামী, দুজন পিতামহী রানী সত্যভামা ও জয়মণি। পূর্বদিকে অংশে বাস করত রাজার ভগিনী কৃপাময়ী তার স্বামী ফরিদপুর জেলার বিলাসবাবু সহ, যার আর একজন স্ত্রী ও পুত্রকন্যা ছিল। এই দুই স্ত্রী বাদীর জন্য এজাহার দিয়েছিল। যখন সাক্ষ্যের ব্যপারে আলোচনা করা হবে তখন এদের উল্লেখ করা হবে। কৃপাময়ীর কোন পুত্রকন্যা ছিল না। রাজার মৃত্যুর পর দুটি জিনিস রাজবাড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল— চাটানের দক্ষিণে মেজকুমার একট নতুন আস্তাবল স্থাপন করেছিল, পিলখানা সরিয়ে বাড়ির কাছাকাছি আনা হয়েছিল। এবং একটি চিড়িয়াখানা তৈরি করা হয়েছিল যাতে ছিল দুটি বাঘ, দুটি চিতা, এবং আরো একগুচ্ছ পশুপাখি যার মধ্যে ছিল একটি সাদা শেয়াল। এটা বাদীর দ্বারা উল্লিখিত হয়েছিল। অনেকেই মেজকুমারকে চিড়িয়াখানায় দেখে থাকবে, এটা অগৌরবের বিষয় নয়। ঘটনাটি হল মেজকুমার সাদা শেয়ালটি দেখেছিল এটা সত্যি, কারণ প্রতিবাদীদের একজন সাক্ষীও এটা দেখেছিল।

১৯০৪ সালের জুন মাসের আগে মনে হয় তেমন কিছুই ঘটেনি। ১৫ জুন. মিঃ মেয়ের ঢাকার কালেক্টরের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠায় (এক্সিবিট নং ২৮৪)। এই রিপোর্টে মিঃ মেয়ের এস্টেটের পরিচালকবর্গের সঙ্গে তার নিয়োগকর্তার হস্তক্ষেপের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। এই হস্তক্ষেপকারী হল ব্যক্তিগত চাকর ও কুমারদের মাতা। তিনি অভিযোগ করেন যে মাতা টাকার অপচয় করছে এবং এস্টেটের পক্ষে বেআইনি কাণ্ড করছে । রিপোর্টে বড় কুমারের সম্বন্ধে মিঃ মেয়ের সুখ্যাতি করেন। দুই ছোট ভাইয়ের থেকে বড় ভাইয়ের প্রকৃতির এক দারুণ স্বতন্ত্র ছবি তিনি অঙ্কন করেন যেটা প্রতিবাদীরা গঠন করার চেষ্টা করছিল। যদিও বাদী যেটা প্রমাণ করার চেষ্ট করছিল মিঃ মেয়ের সেই রিপোর্ট অনুমোদন করেনি। যেহেতু কালেক্টরেটের কাছ থেকে আনীত মূল রিপোর্ট পেশ করা হয়নি। যাইহোক, তৎকালীন ঢাকার কালেক্টর মিঃ ব্যানকিন্ দ্বারা রিপোর্টটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। যার কাছে এটা পাঠানো হয়েছিল, তার এটা মনে রাখার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাকে প্রতিপক্ষের সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই রিপোর্টের ক্ষেত্রে মিঃ মেয়ের ও বড়কুমার এক পক্ষে এবং রানী ও তার দুই ছোটো ছেলে অন্য পক্ষে। মিঃ ব্যানকিন্ ও জয়মণির সাক্ষ্য হিসাবে এটা বলা হয়েছিল। মিঃ মেয়ের অধীনে একজন কেরানী ছিল। (বাদী সাক্ষী নং-৩৪) যাকে মিঃ মেয়েব মনে রেখেছিল। সে বলেছিল যে ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রানী মিঃ মেয়েরকে বরখাস্ত করেন। মিঃ মেয়ের, বড়কুমার, এই কেরানী , জয়মণি ঢাকার নবাব শালিমোল্লার কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে দার্জিলিঙে রওনা হয়। সাময়িক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মিঃ মেয়েরের কোন গোলমাল ছিল না সেখানে গোলমাল উপস্থিত হল। শুল্ক বিভাগ একটি আদেশ জারি করল যে এস্টেটকে চলতে দেওয়া উচিত্ কিন্তু মিঃ মেয়েরকে ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত না করে। শুল্ক দপ্তর একজন মিঃ থার্ডকে ম্যানেজার নিযুক্ত করল। অক্টোবর মাসের একদিন মিঃ ব্যানকিন ও মিঃ মিলিগ্যান, তখনকার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, জয়দেবপুরে আগমন করলো এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য এবং যদিও মিঃ মেয়েরের এখানে কোন ভূমিকা ছিল না তথাপি সেও গেল। সমস্ত বিষয়টি রানীকে অবগত করা হল। আশ্চর্য হয়ে মিঃ মেয়ের বলেছেন, এটাই ছিল উদ্দেশ্য ব্যানকিন্ চেয়েছিল এস্টেট ও প্রাসাদের অধিকার নিতে, সে রানীকে দশমিনিট সময় দিয়েছিল সমস্ত মহিলাদের একটি ঘরে নিয়ে যেতে যাতে সে প্রবেশ করে কাগজপত্রের খোঁজ করতে পারে এবং মিঃ মেয়েরকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে কাগজপত্র দেখাতে যদিও মিঃ মেয়ের জানত না সেগুলি কোথায় । বিবেচনা করা যেতে পারে সেই সব দিনের স্মৃতি তার কাছে অত্যন্ত তিক্ত। এটা অদ্ভুত যে মিঃ মেয়ের সে সব কথা বেশি মনে রাখেনি, এমনকি মিঃ ব্যানকিনের চেয়েও, যদিও ঘটনার আগে বা পরে পারস্পরিক সম্পর্কের আদানপ্রদান বলে যে বড়কুমার সমস্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন এবং মিঃ ব্যানকিনের মতে এইজন্য মেজকুমার ও ছোটকুমার এই বিবাদে রানীর পক্ষ নিয়েছিলো ও মিঃ মেয়েরের নিজের সাক্ষ্য অনুসারে তাদের সাথে তার সম্পর্ক অবশ্যই অত্যন্ত তিক্ত ছিল।

মেজকুমার জয়দেবপুরে না থাকাকালীন মিঃ র‍্যানকিন এস্টেটের অধিকার নিয়েছিল। মেজকুমার কলকাতায় গিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মিঃ র‍্যানকিন আকস্মিকভাবে অফিসারদের সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বড়কুমার ও মিঃ মেয়েরের গুপ্ত-ষড়যন্ত্র মাৎ করে তাদের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আওতায় আনতে পেরেছিলেন। মেজকুমার এই সময় পার্ক স্ট্রিটের একটি বাড়িতে উঠেছিলেন। যখন সে এখানে ছিল, এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের আওতায় চলে গিয়েছিল। মেজরানী তখন জয়দেবপুরে ছিল। সে অবশ্য পরে রানী সত্যভামা, তার নিজের একজন ভাই যে সে সময়ে জয়দেবপুরে এসেছিল ও ছোটরানীর এক ভাইয়ের সাথে মেজকুমার যেখানে অবস্থান করছিল সেই পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। তার মতে সময়টা ১৩১১ সনের আশ্বিন মাস এবং সে আরো বলেছে যে রানী আরো প্রায় একমাস পরে কলকাতায় এসেছিল (এবং ছোটকুমার আরো পরে, সন্দেহাতীত সাক্ষ্য অনুসারে) এবং যেহেতু ঐ বাড়িটি ছোট ছিল যেহেতু ৩ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়। এখানে ১৯০৪ সালের মার্চ মাসের কোন একটি দিন পর্যন্ত রানী,তার কন্যারা, তিনকুমার ও তাদের পত্নীরা বাস করেছিলেন। কলকাতায় আগমণের পর সে হাইকোর্টে তার এস্টেটের অধিকারের দাবিতে একটি মামলা রুজু করে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে এবং এই মামলার আবেদনক্রমে ১৯০৫ সালের মার্চে কোর্ট এস্টেটকে মুক্ত করে। এই সময়ে বড়কুমার বাদী সাক্ষী নং ৯৭৭-সাগরবাবুর মতে মট'স লেনের কোন এক বাড়িতে বাস করতেন, কিন্তু তার স্ত্রী পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে ৩ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে বাস করতেন। এই সময়ে মেজকুমারের গতি প্রকৃতির ধারা বা সে কাজের সংস্পর্শে এসেছিল, পরবর্তীকালে সাক্ষ্য তা প্রমাণ করবে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এটা বলা যথেষ্ট, বড়কুমার সহ তার পরিবার ১৯০৫ সালের ২৩ মার্চের পূর্বে জয়দেবপুরে ফিরে যায়, দেখা যাচ্ছে বড়কুমার এই তারিখে জয়দেবপুর থেকে একটি চিঠি (এক্সিবিট নং ৩৩৫) লিখেছিলেন। কিন্তু মেজকুমার মনে হয় আরো কিছুদিন অবস্থান করেছিল সেখানে এবং এই সময়ে একটি আদানপ্রদান ঘটেছিল যা এই মামলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৫ সালের ২৫ মার্চ মেজকুমার একটি বীমাপত্রে সই করে এবং ২ এপ্রিল সে বীমার চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে পরীক্ষিত হয়। এই ডাক্তার মিঃ আর্নল্ড ক্যাডি হ্যারিংটন স্ট্রিটে থাকত। এই মেডিক্যাল রিপোর্টে প্রথাগতভাবে তার পরিবারের সম্বন্ধে কিছু তথ্য নথিভুক্ত করা হয়, মেজকুমারের জন্মতারিখ, অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে তার কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য, নির্দিষ্ট চিহ্ন সহ। এটা দেখতে হবে যে এগুলি বাদীকে শারীরিকভাবে উপযুক্ত বলেছে কিনা এবং কতদূর সনাক্তকরণ করতে পারবে তাকে। কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিবাদীগণ বীমাপত্র চেয়েছিল এবং উপস্থাপিত করেছিল। মৃত্যুর স্বীকৃতিপত্রে হলফ করে বলা হয়েছে ৩০,০০০ টাকা মেজকুমারের গোলমেলে মৃত্যুর পরে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু মেডিক্যাল রিপোর্টে এমন কিছু বলা হয়নি, যদিও শুল্কদপ্তর কর্তৃক ১০ মে চাওয়া হয়েছিল এটি। দিনটি ছিল বাদীকে যখন মেজকুমার বলে ঘোষণা করা হল তার ছদিন পর। ১৯২১ সালের ১৫ জুলাই শুল্ক দপ্তর এটি দেখেছিল। বাদীর অনুরোধক্রমে এই দলিলটি

বীমা কোম্পানির এডিনবার্গ অফিস থেকে চাওয়া হয়েছিল। সময়টি ছিল ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাস যখন শনাক্তকরণের জন্য বেশির ভাগ সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছিল এবং বাদীর পক্ষে ৯৭৭ তম সাক্ষীটিকে জেরার অপেক্ষায় রাখা হয়েছিল।

যখন রাজপরিবার কলকাতায় ছিল তখন রানী দুজন অফিসারকে নিয়োগ করেছিল যাদের মধ্যে একজন এই মামলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাত্র। সে হচ্ছে বাবু যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রায় সাহেব নয়। তাকে তিন কুমারের সেক্রেটারি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু হয়ত সে প্রথম থেকে এই কাজ করেনি, তবে তার পদমর্যাদা ছিল ভাওয়াল রাজ্যের সেক্রেটারি হিসাবে। সে ছিল বাবু সতীনাথ ব্যানার্জি তথা সুপরিচিত সাগরবাবুর ভাই যে ছিল জ্যোতির্ময়ী দেবীর সৎ পুত্র। সাগরবাবুর বিবাহ হয় প্রমোদবালা তথা মণির সাথে ১৩১০ সনের ফাল্গুন মাসে। এই উৎসব উপলক্ষে যোগেনবাবু প্রথমবার জয়দেবপুরে আসে এবং ১৯০৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। এই সময়ে অন্য অফিসারটি নিযুক্ত হয় কলকাতায়। সে ছিল একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ, নাম রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র মৈত্র। সে এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়, এই ভদ্রলোক কলকাতার কোন একজন, বিনোদবাবুকে কুমারদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। কিন্তু সে কুমারদের কাছে আনতে পারেনি এবং এটা এখন মানা যায়, যে একসময় কুমারদের শিক্ষার কিছু অংশ পরোক্ষভাবে তার কাছে প্রদত্ত হয়, কিন্তু এই শিক্ষক তাদের কিছুই শেখাতে পারেনি। এটা স্বীকার্য যে রাজার মৃত্যুর পর শুধুমাত্র মিঃ হোয়ারটন ছাড়া আর কেউ কুমারদের শিক্ষার ব্যাপারে কিছু করতে পারেনি, বিনোদবাবু এখানকার মাইনর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, এবং ১৯০৫ সালের ৯ নভেম্বর যখন এটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয় তখন তিনি হন সেখানকার প্রথম প্রধান শিক্ষক (প্রতিবাদী সাক্ষী নং ৩৪)।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আর কোন ঘটনা ঘটেনি যতক্ষণ না কুমাররা একটি বিতর্কিত দিনে কলকাতায় গমন করে। মেজকুমারের কলকাতা বাসের পর্ব এই মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বহন করে যেহেতু প্রতিবাদী পক্ষের দ্বারা মেজকুমারের ৯ টি চিঠির সত্যতার প্রশ্ন আরোপিত হয়েছিল, কিন্ত বাদীর দ্বারা জালিয়াতি হিসাবে বিরোধিতা করা হয়েছিল। ব্যারিস্টার মিঃ আর সি সেন প্রতিবাদী পক্ষের হয়ে এই সম্বন্ধে প্রামাণিক সাক্ষ্য-বিবৃতি দিয়েছিল। এটা বলা প্রয়োজনীয় কি করে এটা অনুমোদন করা হয়েছে যে কুমারগণ সকলে, মেজকুমারসহ নিশ্চিতভাবে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করেছিল। এই উপলক্ষে তারা রানীর ভ্রাতা কর্তৃক অর্জিত ও উন্নতিকৃত ১৯ নং ল্যান্সডাউন রোডের সমিতিটি অধীনস্থ করে।

১৯০৬ সালের ৪ জানুয়ারি কুমারগণ বা মেজকুমার নিশ্চিতভাবে কলিকাতায় উপস্থিত ছিল। এই তারিখে মেজকুমারের স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে এটা দেখা যাচ্ছে (প্রতিবাদী সাক্ষ্য নং ৪৭০)। যখন সেখানে স্থায়ী হওয়া সম্ভব হল না, তখন তারা জয়দেবপুরে ফিরে গেলেন। ১৯০৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর এক ব্যক্তি তাদের পরিবারের একটি অংশকে কলকাতায় দেখে।

ইন্দুময়ী কুমারদের জ্যেষ্ঠ ভগিনী, মেজরানী, বড়কুমার, অন্যান্য অনেক ব্যক্তি প্রায় ৩৫ জন এই তারিখে আগমন করে। রানীর কাছে প্রেরিত ইন্দুময়ীর একটি চিঠিতে এই তারিখটি হচ্ছে ১৫ পৌষ বা ৩০-১২-০৬ (এক্সিবিট নং ২৩৬)। এরা একটি ভাড়ার বাড়িতে উঠেছিল। সাক্ষ্য অনুসারে এই বাড়িটি হল ১৫৩ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের প্রয়াত মিঃ এ এম বোসের বাড়ি। তারা এখানে এসেছিল যেহেতু মেজরানী রক্তশূন্যতা এবং সম্ভবত রক্তদূষিতায় ভুগছিলেন। মেজরানী এই আগমনের বর্ণনা করেছে এবং তার মায়ের তিনটি চিঠি এই সময়কে প্রমাণ করে (এক্সিবিট নং ৩০২, ৩০৪, ৩০৫)। এই চিঠিগুলির একটি থেকে দেখা যায় যে রানী বিলাসমণি কলকাতায় আসেনি এমনকি ১৯০৭ সালের ৭ জানুয়ারিতেও নয় এবং এই দিনে আশা করা হয়েছিল মেজকুমার কলকাতায় ছিল, কিন্তু সেও আসেনি। বিলাসণি এসেছিল তার পরে—দেখা যায় সে ৯ জানুয়ারি মেজকুমারের সঙ্গে যদি এসে থাকে, কিন্তু এই সূত্রটি ঐ গোলমেলে দুটি চিঠির একটির সংযোগে পরীক্ষা করতে হবে। রানী বিলাসমণি নিশ্চিতভাবে এসেছিল এবং অন্যান্য বহু মহিলা ও আত্মীয়-স্বজনও এসেছিল, তারা এসেছিল ১৯০৭ সালের ১৪ জানুয়ারি গঙ্গায় অর্ধোদয় যোগে স্নানের উদ্দেশ্যে। ১৯ জানুয়ারি রানী কলেরাতে আক্রান্ত হয় এবং ২১ জানুযারি তার মৃত্যু হয়। এই তথ্য মেজরানী ও জ্যোতির্ময়ীদেবীর সাক্ষ্য থেকে গৃহীত হয় এবং এর মধ্যে কোন গোলমাল নেই। এই উপলক্ষে তনকুমার, তিন কন্যা, দুই বড় মেয়ের স্বামী, কৃপাময়ী, সত্যভামা, কৃপাময়ীর স্বামী, রানীর একজন বোন সোনামণি— যে এই মামলায় এজাহার দিয়েছে, তার ভাই বসন্ত মুখার্জির স্ত্রী সহ এই দলের সাক্ষ্যকে সন্দেহ করার কোন কাবণ নেই। এরা সকলে ১৫৩ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে অবস্থান করেছিল, কিন্তু বড়কুমার এই রাস্তার অন্য একটি বাড়িতে উঠেছিল, যদিও তার স্ত্রী নয়। ১৯০৭ সালের ২ জানুয়ারি, রানীর মৃত্যুর পরদিন সকলে বাড়ি ফিরে যায়। কুমারগণ সম্পত্তির পূর্ণ মালিক হলো। ১৯০৭ সালের সেপ্টঃ বা অক্টোঃ মাস পর্যন্ত রায়বাহাদুর যোগেশ ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছিল এবং তারপর ইস্তফা দিয়েছিল (বাদী সাক্ষী নং ৯৫২, তার কেরানী)। ১৯ অক্টো মিঃ জ্ঞানশংকর সেন, একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হন। এই বছর কুমাররা কলকাতায় যায়নি এবং একমাত্র ঘটনা যেটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে হেনী—জ্যোতির্ময়ীর কন্যা ও ফেনী—ইন্দুময়ীর কন্যার বিবাহ হয় ফাল্গুনে। ফেনীর বিবাহ হয় কালামৃধার কোন একজন বীরেন্দ্র ব্যানার্জির সাথে ও ১৩২৬ সালের ভাদ্রমাসে বিধবা হয়। হেনার বিবাহ হয় ঢাকার উকিলবাবু চন্দ্রশেখর ব্যানার্জির সাথে যে এই মামলার এজাহার দিয়েছে। সে হচ্ছে সাগরবাবু সম্পর্কিত ভাই। এরা ছিল পাবনার একটি গ্রামের বাসিন্দা।

এটা জানা যায়নি যে কেন কুমারেরা ১৯০৭ সালে কলকাতায় যায়নি। মেজকুমার সাধারণভাবে সিফিলিস রোগে ভুগছিল। এটা মেনে নেওয়া যায় যে সে তার গোলমেলে মৃত্যুর পূর্বে সিফিলিসে ভুগেছিল। কুমারের শরীরের চিহ্নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটা স্বীকার্য যে তার সিফিলিস ছিল এবং এটা উপদংশজনিত ক্ষতে পরিণত হয়েছিল— হঠাৎ ভোগাত না, কিন্তু ক্ষত ছিল তার কনুইয়ে ও পায়ে। সে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এই

সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্য অবশ্যই কলকাতায় গিয়েছিল। বাদী বলেছে যে সে তিন-চার বছর পূর্বে দার্জিলিঙে গিয়েছিল। বাদী সাক্ষী নং ৯২, ফণিবাবু এটা জানত এবং তাকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হয়েছিল। সে বলেছে তিন বছর পূর্বে বাদী দার্জিলিঙে গিয়েছিল এবং যে এই ব্যাপারে এজাহার দিয়েছিল। ১৯০৭ সাল থেকে এই রোগে বাদী ভুগছিল— এই বছরটি সে নির্দেশ করে—কারণ তখন থেকে সে পারিবারিক সহকারী ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত হয়। সে জানত না কখন থেকে এই রোগের সূত্রপাত হয়েছে। প্রতিবাদীদের মতে এই সময় থেকে মেজকুমারের মাঝে মাঝে জ্বর হত এবং পিত্তশূলে যন্ত্রণা হোত। বাদী এটা অস্বীকার করেছে। বাদীর তরফ থেকে এগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি যে ১৯০৭ সাল বা তার তথাকথিত মৃত্যু পর্যন্ত এমন কিছু বিষয় ছিল, শুধুমাত্র সিফিলিস ছাড়া এবং জ্বর সম্বন্ধে বাদীর ব্যাখ্যা ছিল যে দার্জিলিঙে থাকাকালীন ডঃ আশুতোষ দাশগুপ্তের স্বাক্ষরিত ও লিখিত একটি প্রেসক্রিপশনই এর উৎস যেটা প্রত্যেকেই মানতে অস্বীকার করে যে পিত্তশূলের ফলে একটি আকস্মিক, দূরতিশয় ও ব্যাখ্যাহীন মৃত্যু ঘটতে পারে। বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে বাদীর গোলমেলে মৃত্যুর ব্যাপারে। কিন্তু ১৯০৭ সালে, হয়ত তার শুধু সিফিলিস বা অন্য দুটি রোগও ছিল, কিন্তু তার চেহারা, আচরণে মনে হত অক্ষম বলে। সে শিকারে যেত, তার স্বাভাবিক জীবনধাবায় কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। সে গাড়ি চালাত, ঘোড়ায় চড়ত, ঢাকায় আসত এবং এই বছরে ঢাকার নবাব শালিমোল্লার সাথে টমটম রেসে একহাজার টাকা বাজি জিতে নিয়েছিল (বাদী সাক্ষী নং ৬৭৬,৮১৩)। তার মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও সে অতিথি অভ্যাগতদের সামনে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসহ একজন মানুষ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯০৮ সালে বিষয়গুলি ঘটতে আরম্ভ করে, কিন্তু এগুলিকে অনুধাবন করতে হলে কুমার ও তার পরিবারের সম্পর্কে একটি বিবরণ পেশ করতে হবে, তাদের অভ্যাস, বৃত্তি ও তাদের নীতি। এ সময়ে পবিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনজন কুমার ও তাদের স্ত্রী এবং তিনজন বোন ও প্রথম দুই বোনের ছেলেমেয়ে, ঠাকুমা সত্যভামা ছাড়া, তাছাড়া ছিল পিসীমা, কৃপাময়ী যে তার স্বামীর সঙ্গে পরবর্তী অংশে বাস করত। বোনের সব মেয়েরই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। ইন্দুময়ীর স্বামী গোবিন্দবাবু এই বাড়িতে বাস করত। সে ছিল একজন এম এ বি এল ডিগ্রিধারী। রাজাবিলাসের দোতলা ছিল অন্দর যেখানে বাড়ির মহিলারা বাস করত। সেখানকার পর্দার শাসন এত কড়া ছিল যে চাকর, যদি না তারা ছোট বালক হত উপরে যেতে পারত না। যদিও কুমাররা ছিল কর্তা, তথাপি অন্দরের কর্ত্রী ছিল জ্যৈষ্ঠ কন্যা, ইন্দুময়ী— রানী হিসাবে মায়ের মতোই। এটা ছোট রানীর কিছু চিঠি থেকে পাওয়া যায় যে তাকে সৎমা হিসাবে দেখা হয়। এমনকি ১৯০৯ সালে ঢাকা থেকে লেখা চিঠিতে সে তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে (এক্সিঃ ৩২৭)। বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র যেখানে থাকত সেই আমানতখানার জন্য সে একটি চাবি ব্যবহার করত। সে কুমারদের স্ত্রীদের জন্য গহনা তৈরি করেছিল এবং এস্টেটের দ্বারা মূল্য প্রদান করেছিল (এক্সিঃ ৩২৪)। মনে হয় কুমাররা তাদের বোনেদের পছন্দ করত এবং এর সব কিছুই প্রমাণ করে ইন্দুময়ী ছিল অন্দরের সর্বময়ী কর্ত্রী।

কুমারদের প্রত্যেকেই মিঃ মেয়েরের ভাষায় 'অসংযত জীবন' যাপন করত। ১৯০৪ সালে সে যখন তার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে কালেক্টরের কাছে অভিযোগে করেছিল এই বলে যে বড়কুমার ছিল ভাল প্রকৃতির , তেমনি মেজকুমার ও ছোটকুমার সম্বন্ধেও বলেছিল—

" এই দুই ছোট কুমারের সম্বন্ধে আপনি নিজেও জানেন যে তাদের সাথে কিছু কাজ করা অসম্ভব। তারা সর্বদা নীচু স্তরের সঙ্গীসাথী পরিবৃত থাকে যারা সহজভাবে তাদের সমস্তরকম নিকৃষ্ট কাজ করতে প্ররোচিত করে।" তিনি বলেন, এই দুই কুমার যত দূর জানা যায় অসহায়। এদের কোন শিক্ষা ছিল না। এই সাক্ষ্যে মিঃ মেয়ের বলে যে বড়কুমার ছিল অত্যধিক পানাসক্ত ও নারী আসক্ত এবং এসব সে অনেক আগে থেকেই শুরু করেছে। দেখা যাচ্ছে যে ১৯০২ সালে মিঃ মেয়ের তাকে কলকাতায় পরীক্ষা করেছিল, যাতে সে আশঙ্কা করেছিল বড়কুমারের আয়ু কমে আসছে কেননা বড়কুমার উইল করতে চাইছে। মেজকুমার ও ছোটকুমার সম্বন্ধে মিঃ মেয়েরের বক্তব্য, মদ ও মেয়েমানুষের ক্ষেত্রে এরা একইরকম, যদিও এই মামলায় এটা স্বীকৃত যে মেজকুমার মাতাল নয়। সমস্ত ক্ষেত্রে এটা স্বীকৃত হয়েছে তাদের নৈতিক চরিত্র মন্দ ছিল এটাই ঈঙ্গিত করে। পুরাতন ম্যানেজার রায়বাহাদুর কে পি ঘোষের পুত্র রায়বাহাদুর এস পি ঘোষ রাজার মৃত্যুর পর ১৯০১ সাল পর্যন্ত জয়দেবপুরে বাস করেছিলো, তার বক্তব্য: পিতার মৃত্যুর পূর্বে মেজকুমার কিছু শিক্ষা পেয়েছিল এবং এর পরে সে অত্যন্ত বন্য প্রকৃতির হয়ে ওঠে।"

পিতার মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ১৮ বছরের কম, কিন্তু খারাপ হয়ে গিয়েছিল— তার মামা কেদারেশ্বর (বাদী সাক্ষী নং ৩৩) বলে, ১৯০২ সালে তার বিবাহের মাসে সে রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে একটি ঘরে এলোকেশী নামে মেয়েকে রাখে। এটা ভারি গোলমেলে ব্যাপার ছিল। কিন্তু অকাট্য। ১৯০৩ সালে রায়সাহেব আনন্দ গাঙ্গুলি, একজন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সার্জন, তখন ঢাকা জেলে কর্মরত ছিল, এই মেয়েটিকে চিকিৎসা করতে জেলের কাছে বেগমগঞ্জের একটি বাড়িতে যায় এবং সেখানে এই মেয়েটিকে পরিচর্যারত মেজকুমারের সাক্ষাৎ মেলে। বলা হয় এই মেয়েটির কোন অস্তিত্ব ছিল না। যাদব বসাক (বাদী সাক্ষী নং ৯২০) এতে সায় দেয় এবং বলে যে মেজকুমার ও ফণীবাবু (প্রতিবাদী সাক্ষী নং ৯২) ১৩১০ সালের মাঘ মাসে একটি বেশ্যালয়ে মিলিত হয়েছিল। দোলের দিনে ফণীবাবু তার রক্ষিতা কুসুমের সাথে মিলিত হয়েছিল ও তার গান শুনে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল, মেজকুমার বেগমবাজারে তার রক্ষিতা এলোকেশীর বাড়িতে ফণীবাবুকে নিমন্ত্রণ করে কিন্তু ব্যাপারটি হল এলোকেশী তখনো অলীক। এলোকেশীর একটি ফোটো প্রমাণিত হয়। পরবর্তী অংশে এলোকেশী নিজেকে উপস্থিত করে। কিন্তু মামলাটি যুক্তিহীনভাবে চালানো হয় যে এলোকেশী অলীক। অবশেষে প্রতিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী স্বীকার করে যে এই এলোকেশী রাজবাড়িতে নাচগান করতে এসেছিল। এবং তারপর ফণীবাবুও স্বীকার করে এটা, কিন্তু এটা অস্বীকার করে যে তাকে রাজবাড়িতে রক্ষিতা করে রাখা হয়েছিল। একটি বইয়ে, যেটি ফণীবাবু প্রস্তুত করেছিল, তাতে সে এলোকেশীকে মেজকুমারের একজন ':ক্ষিতা' করে বলে

পরিচয় দিয়েছিল। এই স্ত্রীলোকটির সাক্ষ্য ছিল যে সে বড়কুমাররের ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে নাচগান করতে গিয়েছিল, যে ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে জন্মেছিল, তখন মেজকুমার তাকে আটকে রেখে দেয় নাচঘরের পূর্ব অংশে দোতলার একটি ঘরে, এই ঘরটিকে বলা হত হাওয়া-খানা, ছোট কুমারের বিবাহের কিছু পূর্বে ১৯০৩ সালে তাকে আবিষ্কার করা হয়। তারপর তাকে ঢাকায় আনা হয় এবং প্রথমে বেগমবাজারে রাখা হয়। তারপরে নিয়ে যাওয়া হয় চাঁদমারীর আরেকটি বাড়িতে। এই বাড়িতে মেজকুমারকে পায়ে হেঁটে যেতে দেখা যেত। এই তথ্য কিছু নির্দিষ্ট শনাক্তকরণ চিহ্নের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটা বোঝা যায় যে এই যুবকটি, বড়জোর আঠারো বছর বয়স, ভুল পথে যাচ্ছিল ও বিবাহের পূর্বে ছিল বন্যপ্রকৃতির ও রক্ষিতা রাখতে শুরু করেছিল। হয়ত ঐ স্ত্রীলোকটি ছিল তার প্রথম রক্ষিতা। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০4 সালের জুন মাস পর্যন্ত ও ১৯০৫ সালের জুন থেকে শেষ পর্যন্ত— এই সময়টুকু ছাড়া সে কলকাতায় যেত নৌকা সহযোগে, সঙ্গে থাকত বাজারে স্ত্রীলোক। এই প্রমোদ ভ্রমণে তার সঙ্গীসাথীরা হল মিঃ এন নাগ (বাদী সাক্ষী নং ৪৫৯) ও রাজেন্দ্র রায় (বাদী সাক্ষী নং ৭৯২) একজন বয়স্ক মানুষ, ঢাকার প্রায় একজন কোটিপতি মানুষ। এদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সম্বন্ধে ব্যক্ত করতে হয়েছিল যে কীভাবে তারা মেজকুমারের সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল। ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে মেজকুমার ১০,০০০ টাকা ধার করে এবং এর বেশিরভাগ মালিকাজান নামে এক মহিলাকে প্রদান করে (বাদী সাক্ষ্য নং ৮৯)। মিঃ জি সি সেন, যে ছিল জীবনবীমার এজেন্ট ও যে ধারের ব্যবস্থা করেছিল। ১৯০৫ সালের ২৩ মার্চ বড়কুমার কলকাতা থেকে বাড়িতে ফিরে সেক্রেটারি যোগেন্দ্রবাবুকে একটি চিঠি লেখে মেজকুমারের প্রতি দৃষ্টি বাখতে, কেননা সে ভয় করছিল যে মেজকুমার 'কাউকে' জয়দেবপুরে আনতে বলেছে, স্পষ্টভাবে একটি স্ত্রীলোক। ১৯০৫ সালের শীতকাল, ১৯০৭ সাল ও ১৯০৮ সালেও দেখা যাচ্ছে মেজকুমারের এই আচরণ অব্যাহত ছিল। রেবতীবাবু নামে ঢাকার একজন সিনিয়র উকিলের ভাষায় মেজকুমারের নৈতিক চরিত্র ছিল 'জঘন্য'।

এরকমই ছিল তাদের নৈতিক চরিত্র এবং সাক্ষ্যে সেটা অস্পষ্ট ছিল না। মহিলারা বাস করত উপরের অন্দরে। কুমারেরা বাস করত তাদের বৈঠকখানায়। মেজকুমারের বৈঠকখানা হল রাজবিলাসের এক তলার পূর্বতম ঘর (ঘর নং ১১১) এর পেছনে ছিল একটি সজ্জিত শোবার ঘর। তার পেছনে ছিল বারান্দা যেখানে সে খাবার খেত। এর উত্তরে ছিল একটি বাথরুম, যার মধ্যে ছিল একজোড়া শৌচাগার ও একটি ট্যাপ্ কল। তৃতীয় কুমারের বৈঠকখানা ছিল একই তলার পশ্চিমতম ঘরে — ঘর নং ১২৬। এর উত্তরের একটা ঘরে সে খাবার খেত, আর এর উত্তরে আরো একটি সজ্জিত শোবার ঘর ছিল এবং এর পেছনে ছিল বাথরুম। এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিলু (বাদী সাক্ষী নং ৯৩৮) ও সাগরের (বাদী সাক্ষী নং ৯৭৭) কাছ থেকে। বিলু হচ্ছে কুমারের ভাইপো। কুমার যতদিন জীবিত ছিল ততদিন সে রাজবাড়িতে বাস করত এবং সাগর কুমারের বিবাহের সময়, ১৯০৩ সাল থেকে এখানে বাস করছিল। এই তথ্যে কোন গোলমাল নেই, ব্যতিক্রম হিসাবে শুধু পূর্বোক্ত শোবার ঘরকে বলা

হয়েছে 'বিশ্রামঘর' বা 'অবসরঘর'। কুমারেরা রাতে যেখানে ঘুমাত সেই ঘর নয় এবং মেজকুমারের বাথরুম সম্বন্ধে বলা হয়েছে অন্য কোথাও ছিল সেটা। মেজরানী বলেছে উপরের অন্দরে প্রত্যেকের জন্য আলাদা একটি শোবার ঘর ছিল এবং সেখানে তারা তাদের স্বামীদের সঙ্গে রাতে, বা দুপুরে ঘুমাত। বড়কুমারের একটি শোবার ঘর ছিল বৈঠকখানার কাছেও (ঘর নং ৯৬), তার বৈঠকখানা (ঘর নং ৯১) তার বাথরুম (ঘর নং ৯০) এবং তার খাবার-ঘর ছিল ঠিক শোবার ঘরের বিপরীতে (ঘর নং ৯৪)। সংক্ষেপে প্রত্যেক কুমারের একটি করে শোবার ঘর, বৈঠকখানা, খাবার ঘর এবং দাসমহল ছিল রাজবাড়ির বাইরে। রানীদের বক্তব্য ছিল যে কুমারেরা উপরে ঘুমাতে আসত, তাদের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করত। প্রকৃতপক্ষে এই ছবি, যা তারা দিতে চেষ্টা করেছিল, ছিল অসত্য। মায়ের ও বোনের কিছু চিঠির সম্মুখীন হয়ে মেজরানীর এই ছবি অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সব চিঠিতে, যাতে মেজরানীর সম্ভাব্য বিবাহিত জীবনের অধ্যায় বর্ণিত আছে। তার মা তার সম্বন্ধে ভীত ছিল এবং খোঁজ নিত যে মেজকুমার তার প্রতি সদয় কি না। মেজরানীর বোন একটি চিঠিতে তাকে ভাল পোশাক পরতে বলেছে ও মুখে হাসি রাখতে বলেছে এবং নিচুতলায় কুমারের সাথে ঘুমাতে যেতে বলেছে। মেজকুমারের পুরাতন খানসামা প্রতাপ (বাদী সাক্ষী নং ৪৮) এবং প্রভাত (বাদী সাক্ষী নং ৫২) সত্য ঘটনা বলেছিল কুমারেরা প্রত্যেকে তাদের বৈঠকখানা সংলগ্ন শোবার ঘরে ঘুমাত এবং রানীরা তাদের কাছে আসত যখন তাদের ডেকে পাঠান হত, যদিও বড়কুমার মনে হয় উপরে মাঝে মাঝে তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাত।

পুরাতন খানসামার সাক্ষ্য অনুসারে মেজরানী কোন উপলক্ষে তার স্বামীর কাছে যেত এবং রাতে শুধু যদি বিপিন নামে (প্রতিবাদী সাক্ষী নং ১৪০) বালক খানসামার দ্বারা ডেকে পাঠানো হত। বৈঠকখানা সংলগ্ন একটি সিঁড়ির দ্বারা সে নীচে নেমে আসতে পারত, এবং আরেকটি সিঁড়ি নেমে এসেছিল ছোট কুমারের বৈঠকখানার কাছে। মেজ ও ছোট রানী এটা অস্বীকার করেছে। প্রতিবাদীদের কিছু সাক্ষী যেমন রুক্মিনী (প্রতিবাদী সাক্ষী নং ২১) ছোট কুমারের খানসামা, মদন মোল্লা (প্রতিঃ সাঃ নং ৪১) একজন পাখাওয়ালা ও হরেন্দ্র (প্রতিঃ সাঃ নং ২৯০) যে ১৯০৮ সালে মেজকুমারের ব্যক্তিগত কেরানি হয়েছিল, বিপিন — মেজরানীর খানসামা এটা অস্বীকার করেছে ও বলেছে যে বৈঠকখানার পরে শোবার ঘর হল নিছক 'বিশ্রামঘর'। ১নং প্রতিবাদীর ভাই সত্যেন্দ্রবাবু যোগ করেছে যে জয়দেবপুরে অবস্থানকালীন সে বৈঠকখানার পরে শোবার ঘরে ঘুমাত। কিন্তু বাদীর তরফের সাক্ষী ও বোন, বিলু, সাগর, মেজকুমারের নিজের দুজন পুরাতন খানসামা প্রতিবাদী সাক্ষীদের থেকে সামান্য বেশি তথ্যকে সত্য বলে বর্ণনা করেছিল। প্রতিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষী (৪১নং) স্বীকার করেছিল যে মেজকুমার দিনের বেলা কদাচিৎ উপরে গমন করত, এই সাক্ষী একতলায় শোবার ঘরে পাখা টানত। বীরেন্দ্রবাবু হচ্ছে তাদের একজন যারা দার্জিলিঙে গিয়েছিল, যার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবোধক — যেটা

পরে আলোচনা করা হবে। এই ব্যক্তি বলেছে মেজকুমার মাঝে মাঝে এই ঘরে ঘুমাত ও মাঝে মধ্যে উপরের ঘরেও। ৪১ নং প্রতিবাদী সাক্ষী এটাকে বলত কুমারের শোবার ঘর এবং সে এও বলেছে যে সাধারণত সে এই নীচের ঘরে ঘুমাত না, উপরের ঘরে ঘুমাত। বড়কুমারের একজন পুরাতন খানসামা বলেছে যে সে মাঝে মাঝে বৈঠকখানার পরে অবস্থিত শোবার ঘরে ঘুমাত, মাঝে মাঝে অন্দরে। একটি তাৎপর্যময় বিষয় হচ্ছে যে নীচের এই ঘরগুলিই তাদের স্মৃতিতে বর্তমান, উপরের কোন ঘর নয়।

কুমারেরা বার-বাড়িতে বাস করত, ঘুমাত ও খাওয়া দাওয়া করত। তাদের স্ত্রী বা অন্য মহিলাদের তাদের খাবার বিষয়ে কিছু করার ছিল না। খানসামাই তাদের খাবার দাবার নিয়ে আসত, মহিলারা নয়। ৪৮ নং বাদী সাক্ষী, পুরানো একজন খানসামা এটা বলেছে। এটা গ্রহণ করা যায় না। প্রতিবাদী তরফের চাকররাও তাদের জেরার উত্তরে এই একই কথা বলেছে। প্রত্যেক কুমারের ১৫ থেকে ২০ জন খানসামা ছিল, এক জোড়া বেয়ারা, প্রায় চারজন পাখাওয়ালা, একজন আর্দালী। খানসামারা চা বানাত, পান-তামাক পরিবেশন করত কুমারের হুঁকা খেত। খানসামা খাবারের আসন বিছাতো, সেগুলি ধুত, তাদের পোশাক পরিষ্কার করত এবং বেয়ারারা তাদেব পোশাক পরতে সাহায্য করত। মেজকুমার তার শোবার ঘরের উত্তরের বারান্দায় আসন পিঁড়ি হয়ে খাবার খেত। তার খাবার আনত অন্দরের বাবুর্চিখানার রান্নার ঘর থেকে এবং আরেকটি রান্নাঘর থেকে যেখানে খানসামারাও রান্না করত। কুমারেরা প্রত্যেকে হাত দিয়ে খাবার খেত, কাঁটাচামচের সাহায্যে নয়। এই তথ্য উভয়পক্ষের সাক্ষীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং এর মধ্যে কোন তর্ক নেই। কিন্তু এই মামলার একটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে যখন ৯৭৭ নং বাদী সাক্ষী সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছে খাবারঘর থেকে স্বতন্ত্র একটি আরো 'ডাইনিং রুম' ছিল যেখানে কুমারেরা মেঝের উপর বসে হাতের সাহায্যে খাবার খেত না, এখানে মেজকুমার কাঁটাচামচের দ্বারা বিদেশি খানা খেত ইংরেজি কেতায়। বিষয়টি হচ্ছে কতদূর তারা ইংরেজি খানা বা ইংরেজি কেতা সম্বন্ধে জানত, বস্তুগুলির সম্বন্ধে শুধু নয়, তাদের ইংরেজি নাম সম্বন্ধেও কুমারের জ্ঞানের হার কতদূর ছিল?

কুমারদের পোশাকের বিষয়েও এটা স্বীকৃত যে মেজকুমার বাঙালির মতন সাধারণ পোশাক পরত। সে দুভাঁজ করে ধুতি পরত, লুঙ্গির মতন করে, এবং বাইরে যাবার সময় কুর্তা বা পাঞ্জাবি পরত। তার বোন বলেছে সে জমকালো লাল, হলুদ, রক্তবর্ণের পোশাক পছন্দ করত এবং বাদী সাক্ষী নং ৯৫৯ চন্দ্রশেখরবাবুও লুঙ্গির কথা উল্লেখ করেছে। মেজরানী তাকে কখনো লুঙ্গি পরিহিত দেখেনি বলে তার বক্তব্য পেশ করেছে।

কিন্তু ফণীবাবুর বক্তব্য সে বার্মিজ বা সিল্কের লুঙ্গি পরত এবং রায়সাহেব (প্রতিবাদী সাক্ষী নং ৩১০) অনিচ্ছাভরে স্বীকার করেছিল রঙ ছিল বাহ্যত গোলাপী, যখন সে দর্জির বিলের সম্মুখীন হয়েছিল, কারণ সেটা ইংরেজী কেতার সাথে সম্পূর্ণ মানানসই ছিল না।

ছোট কুমার ঢিলা পায়জামা পরিধান করত ও বড়কুমার সাধারণ রীতিতে ধুতি। শুধুমাত্র তারা যখন সাহেব বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত তখন ইউরোপিয়ান পোশাক পরিধান করত। এই বিষয়ে কোন গোলমাল ছিল না। ঐ সমস্ত প্রতিবাদীই জোর দিয়ে বলেছে যে কুমাররা যখন শিকারে যেত তখন ইংরাজী পোশাক বা খাকী শিকারের পোশাক পরত, যা অস্বীকার করা হয়নি, শুধুমাত্র বাদীর ক্ষেত্রে ব্যতীত যে এই পোশাক পরিধান তার স্থায়ী অভ্যাস ছিল না, শুধু বাঘ শিকার বা ঐ রকম কাজ ছাড়া। এখন দেখতে হবে ইংরেজী কাপড়, বিষয় বা পোশাক সম্বন্ধে তার কী জ্ঞান ছিল বা কতদূর সে এগুলির নাম জানত, কিন্তু একটি বাঘের সাথে ফটোতে সে ধুতি পরিহিত দেখতে পাওয়া যায়।

মেজকুমারের দৈনন্দিন অভ্যাস এবং তার সাধারণ পেশা সম্বন্ধে বাদীর সাক্ষীদের দ্বারা প্রদত্ত তথ্য পরিষ্কার ও সঙ্গতিপূর্ণ, এখানে প্রতিহত করার মত কিছুই ছিল না, শুধু রানীর বিবৃতি ব্যতীত, ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে যার সাথে কোন ঘটনার মিল নেই। তবে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই যেহেতু অসঙ্গতি ছিল খুব সামান্য, একটি স্বাভাবিক গাত্রবর্ণের বিষয়।

বাল্যকালের পর থেকে জ্যোতির্ময়ী দেবী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ছিল এরূপ শিশু হিসাবে মেজকুমার বড়কুমারের মত ছিল না এবং তৃতীয় কুমার ছিল হিংস্র ও বার-মুখী, কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে তার শিক্ষা আরম্ভ হয় 'হাতে খড়ি'র দ্বারা এবং তাকে একজন শিক্ষকের অধীনে দেওয়া হয়।

বড় ছেলেমেয়েদের শিক্ষক ছিল দ্বারিকানাথ মুখার্জি। দুবছর পরে মেজকুমারকে এর অধীনে দেওয়া হয় এবং এটা দেখতে হবে পরবর্তী সময়ে এই শিক্ষকের চেষ্টা কতখানি আন্তরিক ছিল, আরেকজন শিক্ষকও রাখা হয়েছিল। কিন্তু কী শিক্ষা তারা পেয়েছিল? তবে এই তথাকথিত পদ্ধতি চলতে লাগল। বালকেরা যেভাবে খেলে মেজকুমার সেভাবে খেলত ছাগল, পাতিহাঁস, ভেড়া ও পায়রার সাথে। ১৯০১ সালে পিতার মৃত্যুর পরে সে কিছু বন্যপ্রাণী সংগ্রহ করেছিল। এটা ছিল খুব ভাল সংগ্রহ — দুটি বাঘ, দুটি চিতা, দুটি ভালুক, একটা সাদা শেয়াল একটি উটপাখি, একটি ওরাঙওটাঙ। ১৯০৪ সালে প্রথম কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের সময়ে মিঃ হার্ড দ্বারা এটি বর্ণিত হয়েছিল।

বড় হওয়ার সাথে সাথে সে ঘোড়ায় চড়তে, টমটম হাঁকাতে শিখল, হাতির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল এবং তার একটি শখকে সবাই স্বীকার করে সেটা হচ্ছে শিকারের প্রতি তার আকর্ষণ। এই এস্টেটটি ছিল পুরোপুরি জঙ্গলাকীর্ণ, যেখানে যে কেউ শিকার পেতে পারে। সে প্রায় প্রতিদিন বন্দুক ও হাতিসহ শিকারে বেরিয়ে পড়ত এবং শূকর, হরিণ, খেঁকশিয়াল, খরগোশ ও বাঘ শিকার করত। সকলে বলত সে খুব ভাল শিকারী। বাদীর তরফে সাক্ষ্য ছিল সে একজন ভাল সওয়ার।

তার দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্যে ছিল সকালে চা, বিস্কুট ও পাঁউরুটি, আহার এবং ভোরবেলা আস্তাবলে ঘোড়াগুলিকে পিলখানায় হাতি ও গোয়ালে বা বাথানে গরুগুলিকে

দেখতে যাওয়া। অসংখ্য সাক্ষী এটা দেখেছে। এ বিষয়ে সাক্ষীর পূর্ণ তালিকা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আশুতোষ ডাক্তারও এটা স্বীকার করেছে। প্রতিবাদী সাক্ষী আমানুল্লা ও একজন মাহুত বলেছে যে মেজকুমারের সঙ্গে সাধারণ নীচুস্তরের মানুষ যেত না, তবে মেজকুমার যখন রোজ সকালে পিলখানায় আসত তখন মাহুতরা তার কাছে হাতির প্রয়োজনের জন্য টাকা দেওয়ার আর্জি জানাত বা কোন হাতি অসুস্থ হলে তা জানাত। যদি পিলখানা, আস্তাবল ও বাথানের ২০টি হাতির মাহুত, ৪০ টি ঘোড়ার সহিস ও কোচওয়ান, কামার, চিড়িয়াখানার কর্মচারী, যতদিন এটা টিকে ছিল, তার কাছে আদেশের জন্য আসতে থাকে, তাহলে সাক্ষ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে সে নীচু স্তরের লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত, যাকে সঙ্গ বলা যেতে পারে বা নাও পারে।

কিন্তু এগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে দিলে, তার চিরাচরিত সঙ্গীসাথী কি ছিল? একটি নীচু সম্প্রদায় ছিল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিছু যুবক যারা নিজেদের তার কেরানি বলত, যদি তাদের একজন বীরেন্দ্র শুধুমাত্র এস্টেটের দ্বারা তার ব্যক্তিগত কেরানি হিসাবে বেতন পেত (প্রতিবাদী সাক্ষী নং ২৯০)। ফণীবাবু বলেছে মেজকুমার জয়দেবপুরের কিছু ভদ্রলোকের সাথে মেলামেশা করত এরা তার ব্যক্তিগত কর্মচারী এবং এস্টেটের অফিসার। হরেন্দ্র দ্বারা উল্লিখিত এই সব অফিসার হল বীরেন্দ্র (প্রতিঃ সাঃ ২৯০) অ্যান্টনি মোরেল, এডুইন ফ্রেসার, ম্যাকাবিন, তিনজন নেটিভ ক্রীশ্চান। সাক্ষীরা এদের এদের বলত বাঙালি সাহেব ও অন্যদের বলত কেরানিবাবু। মণি সাহেবও ছিল বাঙালি সাহেব। নিক্কার পুত্র অবনী ও গোশলখানার নিশি ডাক্তারের পুত্র অবনীর নামটাও উল্লেখিত। তখন অবনী জযদেবপুরে থাকত। বাদীর শিক্ষার বিষয়ে তার প্রদত্ত তথ্য অনুসারে পিতার মৃত্যুর পর সে মেজকুমারের সাথে মিশতে পারেনি। সে ছিল এস্টেটের একজন নায়েব, বীরেন্দ্রর মত একজন রেকর্ড-কিপার। এই দুই অবনীই ২৫ বছরের কম বয়সী। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বরে জয়দেবপুরের বীরেন্দ্র মেজকুমারের কর্মচারী হিসাবে যোগ দেয় এবং তাকে ৩০ টাকা বেতন দিত মেজকুমার, এস্টেট নয়। এই সব যুবকদের মধ্যে শুধুমাত্র কুমারের হিসাবরক্ষক ম্যাকবিনকে এস্টেট বেতন দিত। ১৯০৯ সালের জানু-ফেব্রু মাসে মুকুন্দ গুঁইকে ব্যক্তিগত কেরানি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। যদিও সে দার্জিলিঙে গিয়েছিল কুমারের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি হিসাবে।

কুমারের সঙ্গীসাথী ছিল এইসব যুবক। সত্যবাবুর মতে একে তাদের মেজকুমারের ব্যক্তিগত কর্মচারী বলা উচিত। তারা 'সহিস' বা 'মাহুত' নয়— তারা, বাংলায় যাকে অবজ্ঞা করে বলা হয় মোসাহেব — যারা কোন ধনী ব্যক্তির চারপাশে ঘিরে থাকত। মিঃ মোয়ারের ভাষায় "এরা সর্বদা নিকৃষ্ট সঙ্গীসাথীর দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে যারা নিছক তাদের ঠকায় এবং তাদের দ্বারা সমস্তরকম বাজে কাজ করায়।"

এই হল কুমারের সঙ্গীসাথী। শুধু ব্যতিক্রম হল ফণীবাবু (প্রতিঃ সাঃ ৯২)। তার বিষয়ে আলোচনা করা হলে বোঝা যাবে কি ধরনের মানুষ ছিল সে এবং এই মামলায় কী

কাজ সে সম্পন্ন করেছে।

১৯০৮ সালে কুমারদের বয়স ছিল ২০ বছর, সকলে ছিল বিশৃঙ্খল ও পথভ্রষ্ট যুবক। বড় কুমার ছিল মাতাল ও লম্পট। তৃতীয় কুমারও ভাল ছিল না, যদিও সে মদ্যপান করত না এবং মেজকুমার ঐ বয়সেই হয়ে উঠেছিল লম্পট। তার উপদংশ হয়েছিল যা দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৬ সালে মেজরানীকে কলিকাতায় আনা হয় চিকিৎসার জন্য। তার সাথে গিয়েছিল ইন্দুময়ী, যার চিঠি থেকে জানা যায় যে ডাক্তার মতামত দিয়েছিল মেজরানী সংক্রমণ থেকে মুক্ত, কিন্তু অ্যানিমিয়ায় ভুগছিল সে। প্রতিবাদী তরফের ব্যারিস্টার মিঃ চৌধুরী চিঠির এই অংশে অঙ্গুলিপাত করে এবং বলে যে এই চিকিৎসা প্রমাণ করে যে জ্যোতির্ময়ী দেবী এই উপদংশ সম্বন্ধে অবশ্যই জানত এবং তার সাক্ষ্য ছিল যে মেজকুমার যখন দার্জিলিঙে গিয়েছিল তখন সত্য বলেছিল 'ক্ষত' গুলি ছিল খারাপ ও সেগুলি সাধারণ নয়। জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেনি যে সে উপদংশ সম্বন্ধে জানত না, কিন্তু এটা যে সংক্রামক বা এর প্রভাবে ক্ষত হতে পারে সেটা তার অজ্ঞ ছিল।

যাইহোক, ১৯০৮ সালে, তিনরানী পূর্বের মতই অন্দরে বাস করছিল, পর্দার কঠিন অন্তরালে, কেউ দেখতে পেত না তাদের। একধরনের আত্মীয়ের মত থাকত তারা, বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা তাদের শাসন করত। তাদের স্বামীরা বাইরে দিন কাটাত, ঘুম-খাওয়াদাওয়া বাইরে হত, সর্বদা একধরনের নীচু একদল মোসাহেব দ্বার আবৃত থাকত, চাকরদের উপর নির্ভর করত, তাদের ইঙ্গিত আনন্দকে তারা অর্থ দিয়ে কিনত। মিঃ চৌধুরী, ব্যারিস্টার, জ্যোতির্ময়ীদেবীকে জেরার সময়ে মতামত দিয়েছে যে ১৯০৯ সালে কুমাররা তাদের স্ত্রীদের জন্য ৮০,০০০ টাকার গহনা ক্রয় করেছে। মেজকুমার তার স্ত্রীকে কোন উপহার দিয়েছে তার কোন সাক্ষ্য নেই, এর সবার উপরে আছে উপদংশ রোগ, সংক্রমণের ঝুঁকি এবং নোংরা ক্ষত। বাস্তবিকপক্ষে মেজরানীর সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনে এমন কিছু আনন্দদায়ক ঘটনা নেই যার প্রতি তার সুখস্মৃতি থাকতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই মামলা সূত্রপাতের আগে পর্যন্ত ২৫ বছর সে কলকাতায় বাস করেছে।

তার বিবাহিত জীবনের যে ছবি সে প্রদান করা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য নয়। ঘটনার দ্বারা এগুলির সত্যতার স্থানচ্যুতি ঘটেছে। ১৯১১ সালে ১টি আবেদনে সে কুমারদের সীমাহীন বাজে ব্যয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করেছে যা এস্টেটকে দেনার সম্মুখীন করেছে, যদিও কুমারদের প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় ১ লাখ টাকা।

অভ্যাস ও নৈতিক চরিত্রের কথা ছাড়াও কুমারদের আচরণ ও অবহেলা বিষয়ে সাক্ষ্য আছে। মেজকুমার ভদ্রলোকের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলত, যদিও সে যখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করত সে জানত কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে সাক্ষী আছে বাদী সাক্ষী নং ৩২৬ — ২৪ পরগনার একটি সরকারি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, ময়মনসিংয়ের একজন জমিদার হরেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী (১৬৭), জয়দেবপুর

স্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধানশিক্ষক যোগেশচন্দ্র রায় (২৬২), ঢাকার একজন সম্মানিত নাগরিক রমেশচন্দ্র চৌধুরী (৩২০)। কিন্তু এখানে দুজন অন্য সাক্ষীর সাক্ষ্য উল্লেখ করা উচিত। একজন হচ্ছে ঢাকার একজন পাট ব্যবসায়ী মিঃ স্টিফেন, যে ঢাকায় মেজকুমারের প্রতিবেশী ছিল। সে বলেছে যে সে কুমারকে বুদ্ধিমান বলবে না, কিন্তু সে বোকা নয়।

তাদের ব্যবহার ছিল রাজার ছেলের মতই, যদিও তারা আরো ভালো হতে পারত। সে কাপুরুষ ছিল, বলেছে রমেশবাবু, কিছু ব্যাপারে সে কাপুরুষ ছিল, যেমন — পড়াশুনার ব্যাপারে, কিন্তু সওয়ারি চালনা, হাতি চালনাতে সে ছিল দক্ষ। ৪৬১ নং বাদী সাক্ষী মিঃ পি. সি. গুপ্ত যে ইংল্যান্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রাপ্ত, বলেছিল কুমার বুদ্ধিমান ছিল না, কিন্তু বোকাও ছিল না। সে সংশোধিত হয়নি, কিন্তু সাধারণ ভদ্রলোকদের সাথে মেশার পক্ষে যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল, তবে সমাজের সাথে নয়। রাজার পুত্রের মত চাকচিক্যময় ছিল না। সাধারণত মেজকুমার ভদ্রলোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলত এবং তাদের উপেক্ষা করত। বরঞ্চ প্রাসাদের চাকর, কোচওয়ান, মাহুত ও সহিসের সাথে মিশতে পছন্দ করত। উক্ত ভদ্রলোকের সাথে কুমারের ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং পরিবারের লোকেরা একে অপরের বাড়িতে যাতায়াত করত, যদিও বয়সের অসমতা ছিল, তথাপি বিষয়টি তার একার বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল নয়। বহু সাক্ষীর থেকে মেজকুমার সম্বন্ধে জ্ঞাত অন্যান্য তথ্য থেকেও এই বিষয়ে মিল পাওয়া যায়, যদিও এই উপসংহার হয়তো ভুল হবে যে যদি সে শিক্ষিত হত, যদি সে ইংরেজী জানত এবং তার যদি শিক্ষিত অভিজাতদের মত জৌলুস থাকত, যা মিঃ চৌধুরী কমিশনে মিঃ ঘোষালকে বলেছিল। সাক্ষ্যে কুমারের শিক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট তর্কযোগ্য, যার মধ্যে প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষীও অন্তর্ভুক্ত।

মেজকুমারের শরীরের বিশ্লেষণ পরবর্তীকালে অবশ্যই উত্থাপিত হবে। তার সবচেয়ে সাম্প্রতিক ফটো ছিল ঠিক দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বে — এক্সিবিট নং A-10। ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে এটি তোলা হয়েছিল। এই মুহূর্তে ফটোর বর্ণনা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সামান্য বিস্তারিত কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে যেটা ফটোতে নেই। সকলে একমত যে মেজকুমারের শরীর ছিল সুগঠিত ও পেশীবহুল। লেফটানেন্ট কর্নেল পুলির মতে (বিবাদী সাক্ষী নং ১) তার চুল ছিল ছিল সোনালি পীতবর্ণ যাতে একটি সূক্ষ্ম লাল রঙের শেড্ ছিল যার সম্বন্ধে অসংখ্য সাক্ষী বলেছে পিঙ্গলা বা বাদামী ধাঁচের এবং গোঁফও ছিল এই রকম, কিন্তু হালকা, তার চোখ ছিল কটা, সাধারণ বাঙালিদের মত কালো নয়, কিন্তু সঠিক রঙ নির্ণয় ছিল গোলমেলে ব্যাপার। বাদীর মতে বাদামীধরনের বা বাদামী, বিবাদী পক্ষের মতে নীলচে। তার গাত্রবর্ণ মনে হয় সব সাক্ষীকেই প্রভাবিত করেছিল। উভয়পক্ষের সব সাক্ষীই বলেছে গাত্রবর্ণ 'সাহেবী' বা ইউরোপীয়দের মত। একজন ইংরেজ মিঃ ব্যানকিন বলেছে তার মুখ ছিল ফর্সা, পুলি বলেছে বাঙালিদের পক্ষে অত্যন্ত ফর্সা, মুখে অবিশ্বাস্য উজ্জ্বলতা। প্রতিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষী, অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি বলেছে একটা অদ্ভুত ধরনের উজ্জ্বলতা (সাক্ষী নং

২৯২)। বাদীর পক্ষের সাক্ষীরা তার গাত্রবর্ণের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'ইংরেজদের মত ফর্সা', 'সাহেবদের মত ফর্সা', 'অত্যন্ত ফর্সা' এই রকম কিছু কথা ব্যবহার করেছে, তবে বিবাদী পক্ষের বক্তব্য হল হলুদ আভাযুক্ত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না সে অত্যধিক ফর্সা ছিল, অন্তত ভারতীয় হিসাবে, গাত্রবর্ণ ও চুলের রঙের বিষয়ে তার সাদৃশ্য ছিল। ছোট কুমারের চোখের রঙও ছিল 'কটা' এবং সঠিক রঙ তার ক্ষেত্রে ছিল নীলচে। এই দুই ভাই ও জ্যোতির্ময়ী দেবীর পুত্র বুধুকে প্রায় একই ধরনের দেখতে, গাত্রবর্ণও একইরকম, একই রকমের চুল, তাদের চোখের রঙও ছিল 'কটা' অর্থাৎ সাধারণ কালো নয়, কিন্তু পৃথক ধরনের। বাদীর পক্ষের কয়েকশত সাক্ষীকে কাগজে-কলমে প্রতিবাদীদের সাক্ষ্য আরম্ভ হবার আগে এজাহার দিতে হয়েছিল এবং তারপর এবারও একই কথা বলেছিল এবং মিঃ চৌধুরী তার জেরার সময়ে তিনজনের এই সাদৃশ্যের উপর জোর দিয়েছিল। লোকের মনের উপর এর প্রভাব পড়েছিল প্রত্যক্ষভাবে। তারা দেখেছিল একজন মানুষ বুধুবাবুর সঙ্গে চলে যাচ্ছে ও লোকটিকে বুধুবাবুর মত দেখতে। অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর মতে বাদী ও মেজকুমার একই ব্যক্তি। তার বোন জ্যোতির্ময়ীদেবীর গাত্রবর্ণও ছিল অত্যধিক ফর্সা, চোখ হালকা বাদামি রঙের, ও চুল বাদামি। বড়কুমার ও জ্যেষ্ঠ্যভগিনী ছিল একই রকমের। তারা ছিল কালো, বরঞ্চ কালচে ধরনের। বড়কুমার ছিল লম্বাটে, উচ্চতায় ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, মুখে দাড়ি-গোঁফ ছিল না, মোটা, সাধারণ বাঙালিদের মত চোখ কালো রঙের এবং তার মুখ একদিকে কাঁপত। ছোটকুমারও মোটা ছিল, কিন্তু কম। সে মেজকুমারের চেয়ে উচ্চতায় খাটো ছিল। ১৯০৫ সালের ২ এপ্রিল জীবনবীমার প্রয়োজনে কৃত মেডিক্যাল রিপোর্টে ডঃ ক্যাডি মেজকুমারের উচ্চতা মেপে নথিবদ্ধ করেছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। একজন চাষী (বিবাদী সাক্ষী নং ৮২) মেজকুমার সম্বন্ধে বলেছে সে আমাদের দিশি লোকেদের মত ছিল না, কিন্তু সাহেব-সুবোদের মত ছিল। এককথায় তার সবকিছু সাধারণ লোকের মত ছিল না। একজন সাক্ষী, যাকে শনাক্তকরণের জন্য খুব বেশি ব্যবহার করা হয়নি বা কোন ব্যবহারই করা হয়নি, সে বলেছে, "আমি তার মত এত গোলাপী রঙের মানুষ কখনো দেখিনি" (বাদী সাক্ষী নং ৫১)। সে শুধু রাস্তায় কুমারকে দেখেছিল। কিন্তু সে বলেছিল সেই প্রথম দিনটির কথা যেদিন সে রাজবাড়ির তোরণদ্বারে মেজকুমারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, বিষয়টি হচ্ছে যদি কেউ তাকে দ্যাখে, সহজে তাকে ভুলতে পারবে না। এমন লোক সহজলভ্য নয় যে কুমারের পরিচিত লোকেদের মধ্যে মেজকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে।

১৯০৮ সালে যে কেউ এইভাবে ২৩ বছরের যুবককে দেখে থাকবে, যার অপূর্ব গাত্রবর্ণ, অসাধারণ চোখ ও চুল, সুগঠিত পেশীবহুল দেহ, জীবন কাটাত ঘোড়ায় চড়ে, শিকার করে গাড়ি চালিয়ে, প্রিয় হাতি ফুলমালার পিঠে চেপে। ফুর্তি করে ক্রিসমাসে বা কোন উৎসবে কলকাতা ঘুরে আনন্দ উপভোগ করে। মোসাহেব বা চাকরদের সাথে অনবরত ঢাকায় গিয়ে টাকার নয়ছয় করে, হয়ত সে শিক্ষিত ছিল, হয়ত সে ইংরেজীতে

কথা বলতে পারত, হয়ত সে গান জানত, হয়ত সে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, পোলো, বিলিয়ার্ড খেলা জানত, হয়ত সে ক্যামেরা দ্বারা ফটো তুলতে জানত, হয়ত সে ইংরেজী পোশাক সম্বন্ধে সব কিছু জানত, বা অসংখ্য ইংরেজী কথাবার্তা জানত, যেগুলি এই মামলায় বাদীর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহের কারণ। এই সকল বিষয় জেরায় প্রদত্ত সূত্রের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচিত হবে। এখনো পর্যন্ত সাধারণভাবে পূর্ববর্তী ইতিহাস প্রদত্ত হচ্ছে, যার মধ্যে বাদী এসেছে এবং তার গল্পের সূত্রপাত হয়েছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্য নাটকটির মধ্যে উপস্থিত ও যে সব ব্যক্তি এর মুখ্য অভিনেতা, সঠিক পরিবেশটি যার মধ্যে বাদী আবির্ভূত হয়েছে ও সঞ্চালন করেছে, যে স্মৃতি সে জাগিয়ে তুলেছে, যে আবেগে সে উত্তেজিত হয়েছে তা জ্ঞাত হতে পারত। যাইহোক, এটা প্রয়োজন হবে বাদীর আবির্ভাবের মুহূর্ত পর্যন্ত ঘটনাকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে।

১৯০৮ সাল এল। ২১ বৈশাখ, ১৩১৫ (৪-৫-০৮) মেজকুমারের শ্যালক, সত্যবাবুর বিবাহ হয় এবং ২৮ বৈশাখ, ১১ মে ইন্দুময়ীর বড় মেয়ে বিলুর বিবাহ হয়। এই তারিখগুলি রানী নিজেই বলেছে। সে বলেছে যে ভাইয়ের বিয়ের এই উৎসব উপলক্ষে জয়দেবপুর থেকে উত্তরপাড়ায় এসেছিল তার ভাইয়ের সঙ্গে এবং তিনসপ্তাহ ধরে সেখানে অবস্থান করেছিল। তারপর ২৯ বৈশাখ উত্তরপাড়া থেকে জয়দেবপুরে ফিরে গিয়েছিল। তার মতে ৬ মে মেজকুমার জয়দেবপুরে ফিরে গিয়েছিল, সঙ্গে সেও ফিরে গিয়েছিল। মেজকুমারের এই ভ্রমণ ছিল গোলমেলে, কিন্তু ভ্রমণের পূর্বে ১৩ বৈশাখ তার স্ত্রীকে সে একটি চিঠি লিখেছিল।

১২ এপ্রিল তিনকুমার ২৫০০০ টাকা ধার করে (এক্সি নং ৫০,০৬) এবং প্রমিসারি নোটে স্বাক্ষর করে অন্যান্য কাগজপত্র ছাড়াও। বাদীর শনাক্তকরণের প্রশ্নে এর মূল্য আছে।

এক মুখ্য জেরায় সত্যেন্দ্রবাবু বলেছে যে, তার বোনের সাথে মেজকুমারের বিবাহের পর সে প্রায়ই তিনকুমারের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত কলকাতা, ঢাকা, উত্তরপাড়া ও জয়দেবপুরে এবং তাদের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল। ১৯০৮ সালের মে মাসে সে বি. এ পাস করে এবং অক্টোবর মাসে সে ছিল বি. এল. এর একজন ছাত্র। এই মাসেই সে জয়দেবপুরে আসে এবং সেখান থেকে শিলঙে যায় সরকারি চাকুরির আশায়। ২২-১০-০৮ তারিখে তার মা মেজরানীকে এক চিঠিতে লেখে যে সে একটি টেলিগ্রাম পেয়েছে যে সত্য শিলঙে চলে গিয়েছে এবং স্বীকার করেছে সে একটি চাকরি খুঁজছিল এবং আশা করে বড়কুমারের সুপারিশে এ এটা পাবে, এই চিঠিতে (এক্সিবিট: ২৯৩(৪))সে জিজ্ঞাসা করেছে বড়কুমার তাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা সাব ডেপুটি ম্যাজিস্টেটের পদ পেতে সাহায্য করতে পারত বা পুলিশের কোনপদ। গভীরভাবে চিন্তা করলে এটা হয়তো ঠিক হবে না। যাইহোক, সত্যবাবু জয়দেবপুরেই বাস করছিলো। তার মা রেগে গিয়েছিল যেহেতু সত্য বাড়ি না ফিরে পড়াশুনায় অবহেলা করছিল। তাব তিনটি চিঠিতে এই

ব্যাপার দেখা যায় — (২৭ নভে, ১ ডিসে, ২ ডিসে)। সত্যেন্দ্রবাবু স্বীকার করেছে সে শিলঙ গিয়েছিল যেহেতু ২২ অক্টোবরের চিঠিতে তার মা এটি উল্লেখ করেছিল এবং এই চিঠিটি নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে যে তার মা মনে করত জয়দেবপুরে থাকা তার ছেলের পক্ষে ভাল হচ্ছে না। যদিও তাকে দিয়ে বলানো হচ্ছিল যে মেজকুমার ভাল নেই, তার জ্বর হয়। সে মনে করে এগুলি গুজব।

২২ ডিসেম্বরেও যখন সত্যবাবু জয়দেবপুরে ফিরে গেল না, যেটা তার মার শেষ চিঠি থেকে জানা যায়, এটা মনে করা যেতে পারে সে ঠিক এর কিছুকাল পরেই ফিরে এসেছিল। যেহেতু বড়কুমার ও মেজকুমার মনে হয় ৫ ডিসেঃ রওনা হয়ে ৬ তারিখে কলকাতায় পৌঁছেছিল। কলকাতার একটি জুয়েলারি সংস্থা লাভচাঁদ মতিচাঁদ-এ পাঠানো একটি টেলিগ্রাম থেকে তারিখটি পাওয়া গিয়েছে যাতে বলা হয়েছে একটি বাড়ি ঠিক রাখতে ও ৬ তারিখে স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে।

দুইভাই কলকাতায় এসে পুলিশ হসপিটাল স্ট্রিটে লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়িতে অবস্থান করে। দুই রানীর সাথে ১৫দিন তারা সেখানে থাকে। প্রতিঃ সাঃ ৮৭ নং সৌভাগ্যচাঁদ, লাভচাঁদের এক পুত্র এই সাক্ষ্য দেয়। এই বাড়িটি ছিল তাদের অতিথিশালা। পরে তারা ওয়েলেসলি স্ট্রিটের একটি বাড়িতে উঠে যায়। সেখানে ছোটকুমার তার দলবল সহ আসে ও বাস করতে থাকে। বড়কুমার ওয়েলিংটন স্ট্রিটের ওয়াটার ওয়ার্কসের কাছে আরেকটি বাড়িতে উঠে যায়। এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল বাদীর তরফে সাক্ষী বিলু, যোগেশ রায় ও বিবাদী পক্ষের সাক্ষী সৌভাগ্য, আশু ডাক্তার, মেজরানীর খানসামা বিপিন, ছোটকুমারের ও ছোটরানীর খানসামা রুক্মিণীর কাছ থেকে।

রুক্মিণীর মতে কে কোন দলের সাথে গিয়েছিল — এ বিষয়ে একমত হওয়া যায় না। এটা কেউ বলে না তিনকুমার একসাথে কলকাতায় গিয়েছিল। ছোটরানীর মতে সে প্রথম দলের সাথে গিয়েছিল, আবার বলা হয়েছে বড়রানী ও ছোটরানী দ্বিতীয় দলের সঙ্গে এসেছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই পরিবারটি দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দলের সঙ্গে গিয়েছিল ডঃ আশুতোষ দাশগুপ্ত এবং জয়দেবপুর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক যোগেশ রায়।

কলকাতা যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মেজকুমারের চিকিৎসা, এ বিষয়ে সকলে একমত। এটাও স্বীকৃত যে তার উপদংশ ইতিমধ্যে নোংরা ক্ষতে পরিণত হয়েছে। প্রতিবাদীদের বক্তব্য ছিল যে মেজকুমার পিত্তশূলে ভুগছিল ও জ্বরও হত। কিন্তু এটা অস্বীকার করা হয়েছে যে এগুলি তার আদৌ ছিল না। এবং বাদীর বক্তব্য ছিল যে তার তথাকথিত মৃত্যুর পরেই পিত্তশূলের ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয়েছে। জ্বরের বিষয়টিও ১৯০৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উল্লেখ করা হয়েছিল তার শাশুড়ির দ্বারা। এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে সে কলকাতায় জ্বরের চিকিৎসা করতে যায়নি, এমনকি যদি সেটা সত্যিও হত। এই সময়ের দুটি সাক্ষীর মধ্যে একজন হচ্ছে অ্যান্টনি মোরেল, সে একজন ভারতীয়

বাঙালি ক্রীশ্চান, ভাওয়ালের একটি গ্রামে বাস করত এবং সেই সময়ে এস্টেটের আস্তাবল দেখাশোনার কাজে ৩০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত হয়েছিল, ঘোড়া ও হাতির খাবার ব্যাপারে দেখাশোনা করত। তাকে কমিশনের সামনে জেরা করা হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিবাদীদের সাক্ষীরাও বলে ঐ সময়ে কুমারের শরীর ভালই ছিল, টমটম চালাত, গোধূলি লগ্নে বাইরে বেরোত। মিঃ লাহিড়ী নামে একজন উকিল এজাহার দিয়েছিল এ বিষয়ে। এক সন্ধ্যায় সে মেজকুমারকে লাভচাঁদ মতিচাঁদের দোকানে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েকে দামী উপহার দিতে দেখেছে। বলা বাহুল্য, কুমারের নৈতিক চরিত্র বাজে ছিল। কিন্তু এখানে মূল বিষয় ছিল তার ইংরেজীতে কথা বলার ক্ষমতা বা যোগ্যতা এটা কতদূর সত্যি।

কলকাতা থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পরিবারটি বাড়ি ফিরে যায়। লর্ড কিচেনার জয়দেবপুরে যায় ১৫ বা ১৬ ফেব্রুয়ারি যেটা উভয় পক্ষের সাক্ষী স্বীকার করছে। এক্সিবিট নং ৬৮ অনুসারে সঠিক দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। কেউ এটা অস্বীকার করেনি যে এই ব্যক্তিগত সফরের আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতায়। সে নারায়ণগঞ্জ থেকে বিশেষ ট্রেনে জয়দেবপুরে এসেছিল। সঙ্গে ছিল কর্নেল বার্ডউড্, ক্যাপ্টেন ফিউজারল্যান্ড এবং একজন ইংরেজ ডাক্তার। স্টেশনে বড়কুমার তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং একটি রৌপ্যচূড়াবিশিষ্ট গাড়িতে দুপুরে তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই দলকে 'বড়দালান'এ রাখা হয়। পরদিন লর্ড কিচেনার ও তার দলবল হাতিতে চড়ে কোদ্দা অতিক্রম করে বাঘবাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করে। একটি অন্য হাতিতে চড়ে মেজকুমারও তাদের সঙ্গে ছিল। শিকার শেষ হল। কিচেনার শুধু একটি সম্বর শিকার করল এবং দলটি জয়দেবপুর ফিরে গিয়েছিল সেই দিনই। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত অফিসারদের কাছ থেকে হাতিদের মাহুতদের থেকে এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। এরা হল গঙ্গাচরণ ও নাজির — একজন বাঁটার, দিলবর ও আবদুল জমাদার মাহুত। এই তথ্য সম্বন্ধে সব পক্ষ মোটামুটি একমত ছিল বা কোন গোলমাল ছিল না এবং আদালতের কাছে লর্ড কিচেনারের এই সফরের কিঞ্চিৎ গুরুত্ব ছিল, যদি না বিবাদী পক্ষের সাক্ষী এর মধ্যে কিছু বিস্তৃত তথ্য পেশ করত এটা দেখাতে যে মেজকুমার ও অন্য দুইকুমার ছিল সু-সজ্জিত ও সুশিক্ষিত অভিজাতবর্গের ব্যক্তি। বলা হয়েছে তারা লর্ড কিচেনার ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে তাদের আগমনের দিনে রাতের খাবার খেয়েছিল, তারা এবং তাদের ম্যানেজার মিঃ জি. সি সেন- ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তারা তাদের সাথে দিনের আহার ও প্রাতরাশেও যোগ দিয়েছিল। শিকারেও এটা ঘটেছিল। এই সাক্ষ্য রায়সাহেব যোগেন্দ্র (বিবাদী সাক্ষী নং ৩১০), একজন মাহুত (বিবাদী সাক্ষী নং ৪৩) এবং একজন পাচক, আলোক ডি কস্টার। এই তথ্যের অন্তর্ভুক্ত আছে চূড়ান্ত অসত্যের অন্তর্নিহিত চিহ্ন, কিন্তু ইউরোপীয়দের সাথে এইরূপ সংযোগকে শিক্ষার অন্তর্গত বলে বিবেচনা করা হত। যদিও একত্রে স্থাপন করা যায় তবে নির্দিষ্ট ঘটনার আবির্ভাব হবে।

লর্ড কিচেনার ১৪ ফেব্রুয়ারি সফর করেছিল। মার্চ-এর মাঝামাঝি সত্যবাবু জয়দেবপুরে এসেছিল। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সে কুমারের সঙ্গে ছিল, কুমারেরা যতদিন কলকাতায় না যায় ততদিন পর্যন্ত, এবং সে কুমারদের সাথে কলকাতায় সাক্ষাৎ করেছিল ও ফিরে এসেছিল। বাদীর বক্তব্য ছিল যে সে এসেছিল মেজকুমারকে ছলনা করে দার্জিলিং নিয়ে যেতে। যাতে সে তাকে হত্যা করতে পারে এবং উদ্দেশ্য সে উদ্ভাবন করেছিল পারিবারিক ডাক্তার আশুতোষ দাশগুপ্তের সহায়তায়। অভিযোগ আনা হয়েছিল তার ও আশুডাক্তারের বিরুদ্ধে, প্রায় তখনই, যে মুহূর্তে বাদী ঘোষণা করল যে সে মেজকুমার। সত্যবাবু স্বীকার করে ১৯২১ সালের মে মাসে এটা কলকাতায় তার কাছে টেলিগ্রাফে জানানো হয়েছিল। সত্যবাবু বলেছে যে কলকাতায় এটা স্থির করা হয়েছিল যে মেজকুমারকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিঙে নিয়ে যাওয়া উচিত, ডাক্তারও তাকে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যেতে পরামর্শ দিয়েছে। সে আরো বলেছে, সে জয়দেবপুরে এসেছিল নিজের কাজে যেটা ছিল সরকারের অধীনে একটা চাকরি যোগাড় করা এবং সেজন্য সে সুপারিশপত্র নিতে এসেছিল। তারপর সে শিলঙে চলে যায় এবং ফিরে আসে। আবার দার্জিলিঙে যায় মেজকুমারের একজন কর্মচারী মুকুন্দ গুঁইকে সঙ্গে নিয়ে একটা বাসা ঠিক করতে। ২২-১০-০৮ তারিখে লিখিত তার মায়ের এক চিঠিতে বলা হয়েছে যে সে তার ছেলের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়েছে যে সে শিলঙে চলে গিয়েছে। সত্যবাবুর মতে সে শিলং গিয়েছিল যখন সে লর্ড কিচেনারের শিকারের পর জয়দেবপুরে এসেছিল, ১৯০৯ সালে এই উপলক্ষে নয়। রানীর সাক্ষ্য অনুসারে মেজকুমারের, ডাক্তারের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে, মুসৌরি বা দার্জিলিং যাওয়া উচিত এবং এটি তার ভাইয়ের কাছে লেখা হলে সে এসেছিল। সত্যবাবুই প্রস্তাব করে দার্জিলিঙে যাওয়ার জন্য এবং মেজকুমারের কর্মচারী মুকুন্দ গুঁইয়ের সাথে বাড়ি ঠিক করতে সেখানে চলে যায়। এই সাক্ষ্য দেয় জ্যোতির্ময়ীদেবী, বিলু, পুরানো দেওয়ান, রসিক রায় এবং সত্যবাবুর তথ্যের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেজকুমারের দার্জিলিঙে যাওয়ার প্রায় ১৫ দিন পূর্বে শেষ বড় শিকার পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই শিকারই হয়েছিল সালনা কাছারির কাছে জোলারপুরে এবং সেখানে সে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে শিকার করে। এটা ছিল তার ২য় বাঘ শিকার। দেখা যাচ্ছে সে প্রথম বাঘ শিকার করে অক্টোঃ বা নভেম্বরের কিছু পরে, নাগরগড়ে। প্রতিবাদী সাক্ষী নং ২৪, কালিমুদ্দি হাজি এটা বলেছিল। এই সাক্ষীর মনে আছে এই শিকার দেখেছিল যেটা তার মতে হয়েছিল ফাল্গুন বা চৈত্রের পরে, প্রায় এপ্রিলের শুরুতে। অন্যান্য সাক্ষীও যারা এর প্রত্যক্ষদর্শী ছিল, এটা বলেছে। যে কোন একটি শিকারে বাঘের সঙ্গে একটি ফটো তোলা হয়েছিল কুমারের। এক্সি: L নাগরগড় শিকারের পরে তোলা ফটো। এই ফটোতে কুমারকে দেখা যায় ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত। এই ফটোকে 'টাইগার ফটো' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। (এক্সি: ১০) ফটোটি তার শিকারের। এখানে তাকে দেখা

যায় ব্রীচেস্ ও পট্টি পরিহিত। এটা তার মৃত্যু বা ধরে নেওয়া মৃত্যুর পূর্বে গৃহীত হয়েছিল দার্জিলিঙে। এটাকে ব্রীচেস পরিহিত 'টাইগার ফটো' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সত্যবাবু এই শিকারের সাথে গিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও বলা হয়ে থাকে তাকে কোথাও নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেহেতু সে ভয় পেয়েছিল। এই শিকারের সাথে সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ বাদী সাক্ষীদল ছিল (৬৭১, ১৫, ৯, ২৬, ৮৫, ১০৭, ৩৭৪)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে ফটোটি ফেলে আসা হয়েছিল। এই সময়ে দার্জিলিঙে যাত্রা করার ৫/৬ দিন পূর্বে আরো একটি শিকার সংঘটিত হয়েছিল যেটা তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নির্দেশ করে। মেজকুমার অনবরত শিকারে যেত। সে কাশীমপুরে, কোদ্দার বারুণী মেলাতে গিয়েছিল। ১লা এপ্রিল সে ঢাকাতে ফিরেছিল, ৯ই এপ্রিল সে তার ভাইদের সাথে ৫০,০০০ টাকা ধার করেছিল। ১৬ই এপ্রিল সে তাদের পারিবারিক ডাক্তার মহিমবাবুর বাড়িতে রাতের আহার গ্রহণ করে এবং ১৭ই এপ্রিল মহিমবাবুর পুত্র আশু ডাক্তারকে গোয়ালন্দে খাবার আয়োজন করতে ৩০ টাকা প্রদান করে। ১২ই এপ্রিল সে বাবু দীগেন্দ্র ঘোষের পক্ষে একটি দলিল সম্পাদনা করে (এক্সি নং ৭) — দার্জিলিঙে যাওয়ার পূর্বে তার শেষ বিষয়গত কাজ। এই সব গোলমালহীন কাজের দিকে এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নিঃসন্দেহে যাত্রাকালে মেজকুমার অসুস্থ ছিল না। বড়রানী বলেছে সে হাসিমুখে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে ১৮ই এপ্রিল রাতে রওনা দিয়েছিল। রেলস্টেশনে সে স্টেশন মাস্টার (বাদী সাক্ষী নং ৫৯) আশুবাবুর সাথে বাংলায় সম্বোধন করে বলে, মাষ্টারমশাই আমার মালপত্র কোথায়? যে সব বাদীপক্ষের সাক্ষী (২২০, ৮৮১, ৯৪৯) স্টেশনে তাকে দেখেছিল, যতীন (বাঃ সাঃ৯) যে গোয়ালন্দ পর্যন্ত তার সাথে গিয়েছিল, সাগর ও মানুক যারা ঢাকা পর্যন্ত তার সাথে এসেছিল, একজন রেলকর্মী যাকে সে ফতুল্লা (বাঃ সাঃ ২৩১) বলে সম্বোধন করেছিল এবং সর্ব মহান — এস্টেটের মুক্তার যে নারায়ণগঞ্জে তার জন্য জিনিসপত্রের আয়োজন করেছিল যেখানে মেজকুমার স্টীমারে উঠেছিল, এরা সবাই এজাহার দিয়েছিল। এদের সাক্ষ্য অনুসারে সে আদৌ অসুস্থ ছিল না, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সুস্থ, উপদংশ ছাড়া যেটা বর্তমানে প্রশ্ন নয়, এখন প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। কমিশনের সামনে অ্যান্টনি মোরেল ও মিঃ আর. এন. ব্যানার্জীর সাক্ষ্য অনুসারে যখন মেজকুমার দার্জিলিঙে পৌঁছায় তখন অসুখে ভুগছিল এবং দার্জিলিঙে অবিরাম অসুস্থ ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে কেউ বলছে কুমার ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ, কেউ বলেছে অসুস্থ কিন্তু এটা সন্দেহাতীত যে যখন কুমার দার্জিলিঙে যাত্রা করেছিল, তাকে সুস্থ দেখাচ্ছিল এবং এমন কোন ব্যাপার তার ছিল না যতটা তাকে বাইরে থেকে দেখাত, উপদংশ এবং কনুইয়ে, বাহুতে ও পায়ের উপরে ব্যান্ডেজ বাঁধা ক্ষত ছাড়া। যখন সে বেড়াত, তখন লুঙ্গি বা লুঙ্গির মত কাপড় ভাঁজ করে পরত এবং পাঞ্জাবী বা সার্ট।

১৯০৯ সালের ২০ শে এপ্রিল মেজকুমার তার সঙ্গীসাথীদের সাথে দার্জিলিং

পৌঁছলো। 'স্টেপ অ্যাসাইড' নামে এক বাড়ীতে সে উঠল, এটি চৌরাস্তার নিকটে, সত্য ও মুকুন্দ এই বাড়ীটি ভাড়া করে রেখেছিল। সত্য জয়দেবপুরে ফিরে কুমারের সঙ্গীসাথীদের সাথে ফিরে গেল, কিন্তু মুকুন্দ সেখানেই থেকে গিয়েছিল। বাড়ীর মালিক মিঃ ওয়েলিকেল-এর এজেন্ট রাম সিং সুভার সাক্ষ্য মতে বাড়ীটি ৫/৬দিন পূর্বে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এটা অস্বীকার করা হয়নি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত বাড়ীটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

মেজকুমার ও তার সঙ্গীসাথীরা এই বাড়ীটিতে অবস্থান করেছিল, ৬ই মের মধ্যে এই অল্প সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং দার্জিলিঙে আসবার ১৮ দিন পরে তার মৃত্যু বা তথাকথিত মৃত্যু হল। এই সময়ের অন্তর্ভুক্ত তার অসুস্থতা, চিকিৎসা, বাহ্যত মৃত্যু ও অভিযোগ বর্ণিত দাহকার্যের বিষয়ে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বর্তমান, বাদীর অভিযোগ হচ্ছে যে এই অর্থে তার মৃত্যু হয়েছিল যে সন্ধে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। সেই রাতে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৯টার পর। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে বেঁচে গিয়েছিল। প্রতিবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে দার্জিলিঙের তৎকালীন সিভিল সার্জেন কর্নেল কালভার্টের ডেথ সার্টিফিকেট অনুসারে বাদীর মৃত্যু হয়েছিল মধ্যরাতে ১১-৪৫ মিনিটে। মৃতদেহ সারারাত বাড়িতেই ছিল, পরদিন সকালে শোভাযাত্রা সহকারে সেটিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যথাযথ দাহ করা হয়। এইরূপে শবযাত্রা প্রবেশ করেছে, এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই যে শ্মশানে যা দাহ করা হয়েছিল সেটা কোন মানুষের দেহ কি না। কিন্তু বাদীর বক্তব্য হচ্ছে দেহটি তার ছিল না, শ্মশান থেকে তার দেহ অদৃশ্য হবার পর রাত থেকে অন্য কোন দেহ এইভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এটা করা হয়েছিল অপবাদ এড়ানোর জন্য বা অন্য কোন কারণে। যেমন, বীমার অর্থ পাবার জন্য, যাতে জয়দেবপুরে যেন কেউ মনে না করতে পারে যে কর্মচারীদের কোন কষ্ট হয়নি, এমনকি দাহ করতেও।

দার্জিলিঙে মেজকুমারের সঙ্গীসাথীদের মধ্যে ছিল —

১. মেজকুমার — তখন বয়স ছিল অনধিক ২৫ বছর
২. ঐ স্ত্রী — বড়জোর ২০ বছর বয়স
৩. স্ত্রীর ভাই — প্রায় ২৪ বছর বয়স (প্রতি. সা. ৩৮১)
৪. ডঃ আশুতোষ দাশগুপ্ত — প্রায় ২৫ বছর (প্রতি. সা. ৩৬৫)
৫. মুকুন্দ গুঁই (কর্মচারী) — প্রায় ৩০ বছর (পরে মৃত)
৬. বীরেন্দ্র ব্যানার্জী (কেরানী) — প্রায় ২১ বছর, বয়স। যার কাকা কুমারের জ্ঞাতির এক বোনকে বিবাহ করেছিল।
৭. সি. জে. ক্যাবরাল (দর্জি) — ঢাকার পারিবারিক বাড়ীর একজন। আংশিক সময়ের এজেন্ট, একজন দেশীয় খ্রীশ্চান, সাক্ষ্য অনুসারে যে ছিল মূর্খ ও তারপরে মৃত।

৮. এ্যান্টনি মোরেল -- প্রায় ৪১ বছর বয়স্ক একজন দেশীয় খ্রীশ্চান।

৯. জলধর ১০ যামিনী (মৃত) ১১. অখিল ১২ প্রসন্ন (মৃত) ১৩. বিপিন (প্রতিং সাং ১৪০) [৯ থেকে ১৩ নং খানসামা /চাকর]

১৪ সর্বাফ খান -- একজন বিদেশী আর্দালী

১৫. অম্বিকা চক্রবর্তী -- একজন ব্রাহ্মণ পাচক .

১৬. নববীর ১৭. ফলান সিং ১৮. হরি সিং ১৯ ধনমন সিং (১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত গুর্খা রক্ষী)

২০. জিৎলাল ও ২১ বাগরি (বেয়ারা)

২২. বাবুর্চি -- বাদীর সাক্ষ্য অনুসারে অলিমুদ্দি
বিবাদীর সাক্ষ্য অনুসারে আব্দুল

২৩ তীর্থ দাই - চাকরানী (মৃত)

২৪ কামিনী — চাকরানী (জয়দেবপুরে বাসরত)

২৫. বাবুর্চির সহকারী

মিঃ চৌধুরী, প্রতিবাদী তরফের আইনজীবি প্রকৃতই এই দলকে অভিহিত করেছিল "ভাঁড়ের দল" বলে।

মেজকুমারের মৃত্যু হয়েছিল বা বাহ্যত মৃত্যু হয়েছিল ৮ই মে সন্ধে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে বা রাত ১১.৪৫ মিনিটে। পরদিন সকালে শবযাত্রা হয়েছিল, প্রকৃতভাবে বা কৃত্রিমভাবে। ১০ই মে, অর্থাৎ পরের দিন দলটি রানী ও তার ভাই সহ, মেলট্রেন সহযোগে দার্জিলিং ত্যাগ করেছিল বেলা ২ ৩০ মিঃ। মৃত্যুর খবর টেলিগ্রাফে জয়দেবপুরে পাঠানো হয়েছিল এবং এখানে একটি গুরুত্ব প্রশ্ন আছে যে কখন এই টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। যদিও বলা হয়ে থাকে ৯ই মে সকালে দার্জিলিঙে যাওয়ার ট্রেন ধরতে স্টেশনে যাওয়ার পথে ছোটকুমারের কাছে এটি প্রদান করা হয়। পরিবারের অন্যান্যদের কাছে পূর্বের দিন একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল এই বলে যে মেজকুমার গুরুতর অসুস্থ। এই টেলিগ্রামের বিষয়ে আবার ফিরে আসতে হবে যখন দার্জিলিঙের ব্যাপারে জেরা করা হবে।

ট্রেনে দলটি দার্জিলিং ত্যাগ করে। যখন ট্রেনটি পোড়াদা স্টেশনে আসে, তখন জয়দেবপুরের একটি দলের সাথে তাদের দেখা হয়। এদের মধ্যে ছিল জ্যোতির্ময়ীদেবীর পুত্র বিলু, যোগেনবাবু প্রাইভেট সেক্রেটারী, নিক্কা, আরেকজন কর্মচারী ও দ্বারিকা মাস্টার, কুমারের পুরাতন শিক্ষক যে শিক্ষক হিসাবে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের তখনো পড়াচ্ছিল বা অন্য কোনভাবে সাহায্য করত, মহিলাদের তীর্থধর্ম করাত। বিলুর মতে এই দলের মধ্যে নিক্কার স্ত্রী আরেকজন মহিলা ও দারোয়ানও ছিল। এই বড় দলটি পাঠানোর কারণ ছিল বড়কুমারের আশঙ্কা ছিল দার্জিলিং বা উত্তরপাড়া থেকে প্রাপ্ত একটি টেলিগ্রাম যে সত্যবাবু তার বোন মেজরানীকে সরাসরি কলকাতা নিয়ে যেতে পারে। এই রকম

একটি দল প্রেরিত হয়েছিল এটা স্বীকৃত হয়েছে এবং স্টেশনের দৃশ্য যখন গাড়ীটি ঢুকছে। এটা বর্ণিত হয়েছে সত্যবাবুর একটি ডায়েরীতে যা বাদী বা তার এজেন্ট কর্তৃক সুরক্ষিত ছিল। সত্যবাবু স্বীকার করেছে সে ডায়েরী রাখত যেটা লেখা হয়েছে ৭ই মে অর্থাৎ কুমারের অসুস্থতার দ্বিতীয় দিন থেকে অর্থাৎ তার মৃত্যুর পূর্ব দিন থেকে। এই ডায়েরীতে ঘটনা ও তার প্রতিফলন লিপিবদ্ধ ছিল। সত্যবাবু বলেছে সে ১৯ বা ২০ শে মে জয়দেবপুর থেকে এটা লিখতে শুরু করেছে। এর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হবে।

দার্জিলিঙ থেকে আগত দলের সাথে জয়দেবপুর থেকে আগত দলের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি সত্যবাবু তার ডায়েরীতে বর্ণনা করেছে 'কান্নার ঝড়'।

এত মানুষকে পাঠানোর কারণ ও তাদের পোড়াদা স্টেশনে বসিয়ে রাখার কারণ হিসাবে সে ডায়েরীতে বলেছে, "পাছে আমি বোনকে কলিকাতায় নিয়ে যাই।" ডায়েরীটি ইংরেজীতে লেখা হয়েছে এবং এটি লেখা হয়েছে কারণ সে নিজেকে অত্যন্ত অবহেলিত ভাবত। কারণ কুমারের পবিবার তাকে বিশ্বাস করত না, কুমারের মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী এই ধারণাকে তারা বিশ্বাস করেছিল। পোড়াদায় দল পাঠানোর পরিষ্কার কারণ তাকে পথিমধ্যে আটক করা, তাদের আশঙ্কা ছিল মেজরানীকে কব্জা করে তথা এস্টেটের বাৎসরিক ১ লাখ টাকার যে ভাগ মেজরানীর ছিল তার উপর ভাগ বসানো এবং পরবর্তী ঘটনাগুলির সাক্ষ্য আছে তার নিজের ডায়েরী। ডায়েরী এটা প্রমাণ করেছিল যে তাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সত্যবাবু তখনো কলেজের ছাত্র হলে কি হবে, তার তরুণ স্কন্ধের উপর যে মস্তিষ্কটি রয়েছে, সেটা ষাট বছরের লোকের পাকা মাথা।

দুটি টেলিগ্রাম — একটি পোড়াদা অন্যটি দামুকদিয়া ঘাট থেকে জানা যায় দলটি পোড়াদা থেকে চাঁদপুর মেলে যাত্রা করেছে এবং ১১ই মে মধ্যরাতে জয়দেবপুরে পৌঁছায়। ট্রেন ঢাকা হয়ে যেত, বড়কুমার ঢাকায় আসছিল তাদের সাথে মিলতে, ডাউন ট্রেনটি লেট ছিল। প্রচণ্ড শোকগ্রস্ত ছিল সে। সরাসরি মেজরানী বাড়িতে পৌঁছল এবং পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে দেখা হল তার।

সত্যবাবু ছোটকুমারের সাথে 'বড়দালান'এ ১১ তারিখ রাতটা অতিবাহিত করলো যেটা সে ১১ই মে ডায়েরীর পাতায় লিখেছে। পরেরদিন সকালে ছোটকুমারের উপস্থিতিতে ম্যানেজার মিঃ সেনের সাথে দেখা করলো এবং বললো যে মেজকুমার কোন উইল করেনি, কিন্তু স্ত্রীকে উইল করবার অধিকার দিয়েছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। সত্যবাবুর মতে যে সে এটা তাদের ভয় দেখে ঠাট্টা করে বলেছে। সে তার ঠাট্টা বর্জন করে যখন দেখে পরিবারটি মৃত্যুর শোক ভোলেনি যেটাকে অবশ্যই চরম দুঃখ বলে বিবেচনা করতে হবে।

এই সময়ে মেজরানীর আচার আচরণ ছিল চরম শোকগ্রস্ত হিন্দু স্ত্রীর মতন। সে তার উপরের ঘরের বিছানায় শুয়ে সারাক্ষণ কেঁদে চলেছিল এবং সত্যবাবুর ডায়েরীর একটি

উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় দুঃখে 'উন্মাদিনী' - নিজের ভাইকে চিনতে পারছিল না। জোতির্ময়ীদেবী, বিলু, কিছু বয়স্ক মহিলা প্রতিবেশীর সাক্ষ্য ছিল, যারা এইসময়ে তাকে দেখতে এসেছিল, যে সে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে শুয়ে ছিল, যখন তার ভাই তাকে দেখতে আসে, যেমন সে মাঝে মাঝে আসত, সে তার মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে - 'আমার কাছে এস না। তুমি আমাকে রানী করেছিলে আব তুমিই আমাকে ভিখারিণীও করেছ'। এটা কিছুই প্রমাণ করে না। যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে সে একজন সদ্য বিধবার মত আচরণ করছিল। যাইহোক একটি ছোট্ট ঘটনা, যার প্রতি সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং সাধারণভাবে একমত হয়েছিল, সেই সদ্যবিধবা কান্নার উচ্ছ্বাসের মাঝে মাঝে বলছিল যে তাকে স্বামী সেবা করতে দেওয়া হয়নি, এমনকি তাকে ভাল করে দেখতেও দেয়া হয়নি শেষ হবার আগে। এই সময়ে স্বামীর সম্বন্ধে সামান্য কিছু জিজ্ঞাসা করলেও সে কান্নায় ভেঙে পড়ছিল। সুতরাং কিছুই জিজ্ঞাসা করা যায়নি কুমারের মৃত্যুর সম্বন্ধে। সে নিজেকে বলছিল যে কখনও সে তার মার সাথে দেখা করবে না, তার বৈধব্য বা বাহ্যত বৈধব্যের পব কেউ আলোচনা করতে পারছিল না যে কি ঘটেছিল, বিষয়টি ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এই বিস্তৃত বিবরণও কিছুই প্রমাণ করতে পারে না, যতক্ষণ না দার্জিলিঙে কী ঘটেছিল, প্রত্যক্ষভাবে সেটা নির্ধারিত না হয়। এটা নিশ্চিতভাবে দেখা যাচ্ছিল বাদীর আবির্ভাব যথাযথ নয়।

অনুমিত মৃত্যুর ১১ দিনের মাথায় মেজকুমারের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এটা মৃত্যুর উপসংহারমূলক প্রমাণ নয়, তবে বিশ্বাস যে এটা ঘটেছিল। ১৮ই মে এই শ্রাদ্ধ হয়। মেজরানী তার বাড়ীতে একাদশী করে এই শ্রাদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ছোটকুমার বাজবাড়ীর মধ্যে 'মাধববাড়ীতে' 'বৃষোৎসর্গ' করে শ্রাদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

বাদীর তরফ থেকে প্রদত্ত সাক্ষ্য অনুসারে এই শ্রাদ্ধের পূর্বে একটি গুঞ্জন শোনা যায় যে মেজকুমারের শরীর দাহ করা হয়নি এবং আলোচনা হয় যে কুশপুত্তলিকা দাহ না করে এটা করা যায় কিনা এবং প্রায় চারমাস পরে এক গুজব ওঠে যে মেজকুমার জীবিত এবং এই গুজব সারা ভাওয়াল, এমনকি বাংলার অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। একটি গুজব কিছুই প্রমাণ করতে পারে না, নিজেকে ছাড়া। এটা যা বলে তা প্রমাণ করতে পারে না, কিন্তু গুজব হচ্ছে গুজব, অন্যান্য ঘটনার মত এটাও একটা ঘটনা এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এই দুটি গুজবকে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল, তাদের বিবৃত ঘটনার কোন প্রমাণ হিসাবে নয়, তথাপি একটি ঘটনার ব্যাখ্যা হিসাবে, অন্যথা এটি অব্যাখ্যাকৃত থাকবে -- যে কি পরিবেশের মধ্যে বাদীর আবির্ভাব ঘটল। ১৯১৭ সালে কুমারের আবির্ভাবের চারবছর পূর্বে এক স্বল্পস্থায়ী গুজব উঠেছিল যে, কুমার জীবিত আছে। প্রকৃতপক্ষে বিবাদীপক্ষের এইসব সাক্ষ্যের উপস্থাপনাব কারণ ছিল এটা প্রমাণ করা যে এই গুজবের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯১৩ সালে।

'কুশপুত্তলিকা' সম্বন্ধে জেরার কারণ ছিল এটা প্রমাণ করতে যে এটা পরিচিত ছিল

না, বা এটা রীতি নয় বা সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর। এটা শাস্ত্রের অন্তর্গত এবং এটা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এর জন্য যে অনুষ্ঠান আছে সেটা অবশ্যই দুর্লভ। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় বা ধরে নেওয়া হয় সে মৃত, একটা নির্দিষ্ট বছরের পরে যদি তাকে দাহ করা না হয় বা ধরে নেওয়া হয় তাকে দাহ করা হয়নি, তখন 'কুশ' নামে এক প্রকার ঘাস দ্বারা নির্মিত তার প্রতিমূর্তিকে দাহ না করে শ্রাদ্ধ করা যায় না। শ্রাদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে এই প্রতীক দাহ কাজ করা হয় যথাযথভাবে। ফণীবাবু স্বীকার করেছে সে তার ভাইয়েব ক্ষেত্রে যে নদীতে আত্মহত্যা করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল এই অনুষ্ঠান করেছিল।

এইসব সাক্ষীরা এজাহার দিয়েছিল যে মেজকুমারের শ্রাদ্ধের পূর্বে কুশপুত্তলিকার প্রস্তাব করা হয়েছিল নিশ্চিতভাবে। সেই সময়ে যারা জয়দেবপুরে ছিল তারা এই আলোচনা শুনে থাকবে। এদের মধ্যে ছিল জ্যোতির্ময়ীদেবীর সংপুত্র ও কুমারের ভাগ্নে বিলু (বাদী সাক্ষী নং ৯৩৮), পুরানো চাকর ও অফিসার, আত্মীয়স্বজন যারা তখন জয়দেবপুরে ছিল (বাদী সাক্ষী নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১৫, ১৬, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৪৮, ৫২, ৮৭, ১৫৫, ২৬২, ৫১২, ৫৫৭, ৮৫২, ৮৯২, ৯৫২, ৯৫৮)। এদের মধ্যে একজন ছিল জমিদার অখিলবাবু, বিলুর সৎপিতা যে নিশ্চিতভাবে সেই সময়ে সেখানে ছিল। ১৯০৯ সালের ১১ই মে প্রেরিত তার টেলিগ্রামে (এক্সিঃ ২৬২) সে লিখেছে যে সে ১৩ই মে আসছে। শ্রাদ্ধ হয়েছিল মৃত্যুব দিন থেকে একাদশ দিনের মাথায় ১৮ই মে এবং এই সাক্ষী বলেছে যে সে তখন জয়দেবপুরে সত্যবাবুকে দেখেছিল। তার আসার ২/৩দিন পরে সত্যবাবু কলিকাতায় যাত্রা করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সত্যবাবু ঠিক কথা বলেছিল যে সে শ্রাদ্ধের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল না আদৌ, ১৬ই মে তারিখ যাত্রা করেছিল। সে নিশ্চিতভাবে শ্রাদ্ধের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল, যদিও অংশগ্রহণ করেনি, কারণ সে সাক্ষ্যে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল যে সে কুমারকে দাহ করেছে। কেননা কিছু সাক্ষী মিথ্যা বলেছিল যে সত্যবাবু শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত ছিল। সে যে শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিল না — এটা কারো সাক্ষ্যে দৃষ্ট হয়নি, যতক্ষণ না সে সাক্ষ্য দেয়। অপরপক্ষে কিছু সাক্ষী বলে যে 'কুশপুত্তলিকা' দাহের কথা হয়নি। এরা হলো রায়সাহেব যোগেন্দ্র, ফণীবাবু, এস্টেটের কয়েকজন বর্তমান কর্মচারী এবং একজন ব্রাহ্মণ যে বলেছিল সে শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হয়েছিল। টাঙ্গি থেকে ট্রেনে করে সে গিয়েছিল এবং তাকে ট্রেনভাড়া প্রদান করা হয়েছিল এবং পরে দেখা গিয়েছিল তখনও ভৈরব লাইন খোলা হয়নি। কুমারকে দাহ কবা হয়নি — ধরে নেওয়া হচ্ছে। এটি প্রতিষ্ঠিত মত। যদি এটা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে প্রস্তাবিত কুশপুত্তলিকা' কিছুই প্রমাণ করে না। যদি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এই সাক্ষ্য বাতিল করার কোন কারণ থাকবে না যে কিছু 'বিচিত্র ভাঁড়ের দল' দার্জিলিঙে গিয়েছিল।

কিন্তু মেজকুমার জীবিত থাকার যে গুজব উঠেছিল, সেটাও কিছু প্রমাণ করে না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই গুজবের উৎপত্তি হয়েছে ১৯০৯ সালে, প্রতিবাদীদের

মতানুযায়ী ১৯১৭ সালে নয়। শুধুমাত্র সাধারণ শতশত সাক্ষীই এটা শোনেনি, এর মধ্যে ছিল মিঃ স্টিফেন, ঢাকার একজন আর্মেনিয়ান বণিক, আঞ্চলিক আর্মেনিয়ান গীর্জার সভাপতি, হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী — ময়মনসিংহের একজন জমিদার, যে এই পবিবারকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত, জয়দেবপুর স্কুলের ভূতপূর্ব সহকারী প্রধানশিক্ষক যোগেশ রায় — যে ১৯০৯ সালে জয়দেবপুরে ছিল, কলকাতার একজন ধনকুবের হলধর রায়, চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত — সরকারী স্কুলের একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঢাকা শহরের একজন জমিদার নবেন্দু বসাক। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পূর্ণবাবু, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ মিঃ সোমেশবাবু, ঢাকার একজন বর্ষীয়ান উকিল বেবতীবাবু, পুলিশের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইনস্‌পেক্টর মিঃ শরৎচন্দ্র ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কালীমোহন সেন, একজন বর্ষীয়ান উকিল হিরণ্ময় বিশ্বাস, ঢাকার একজন সম্মানিত ধনী বাবু হরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ব্যারিস্টার মিঃ এন. কে. নাগ, জমিদার রাজেন্দ্রকুমার রায়, রায়সাহেব আনন্দকুমার গাঙ্গুলী — ঢাকার একজন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সার্জন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মিঃ মণীন্দ্র সেন, যে জয়দেবপুর স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ছিল, ঢাকার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ দেবেন্দ্র বোস, ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পি. সি. গুপ্ত, কলিকাতার প্রতিষ্ঠিত ধনী মিঃ ব্রজগোপাল বসাকের মত মানুষ। এরা এবং আরো অন্যান্য বহু বিখ্যাত ধনী বর্ষীয়ান মানুষের সাক্ষাতে এটা প্রমাণিত হয় যে এই বিষয়ে এদের সাক্ষ্য বাতিল করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। ১৯১৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বাদীর আবির্ভাবের ৩ বছরেরও পূর্বে কুমারদের ঠাকুমা রানী সত্যভামা বর্ধমানের মহারাজাধিরাজকে নিম্নোক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন :

জয়দেবপুর রাজবাড়ী
ভাওয়াল, ঢাকা
১৮ই ভাদ্র, ১৩২৪

আশীর্বাদধন্য,

আশীর্বাদান্তে লিখি যে যদিও আমরা পরস্পরকে কখনো চিঠি লিখি নি তবুও অনেকদিন ধরে পরস্পরকে জানি। আমি মৃত রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরীর বিধবা পত্নী এবং মৃত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মাতা। আমাব তিনপৌত্রের নাম কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়। এরা আমার পৌত্র, রাজার সন্তান। তিন পৌত্রের প্রত্যেকেই সাবালক হবার পর অকালে মারা গিয়েছে। প্রত্যেকে বিবাহিত ছিল। কারো সন্তান নেই, নির্বংশ হয়েছে। আমার বড় পৌত্র জয়দেবপুরে তার বাড়ীতেই মারা গিয়েছে, দ্বিতীয় পৌত্র দার্জিলিঙে ও ছোট পৌত্র ঢাকায়। দ্বিতীয় পৌত্র আটবছর আগে স্ত্রী ও শ্যালকের সাথে দার্জিলিং গিয়েছিল, সেখানে রক্ত পিত্তে তার মৃত্যু হয়।

গত দুমাস ধরে একটি গুজব শোনা যাচ্ছে যে ভাওয়ালের মেজকুমার জীবিত আছে।

তার মৃত্যুর পর দাহের জন্য গুহাব কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেই ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হওয়াতে দেহ দাহ করা যায়নি, মুখে আগুন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মৃতদেহ সেখানেই পড়েছিল। পরে একজন সাধু ও তার সঙ্গী সাথীরা এসে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। সে নাকি এখন তাদের সঙ্গে আছে। সংসারের প্রতি তার কোন মোহ নেই — ফিরতেও চায় না। সে ঠিক কোথায় আছে তা আমি স্থির করতে পারছি না। লোকে বিভিন্ন স্থানের নাম করছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, মৈমনসিং, রংপুর, কুমিল্লা, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলায় এই জনরব শোনা যাচ্ছে। অনেকে আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে, কিন্তু আমি তার কোন উত্তর দিতে পারছি না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছি।

মেজকুমারের সঙ্গে সেই সময়ে যারা দার্জিলিঙে ছিল তাদের মধ্যে আপনি একজন এবং আপনি তুলসীপাতা ও গঙ্গাজলের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেজন্য আপনার কাছে জানতে চাইছি যে ঘটনাটি সত্য কিনা? মেজকুমারের দেহ কি সত্যিই দাহ করা হয়েছিল? আপনার নিশ্চয় ঘটনাটি জানা আছে, সেজন্য যা ঘটেছিল এবং যতখানি আপনি জানেন আমাকে জানালে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পাব। আপনি আপনার সুবিধামতো উত্তর দেবেন। আর বেশী কিছু লিখবার নেই।''

প্রতিবাদীরা এই চিঠির উপর নির্ভর করেছিল। এটি মৃত্যুকে বাস্তব বলে অভিহিত করেছিল এবং গুজবকেও বাস্তব বলে বিবৃত করেছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে এই চিঠি লেখার উপলক্ষ হল একজন মৌন সন্ন্যাসী যে এই চিঠি লেখার কিছুদিন পূর্বে জয়দেবপুরে এসেছিল এবং চিঠির উত্তরে সে লিখেছিল যে মেজকুমার হয়ত জীবিত। এমন কিছু-- যা আশা উজ্জীবিত করেছিল এবং এর জন্য কিন্তু গুজবের উৎপত্তি হয়নি, গুজবকে আরো সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। এটা শুরু হয়েছিল মেজকুমারের অনুমিত মৃত্যুর চারমাস পর, কারণ কোন একজন সন্ন্যাসী যে 'মাধববাড়ি' তে এসেছিল। প্রতিবাদীরা স্বীকার করেছিল ১৯১৭ সালের এই সন্ন্যাসী ও সমসাময়িক গুজবের ফলে জ্যোতির্ময়ীদেবী এই সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলে ডাকত। এটা সে অস্বীকার করেছিল। পরবর্তীকালে গুজবের অবসান ঘটে। ২০-৯-১৭ সালে বর্ধমানের মহারাজা সরাসরি চিঠির উত্তরে যা লিখেছিল — তিনি দার্জিলিঙে শ্মশানে কিছু লোককে জমায়েত হতে দেখেছেন এবং বলা হয়েছিল এটা ছিল মেজকুমারের সৎকার, সকালে বা সন্ধ্যার আগে হয়েছিল। ভাওয়ালে ব্যাপকভাবে গুজব ছড়িয়েছিল যে মেজকুমার জীবিত এবং শুধুমাত্র বাদীর আবির্ভাবেব পরেই মেজকুমারের সৎকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি।

আবার মেজকুমারের শ্রাদ্ধের ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। ঘটনাটি ছিল জাঁকজমকহীন করুণ ঘটনা। এটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই মে এবং তারপূর্বে, ১৬ই মে নাগাদ সত্যবাবু কলিকাতায় গমন করে, মুকুন্দ গুই সহ, যে দার্জিলিঙে গিয়েছিল মেজকুমারের একজন কর্মচারী হিসাবে। সত্যবাবু বলেছে সে আইনী পরামর্শ নিতে কলিকাতায় গিয়েছিল ও তাছাড়া তার মায়ের অসুখও যাওয়ার একটা কারণ। কেন তার আইনী পরামর্শের

প্রয়োজন পড়ল?

এর কারণ বড়কুমার এস্টেট পরিচালনার জন্য একটি দলিল করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল মেজরানীকে পরিচালনা থেকে বাইরে রাখা এবং তাকে প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে দেওয়া। কোন সন্দেহ নেই এমন একটি দলিল দাখিল করা হয়েছিল। কিন্তু এর তেমন কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। সত্যবাবু ভাওয়াল এস্টেটের পক্ষে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল সেটা ডায়েরীর লেখা থেকে জানতে পারা যায়। কলিকাতা থেকে ফিরে সত্যবাবু এস্টেটের ম্যানেজার মিঃ সেনের সাথে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে যে কী করে তার বোনকে কব্জা করা যায়। এটা সম্ভব হয়েছিল যেহেতু মিঃ সেনের তখন হিসাবের গোলমালে চাকরী যায় যায় অবস্থা, সেই সময় এই বিধবা হয়ত এটা থামাতে পারে। ১৯০৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রকৃতপক্ষে তাকে এর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। ৬-৯-০৯ তারিখে মিঃ সেন তাকে বলছিলেন যে টাকা আত্মসাতের অভিযোগের বিরুদ্ধে তার সাক্ষী আছে। প্রকৃতপক্ষে জুন মাসে তাকে ম্যানেজারের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, যদি তার পূর্বে না হয়, দেখা যাচ্ছে যে সে ঢাকায় এসে সূত্রপুরের একটি বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করছিল, মনমোহন (বাদী. সা. নং ৯৫২) নামে একজন কেরানীর সাথে হিসাবপত্র ঠিকঠাক করছিল এবং ১৯শে জুলাই ম্যানেজার পদ থেকে অবসর নিয়েছিল। এর মধ্যে সে ও সত্যবাবু সত্যবাবুর মাকে আনবার জন্য আয়োজন করেছিল যাতে মেজরানী রাজপরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং সত্যবাবুর নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। মিঃ সেনের কাছ থেকে সত্যবাবু জানতে আসে যে কবে তার মা আসছে। ১৩ই জুন কলুটোলাতে একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়। মিঃ সেন তার ইস্তফা পাঠায় এবং এটি ২রা জুনের আগে গৃহীত হয়েছিল। সত্যবাবুর মা ঐ বাড়িতে ওঠে কিন্তু শীঘ্র সদর ঘাটের একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯শে জুন মেজরানী এই বাড়িতে আসে, তার পূর্বে ঢাকা স্টেশনে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, যেখানে সত্যবাবু তাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। যাইহোক এই নোংরা ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সত্যবাবু, তার মা ও স্ত্রী ঢাকাতে বসবাস করতে থাকে, পরবর্তী কালে লালগোলার একটি বাড়িতে উঠে আসে। তার বোন মাঝে মাঝে আসে ও চলে যায়। মনে হয় সে তার ভাইয়ের বাড়িতে দীর্ঘকাল কাটাতে অপছন্দ করত। সত্যবাবু ২রা অক্টোবর তার ডায়েরীতে লিখেছে : "বোন এখনো অন্য পক্ষের দিকে ঝুঁকে আছে। সে এখানে থাকতে অনিচ্ছুক। চাপ দিলে নিরুত্তর থাকে।" যখন সে ঢাকায় আসতে শুরু করে এক জটিল মনোভাব নিয়ে যেটা সত্যবাবু বুঝতে পারত না, তার সাথে বড়কুমার নিজে আসত বহুসংখ্যক আর্দালী ও চাকরবাকর সহ। সত্যবাবু তাদের বলত বড়কুমারের চর এবং একবার বড়কুমার না আসায় সে লিখেছে : আশ্চর্য, ভাইয়ের বিধবাকে পাহারা দিতে সে এখানে থাকবে না, পাছে আমি এস্টেটের কিছু ক্ষতিসাধন করি।" ২৩শে সেপ্টেম্বর সে অবগত হয় যে ছোটকুমার মাঝে মাঝে বড়রানীকে কড়া কথা শোনায়। সে আনন্দের সাথে

লেখে; "একটি পারিবারিক ঝগড়ার সূত্রপাত হচ্ছে।" এবং শোনা যাচ্ছিল বড়রানী ও ছোটরানী ঝগড়া করছিল, সে লিখেছে: "একটি অনুকূল পরিস্থিতি।"সে আশ্চর্য হয়ে একটি স্থানে লিখেছে যে কাভাবে ইন্দুময়ী "তার উপর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করলো।" এটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন সে তার মাকে নিয়ে এসেছিল, সে বলেছে যে তার বোন একা বাস করতে পারতো না, সেজন্য এই পরিবার থেকে আলাদা হতে পারছিল না। এটা সঠিকভাবে স্পষ্ট যে মিঃ সেনের সহযোগিতায় তার পদক্ষেপ ছিল তার বোনকে প্রভাবিত করা যে 'তাদের পক্ষের দিকে ঝুঁকে আছে' এবং এইভাবে এস্টেটকে কব্জা করা। পরিবারটি এই বিপদের কথা জানত। যার সম্বন্ধে সে লিখেছে তার মেজাজের সঙ্গে তাল রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তারা। তার বাড়ি সজ্জিত করবার জন্য তারা আসবাবপত্র পাঠাচ্ছিল। তারা বিছানাপত্র পাঠাচ্ছিল। তারা ঘোড়া পাঠাচ্ছিল সওয়ারীর জন্য যেহেতু সে ঘোড়সওয়ারী শিখতে চেয়েছিল। তারা তাকে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছিল। মিঃ নিডহাম্ ১৯০৯ সালের ১লা নভেম্বর ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হল। ৪ঠা নভেম্বর, মেজরানীকে 'অপরপক্ষের অনুকূল হওয়ার জন্য, অভিযুক্ত করা হল। এই দিন সে তার এজেন্ট হিসাবে তার ভাইকে নিযুক্ত করে। পরেরদিন মেজকুমারের ৩০,০০০ টাকার জীবনবীমার দাবী করে কোম্পানীর নিকট আবেদন করা হয়। ১৫ই নভেম্বর মিঃ নিডহাম বড়কুমারের কাছে লেখে যে বীমাপত্র যৌথসম্পত্তি কিনা — এস্টেট দ্বারা প্রিমিয়াম প্রদত্ত হয়েছিল কিনা— সে ও ছোটকুমার নাকি তাদের অংশ আগে দখল করতে প্রস্তুত হয়েছিল ইত্যাদি। যদি এমন হয় তাহলে মিঃ নিডহাম্ টাকা তুলে মেজরানীর খাতে স্থাপন করতে পারে। ডায়েরীর লেখা অনুসারে সত্যবাবু পলিসির অধিকার নিশ্চিত করেছিল, বীমা কোম্পানীর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করত, একটি বিভাগীয় স্বীকৃতিপত্র বের করেছিল এবং সে স্বীকার করেছে যে অন্য দুই কুমার কোন অংশ দাবী করেনি। সে কলিকাতায় বড়কুমারের মৃত্যুর কিছু পূর্বে টাকা তুলেছিল, ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই মিথ্যাপ্রচার রক্ষা করা হয়েছিল সারা বিচারপর্ব জুড়ে যতক্ষণ না ডায়েরী উপস্থাপিত করেছে যে টাকা তোলার সাথে সম্পর্কিত সবকিছুর আয়োজন করেছে এস্টেট এবং সে-ই শুধু চেক্ নিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহ যে সে-ই মৃত্যুর এফিডেফিট সার্টিফিকেট ও সনাক্তিপত্র যোগাড় করেছে এবং টাকা তোলার উদ্দেশ্যে বীমা কোম্পানীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই সকল এফিডেভিটের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হচ্ছে কর্নেল কালভার্ট যে লন্ডনে এই মামলার এজাহার দিয়েছিল। কুমারের অসুস্থতা ও মৃত্যুর ব্যাপারে এই এফিডেভিট একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কর্নেল কালভার্টের সাক্ষ্য ছিল যে কুমারের লোক এই ব্যাপারে তার কাছে এসেছিল এবং অন্য সাক্ষ্যটি ছিল যে সে এটি দার্জিলিঙে বাসরত ও অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ চন্দের কাছে পাঠিয়েছিল দার্জিলিঙের কোন এক ডাক্তার শিশির পালের অনুরোধে। কেউ বলেনি, এমনকি রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথও নয়, যে এস্টেটের কোন এজেন্ট দার্জিলিঙে কর্নেল কালভার্টের কাছ থেকে এফিডেভিট আনতে যায়নি। ৪ঠা মে বাদীর পরিচিতি

ঘোষণার কয়েকদিন পূর্বে সত্যবাবু রেভিনিউ বোর্ডের অফিসে গিয়েছিল এবং তার কাছে রক্ষিত বীমা এফিডেভিটের কাগজপত্র দাখিল করেছিল।

দুজন জীবিত কুমার এমন সবকিছু করেছিল যাতে তারা সত্যবাবুর মেজাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, তাকে আসবাবপত্র, অর্থ, ঘোড়া, বিছানাপত্র ও জিনিসপত্র পাঠাচ্ছিল। এই শহরে সামান্য ১৫০০ টাকা সেলামীতে এক বিঘার বেশি জমি বিনা ভাড়ায় সত্যবাবুকে দেওয়া হয়। ১৯১৩ সালে এই জমির জন্য সে ১৪,৫০০ টাকার প্রস্তাব পায় এবং এমনকি সেলামীর ১৫০০ টাকা এসেছিল তার বোনের টাকা থেকে। ডায়েরীর পাতা বন্ধ করবার আগে এটা বলা যায় যে এই সমস্ত কিছুই সত্যবাবুর প্রতি কুমারদের অনুরাগ। যে কেউ এই ডায়েরী পড়লে বুঝতে পারবে পরিবারের ভাঙ্গন সম্বন্ধে। বড়কুমার ছিল নারী আসক্ত, তখন তার বয়স ছিল প্রায় ২৭ বছর, পানীয় ও আনন্দানুরাগী সত্যবাবু ছিল তার চেয়ে ছোট, কিন্তু তার মন ছিল বিষাক্ত যে রানীদের মধ্যে ঝগড়াকে 'সুলক্ষণ' এবং 'মৃত্যুকে' সৌভাগ্য বলে মনে করত।

বোনের উপর প্রভাব বিস্তার করার পর সত্যবাবু বোনের নামে বেআইনী টাকাপয়সা দাবি করতে শুরু করে। ৪ঠা নভেম্বর ৮০০০ টাকা দাবি করে। জানুয়ারী থেকে মেজরানীর মাসোহারা স্থির হয় মাসিক ১,১০০ টাকা, মনমোহনের সাক্ষ্য অনুসারে। কিন্তু বোর্ড অব রেভিনিউয়ের কাছে দাখিল করা একটি আবেদনপত্রে সে লিখছে যে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে মাসিক ১,১০০ টাকা মাসোহারা পাচ্ছে। ২১ শে এপ্রিল, ১৯১০ সে তার ভাইয়ের সাথে কলকাতায় গমন করে। পায়ে কিছু অসুবিধার জন্য সে পীড়িত ছিল। মিঃ নিডহাম ডা: ক্যলেব দ্বারা চিকিৎসার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু সে চলে গিয়েছিল এবং তার চলে যাওয়ার পূর্বে মিঃ নিডহাম তাকে ৮০০ টাকা দিয়েছিল। কিন্তু সত্যবাবু আরো টাকা দাবি করেছিল সরাসরি সে কলকাতায় গিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ২৭শে এপ্রিল মিঃ নিডহাম তাকে আরো ৫০০ টাকা পাঠাবার প্রস্তাব করে। কলিকাতায় ৩০ নং হ্যারিসন রোডে মেজরানীকে একটি ভাড়া বাড়িতে রাখা হয়। ডাঃ রাউন তার চিকিৎসা করতে থাকে, সেরে ওঠে সে, তারপর ১৪-৭-১০ তারিখে সে তার দাদার ঢাকার বাড়িতে ফিরে আসে (এক্সিঃ মেজরানীর একটি চিঠি)। ৬-৮-১০ তারিখে সত্যবাবু ঢাকার সম্পত্তি পায়। সে ঢাকায় বাস করতে থাকে, যখন বড়কুমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল তখন সে কিছুদিনের জন্য জয়দেবপুরে ফিরে যায়। ১৪ই সেপ্টেম্বর বড়কুমারের মৃত্যুর পর সে ঢাকায় ফিরে আসে এবং চৈত্র মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকে এবং তারপর কলকাতায় যাত্রা করে। সে ১৯৩৪ সালের আগে কখনো ঢাকায় ফিরে আসেনি। বড়রানীও কার্তিকের পূর্বে ঢাকা ত্যাগ করে অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর প্রায় দুমাস পরে, কখনো ফিরে আসেনি।

মেজরানী ৮/৯ হ্যারিসন রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তার মা, ভাই ও ভ্রাতৃবধূর পরিবারে সে হয়ে ওঠে একজন সদস্য। সে প্রতিমাসে ১,১০০ টাকা পাচ্ছিল। তাছাড়া সে জীবনবীমা থেকে পেয়েছিল ৩০,০০০ টাকা। তার

ভাই স্বীকার করেছে যে ১৯০৯ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১১ সালের ৩১ শে মার্চের মধ্যে তার বোন ৩৬,০০০ টাকা তুলেছিল। এর মধ্যে জীবনবীমার টাকা ছিল না, কিন্তু মেজকুমারের শ্রাদ্ধের ২০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত সে ১,১০০ টাকা মাসোহাবা পেয়ে যাচ্ছিল। উল্লেখযোগ্য সে অথবা তার ভাই, জীবনবীমার ৩০,০০০ টাকা যোগ করে, লাখ টাকা পেয়েছিল, এবং তথাপি তার ভাই বলেছে যে তার মা এই টাকার বাইরে ৪০,০০০ টাকা রেখে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সে তার সন্তানসহ সারাজীবন তার ভাইয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল, বাঁচার মত কোন অর্থ ছিল না এ বিষয়ে কোন প্রকার হিসাবপত্র বা সাক্ষ্যদলিল অবশ্যই ছিল না। এবং এজন্য উত্তরাধিকারের বৈধতা সম্বন্ধীয় একটি ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। সত্যবাবুর মতে তার মা যদি কোন টাকাপয়সা রেখে গিয়ে থাকে তবে সেটা তার কন্যার।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে মেজরানী কলকাতায় গমন করে এবং তার প্রস্থানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস এস্টেটে তার অংশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এটা ঘটেছিল তার কলিকাতা চলে যাওয়ার পর পূর্বে নয়। এটা ছিল একটা দারুণ আকস্মিক সংবাদ। সত্যবাবুর মতে মিঃ নিডহাম্ টেলিগ্রাম করে এই সংবাদটি পাঠিয়েছিল। সত্যবাবুর দ্বারা নির্দেশিত হয়ে তার বোনের সলিসিটর মেসার্স আর ডিগনাম ও কোং বোর্ড অব রেভিনিউয়ের কাছে তাদের এস্টেটকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করেন এবং এই আবেদনের তারিখ ২৫-৫-১১। এই আবেদন করেন স্যার এস. পি. সিন্হা (পরবর্তীকালে লর্ড সিন্হা) কিন্তু কোন ফল হয় না। এর অধিকার কোর্টের অধীনেই বহাল থাকে পরবর্তীকালে।

১৯১১ সালের মে মাসে তৃতীয়কুমারের সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীনস্থ হয় এবং ১৯১২ সালে জ্যেষ্ঠ রানীর সম্পত্তি।

এইভাবে ১৯১২ সালে সম্পূর্ণ এস্টেট ধীরে ধীরে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীনস্থ হয়।

তৃতীয়কুমারের বয়স তখন ছিল প্রায় ২৬ বছর। তার জীবন শেষ হয়ে আসছিল এবং পরবর্তীকালে ১৯১৩ সালে সে সাধারণত লালগোলাব বাড়িতে বাস করতে থাকে। তারপর ১৯১৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮দিনের এক অসুখের পর তার মৃত্যু হয়। তার তিনবোন, ঠাকুমা এবং পিসীমা কৃপাময়ী দেবী তখন বাড়িতেই থাকত। মৃত্যুর পর এরা সকলে এই বাড়ি ত্যাগ করে। তৃতীয়রানী তখন অসুস্থ ছিল। তাকে একাকী ফেলে রেখে তারা হৃদয়হীনভাবে চলে যায়। সিভিল সার্জেনের উপদেশ অনুসারে সেও সেদিন সেই বাড়ি ত্যাগ করে। সে বলেছে যে তার স্বামীর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তার বোনেরা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিল। ছোটকুমারের মৃত্যুতে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল সেটা পরিষ্কার। ছোটরানীরও কয়েকজন দরিদ্র, মূর্খ ভাই ছিল। তারা তাকে প্রভাবিত করে ঢাকার এক ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত করে সেখান থেকে আরেকটা বাড়িতে, তারপর কলিকাতায়। কালেক্টর ও বোর্ড অব্ রেভিনিউয়ের সেক্রেটারী মিঃ মার তাকে ঢাকায় ফিরে আসতে

অনুরোধ করে, কিন্তু ছোট রানী ফিরে আসে না। ১৬ই জ্যেষ্ঠ, ১৩২৬ সন, সে তার ভাইয়ের ছেলে কুমুদকে দত্তক নেয়।

ইতিমধ্যে, বোনেরা যারা ছোটকুমারের মৃত্যুর দিন লালগোলা রাজবাড়ি ত্যাগ করেছিল, তারা আর কখনো রাজবাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেনি, সেটা ঢাকার বাড়িই হোক বা জয়দেবপুরের রাজবাড়িই হোক। তারা ঢাকাতে কিছুকাল যাবৎ বাস করেছিল, তারপরে জয়দেবপুরে ফিরে যায়। ইন্দুময়ীদেবী জয়দেবপুরের বাড়ি চক্করে বসবাস করতে শুরু করেছিল বড়কুমারের জীবিতকাল থেকে। ঐ একই স্থানে জ্যোতির্ময়ীদেবীর নিজের বাড়ি নির্মিত হচ্ছিল তখন। ২৯শে ফাল্গুন সে ঢাকা ত্যাগ করে-- ছোটকুমারের মৃত্যুর পর সে ঢাকাতে একটি ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করতে থাকে, বৈশাখ পর্যন্ত কৃপাময়ীর বাড়ীতে অবস্থান করে এবং তারপর ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে নিজের বাড়ীতে উঠে যায়। তারিণীময়ীর বাড়িটি ছিল ইন্দুময়ীদেবী ও জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ীর মাঝখানে। বোনেরা এখানে পাকাপাকিভাবে বাস করতে থাকে। এই তথ্য প্রদত্ত হয়েছে জ্যোতির্ময়ীদেবীর দ্বারা এবং তৃতীয়রানী প্রায় পুরো বক্তব্যই সমর্থন করেছে। সে বলেনি, এমনকি রায়সাহেব বা ফণিবাবুও বলেনি যে তৃতীয়কুমারের মৃত্যুর পর বোনেরা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেছিল। অপরপক্ষে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে কালেক্টর তাদের আসতে এবং বাস করতে অনুরোধ করেছিল সেখানে। তৃতীয়রানীর বিবৃতি ছিল যে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের দ্বারা বোনেরা বহিষ্কৃত হয়েছিল, এটা পুরোপুরি অসত্য। ব্যাপারটি হচ্ছে যে জ্যেষ্ঠরানী ইতিমধ্যে চক্করে তার বাড়ী নির্মাণ করেছিল এবং মেজরানী তৃতীয়রানীর মৃত্যুর পূর্বে বাড়ি নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিল। ছোটরানী পরিষ্কারভাবে বলেছিল যে বোনেদের সাথে ও ভাইদের সাথে তার সু-সম্পর্ক ছিল স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত। তার চিঠিই প্রমাণ করে এই সম্পর্ক কতদূর মধুর ছিল। সে ইন্দুময়ীর কাছে চিঠি লিখত যেভাবে একজন শ্বাশুড়ীর কাছে বৌ চিঠি লেখে, কিন্তু আরো শ্রদ্ধার সাথে। সে জয়দেবপুরে অনুষ্ঠিত ছোটকুমারের শ্রাদ্ধে যোগদান করেনি। বোনেরাও এতে যোগদান করেনি কারণ বাহ্যত তারা আমন্ত্রিত হয়নি। ভাইয়েরাই হয়ে উঠেছিল 'কর্তা'। ছোটরানী ও বোনেরা পুনরায় মিলিত হয়নি। সে ও ইন্দুময়ী যখন মিলিত হয়েছিল, তারা পরস্পর ক্রন্দন করেছিল। এই প্রসঙ্গে এমন কিছুই ছিল না যাতে বোঝা যায় সে ও তার ননদের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। এমন কি কলকাতা বা অন্যকোথাও থাকলেও তাদের মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলত। সে এই চিঠিগুলি দেখত, বিস্তারিতভাবে পড়ত এবং বারবার নেড়েচেড়ে দেখত। বলা বাহুল্য এমন কোন সাক্ষ্য নেই যে প্রমাণ করে বোনেদের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক ছিল।

তৃতীয়কুমারের মৃত্যুর পর বোনেরা চক্করে বাস করতে থাকে, প্রত্যেকে তার নিজের বাড়িতে— একই স্থানে একটি সারিতে তিনটি বাড়ী। পিসীমা কৃপাময়ী দেবী এই মৃত্যুতে এত হতচকিত হয়ে গিয়েছিল যে সে ১৯১৩ সালের ৩রা অক্টোবরে তার উইল প্রস্তুত

করে এবং অগ্রহায়ণের শেষে বেনারস চলে যায় চিরতরে। ঠাকুমা সত্যভামাদেবী তার সাথে চলে যায় ১১ই অক্টোবর তার উইল সম্পন্ন করার পর। কৃপাময়ী আর কখনো ফিরে আসেনি। সত্যভামা ফিরে এসেছিলেন এবং জয়দেবপুরে বাস করছিলেন। সেই সময় ১৯২১ সালে বাদী সেখানে আসে। কৃপাময়ী ১৯২০ সালে ২৭শে এপ্রিল বেনারসে মৃত্যুবরণ করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় রানী কলকাতায় বাস করছিল এবং বাড়ীর ঘটনা সম্পর্কে স্বল্প অবহিত ছিল। বড়রানী ৮নং মধুগুপ্ত লেনে তার পিতার বাড়ীতে বাস করছিল। তার শেষ চিঠি যদি এটা শেষ চিঠি হয়, কিন্তু আর কোন চিঠির অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি, ১৩২০ সালের ৬ই আষাঢ় (জুন, ১৯১৩) ছোট কুমারের মৃত্যুর পূর্বে জ্যোতির্ময়ীদেবীর নিকট প্রেরিত হয়। এটি ছিল গতানুগতিক ধরনের চিঠি বাহ্যত একটি অনুরোধের উত্তর যে তদানীন্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কাছে বুদ্ধুর বিবাহের জন্য খরচ চাওয়া যেতে পারে। ১৯২৫ সালের একটি তারিখ পর্যন্ত এই মহিলা এই বাড়ীতেই বাস করেছিল। তারপরে সে ১১২ নং রিপন স্ট্রীটে উঠে যায়।

মেজরানী ১৯১১ সালে তার ভাইয়ের সাথে কলকাতায় গিয়ে একটি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতে থাকে। ১৯১৪ সালে ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডে সে উঠে যায়।

১৯২০ সাল পর্যন্ত এই দুই রানীর সাথে তার ননদিনীদের সম্পর্ক কোন অর্থে খারাপ ছিল না। জ্যোতির্ময়ীদেবীর মতানুসারে বড়রানী ছিল শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির, তার সাথে ঝগড়ার কোন ঘটনা নেই। মেজরানী ছিল আরো ভদ্র-মার্জিত। সে অস্বীকার করেনি এবং জ্যোতির্ময়ীদেবী তাদের সম্পর্কের প্রসঙ্গে যে তথ্য দিয়েছিল তা সে সমর্থন করেছে। তারা চিঠিপত্র আদানপ্রদান করত এবং এর একটি চিঠি প্রতিবাদীগণ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। এই চিঠিটি (এক্সিঃ Z(32) বেনারস থেকে জ্যোতির্ময়ীদেবী কর্তৃক মেজরানীকে লিখিত। এটা ছিল রানীর একটি চিঠির উত্তর, সে যা লিখেছিল সেই প্রসঙ্গে, তাকে বেনারসে আসতে এবং তার বাড়িতে থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তাকে তার মৃত ভাইয়ের স্ত্রী হিসাবে। নার্স অলকা জানিয়েছে পিসিমা কৃপাময়ী তাকে দেখার ইচ্ছা জানিয়েছিল। সংক্ষেপে এটা একটা ধরনের চিঠি যেটা দুই ননদিনীর মধ্যে প্রথাগতভাবে চালাচালি হতে পারত, শ্রদ্ধার সম্পর্কহীন নয়। চিঠির আদান-প্রদান ছাড়াও এই মহিলা জ্যোতির্ময়ীদেবী কলকাতায় গমন করত। একটি অনুষ্ঠানে তৃতীয়রানী বুদ্ধুর স্ত্রীকে কিছু সামান্য গহনা উপহার দিয়েছিল এবং আরেকটি অনুষ্ঠানে সে মেজরানীকে একজোড়া ব্রেসলেট উপহার দিয়েছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে সত্যবাবুর ভয়ে বাথরুমে নয়, বরঞ্চ সবার সামনে। সে অস্বীকার করেনি যে বুদ্ধুকে কলিকাতায় তার বাড়ীতে ডাকা হত, একটি অনুষ্ঠানে সে তাকে মেজকুমারের কিছু পুরানো বস্ত্র দিয়েছিল এবং এগুলির কিছু বিচারের সময় উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এখানে কোন গোলমাল নেই যে এগুলি মেজকুমারের এবং সনাক্তকরণের প্রশ্নে এগুলি মূল্যবান। কলিকাতায় চিকিৎসা করতে যাওয়ার সময় মেজরানী বুদ্ধুকে

দেখতে এসেছিল এবং তার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা দিয়েছিল। এক কথায় বাদীর আবির্ভাব পর্যন্ত জ্যোতির্ময়ীদেবীর সাথে এই রানীর দারুণ সম্পর্ক ছিল। এই বিষয়ে জ্যোতির্ময়ীদেবী কর্তৃক প্রদত্ত সমগ্র তথ্যকে গোলমালহীন বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। তার সাক্ষ্য বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই যে তার সাথে বড়রানীর সম্পর্ক ছিল সঠিক সৌজন্যের নয় এবং একবার, বাদীর আবির্ভাবের পূর্বে, বড়রানী তার বাবার উইল অনুসারে গৃহীত ভাতা বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। দেখা যাচ্ছে বড়রানীর এজাহারে কেউ ভিন্ন মতামত পোষণ করে না এবং বড়রানীর অসংখ্য চিঠিপত্র যা প্রতিবাদী দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে তাতে মনে হয় সে এমন ধরনের মহিলা নয় যে তার অধিকার ১ ইঞ্চি ছেড়ে দেবে। সুতরাং জ্যোতির্ময়ীদেবী যদি ১৯২১ সালে একজন প্রতারককে সমর্থন করতে এসে থাকে এবং ভাইয়ের বিধবার উপরে অন্যায়ভাবে একজন স্বামীকে আরোপ করে একটি মোক্ষম আঘাত হানে এবং পরোক্ষভাবে তৃতীয়রানীর উপর আরেকটি আঘাত হানে তার পুত্রের উত্তরাধিকারী স্বত্বকে বিপদগ্রস্ত করে, তাহলে তার কোন উদ্দেশ্য নিশ্চয় থাকা উচিৎ ছিল। প্রতিবাদীর বক্তব্য ছিল যে এই উদ্দেশ্য হল সম্পত্তি প্রাপ্তির প্রতি মোহ যেহেতু তৃতীয়রানী কর্তৃক দত্তক গ্রহণ বোনেদের সকল আশাকে চূর্ণ করে দিয়েছিল যাদের সন্তানেরা হিন্দু আইনানুযায়ী তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকারী হিসাবে গণ্য ছিল। এটা জানা যায়নি যখন বোনেরা নিজেদের জন্য বাড়ী স্থাপন করেছিল তখন তাদের প্রকৃত আয় কি ছিল, কিন্তু বাৎসরিক ২,৪০০ টাকা বা মাসিক ২০০টাকা আয় নিশ্চিত ছিল, পিতার উইল অনুসারে এবং সম্ভবত কিছু বেশী যেমন জ্যোতির্ময়ীদেবীর পুত্র বুদ্ধুর ১৯২১ সালে একটি গাড়ী ছিল।

রানীদের মধ্যে ছোটরানী ঢাকাতে বাস করত, যেটা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। বড় রানীও কলিকাতায় থাকত, এবং তারা ভাওয়াল অঞ্চলে আগন্তুক হয়ে উঠছিল। ১৯১৩ সালে মেজরানীর মায়ের মৃত্যু হয় — পৌষমাসে অর্থাৎ জানুঃ বা ফেব্রুয়ারীতে। তার মৃত্যু হয়। মেজরানী ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে এস্টেট থেকে প্রায় এক লাখ টাকা গ্রহণ করা ছাড়াও ১৯১১ সালের এপ্রিল মাস থেকে প্রতিমাসে ১,১০০ টাকা গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৯১৩ সালে টাকার অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ২,৫০০ টাকা। ১৯১৫ সালে এটি হয় ৪,০০০ টাকা, দু বছর পর ৫,০০০ টাকা এবং ১৯১৯ সালে এটি হয় ৭,০০০ টাকা। এছাড়াও সে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত টাকা পেত এবং এগুলি তার নিজস্ব আমানতে হয়ে দাঁড়ায় ৩১/২ লাখ বা ৪ লাখ টাকা। এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মেজরানীর নিজস্ব বিবৃতি থেকে, কোন কাগজপত্র থেকে নয়, যেহেতু কোন হিসাবপত্র দাখিল করা হয়নি, কিন্তু সত্যবাবু এই অঙ্ক দাখিল করেছিল। মেজরানী এই টাকার অঙ্ক সম্বন্ধে জানত, কিন্তু জানত না টাকাগুলি কি হয়। সে ১৯ ল্যান্সডাউন রোডে বাস করত যেটাকে সে বলেছে তার ভাইয়ের সম্পত্তি। যে টাকা কেনাকাটার জন্য খরচ হয় সেটা "ভাইকে আমার উপহার" সে বলেছে। তার ভাই এসে বলেছিল যে তার নামে যে সম্পত্তি আছে তার পরিমাণ ২ লাখ টাকার উপর।

এই পরিমাণ সম্বন্ধে মেজরানী জানত না। অন্যান্য মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তিও কেনা হয়েছিল, সবকিছুই সত্যবাবুর নামে এবং মেজরানী বলেছে এগুলি কেনা হয়েছিল তার ভাইয়ের নিজের টাকায় - যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১ লাখ টাকার বেশী। তার ভাইও এসে তাই বলেছে এবং ১৯, ল্যান্সডাউন রোডের সম্পত্তি তার ভাইয়ের দ্বারা ক্রীত হয়েছে, যদিও রানীর অবদান ছিল এতে। এই সব কিছুই ক্রীত হয়েছিল তার বোনের বিধবা হবার পর এবং তখনো পর্যন্ত মেজরানী তার খাতে ১৯ লাখ টাকারও বেশী গ্রহণ করেছিল। এমন কি তার নিজস্ব কোন জমা খাতাও ছিল না ব্যাংকে। সে কখনো আয়কর দেয়নি। কোন ধরনের কাগজপত্রও ছিল না, যদিও এই পরিমাণ টাকা কেউ কোন কাগজপত্র ছাড়া নাড়াচাড়া করতে পারে না। মেজরানী বলেছে, ''আমার নিজের টাকা আমি নিজেই রাখি। স্বামীর মৃত্যুর সময় থেকে এটা আমি করছি। উপরে একটা সিন্দুক আছে। চাবি আমার কাছে থাকে।'' বিচারকালীন সে কিছু সম্পত্তির নিদর্শন এই সিন্দুকে রেখেছিল। তার ভাই তার পরে এজাহার দিতে এসেছিল এবং বোনের একটা ব্যাংক আমানত সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে বলেছিল যেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার আয়কর প্রদান সম্বন্ধেও বলেছিল — করদাতা হিসাবে নয়, সম্পত্তির নিদর্শনপত্রের স্বার্থে। বিচার আরম্ভ হবার পর একটি ব্যাংক আমানত খোলা সম্বন্ধেও সে বলেছিল। এটা অসম্ভব যে এতবড় সম্পত্তির মালিকের তার নিজের নামে কোন প্রমাণ পত্র ছিল না। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার ভাই কোনদিন টাকা উপার্জন করেছে কি না। রানী তার শেয়ার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল। বলেছিল এ সম্বন্ধে তার কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান নেই। তার ভাই এসে বলেছে কলকাতায় মূল্যবান সম্পত্তি আছে, যেটা ক্রীত হয়েছিল তার নিজস্ব টাকার দ্বারা যার উৎস ছিল ৪০,০০০ যেটা সে মায়ের নিকট থেকে পেয়েছিল এবং ১৯১০ সাল থেকে সে এর দ্বারা শেয়ার কেনা-বেচা আরম্ভ করেছিল। এটাই ছিল তার মূলধন এবং এর দ্বারা সে ভাগ্য ফিরিয়েছিল। কিন্তু তার মায়ের কোন অর্থ ছিল না দেওয়ার মত। দেখা গেছে মেজরানীর মা তার সন্তান সহ তার ভাইয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল এমনকি তার বিবাহের সময় থেকে এবং তার চিঠিপত্রে দেখা যাচ্ছে তার সন্দেহাতীত দারিদ্র্যের কাহিনী। যদিও সে কোন অর্থ রেখে গিয়ে থাকে এটা ছিল তার কন্যার দেওয়া অর্থ। সত্যবাবুর নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী ১৯১৩ সালে কন্যার এস্টেট থেকে ১ লাখ টাকার বেশী অর্থ তার মায়ের হাতে এসেছিল অবশ্য যদি এটা সত্যবাবুর কুক্ষিগত না হয়ে থাকে। এবং সত্যবাবু অস্বীকার করেনি যে পুরো বাড়ীর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তার বোনের দ্বারা নির্বাহ হত এবং এমনকি দুটো গাড়ীও তার নামে ছিল। এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে মেজরানীর সম্পূর্ণ আয় তার ভাইয়ের পকেটে যেত। সে বলেছে, ''তার ইচ্ছা হচ্ছে তার ভাইয়ের ইচ্ছা,'' কিন্তু তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে যে সে তার রাজকীয় আয়ের কোন অংশের সপক্ষে কাগজের একটি টুকরাও উপস্থাপিত করতে পারেনি। এই রটনা ছিল নিঃসন্দেহে সত্যি।

১৯২০ সাল। ২৭শে এপ্রিল কৃপাময়ী বেনারসে মৃত্যুবরণ করে। কুমারদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুময়ী ২১ শে আগস্ট মারা যায়। তার স্বামী-পুত্র-কন্যা তার বাড়িতে বাস করতে লাগল। জ্যোতির্ময়ীদেবী তার পুত্রকন্যা সহ তার বাড়িতে বাস করছিল এবং ঠাকুমা রাজবাড়ীর একটি অংশে নির্জনে কাল অতিবাহিত করছিল। মেজকুমারের মৃত্যু ছিল একটি মেনে নেওয়া ঘটনা। তার শ্রাদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল। তার উত্তরাধিকারী ছিল বিধবা। পরিবারটি হয়ে গিয়েছিল নির্বাপিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল। এস্টেট সঠিকভাবে পরিচালিত হয়ে ঋণমুক্ত হয়েছিল। এস্টেটে মেজকুমারের সম্পত্তির ভাগ তার বিধবা স্ত্রী কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত ভোগ করতে থাকল তার ভাই।

কেউ এই গুজবে বিশ্বাস করত না যে মেজকুমার জীবিত এবং সন্ন্যাসীর সাথে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে সে এটা বিশ্বাস করে। তার ছিল সন্দেহপ্রবণ আশাযুক্ত বিশ্বাস, যেমন কেউ পরজন্মে বিশ্বাস করে বা কারো প্রিয়জন জাহাজ-ডুবিতে হারিয়ে গেছে, সে নাবিকদের খোঁজ করে, তেমনি জ্যোতির্ময়ী বা কৃপাময়ী সন্ন্যাসীদের খোঁজ করত, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস তাদের ছিল না যদিও প্রমাণ ছিল. কিন্তু পরিণতি ছিল না।

যখন বাদী, সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল ঢাকায়, তখন থেকেই ঘটনার সূত্রপাত হল। সন্ন্যাসীর সঠিক আবির্ভাবের তারিখ জানা যায়নি। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর বা ১৯২১ সালের জানুয়ারীর কোন একটি দিনে। বাদী কোন নির্দিষ্ট দিনের কথা বলেনি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আন্দাজ মত নির্দিষ্ট করা হয়। বাদী দার্জিলিঙের দুর্ঘটনার পর নেপালের বরাহ ছত্র নামে একটি স্থানে এসে উপস্থিত হয়. সেই দীর্ঘ ভ্রমণের সম্বন্ধে একটি তথ্য প্রদান করে। এই তথ্য সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হবে এবং প্রয়োজন হবে ঘনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণের। কিন্তু ঘটনার এই মুহূর্তে এটা বলা প্রয়োজন যে বরাহ ছত্রতে তার মনে পড়েনি সে কে, ঢাকাতে এটা হয়েছিল। সে তখনও পর্যন্ত গুরু ধর্মদাস নাগা সহ চারজন সাধুর সাথে সঙ্গে ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয়। বরাহ ছত্রতে " আমার মনে পড়ে আমার বাড়ী ঢাকায়। আমি গুরুকে এটা বলি। তিনি বলেন, "যাও, তোমার যাওয়ার সময় এসেছে। তোমার বাড়ী ফিরে যাও।" সে জিজ্ঞাসা করেছিল আবার কোথায় গুরুর দেখা পেতে পারে। গুরু বলেছিল যে তার দেখা পাওয়া যাবে হরিদ্বারে। গুরু যা বলেছিল তা সে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে যদি সে মায়া জয় করতে পারে, সে সন্ন্যাসের প্রাথমিক স্তরে উন্নীত হবে। সে সন্ন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন জায়গা একাকী ঘোরার পর ঢাকায় এসে উপস্থিত হল। সে প্রায় দুপুর ১২/১টার সময়ে ঢাকা স্টেশনে পৌঁছল, সেখানে রাত কাটায়। "যেই আমি স্টেশনে নামি, আমার মনে পড়ে যায়, সে বলেছে, "আমি এখানে বহুবার যাওয়া-আসা করেছি।" সে তারপর সদর ঘাটের রাস্তা খুঁজে পায়, নদীব দূরবর্তী একটি চর অতিক্রম করে, বেলা ১০ টা নাগাদ নদীর তীরে ফিরে আসে এবং বাকল্যান্ড বাঁধের উপর রূপবাবুর গেটের সামনে উপবেশন করে।

নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে তার প্রদত্ত তথ্যকে পরীক্ষা করার পর দেখা যায় এখনো তার প্রামাণিক সাক্ষ্যের অনেক অনেক বাকী আছে। বাকল্যান্ড বাঁধের উপর আসন গ্রহণ থেকে ঘটনাটি সাধারণ। সে সেখানে বসে থাকত, রাতদিন রোদে জলে, তিন-চা'র মাস ধরে, প্রায় ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত বা চৈত্রমাস শেষ হওয়ার কিছু আগে পর্যন্ত। এ বিষয়ে একমত যে চৈত্র শেষ হওযার একমাস আগে সে কাশিমপুরে গিয়েছিল, এবং প্রতিবাদীপক্ষের মতে বাদী যেদিন কাশিমপুরে গিয়েছিল সেদিন ছিল বারুণীর দিন। বাদী এই যাত্রার বিষয়ে তথ্য অনুমোদন করে না, কিন্তু সময়টা ছিল সম্ভবত ৫ই এপ্রিল। যাইহোক, যদি বাদী বাকল্যান্ড বাঁধের উপর ৩/৪ মাস অবস্থান করে থাকে, যেহেতু তার নিজের সাক্ষীরা বলেছে সে ডিসেম্বরের কোন একদিনে ঢাকায় অবতরণ করেছিল। মিঃ নিডহাম তার প্রতিবেদনে এটা বিবৃত করেছিল।

প্রায় চারমাস বাদী দিনরাত এখানে বসে থাকত। তাকে সন্ন্যাসীর মত দেখাত। একটি লেংটি ছাড়া তার পরনে কিছু ছিল না। তার দাড়ি ছিল লম্বা এবং চুল জটা পাকিয়ে ঘাড়ের পিছন থেকে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেছিল (এক্সি নং ১৯, ফোটো)। একটি জ্বলন্ত ধুনির দিকে মুখ করে সে বসে থাকত, আপাদমস্তক ছাই মাখা। শতশত লোক যারা বাকল্যান্ড বাঁধের উপর দিয়ে যাতায়াত করত তারা অবশ্যই তাকে দেখে থাকবে। তাদের মধ্যে একজন ছিল বাবু দেবব্রত মুখার্জী, একজন অধস্তন জজ, অবসরপ্রাপ্ত, কিন্তু ঢাকায় কর্মরত ছিল। সে বাঁধের উপর কিছুক্ষণ কাটাত, বাঁধের উপর সকাল সন্ধ্যা পায়চারি করবার অভ্যাস ছিল তার। সন্ন্যাসীর বাঁধের উপর অবস্থানের শুরু থেকে সে প্রতিদিন তাকে লক্ষ্য করত যা সে বলেছে প্রায় ২/৪ মাস। প্রতিবাদী পক্ষের হয়ে কমিশনে তাকে জেরা করা হয় এবং সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে তার বর্ণনা যখন সে বাঁধের উপর বসে থাকত ফোটো সহকারে গৃহীত হয়েছে, তখনকার নয়, কিন্তু পরবর্তীকালের, যখনও পর্যন্ত সে লেংটি পরিধান করত, তখন সে যেমন ছিল তার সম্বন্ধে একটি ভাল ও সাধক চিত্র সে প্রদান করেছিল। মিঃ মুখার্জী বলেছে, " আমি উৎসুকতা অনুভব করেছিলাম, কেমন করে এই সুন্দর ফরসা লোকটি একই স্থানে বসে থাকে, দিনরাত, রোদে-জলে," সে বলেছে,"যে আমাকে প্রথম নাড়া দেয় তার সুন্দর ও মহান নৈতিক গুণের দ্বারা এবং আমি প্রতিদিন তার আগমন লক্ষ্য করতাম যখন সে একই স্থানে বসে থাকত— এমনকি যখন দুপুরেও একাকী যেতাম।" একদিন রাতে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল, দমকা বাতাস বইছিল, এবং কনকনে ঠাণ্ডা আবহাওয়া। মিঃ মুখার্জী বাইরে গেল— সময়টা ছিল রাত ২-৩০মিঃ বা ৩টে, দেখতে যে সাধু কি করছে। ধুনি জ্বলছিল এবং সাধু বসে ছিল, শান্ত নির্বিকারভাবে। আমি মনে করতে পারি না যে ঢাকায় এমন সৌম্য, ফরসা জটাধারী সন্ন্যাসী দেখেছি।

মিঃ মুখার্জী বলেছিল যে সাধু দুর্বার অর্থাৎ বাংলা কথ্য রীতিতে ৩-৪ মাস অবস্থান করেছিল। কোন উপলক্ষে সে তার কাছে একদল লোককে দেখেছিল— এবং সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কেমন করে রোদ-জল গরম শীত সহ্য করেন এই ভাবে?" সাধু ১০-১১ বছরের একটি বালককে দেখায় এবং হিন্দীতে বলে— "যখন আমি এত বড় ছিলাম তখন

আমার দেশ পাঞ্জাব ছেড়ে আসি আর এইভাবে থাকতাম। বাংলাদেশের জলহাওয়া খুব খারাপ।" এবং সে তার মাথা ঝাঁকায় ও বলে,-- " মাথা যন্ত্রণা করে, এই স্থান খারাপ।"

মিঃ মুখার্জী তার নাম জিজ্ঞাসা করেনি, তার বাড়ি কোথায় তাও নয়। ১৯২১ সালের ২৬শে মে ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রমেশচন্দ্র দত্তের সামনে একটি উক্তি করে। এই দিনে বাদী জয়দেবপুরে ছিল। ৪ঠা মে সে তার পরিচয় ঘোষণা করে। ২৬ শে বিতর্কের উদ্ভব ঘটে- - সঠিক কোন তারিখে এর উদ্ভব ঘটে সেটা পরে আলোচিত হবে এবং মিঃ মুখার্জি যখন বিবৃতি প্রদান করছিলেন, তখন কয়েকমাস পূর্বেকার কথাও বলছিলেন। এই বিবৃতি কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল, অবশ্য এটা সে দৃঢ়ভাবে সত্য বলে ঘোষণা করতে পারেনি, তার স্মৃতিকেও সজীব করেনি। কোন ক্ষেত্রেই সে স্মৃতিচারণ করেনি। বাদী বলেছিল সে নানকের অনুসরণকারী, আমার পিতা মাতা কেউই নেই। আমার কিসের চিন্তা? ঘটনাসূত্রে সে এটা পূর্বেও বলেছিল।

" আমার মনে পড়ে অন্য একটি উপলক্ষে আমি শুনলাম সাধু কিছু মধ্যদেশীয় লোকের কথা বলেছে, তোমরা আমাকে কি দিতে পার? আমি আমার পিতা-মাতা-স্ত্রীকে ছেড়েছি। এমনকি থাকার জন্য আমার কোন ঘরেরও প্রয়োজন নেই।"

সে অনুমোদন করেছে সে এটা বলেছে এবং এটা সত্য। সাধুর বর্তমান বিবৃতি যে তার পিতা-মাতা নেই এটা ভুল। বাদী পাঞ্জাবী না হিন্দুস্থানী— এটা একটা বড় বিষয়। কিন্তু এই স্তরে এটা বলা যথেষ্ট যে বাদী মিঃ মুখার্জীকে যা বলেছিল সেটাই মুখার্জী এজাহার হিসাবে দিয়েছিল। সে পাঞ্জাবীতে কথা বলেনি বা যাকে বলা হয় দুর্বোধ্য হিন্দী, যেটা প্রতিবাদী গণের বক্তব্য ছিল, কিন্তু হিন্দী, এমনকি ভাল উর্দুও নয়, কিন্তু সহজতম সম্ভাব্য বর্ণনাসই বিজারী হিন্দী। মিঃ মুখার্জী বলেছে যে সে নিজে হিন্দী বলে নিজের মাতৃভাষার মতো, পাটনার হিন্দী এবং তার এজাহার ছিল যে সাধু যে ধরনের হিন্দী বলেছে তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। মিঃ মুখার্জী বলেছে যে সাধু বাঙালীদের সাথে মাঝে মাঝে হিন্দীতে কথা বলত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাধুর কাছে ওষুধের জন্য আসত, কিন্তু সে মনে করতে পারে না সাধু এমন কোন ওষুধ দিয়েছে কি না। প্রতিবাদীদের বক্তব্য ছিল, জ্যোতির্ময়ীদেবীসহ আরো অন্যান্য সাক্ষীরাও বলেছে, বাদী বাংলা বলতে বা বুঝতে পারত না মে মাস পর্যন্ত যখন সে তার পরিচয় ঘোষণা করে, কিন্তু অদ্ভুত এক হিন্দুস্থানীতে কথা বলত। অতুলবাবুর মতে, কমিশনের সামনে পরীক্ষা করা হয়েছিল এ ব্যাপারে, কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি।

বাদী স্বীকার করেছে বাকল্যান্ড বাঁধে যারা তার সাথে আলাপ করতে আসত তাদের সাথে সে হিন্দীতে কথা বলত। সে বলেছে— " অনেক লোক সেখানে আমার কাছে আসত। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, এই লোকটি ভাওয়ালের কুমার।" 'মেজকুমার'। তাদের মধ্যে অনেককে আমি চিনতাম। আমি তাদের সাথে কথা বলেছি, অধিকাংশের বাজে কথা। তারা বাংলায় কথা বলত এবং আমি হিন্দীতে উত্তর দিতাম। আমি হিন্দীতে কথা বলতাম এই জন্য যে আমার গুরু আমাকে পরিচয় দিতে বারণ করেছিল।"

জেরায় বাদী বলেছে, ''জয়দেবপুরে পৌঁছে আমি প্রথম জানতে পারলাম যে আমি একজন বাঙালী ছিলাম— অর্থাৎ যখন আমি ঢাকায় পৌঁছালাম, তারপর আমার সব মনে পড়ল। ঢাকা রেল স্টেশনে পৌঁছে সব কিছু আমার পরিচিত বলে মনে হতে শুরু করল এবং আমি অবশ্যই বুঝলাম আমি একজন বাঙালী ছিলাম। জায়গাটা পরিচিত বলে আমাকে নাড়া দিল। সন্ন্যাসী থাকার সময় আমি এর পূর্বে কখনো ঢাকায় আসিনি। রেলস্টেশনে আমি জানতাম না, আমার মনে পড়েনি আমি কে— যে আমি একজন রাজার সন্তান।''

''পরের দিন আমি বাকল্যান্ড বাঁধে স্থান গ্রহণ করলাম। যে সব লোক যাতায়াত করত তাদের চিনতাম। তাদের নাম আমার মনে পড়ে। ঢাকায় আগমনের পূর্ব থেকেই আমি এই গবাদিপশু, মানুষ ও জিনিসপত্র সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম। আমি জানতাম না আমি রাজার সন্তান।''

'' আস্তে আস্তে আমার মনে পড়ল আমি এই সব জিনিসের সাথে জড়িত ছিলাম।''

প্রঃ- তখন কি আপনার মনে পড়েছিল যে আপনি মেজকুমার?

উঃ- আমার মনে পড়েনি। (প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি) যে সব লোক যাতায়াত করত আমার কাছ দিয়ে তাদের আমি চিনতাম এবং আমার মনে পড়ে যায় আমি মেজকুমার। প্রথম থেকে এটা আমার মনে পড়ে, লোকেরা বলছিল, ' ও ভাওয়ালের মেজকুমার।'

— আপনি কি তখন মনে করছিলেন এটা 'মায়া?' মনে করছিলেন ব্যাপারটি জটিল হয়ে যাচ্ছে?

উঃ- না।

আমার পুরনো স্মৃতি ফিরে এসেছিল— আমার বাড়ি ঘর, লোকজন। এটা বাকল্যান্ড বাঁধে হয়েছিল। যখন আমি কাশিমপুর গেলাম. আমার বাড়িঘর-দোর, আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে পড়ল।'

প্রঃ- তারপর আপনি যখন জয়দেবপুরে গেলেন, তখন আপনার সব মনে পড়ে গেল। শুধু চেয়েছিলেন মায়া কাটাতে?

উঃ- হ্যাঁ। গুরুর আদেশ ছিল।

কেউ আমাকে কিছু মনে করিয়ে দেয়নি। যা দেখেছি, মনে পড়ে গেছে।''

এই তথ্য অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু বাদীর বক্তব্য ছিল যে দার্জিলিঙের ঘটনার পর স্মৃতি ফিরে পাবার পর, সে নিজেকে চারজন নাগা সন্ন্যাসীর সাহচর্যে আবিষ্কার করে, কিন্তু, তার পূর্ব স্মৃতি লোপ পায়, সেখানে একটা অবস্থায় সে থাকে, অনেক পরে আবছা স্মৃতি ফিরে আসে যাতে কিছু নির্দিষ্ট হয় না সে কে, যেটা তাকে কষ্ট দিত, কিন্তু বারো ছত্তার তার মনে পড়ে তার বাড়ি ঢাকায়, এর বেশী কিছু নয়, তারপর ঢাকায় ফিরে আসার পর ক্রমে তার স্মৃতি ফিরে আসে।এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা ও বিচার করতে হবে এবং আদালতকে এই মামলার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হবে— প্রায় ১২ বছর যাবৎ এক স্মৃতিলোপের মামলা? এই সূত্রের উপরে আদালতকে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞদের মতামতকে, প্রধান নজির সমূহ,

বইতে বিভিন্ন মামলাকে পর্যবেক্ষণ করে, কোন মামলা যা এই রকম ঘটনাকে প্রকাশ করে, বাদীর বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে প্রাপ্য গুরুত্ব সহকারে এবং তার মানসিক ভারসাম্য স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক এই সবকিছুকে বিবেচনা করতে হবে। প্রশ্নটি শিক্ষা বিষয়ক নয় বা কোন রহস্যময় ঘটনা নয়। এই ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে, শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে এবং সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এটা যে সম্ভব তা প্রমাণিত হবে না, কিন্তু এটা সংঘটিত হয়েছিল, অনুমান প্রমাণ হাতে আসবে, বা অনুমান করা হচ্ছে যে এটা অন্যভাবে প্রমাণিত যে বাদী নিজে মেজকুমার। সামান্যকারণে এই ঘটনাকে স্থানচ্যুত করা যায়নি যে স্মৃতিলোপ একটা অসম্ভব ঘটনা।

এক মুহূর্তের জন্য এই তর্কবির্তককে একপাশে রেখে, বাকল্যান্ড বাঁধে এই ঘটনায় ফিরে আসা যাক ওটা গৃহীত হয়েছে বা এই ঘটনায় গোলমালহীন বা সহজে বোধগম্য যদিও জটিল।

বাদী বাকল্যান্ড বাঁধে প্রায় তিনমাসের ওপরে ছিল, শতশত লোক এটা দেখেছে, তার দেহাকৃতি তাদের আকর্ষণ করত, তার চুল, তার গলার স্বর, যারা তার কাছে আসত। তাদের সাথে সে হিন্দীতে কথা বলত। লোকে তার কাছে ওষুধ চাইত, যেমনভাবে একজন সন্ন্যাসী দেখলে লোকে চায়, মাঝে মাঝে সে তাদের এক চিমটি ছাই দিত। সে অস্বীকার করেছে যে কোনদিন কাউকে কোন ভস্ম দিয়েছে। এই সূত্রে তাকে কোন জেরা করা হয়নি। সে প্রায়ই এলাচ দিত কাউকে।

দেবব্রতবাবু, অবসবপ্রাপ্ত অধস্তন জজ, রাজপরিবার বা কুমারদের সম্বন্ধে কিছুই জানত না। বাদী ২১ জন সাক্ষীকে ডেকেছিল যারা বলেছে যে তারা কুমারকে জানত এবং যারা বলেছে যে ঐ সময়ে বাকল্যান্ড বাঁধের উপর তারা বাদীকে দেখেছিল। প্রতিবাদীপক্ষের বক্তব্য ছিল বাদী সনাক্তকৃত হয়নি বা মেজকুমার বলে চিহ্নিত হয়নি বাকল্যান্ড বাঁধের কোন ব্যক্তি দ্বারা এবং কোন ব্যক্তি বলেনি বা সনাক্তকরণ করেনি যে এই ব্যক্তি মেজকুমার যতদিন না জয়দেবপুরে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে ১৯২১ সালেব ৪ঠা মে তার পরিচয় ঘোষণা করা হয়— তাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাত, একটি বাঙলা কথাও বলতে বা বুঝতে পারত না সে। এমন অবোধ্য অর্থহীন কথা বলত যা কেউ বুঝতে পারত না। বাকল্যান্ড বাঁধের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সব ব্যক্তি বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তারা বলেছিল যে তারা বাদীকে দেখেছিল, তাকে মেজকুমার বলে ধারণা করেছিল বা এই চিন্তা তাদের মনকে স্পর্শ করেছিল (বা, সাক্ষী নং, ৩২৫, ৩৫৮, ৪৩৭, ৪৭২, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৯৯, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৮৩, ৭৭৯, ৮৫৮, ৮৮৮, ৮৯৩, ৯১৯)। এদের মধ্যে কারো কারো মনে এই চিন্তার উদয় হয়নি, কিন্তু এতে মনে হয় তারা কুমারকে ভালভাবে জনাত না— তাকে শুধুমাত্র রাস্তাঘাটে সাধারণভাবে দেখেছিল। তাদের দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের বাকী অংশ সত্য, তার মেজকুমারকে জানত বা তার মুখ চিনত এবং তাদের মধ্যে কেউ বলেছে যে যখন তারা বাকল্যান্ড বাঁধের উপর বাদীকে দেখেছিল, তারা ধারণা করেছিল যে ঐ ব্যক্তি মেজকুমার, কিন্তু সনাক্ত করেনি তাকে। বাকল্যান্ড বাঁধের উপর বাদীকে মেজকুমার বলে ধারণা করা হচ্ছিল এটা সনাক্তকরণের প্রশ্নে কিছুই প্রমাণ করবে না।

যখন বাদী বাকল্যান্ড বাঁধের উপর অবস্থান করছিল, তখন নবাব এস্টেটের ম্যানেজার মিঃ মেয়ের বাকল্যান্ড বাঁধের উপর ওয়াইজ হাউসে অবস্থান করছিল। প্রতিবাদীদের পক্ষের জন্য তাকে জেরা করা হয়। সে বলেছে যে সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই সাধুকে দেখেছিল। সে বলেছে বিশেষ কারণে তার প্রতি লক্ষ্য করা হয়। এই কারণ হচ্ছে একজন মানুষ এসে তাকে বলে যে সে শুনেছে সাধু বলছে সে মেজকুমার। এই আলোচনার পর সে বলেছে, " বাকল্যান্ড বাঁধের উপর যাতায়াত করার সময়ে আমি বিশেষ মনোনিবেশ করি তার উপর এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সে একজন প্রতারক।" এটা সরল যে এমনকি যখন সে বাকল্যান্ডে বাঁধে ছিল, বলা হচ্ছিল বা সন্দেহ করা হচ্ছিল যে সে মেজকুমার। প্রতিবাদীর বক্তব্য ছিল বাদীকে দেখতে সম্পূর্ণ অন্যরকম, বাকল্যান্ড বাঁধে তাকে মেজকুমার বলে ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষ ঢাকা থেকে একজন সাক্ষীও উপস্থিত করতে পারেনি যারা তাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল, শুধুমাত্র দেবব্রতবাবু ছাড়া যে কুমারকে চিনত না। যদিও অসংখ্য ঢাকার নাগরিক অবশ্যই তাকে দেখে থাকবে, এবং অবশ্যই তাকে মনে রাখবে। সংবেদনশীলতার দৃষ্টিতে, কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষ এই সূত্রে কোন সাক্ষী দিতে পারেনি, সতীশ মিত্র (প্র সা নং ১২৪) নামে একজন ছাড়া যে ঢাকায় থাকত না। তার সাক্ষ্য দেখে সন্দেহ করা যেতে পারে সে আদৌ কুমারকে চিনত কিনা বা তাকে বাকল্যান্ড বাঁধে দেখেছিল কিনা।

বাকল্যান্ড বাঁধে থাকাকালীন পরিবারের কেউ তাকে দেখেছিল কিনা, এর সাক্ষ্য ছিল না। শুধু বুদ্ধ ছাড়া। সে একদিন বাবু রমেশ চৌধুরী ও ভুলুবাবু ওরফে কাশিমপুরের অতুল প্রসাদের সাথে তাকে দেখতে গেল, কিন্তু তাকে সনাক্ত করেনি, যদিও সে বলেছিল, অতুলবাবু যেমন বলেছিল, লোকটিকে দেখতে মেজকুমারের মতন। যাইহোক প্রতিবাদীপক্ষ এটা স্বীকার করেনি। বাকল্যান্ড বাঁধে তাকে মেজকুমাব বলে ধারণা করা হচ্ছে, এটা তার সার্থক পরিচয়কে প্রমাণ করে না। কিন্তু গুজবের প্রতি কিছু সমর্থন পায়। অন্যভাবে দেখা গিয়েছে সে জীবিত তার একাংশ সাদৃশ্য সমর্থিত। সাদৃশ্যের এই আর এক আশ্চর্যজনক মায়া। কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষ এটা স্বীকার করেনি এবং একের পর এক সাক্ষী চলচ্চিত্র করে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে এই গুজব কোন ঘটনা নয় এবং বাদীকে দেখতে সম্পূর্ণ অন্যরকম, এত পার্থক্য যে কেউ একে অন্যের সাথে সাথে ভুল করতে পারে না, এমনকি সে বাংলা বলতে বা বুঝতেও পারে না।

৫ই এপ্রিল তারিখে বাদীকে কাশিমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে প্রশ্ন আসে কে তাকে নিয়ে গিয়েছিল এবং বাদীর বক্তব্য যে কাশিমপুরের জমিদার বাবু অতুলপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাকে কাশিমপুরে নিয়ে গিয়েছিল, এই স্থান জয়দেবপুর থেকে খুব একটা দূরে নয়। জয়দেবপুর থেকে চারমাইল দূরে কোড়ায় গিয়ে তোবাগ পার হয়ে প্রায় দুমাইল হেঁটে কাশিমপুরে পৌছান যায়। এখানকার জমিদারদের মধ্যে অতুলবাবু একজন। এই পরিবারের সাথে ভাওয়াল পরিবারের ভাল পরিচয় ছিল এবং মেজকুমার ও অতুলবাবু পরস্পরের সাথে সুপরিচিত ছিল। বাদী বলেছে যে অতুলবাবু তাকে কাশিমপুর নিয়ে গিয়েছিল, যখন সে তাকে

মেজকুমার বলে সন্দেহ করে, ৫-৬ দিন সেখানে থাকে সে, এবং তারপর হাতীতে করে জয়দেবপুরে তাকে ফেরত পাঠান হয়। বাদী যে বাঁধ থেকে কাশিমপুরে গিয়েছিল এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই। যতক্ষণ না প্রতিবাদীপক্ষ বলতে শুরু করে যে বাদী ১৩২৮ সনের ৩০ শে চৈত্র জয়দেবপুরে আবির্ভূত হয়, ততক্ষণ কোন প্রশ্ন নেই। বরঞ্চ বলা যেতে পারে প্রশ্ন ছিল না। তারা চৈত্রের শেষ দিন বাদীর আগমণের দিন স্থাপিত করেছিল, কিন্তু ৩০ শে শেষ তারিখ বটে, তবে ঐ বছরে চৈত্র মাস ছিল ৩১ দিনের। যতক্ষণ না এই প্রসঙ্গে আসা হবে, ততক্ষণ এটা বোধগম্য হবে না। কিন্তু কাশিমপুরে কি ঘটেছিল এবার সেটা দেখা যাক।

ভুলুবাবু অস্বীকার করে যে সে বাদীকে কাশিমপুরে নিয়ে যায়নি নিজে। একজন অফিসার তাকে কাশিমপুরে নিয়ে যায়। কাশিমপুর জমিদার পরিবারের প্রধান বাবু সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ছিলেন অতুলবাবুর কাকা, তিনি নিঃসন্তান এবং তিনি সন্ন্যাসীকে দিয়ে একটি 'পুত্রেষ্টি' যজ্ঞ করাতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ একটি সন্তান লাভ করার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সন্ন্যাসী বলার পর যে সে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কিছুই জানে না, তিনি তাকে হাতীতে করে জয়দেবপুরে ফেরত পাঠান। বাবু অতুলপ্রসাদ, ঋণগ্রস্ত ছিল, কিন্তু নিঃসন্দেহে সে এই পরিবারকে জানত এবং নিজেরাও প্রচান জমিদার বংশের অন্তর্ভুক্ত। তুলনামূলকভাবে সে ছিল কমবয়সী। কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তার বয়স ছিল ৪২ বছব এবং সে বিচারকালীন আদালতে আসতে উত্তমরূপে সমান ছিল। তাকে ডাকা হয়নি, বা তার সাক্ষ্য পেশ করা হয়নি, শুধুমাত্র বিচার শেষ হওয়ার পূর্বে যখন একটি অভ্যর্থনা বিষয়ক মামলা উত্থাপিত হয়, এক ব্যক্তি কাঠগড়ায় আসে এবং বলে সে একজন ডাক্তার, অতুলবাবু অসুস্থ এবং কলকাতায় গেছে। ডাক্তার, পরে রূপান্তারিত হয় তার গোমস্তায়, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে সে বিচারব্যবস্থাকে প্রতারণা করেছিল। সংক্ষেপে সে পলায়ন করেছিল। পলায়নের পেছনে তার ভাল কারণ ছিল। সনাক্তকরণের প্রশ্নে সে ছিল প্রতিবাদীদের পরীক্ষাকৃত দশজন সাক্ষীর একজন। এই অতুলবাবু বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে একটি তালিকা প্রদান করেছিল। এবং এই পাথর্ক্যের মধ্যে একটি ছিল কুমারের চুলের রঙ ছিল বাদামী, কিন্তু বাদীর চুলের রঙ ছিল কালো। বর্তমানে বাদীর চুলের রঙ কালো ছিল না, বাদামী ধরনের, কালোর সাথে লালের ঔজ্জ্বল্য সহ, যা প্রত্যেকের চোখে পড়ে। ১৯২১ সালের মে মাসে মিঃ লিন্ডসে এটা দেখেছিল এবং মুগ্ধ হয়ে বলেছে যে তার চুল সোনালী-বাদামী রঙের এবং গায়ের রঙ ছিল দারুণ। অতুলবাবুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, দশজন লাহোরের সাক্ষী বলেছিল মাল সিংহের চুলের রঙ ছিল কালো — বাদীকে মাল সিংহ হিসাবে বলা হয়েছিল। বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে এটুকু বোঝা গিয়েছিল কৌসুঁলিও বাদামী চুলের ব্যাপারটি হালকা করে দেখে কালো চুলের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিল। অতুলবাবু আসতে পারেনি। কিন্তু বাদী ও মেজকুমারের পার্থক্যের তালিকার উপর একটি মামলা দায়ের হল। অতুলবাবু স্বীকার করেছে যে তাকে সন্ন্যাসীর জন্য পাঠানো হয়েছিল। যে অফিসার তাকে কাশিমপুরে নিয়ে এসেছিল তাকে ডাকা হয়নি। সে স্বীকার করেছে সে সন্ন্যাসীকে জয়দেবপুরে পাঠিয়েছিল। সে অনুমোদন করেছে সে

জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়িতে গিয়েছিল যখন পরবর্তীকালে ১৯২১ সালের মে মাসে বাদী সেখানে অবস্থান করেছিল। সে অনুমোদন করেছে সে ঢাকার বাড়িতে গিয়েছিল যেখানে বাদী এসেছিল তারপরেও থাকার জন্য। বাদী এই বাড়িতে এত যেত, ঢাকার এক প্রতিবেশী উকিল তাকে বলে যে এত লোকের মধ্যে তার কি এত ঘনিষ্ঠভাবে যাওয়া উচিত! যেখানে দেখা যাচ্ছে সরকার তাকে একজন প্রতারক বলে ঘোষণা করেছে এবং তার উত্তর ছিল যে সাধু হচ্ছে মেজকুমার নিজে। কাশিমপুর জমিদার পরিবারের প্রধান সারদা বাবু, অতুলবাবুর কাকা, বাদীর আগমনের সময় কাশিমপুরে ছিল। বাদী তাকে ডেকে পাঠায়, কিন্তু সে যায়নি এবং প্রতিবাদীপক্ষ তাকে ডেকে পাঠানোর ঝুঁকি নেয়নি। এটা স্বীকৃত যে অতুলবাবু বাকল্যান্ড বাঁধে সাধুকে দেখতে আসেনি এবং সে-ই সাধুকে কাশিমপুরে নিয়ে গিয়েছিল, যেমন পরবর্তীকালে সে বাদীকে ঢাকা থেকে জয়দেবপুরে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯২১ সালে ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজার মিঃ নিডহ্যাম তার বিবৃতি অনুমোদন করে। বাদী সাঃ নং ৪৩৭ হেমেন্দ্রবাবু প্রকৃতপক্ষে তাকে চৈত্রমাসে একদিন বিকাল ৪ টের সময় বাকল্যান্ড বাঁধ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করেছিল। চৈত্র মাস সম্বন্ধে কোন ভুল হয়নি, দেখা যাচ্ছে বাদী ৬ টার সময় কাশিমপুরে পৌঁছেছিল, সাক্ষ্য হিসাবেও চৈত্রমাসের উল্লেখ মানানসই। যদি ঘণ্টা সম্বন্ধে কোন ভুল হয়ে থাকে বা যদি তাকে ঢাকাতে অতুলবাবুর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে এই যাত্রা পরের দিন করা হয়েছিল।

'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ' ও সন্ন্যাসীর চুক্তির গল্প এত অস্বাভাবিক, যে গল্পের মধ্যে সন্ন্যাসীকে জয়দেবপুরে আনা হয়েছিল এবং প্রতিবাদী পক্ষ আরেকটি গল্প বানানোর চেষ্টা করেছিল। ১৯৩৪ সালের একটি তারিখ পর্যন্ত রায়সাহেব যোগেন্দ্র জয়দেবপুরে প্রতিবাদীপক্ষের একজন অফিসার ছিলো। পদচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত সে ছিল এই মামলার একজন প্রধান তদ্বির-তদারককারী। সে পুনর্নিযুক্ত হওয়ার জন্য একটি আবেদন করেছিল, যেটা চাপা পড়ে ছিল এবং এই মামলার জন্য কিছু বিস্ময়কর তদ্বির সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হবে। এই সাক্ষী এসে বলে যে সে বাদীকে হাতীতে চড়ে কাশিমপুরে যাওয়ার পথে বারুণী মেলার দিনে দেখেছিল (দিনটি ছিল ঐ বছরের ৫ই এপ্রিল) এবং তার সঙ্গে ছিল মিঃ থমাস রঞ্জন একজন সাবডেপুটি কালেক্টর (মৃত), কাশিমপুরের একজন অফিসার (ডাকা হয়নি) এবং মিঃ থমাস বলেছিল যে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সারদাবাবুর স্ত্রীকে চিকিৎসা করবার জন্য— কোন যজ্ঞ করবার জন্য নয়। সে বলেছিল যে সাধুকে পথেই জয়দেবপুরে ফেরত পাঠানো উচিত। বাদীর প্রতি এই মামলা আরোপ করা হয়নি। সহকারী ম্যানেজার মিঃ মোহিনী চক্রবর্তী অন্যান্য চুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে প্রস্তুত হয়েছিল যেটা প্রমাণিতভাবে অসত্য।

দেখা যায়, বাদী সত্য কথা বলেছিল যখন সে বলেছিল যে অতুলবাবু তাকে বাকল্যান্ড বাঁধ থেকে কাশিমপুরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কী ঘটেছিল সেটা গোলমেলে। একধারে বাদী প্রদত্ত তথ্য, অন্যধারে অতুলবাবুর তথ্য। সেজন্য সন্দেহ করা যেতে পারে, অন্য সাক্ষী বাঃ সাঃ নং ৮৫৭ সেখানে ছিল না। দেখা যাচ্ছে, সে সময় দেয় বেলা ১১টা বা ১২ টায় বাদীর

উপস্থিতি। তার সাক্ষ্যে এটা ছিল না কাশিমপুরে যে কেউ তাকে চিনেছিল। দেখা যাচ্ছে যে সারদাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বাদী এখানেও গাছের নীচে অবস্থান করেছিল এবং মহামান্য ওয়ার্ড অব রেভিনিউয়ের কাছে স্মারক লিপি বিষয়ে বাদীর বিবৃতি দিয়েছিল এই বিষয়ে যে কাশিমপুরে সে সনাক্তকৃত হয়েছিল এবং অনেক লোকলস্কর সহ জয়দেবপুরে প্রেরিত হয়েছিল, তার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করবার কোন প্রয়োজন নেই। যতটুকু ঘটনা অবশিষ্ট আছে যে তাকে কাশিমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকে তাকে জয়দেবপুরে পাঠান হয়েছিল, এর কারণ 'পুত্রেষ্টি' যজ্ঞ বা সন্ন্যাসীর সাথে কোন চুক্তি নয়, কারণ হচ্ছে বাকল্যান্ড বাঁধে বাদীর প্রতি ঘনিষ্ঠ নজর রাখা। মিঃ মেয়ের এ বিষয়ে প্ররোচিত করেছিল। অতুলবাবু বলেছিল যে বাদী নানারকম অবোধ্য হিন্দীতে কথা বলছিল যা ভাষান্তরিত করা হয়েছিল, সে বলেছে যে বাদী বলেছিল বাদী জানে না কি করে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে হয়, তার গুরু ছিল ধর্মদাস যেটা ঘটনা— তার বাড়ি ছিল পাঞ্জাবে এবং তার বাবা সুন্দর দাস। এর কিছুই বাদীর প্রতি আরোপ করা হয়নি, সুন্দর দাস নামটি ১৯২১ সালের জুন মাসে পাঞ্জাবে এক অনুসন্ধানের পর বাদীর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল এবং এই কারণে , যেটা পরে দেখা যাবে, ঐ অনুসন্ধান, প্রতিবাদীদের একটি নীরস মামলার পেছনে যেতে প্ররোচিত করেনি যে বাদী একজন পাঞ্জাবী। ব্যপারটি হচ্ছে যে সে সুন্দর দাস বা মাল সিং এটা সওয়ালের মধ্যে ছিল না, মামলা হিসাবে বাদীর প্রতি আরোপিত হয়নি যদিও পরবর্তী কালে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এটা প্রমাণ করতে যে সে ছিল অজলার মাল সিংহ যে সুন্দরদাস হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। বাকল্যান্ড বাঁধে সে বাঙালিদের সাথে হিন্দীতে কথা বলত। যে ধরনের হিন্দী দেবব্রতবাবু বলত এবং এ বিষয়ে প্রচুর সাক্ষ্য ছিল যে ১৯২১ সালের মে মাসে সে তার পরিচয় ঘোষণার পরে বাঙলায় কথা বলতে শুরু করে, কাশিমপুর যাত্রার পর একমাসের মধ্যে। সম্পূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে সে কী পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানী বা মাল সিং বা সুন্দর দাস, এটা দেখতে হলে, যদি সে সুন্দর দাসের নাম এপ্রিলে জেনে থাকে এবং পরিচয় ঘোষণার পর মে মাসে সে জয়দেবপুর এসে থাকে, যে হিসাবে সে বলেছে বাদী একজন প্রতারক, বায়সাহেব ও অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করার সে বাদীর বিপক্ষে তথ্যের জন্য চিন্তান্বিত হয়েছে, সুন্দরদাস নামটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, প্রতিবেদনে প্রথমবারের জন্য উপস্থিত হয়নি, পাঞ্জাবের সুদূর কোণে এক অনুসন্ধানের পর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসাবে ১৯২১ সালে ২৭ মে জুনের প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছিল।

দেখা যায় ৫ই এপ্রিল বাদী কাশিমপুরে গিয়েছিল, অতুলবাবু তাকে নিয়ে গিয়েছিল এবং কাশিমপুর থেকে সে হাতীতে চড়ে ৩০শে চৈত্র জয়দেবপুরে আসে ১৯২১ সালের ১২ ই এপ্রিল।

এটা স্বীকৃত হয়েছিল, তবে পরে প্রতিবাদী পক্ষ ৩১ শে চৈত্রে তার আগমনের দিন স্থাপিত করে। এটা পরে দেখা যাবে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সূচিত এই সামান্য ব্যবধানে কি ঘটেছে। তবে এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে দিনে বাদীর আগমন ঘটেছিল, সেটা ৩০ শে বা ৩১ শে চৈত্র, তার আগমন হয়েছিল ৬টা নাগাদ। সে রাজবাড়িতে অবতরণ করেছিল এবং

মহাদেববাড়ির একটি কামিনী গাচের নীচে এক পোস্তার উপরে আসন নিয়েছিল, রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই ছিল ঠাকুরবাড়ি যেটা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। সে তখনো প্রায় উলঙ্গ, ভস্মাচ্ছাদিত দাড়িযুক্ত সাধু, দীর্ঘ জটাধারী, একটি কম্বল, একজোড়া চিমটে ও জল বহন করার জন্য একটি কমণ্ডলু ছাড়া আর কিছু সম্বল নেই। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট ও রায়সাহেব যোগেন্দ্র সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবু এই তথ্য প্রদান করেছিল। তারা বলেছে যে সন্ন্যাসীর আগমনের দিন তারা তাকে দেখেছিল।

এটাও স্বীকৃত যে বাদী আগমনের দিন রাতে জয়দেবপুরে রাত যাপন করেছিল, তার পরের দিন, ও পরের দিন বিকাল ৪ টে পর্যন্ত অবস্থান করেছিল। এই যাত্রায় কি ঘটেছিল এটা একটা দারুণ গোলমেলে বিষয়, দুটি বিবরণ ছাড়া।

এই যাত্রা সম্বন্ধে যে সব সাক্ষী ছিল :—

১. মোক্ষদাসুন্দরী দেবী, ৭০ বছর (কমিশনে)
২. কুলদা সুন্দরী দেবী (কমিশনে)
৩. বাঃ সাঃ নং ১৪, রামাকানাই শীল।
৪. লালমোহন গোস্বামী (বাঃসাঃনং ৮৫২)
৫. সতীশ রায় („ „ „ ৯২২)
৬. অবিনাশ মুখার্জী („ „ „ ৯৩৭)
৭. বিলু („ „ „ ৯৩৮)
৮. প্রফুল্ল মুখাটি („ „ „ ৯৫৮)
৯. সীতানাথ মুখার্জী („ „ „ ৯৭৩)
১০. সাগরবাবু („ „ „ ৯৯৭)

এই সব সাক্ষী সম্বন্ধে কিছু অবশ্যই বলতে হবে। চণ্ডী নিয়োগীর বিধবা পত্নী মোক্ষদা সুন্দরী , যার স্বামী ছিল এস্টেটের একজন নায়েব। তার বয়স ৭০ এবং স্বামীর নিকট যাওয়া ছাড়াও, সে জয়দেবপুরে বাস করেছে। প্রতিবেশিনী হিসাবে সে কুমারদের মা রানী বিলাসমণির সাথে মিশত এবং রানীর সাথে শিখত সে একজন সেলাই শিক্ষিকার কাছে সেলাই শিখছিল।

রাজা রাজেন্দ্রর একজন জ্ঞাতি প্রসন্ন ব্যানার্জীর বিধবা কুলদাসুন্দরী আরেকজন বৃদ্ধা মহিলা। রাজার মা সত্যভামার একজন বোনের ছেলে হচ্ছে প্রসন্ন এবং সাক্ষ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রসন্ন ব্যানার্জীর নাম দেখা গেছে। তার আরেক ভাই নিকাব থেকে আলাদা করতে তাকে জঙ বাহাদুর বলে ডাকা হত। এই মহিলা কার্যত সারাজীবন জয়দেবপুরে কাটিয়ে দিয়েছিল, অর্থাৎ ১১ বছর বয়সে তার বিবাহ থেকে তার ঘর ছিল রাজবাড়ির উত্তরে। ইন্দুময়ী ও রাজার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সে স্তন্যদান করেছিল এবং তার স্বামীকে জমিদান করা হয়েছিল যা সে ভোগ করেছিল পরেও। এই দুজন মহিলা ও অন্যান্যরা, অনন্তকুমারী, পুরোনো অফিসারদের বিধবাগণ যাদের অন্দরে প্রবেশের অধিকার ছিল, তাদের কমিশনে জেরা করা

হয়। এদের সম্বন্ধে মেজরানী বলেছিল যে এদের ডাকা হোক, কিন্তু তাদের সাথে কথা বলার প্রথা বৌয়ের ছিল না, যেটা ছিল সব দিক থেকে অপছন্দের, যতদিন রানী জীবিত ছিল।

৭১ বছর বয়স্ক পারিবারিক নাপিত রামকানাই শীল রাজবাড়ি থেকে ৫মিঃ দূরত্বে বাস করত; লালামোহন গোস্বামী ছিল রানী সত্যভামার পুত্র।

সতীশ রায় ছিল গুণেন্দ্র ঘোষের একজন অফিসার যে এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং যে বাদীর একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল।

অবিনাশ মুখার্জী ছিল ভাওয়াল রাজের একজন প্রাক্তন কর্মচারী এবং পরবর্তী কালে ১৯২২ সালে সত্যভামা দেবীর মৃত্যু পর্যন্ত একজন কেরানী ছিল।

বিলু হল ইন্দুময়ী দেবীর এক পুত্র।

প্রফুল্ল মুখুটি জয়দেবপুরে রাজ পরিবারের একজন নিকট প্রতিবেশী এবং বর্তমানে বাদীর একজন অফিসার।

সতীনাথ মুখার্জী হল দ্বারিকানাথের পুত্র, কুমারদেব একজন পুরোনো শিক্ষক, যে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল এস্টেটের কার্যে রত ছিল। তারপরে তাকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য কর্মচ্যুত করা হয়। কর্মরত অবস্থায় সে বাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, ১৯২২ সালে একটি মামলায়, বাদী কর্তৃক দাবীকৃত পরিচয়ের বিরুদ্ধে।

সাগরবাবু (বাঃ সাঃ নং ৯৭৭) হচ্ছে জ্যোতির্ময়ীদেবীর জামাই।

এই তথ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ৩০ শে চৈত্র (১৫-৪-২১) সাধুর আগমন ঘটে। রাধিকা ছাড়া (বাঃ সাঃ নং ৮৫১) অন্য কোন সাক্ষী এই দিনে তাকে দেখেনি। সন্ধ্যা ৬টার সময় তার আগমন ঘটে এবং ঐ দিনে রায় সাহেব ও মোহিনীবাবু ছাড়া আর কেউ তার কাছে যায়নি। যেদিন বাদী আগমন করে— তার একমাত্র তথ্য শুধু এটা, রাধিকার সাক্ষ্য থেকে বাস্তবিক পৃথক নয়--- বাদী একটি কামিনী গাছের তলায় বসেছিল, পরনে লেংটি সারা গায়ে ছাই মাখা। রাধিকা বলেছে গোধূলি হবার পূর্বে বাদীর আগমন ঘটে--- এটা 'সঠিক'। সে তার প্রতি লক্ষ্য করে, নিকট থেকে তার হাত-পায়ের প্রতি চোখ পড়ে, কিন্তু তাকে চিনতে পারে না। যদি সে সত্য বলে থাকে, সে সন্দেহ করছিল যে ঐ ব্যাক্তি ছিল কুমার এবং তার আচরণ ছিল একেবারে কুমারের মত। লালমোহন এই দিনটির কথা উল্লেখ করেছে চৈত্রসংক্রান্তির ২-৩ দিন পূর্বে, কিন্তু এই দিনটি সে তার আগমনের দিন হিসাবে উল্লেখ করেনি, দেখা যাচ্ছে সে পরের দুদিনের তথ্য দিয়েছে, বাদী তৃতীয় দিন স্থান ত্যাগ করে।

পরের দিন, ৩১ শে চৈত্র—সাগরবাবুর তথ্য অনুসারে এই দিনটি ৩১ শে। যা ঘটেছিল তা সাময়িকভাবে নিতে হবে।

সকালে সাগরবাবু রায়সাহেবকে দেখতে রাজবাড়িতে গমন করে, তার ভাইয়েরা যাদের ঘর ছিল রাজবাড়ির ভেতরে এবং যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে এই বাড়ির বাসিন্দা শুধু বসন্ত ছাড়া। বসন্ত হচ্ছে কুমারদের মামা যে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে এই বাড়িতে বাস করত। কেউ বলেনি সে এই সময়ে সেখানে বাস করছিল এবং কেউ তাকে কোনভাবে এই

ঘটনার সাথে জড়িত বলে উল্লেখ করেনি। সাগরবাবু তার ভাইকে দেখতে যায় এবং তার ভাই যোগেনবাবু বলেছে যে এক সন্ন্যাসী কাশিমপুর থেকে এসেছিল যাকে লোকে মেজকুমার বলে সন্দেহ করছে। সে বলে, " চল, তাকে দেখা যাক।" উভয়ে গোলবারান্দায় যায় এবং সেখান থেকে দেখে সাধু বসে আছে। তখন সকাল ৮ টা।

" সাধু বসে ছিল। তার চুল কোঁকড়ানো ও কটা, হাঁটু পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। দাড়ি বর্তমান। তার মুখ ও সমস্ত শরীর ভস্মাচ্ছাদিত। যখন আমরা তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম সে আমাদের লক্ষ্য করছিল। আমি তার চোখের রঙ দেখতে পেয়েছিলাম। সেটা বাদামী রঙের, আমি লক্ষ্য করলাম তার গঠন, তার বসার ধরন এবং তার তাকানোর ভঙ্গী। আমি সন্দেহ করলাম সে মেজকুমার। আমি যোগেনবাবুকে বললাম যে আমি কী ভাবছি। সে বলল ব্যাপারটি গুরুতর। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কী ভাবছে। সে বলল হৈ চৈ করো না। অপেক্ষা করে দেখা যাক কি ঘটে।"

এই আলোচনা হয়েছিল গোলবারান্দায় যেখানে বাদী আসন গ্রহণ করেছিল। যখন সে সেখানে ছিল বুদ্ধ এল। আমার উপস্থিতিতে বুদ্ধবাবুর সাথে দাদাব কোন কথা হল না। তারা একটি ঘরে গিয়ে কথা বলল।

বুদ্ধ তারপর বলে গেল, কিন্তু তার পূর্বে সে বলে গেল যে তার মা সাধুকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। সে সাধুকে আসবে কি না জিজ্ঞাসা করায় সাধু বলল সে যাবে, এখন নয়, তবে বিকালে। এরপর সাগরবাবু ও যোগেনবাবু তাদের খাবার খেতে বলে গেল, ফিরে এসে দেখল সাধু তখনো সেখানে বসে আছে। " যতই আমি দেখতে লাগলাম, আমার সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে লাগল। যোগেন্দ্রবাবুও সেখানে ছিল। সে ও আমি সেখানে প্রায় ৫/৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত ছিলাম। তারপর বুদ্ধবাবু এল এবং সাধুকে গাড়িতে নিয়ে চলে গেল।"

এই তথ্যটি লালামোহনবাবুর তথ্যের সাথে খাপ খায় যতদূর সে বলে যে এই দিনে সে সাধুকে দেখেছিল যখন সূর্য উদিত হয়ে রাজবাড়ির দিকে যাচ্ছিল — সারা গায়ে ছাই মাখা এবং সম্ভবত সে গোধূলিতে তাকে দেখেছিল, কিন্তু তার সাক্ষ্য ছিল না সে মাধববাড়িতে তাকে দেখেছিল গোধূলিলগ্নে, যেহেতু বুদ্ধুবাবু তাকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সাগরবাবুর সাক্ষ্যও স্বীকৃতি ঘটনার সাথে খাপ খায় না। বাদীর আগমনের দ্বিতীয় দিনে বাদী সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুর বাড়িতে যায়। কোন তথ্য এর সাথে খাপ খায় না— এটা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

সীতানাথ বলেছে যে সে বাদীকে ঐ দিনে সহকারী ম্যানেজারের বাড়িতে দেখেছিল। তারিখটি ছিল ১৯২১ সালের ১৩ই এপ্রিল অর্থাৎ ৩১শে চৈত্র। সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুও বলেছে যে ঐ দিনে বাদী তার বাড়িতে এসেছিল এবং বিকাল ৫ টা নাগাদ চলে যায়। তারপর সতীশ রায়ের সাক্ষ্য অনুসারে বাদীকে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে।

যাইহোক একটা ব্যাপার সরল। প্রায় পাঁচটার সময় সাধু মাধববাড়ি থেকে কয়েক মিনিট

দূরে সহকারী ম্যানেজারের বাড়িতে ছিল। তারপব সে চলে যায় মাধববাড়িতে। এই তথ্য সহকারী ম্যানেজারের এবং তারপর রাত্রিতে গোলবারান্দায় একটি চায়ের বৈঠকে তাকে আনা হয়। রায়সাহেব যোগেন্দ্রবাবু ও ফণিবাবু এবং আরো তিনজন সাক্ষী। যাদের কথা পরে উল্লেখ করা হবে। এই চায়ের বৈঠককে সমর্থন করেছিল। এটা ছিল বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখের দিন। বাদীর তরফে সাক্ষ্য ছিল যে সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুর বাড়ি থেকে তাকে বুদ্ধবাবু জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে জ্যোতির্ময়ীদেবী ও বাদীর মধ্যে এক সাক্ষাৎকার ঘটে। এটি একটি ঘটনা। নির্দিষ্ট ঘটনার দ্বারা চায়ের বৈঠক তথ্যটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। নীচে প্রদত্ত তথ্যের এক পরীক্ষা থেকে ঘটনাটি প্রকাশ পাবে।

জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে সে তার ছেলের কাছ থেকে এক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কিছু শুনেছে যে এসেছে এবং তাকে বলেছে তাকে গিয়ে নিয়ে আসতে। বুদ্ধ একটি টমটমে করে বেরিয়ে যায়, কিন্তু একাকী ফিরে আসে। গোধূলিতে সন্ন্যাসী আসে। এটা ছিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন। সে সাধুকে দেখেছিল তার ঘরের সামনে দক্ষিণের বারান্দায় একটি মাদুরের উপরে বসে আছে। সাধুর কাছে বসে আছে তার (জ্যোতির্ময়ীর) দুই কন্যা, তার ঠাকুমা— সত্যভামাদেবী, ইন্দুময়ীদেবীর তিনপুত্র, তার মৃত বোনের স্বামী গোবিন্দবাবু। এই বোনের বাড়ি ছিল 'চক্করে' পাশাপাশি, সবচেয়ে পশ্চিমদিকের বাড়িটি হচ্ছে জ্যোতির্ময়ীদেবীর এবং পূর্বদিকেরটি ইন্দুময়ীদেবীর সবচেয়ে ছোট বোনের বাড়িটি হচ্ছে মাঝেরটি যে চলে গিয়েছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবীর ঘরটি ছিল কাদার দেওয়ালযুক্ত, করোগেটেড টিনের ছাদের কাঠামো সহ, মেঝে ছিল এবং এর একটি সম্পূর্ণ বর্ণনা পরে প্রয়োজন হবে। রাজবাড়ি থেকে এর দূরত্ব সিকিমাইল ও এটি দক্ষিণমুখী।

●এই বাড়ির দক্ষিণী বারান্দায়, জ্যোতির্ময়ীদেবী এই সন্ন্যাসীকে বসে থাকতে দেখেছিল পরিবার পরিবৃত হয়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে। সে বলেছে, সন্ন্যাসী বসে ছিল। মাথা অবনত, ঘাড় কাত করে দূরে কি যেন দেখছে। "এটা আমাকে লোকের প্রতি মেজোর তাকানোর ভঙ্গির কথা মনে করিয়ে দিল। এটা আমার সন্দেহকে উদগ্রীব করে তুলল। আমি তাকে লক্ষ্য করতে শুরু করলাম, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চোখ, কান, ঠোঁট, দেহ, হাত-পা, মুখের ভঙ্গি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম। অন্যান্যেরাও তাকে লক্ষ্য করতে লাগল এবং আমার সন্দেহ হল। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা তার চোখের রঙ দেখতে পারলাম না। তার সাথে হিন্দিতে কিছু আলোচনা করলাম আমরা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- - "তুম কই রোজ হিঁয়া রহেগা?"

সে বলে, "হাম কাল ব্রহ্মপুত্র স্নান মে চলা যায়েগা, নাগলবন্দ।"

"আমি তাকে কিছু ফল এবং নরম ও শক্ত সর দিলাম। সে শক্ত দুধের সর ছাড়া আর কিছুই নিল না। এগুলি নেওয়ার পর সে চলে গেল।

আমি তার চলে যাওয়া লক্ষ্য করলাম-- এটার ধরন ছিল মেজকুমারের মতো। আমি তার উচ্চতা লক্ষ্য করলাম, কিন্তু তাকে সামান্য বলিষ্ঠ বলে মনে হল, ১৯/২০ বছরের মতন।

ঐদিন তার মুখে ছাই মাখা ছিল।

তার চলে যাবার পর আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে আলোচনা করলাম এবং পরের দিন তাকে ডেকে খাওয়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম, উদ্দেশ্য দিনের বেশি আলোয় তাকে দেখা। সেই রাতে আমি আমার কর্মচারী যতীন ভট্টাচার্যকে তার খাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে তার কাছে পাঠালাম। সে ফিরে এসে বলল, সামান্য কিছু।"

পরের দিন ১ বৈশাখ, তার পুত্র বুদ্ধ চা খাওয়ার পর তাকে ডেকে আনতে গেল। সে তখন এল না, এল দুপুরে অথবা সামান্য পরে। পারিবারিক নাপিত রামকানাই শীল তাকে দেখেছিল সকালে রাজবিলাসের দিকে যেতে, বারান্দা পার হয়ে মেজকুমারের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে দৃষ্টিপাত করে, পার হয়ে একটা শৌচাগারে প্রবেশ করে এবং তারপর বাথরুমে একটি ট্যাপের নিচে স্নান করে। তারপর সে বেরিয়ে গিয়ে 'শ্মশানেশ্বরী'-র দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখান থেকে সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে যায়। এইদিন সকালে বৃদ্ধা মোক্ষদাসুন্দরীও তাকে দেখেছিল সে এসেছিল এই শুনে যে একজন সাধু এসেছে, সে দেখতে মেজকুমারের মত এবং নিচে তার বর্ণনা যা দেখেছিল সে-- "আমার কন্যা ও 'বাবু' এবং আমি সাধুকে দেখেছিলাম মাধববাড়ির দিকে যেতে। আমি তার পেছন দিকটা দেখেছিলাম। আমি তার চলার ভঙ্গি দেখেছিলাম এবং এক শিহরন বয়ে গেল আমার মধ্য দিয়ে। আমি মনে করলাম, এটা মেজকুমারের চলার ভঙ্গি। সে হেঁটে চলল এবং আমরা তার পেছনে অনুসরণ করলাম। যখনই সে মাধববাড়ির ঘাটে জলের দিকে নেমে গেল, আমি মাধববাড়ির দক্ষিণী বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেলাম। কুমার এল ও কামিনী গাছের কাছে একটি মাদুরে বসল। সামনে একটি ধুনি জ্বলছিল। সে এটি নিয়ে তার সামনে মাদুরের উপর রাখল। তার কোলের উপর একটি তোয়ালে ছিল। সে এটি নিয়ে তার মুখ মুছল বা নিচে রেখে দিল। আমি তাকে দেখার জন্য গেলাম, একই মুখ, একই চোখ, একই দুধসাদা মসৃণ গাল, পিঙ্গলা গোঁফ, একই তাকাবার ধরন। আমার তখন দৃঢ় সন্দেহ হল যে ঐ লোকটি মেজকুমার। অনেক লোক থাকার জন্য আমি তার কাছে যেতে পারলাম না।"

এটা কোন আবিষ্কার হিসাবে নাড়া দেয় না। যাইহোক, এটা পরিষ্কার যে তার (জ্যোতির্ময়ীদেবী) সন্দেহ যাই হোক সে তাকে চিনতে পারেনি। প্রায় বেলা ১২টা নাগাদ জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ি আসে সাধু। সে দিনে সে এসেছিল-- সেটা ছিল তার অবস্থানের শেষ দিন। এটা স্বীকৃত। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে সে এস্টেটের একটি গাড়িতে এসেছিল। সঙ্গে ছিল রায়সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জির ছেলে রাম। আগের দিন যারা ছিল তারা সকলেই ছিল। সন্ন্যাসী তার পুত্রের বৈঠকখানাতে একটি বড় চেয়ারে বসে। তার বোনের স্বামী গোবিন্দ মুখার্জি একটি চৌকির ধারে বসে এবং সাক্ষী ও সত্যভামাদেবী চেয়ারে আসন গ্রহণ করে এবং বাকিরা দাঁড়িয়ে।

"সন্ন্যাসী আমার ঠাকুমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করে, সে এগিয়ে যায় চৌকিতে আসন গ্রহণ করতে। চৌকির এক ধারে সত্যভামা আসন গ্রহণ করে। সন্ন্যাস বলে, "উঠকে বৈঠ।"

সত্যভামাদেবী উপরে উঠে সন্ন্যাসীর মুখোমুখি বসে। সন্ন্যাসী তাকে কাছে আসতে বলল এবং পা দুটি ধরে নিজের কাছে টেনে বলল, "বুড়িকা বড়া দুখ হ্যায়।" তারপর সে আমার দুই মেয়েকে দেখিয়ে বলল--

"এহি তুমারা দোনো বেটি হ্যায়?" এবং আমার পুত্রকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল "তোমার ছেলে?" এবং আমার বোনের ছেলেকে দেখিয়ে বল, "তোমার বোনের ছেলে?" এবং আমার বোনের মেয়ে ফেনিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ কৌন হ্যায়?" আমি বললাম, 'ও হচ্ছে আমার বড় বোনের মেয়ে।' আমি এটা বলামাত্র, সন্ন্যাসী কেঁদে পড়ে। তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কেননা ফেনি তখন বিধবা।

"যখন বাদী কাঁদছিল, ইন্দুময়ীর পুত্র টেবু তার সামনে মেজকুমারের একটা ফোটো দেখাল-- হয় এক্সি : এল ফোটো বা এর মত একটি। যখন টেবু ফোটোটি দেখায়, সাধু এক মুহূর্তের জন্য কাঁদা থামায়, তারপর আবার কাঁদতে থাকে। তারপর টেবু ছোটোকুমারের একটি ফোটো দেখায়। যখন সে এটি দেখায়, সন্ন্যাসী আরো বেশি কাঁদতে লাগল এবং মাটিতে শুয়ে পড়ল— দুহাতে চোখ ঢেকে রাখল। রাম তখন উপস্থিত ছিল। সে কিছু বলছিল। সে দার্জিলিঙ যাওয়ার পূর্বে কুমারকে খুব ভালভাবে জানত। সে বলল, 'সন্ন্যাসী নিঃসন্দেহে মেজকুমার, ওকে যেতে দিও না দিদিমা' যখন বাদী কাঁদছিল, আমি বললাম- "তুম তো ত্যাগী হ্যায়, তুম এত না রোতা কিসিকা বাস্তে?"

সন্ন্যাসী বলল, হাম মায়াসে রোতা হ্যায়। মায়া আমাকে কাঁদাচ্ছে।

জ্যোতির্ময়ী জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু তুমি তো একজন সাধু। মায়া কার জন্য। সাধু কোন উত্তর দেয়নি এ কথার। তারপর জ্যোতির্ময়ীদেবী হিন্দিতে বলে —

"আমি শুনেছি যে আমার মেজভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে দার্জিলিঙে। যখন তাকে দাহের জন্য শ্মশানে আনা হয়, তখন খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই কারণে লোকে তাকে সেখানে ফেলে চলে যায় কোথাও। যখন তারা ফিরে আসে তখন তার লাশ তারা দেখেনি। যারা দার্জিলিং গিয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি বলেছিল তাকে পোড়ানো হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেছে তাকে পোড়ানো হয়নি।"

আমার কথা শেষ হবার পূর্বে সে বলল, "না, না, এটা মিথ্যা, তাকে পোড়ানো হয়নি, সে বেঁচে আছে।"

তারপর সে আমার দিকে তাকাল এবং আমি তার চোখ লক্ষ্য করলাম। চোখগুলি বাদামী ধরনের, আমার ভাইয়ের যেমন ছিল। তারপর আমি বাংলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার সমস্ত অবয়ব মেজ ভাইয়ের মতো দেখি, তবে তুমি কি সেই?"

"না, না" সে হিন্দিতে বলল। "আমি তোমাদের কাছে কিছু না।" আমি বাঙলাতে আমার প্রশ্ন করলাম এটা দেখতে যদি সে বাঙলা বুঝতে পারে। এই দিন সে তার খাবার গ্রহণ করল। আমি লক্ষ্য করলাম তার তর্জনীটি আলগা হয়ে যায়, যখন সে খাবার খায়, তার জিভ একটু বেরিয়ে পড়ে।

আমি তার অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করছিলাম। আমি তার অ্যাডামস্ অ্যাপেল লক্ষ্য করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম তার চুলের রঙ লালচে-- চোখ কটা, বাদামী ধাঁচের। আমি তার চোখ, কান ও নাক, মুখের গঠন ও মুখ লক্ষ্য করলাম। আমি তার দাঁত লক্ষ্য করলাম-- এগুলি মেজকুমারের দাঁতের মতো মসৃণ ও সুন্দর। আমি তার হাত ও প্রত্যেকটি আঙুলের নখ লক্ষ্য করলাম। আমি তার হাতের তালু ও পেছন দিক লক্ষ্য করলাম। আমি তার পদদ্বয় ও বুড়ো আঙুল লক্ষ্য করলাম, আমার মনে পড়ল কী ধরনের নখ ও বুড়ো আঙুল আমার মেজ ভাইয়ের ছিল। আমি কেমন করে ভুলতে পারি। আমরা ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। তার সম্পূর্ণ শরীর, বাহু, পা মুখ এবং এমনকি চোখের পাতা পর্যন্ত ছাই দ্বারা আবৃত ছিল। তার চুল ছিল লম্বা। তখন তার দাড়ি ছিল। যখন দার্জিলিং যায় তখন মেজকুমারের দাড়ি ছিল না। এদিন তার বলার ভঙ্গি ছিল অস্পষ্ট। তার গলার স্বর ছিল মেজকুমারের মতো।

ঐ দিন অন্যান্য যারা উপস্থিত ছিল তারাও তার সাথে কথা বলেছিল— জ্যোতির্ময়ীদেবীর সেটা মনে নেই। তার খাওয়া হয়ে গেলে আমরা খাওয়া দাওয়া করি এবং যখন আমরা খাওয়া শেষ করি তখন বেলা ৩টে। সন্ন্যাসী 'তামসী স্নানের' জন্য ঢাকা যাওয়ার জন্য চিন্তিত ছিল মনে হয়। আমার সন্দেহ হয়েছিল সে আমার ভাই এবং আমি চেয়েছিলাম আরো কিছুদিন তাকে কাছ থেকে দেখার জন্য আমার কাছে রাখতে। এবং নিশ্চিত হতে যদি তার গায়ের পুরানো চিহ্নগুলি থেকে থাকে। আমি তাকে বাঙলায় জিজ্ঞাসা করলাম, ''কতদিন আপনি ঢাকায় থাকবেন?'' সে বলল, 'দিন দশেক হবে'। সে আমার পুত্রের টমটমে করে চলে গেল। যখন সে যাত্রা করল, আমি দেখলাম আমার পুত্র সেটা চালনা করছে। ফিরে সে কিছু বলল।

এখানে কোন গোলমাল নেই যে ঐ দিনে সন্ন্যাসী জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে ছিল এবং ৪টে নাগাদ চলে যায়। এটা অস্বীকার করতে পারা যায়নি কারণ নির্দিষ্ট দলিল ছিল মিঃ নিডহ্যামের প্রতিবেদন (এক্সি ৫৯)। প্রতিবাদীপক্ষ অস্বীকার করেছিল যে সন্ন্যাসী সেখানে ছিল আগের দিন যেটা ছিল ১ বৈশাখ, ৩১ চৈত্র নয়। এবং মামলা গঠিত হয়েছিল যে সন্ন্যাসী জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে এসেছিল ২ বৈশাখ।

একজন সাক্ষী বলেছিল সাধু ৩১ চৈত্র তথা ১ বৈশাখ জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে আসছে। প্রতিবাদীদের পক্ষে মামলার এই অংশের জন্য জ্যোতির্ময়ীদেবীর কাছে জেরা চলাকালীন এই প্রশ্ন রাখে মিঃ চৌধুরী।

প্রঃ- আপনি ১লা বৈশাখ হেনীর চোখ ও বুদ্ধুর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের জন্য চক্করে আপনার বাড়িতে কিছু ওষুধ পেতে বাদীকে এনেছিলেন?

উঃ- কখনো না।

প্রঃ যখন সে খাবার গ্রহণ করেছিল, তখন থালার বাইরে জিনিসপত্র না ফেলে কাপের মধ্যে রেখেছিল এবং সেগুলি মেঝের উপর রেখেছিল?

উঃ- খাবার দেওয়া হয়েছিল একটি পাথরের থালায় এবং বাটি এর উপরে রাখা হয়নি।

সে তারিখের কথা আদৌ জিজ্ঞাসা করছিল না, সে দুদিনের সফরের কথা আদৌ জিজ্ঞাসা

করছিল না এবং এতে সে জিজ্ঞাসা করছিল এবং সিদ্ধান্ত করেছিল যে এই দু'দিনে জ্যোতির্ময়ীদেবী বাদীকে সনাক্ত করেনি, যেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং মাইনা যা অনুমোদন করেছে। এবং সে তার প্রশ্নের মধ্যে তারিখ রেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, প্রশ্নটি পূর্বোক্ত এবং আরেকবার প্রশ্নটি করা হয়েছিল যে হয়ত এটা কোন ঘটনা ছিল না যে ১ বৈশাখ রানী সত্যভামা তাকে প্রণাম করার পর ২ টাকা প্রণামী দিয়েছিল।

এটা পরিষ্কার যে ১ বৈশাখ সাধুকে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে আনা হয়েছিল, সেখানে খাবার গ্রহণ করেছিল, যা নির্ধারিত হয়েছিল। এবং রানী সত্যভামা সেখানে ছিল, এটাও প্রতিবাদী দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। এটাও পরিষ্কার যে সাধুকে আগের দিনও অল্পক্ষণের জন্য ডাকা হয়েছিল। প্রতিবাদীদের বক্তব্য ছিল যে কেউ তাকে মেজকুমার বলে ধারণা করেনি। তাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখতে এবং পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলেছে-- এবং তাকে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে আনা হয় হেনীর চোখ ও বুদ্ধুর স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব সারাতে।

বাদী চুপ করার পর, প্রতিবাদী বাদীর সফরের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মামলা উপস্থিত করল-- বাদী ৩১ চৈত্র গোধূলিতে এসেছিল; সহকারী ম্যানেজারের বাড়িতে গিয়েছিল ১ বৈশাখ এবং ঐ দিন সন্ধ্যায়, এটা হচ্ছে বাংলা নববর্ষের সন্ধ্যা। রাজবাড়ির গোলবারান্দায় রায়সাহেব কর্তৃক একটি চায়ের পার্টি দেওয়া হয়। এই পার্টিতে বাদী এসেছিল এবং জলখাবার গ্রহণ করেছিল। বাদী কোথাকার লোক– একথা ফণিবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং বাদী 'পাঞ্জাবি' ভাষা বলেছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে এই কথাও বলেছিল যে সে একজন নাগা সন্ন্যাসী। পার্টি চলাকালীন যতীন্দ্র ভট্টাচার্য এসে বলেছিল যে জ্যোতির্ময়ীদেবীর ইচ্ছা হেনীর চোখ ও বুদ্ধুর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সারানোর জন্য সাধু তার বাড়িতে যায়। ফণিবাবু বাদীকে ব্যাখ্যা করে বোঝায় যে এই জ্যোতির্ময়ীদেবী অনুরোধ করেছিল যেতে। সাধু যেতে রাজি হয়েছিল।

এই পার্টির সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল প্রতিঃ সাঃ রায়সাহেব যোগেন্দ্র, ফণিবাবু, মোহিনীবাবু, সহকারী ম্যানেজার, বীরেন্দ্র, অবনী ও আশু ডাক্তার-- সাক্ষীর পুরো দল যারা প্রতিবাদী পক্ষের সমর্থক হিসাবে বর্ণিত হতে পারে, সকলেই এস্টেটের কর্মী, রায়সাহেব ছাড়া যে সে নিজেই বলবে তার কথা। চায়ের পার্টির বিষয়ে এরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল। এটা বাদীর প্রতি আরোপিত করা যায় না। বাদীর ১ম সফর সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দিচ্ছিল তাদের প্রতিও এটা আরোপিত করা যায় না। এটা জ্যোতির্ময়ীদেবীর প্রতিও আরোপ করা হয়নি। কৌসুলী কর্তৃক এটা জ্যোতির্ময়ীদেবীর প্রতি আরোপিত হয়েছিল। সহকারী ম্যানেজারের বাড়িতে ৩১ বৈশাখের সফর সীতানাথের সাক্ষ্য অনুসারে বিবৃত হয়েছিল যে তার ডায়েরি দেখে এই সফর সম্বন্ধে বলেছিল যখন সে এস্টেটের একজন অফিসার হিসাবে বাদীর বিরুদ্ধে এজাহার দিচ্ছিল। এই তারিখ সম্বন্ধে কারো কাছে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। এবং ৫ মে যখন রায়সাহেব ও মোহিনীবাবু একত্রে বসে এই ঘটনার একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন যেটাতে স্বাক্ষর করেছিল মিঃ নিডহ্যাম্ এবং এটা কালেক্টরের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। এই প্রতিবেদনে

বলা হয়নি বাদী কখন সফর করেছিল বা বাদী বলেছিল সে একজন পাঞ্জাবি এবং ভাওয়ালের মেজকুমার হওয়ার দাবির বিরুদ্ধে কোন কিছুই বলা হয়নি (১১৭ নং মূল পুস্তকের পৃষ্ঠাতে প্রদত্ত)। মিঃ থমাস রঞ্জনের সাথে কাশিমপুরে যাওয়ার মত এই চায়ের পার্টি একটি পরিকল্পিত প্রতারণা যা পূর্বোক্ত সাক্ষীরা প্রস্তুত হয়ে বলতে এসেছিল। এবং যতই এগিয়ে যাওয়া যাবে দেখা যাবে এটাই একমাত্র উদাহরণ নয় যাতে তারা এত প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ওষুধ প্রদানের গল্প--যেটাতে বাদীকে বাকল্যান্ড বাঁধ থেকে কাশিমপুরে আনা হয়েছিল বন্ধ্যাত্ব নিরাময় করবার জন্য, যাতে তাকে ডাকা হয়েছিল সহকারী ম্যানেজারের বাড়িতে স্ত্রীরোগ সারাতে, যাতে সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে গিয়েছিল আরেকটি বন্ধ্যাত্বের বিষয়কে নিরাময় করতে এবং তার মেয়ের চোখ সারাতে যাতে এটা দেখা যায় ১৯১৬ সালে তার একটি চিঠিতে কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপর এই ওষুধ প্রদায়ক সন্ন্যাসী হঠাৎ নিজেকে মেজকুমার বলে ৪ মেতে ঘোষণা করল-- এই ঘটনা ধারাবাহিকভাবে চলেছিল। জেরা চলাকালীন এ বিষয়ে খুব কম উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় মিঃ চৌধুরী এটা মনে করাতে পছন্দ করত না। কিন্তু অন্যান্য ঘটনার প্রতিও আলোকপাত করতে হবে--

১৩২৮ সালের ১ বৈশাখ বা ১৯২১ সালের ১৪ এপ্রিল সাধু প্রস্থান করে। সাধু বলেছি যে জয়দেবপুর থেকে সে চন্দ্রনাথে যাত্রা করে-- চিটাগাঙ জেলার একটি তীর্থ। একজন সাক্ষী তাকে দেখেছিল। তার নাম অনন্ত ব্যানার্জি (বাঃ সাঃ নং ৬৪৫), একজন সম্মানিত ব্যক্তি, যে সেখানে গিয়েছিল তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য নিজের খরচে একটি সেতু তৈরির ব্যাপারে তদারক করতে। সে সাধুকে সীতাকুণ্ডে দেখেছিল। কিন্তু সূত্রটি হচ্ছে যে সে পরিবারের চোখের বাইরে চলে গিয়েছিল, এবং যতদূর তাদের জানা ছিল, সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

সাধু চন্দ্রনাথ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর বাকল্যান্ড বাঁধে তার জীবন পুনরায় আরম্ভ করল। এটা ২০ এপ্রিল নাগাদ। ২৫ এপ্রিল বা আশপাশে আরেকটি স্বীকৃত ঘটনা ঘটল। কোন একজন ঢাকায় শৈলবাসিনীদেবীর বাড়িতে বাদীকে দেখে। পূর্বেই বলা হয়েছে সে ফণিবাবুর বোন। সে ঢাকার একটি বাড়িতে বাস করত। -- যেটা তার দিদিমা স্বর্ণময়ীদেবী তাকে উপহার হিসাবে দিয়েছিল।

শৈলবালাদেবী স্বীকার করে যে বাদী যখন এসেছিল তখন জ্যোতির্ময়ীদেবী সেই বাড়িতে ছিল। সে ব্যাখ্যা করেনি কেন জ্যোতির্ময়ীদেবী সেখানে ছিল, দেখা যাচ্ছে ঢাকায় তার বাড়ি ছিল না, সে জয়দেবপুরে বাস করত। এ বিষয়ে জ্যোতির্ময়ীদেবী যা বলেছে তা হল-- ১৪ এপ্রিল সন্ন্যাসী জয়দেবপুর ত্যাগ করে এবং তারপর ১২/১৪ দিন অতিক্রান্ত হয়, তারপর সে তার পুত্র বুদ্ধুকে ও কর্মচারী যতীনকে ঢাকায় প্রেরণ করে। কিন্তু তারা বাদীকে খুঁজে পায় না। যাইহোক, সে নিজে ঢাকায় আসে এবং তার বোনের স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করে, যার নাম ব্রজবাবু, পেশায় উকিল। সে সেখানে গিয়েছিল কেননা এখানে তার কোন নিজস্ব বাড়ি ছিল না, এবং সে তার বোন মাতরকে (তারিণীময়ী) দেখাতে চেয়েছিল এই সন্ন্যাসীকে। সে বলেছে যে সে ব্রজবাবুর বাড়িতে সন্ন্যাসীকে নিয়ে যেতে পারেনি, সুতরাং সে তার পুত্রকে

শৈলবাসিনীদেবীর বাড়িতে নিয়ে যেতে বলে বাদীকে। কালা, বুদ্ধু ও জিতেন গিয়ে তাকে গিয়ে নিয়ে আসে এবং এই শৈলবাসিনীদেবী, বিপক্ষ দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিল।

এটা ঘটনা যে তখন সন্ধ্যা নাগাদ বাদীকে এই বাড়িতে আনা হয়েছিল। কালা শৈলবাসিনী ও বুদ্ধুর সন্তান। সেখানে তাকে দেখে শৈলবাসিনী, কমল-কামিনী-ফণিবাবুর মায়ের বোন, কিছু মহিলা, এবং কুমারের সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী মাতর। শৈলবাসিনী দেবী এটা স্বীকার করে। যদিও মাতর বলেছে তার মনে নেই। কিন্তু সেখানে সে ছিল।

কেন সন্ন্যাসীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কালার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নিরাময় করতে? শৈলবাসিনীদেবী এটাই বলেছে। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে স্বর্ণময়ীদেবীর মৃত্যুর দু'বছর পর কালার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। (স্বর্ণময়ীদেবী ১৯১৭ সালের ১৮ এপ্রিল মারা যান)। মহিলাকে এটা স্বীকার করতে হয়েছিল এবং জরায়ু সম্পর্কিত রোগের বিষয়ে কথা বলতে হয়েছিল। সন্ন্যাসী অবশ্যই এইরকম বলেছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছিল-- সাধু কিছুই করতে পারেনি। এ সবই মিথ্যা। মাতর ও জ্যোতির্ময়ী কেন সেখানে গিয়েছিল? এটা পরিষ্কার যে তারা গিয়েছিল কারণ জ্যোতির্ময়ীদেবী সন্দেহ করেছিল যে সাধু হচ্ছে মেজোকুমার। কমল কামিনী দেবী -স্বর্ণময়ীদেবীর কন্যা এবং পিসেমশাই ফণিবাবু বাদীর সপক্ষে এজাহার দিয়েছিল। কমলকামিনীদেবীর সাক্ষ্য ছিল যে ঐ দিনে সে শৈলবাসিনীদেবীর বাড়িতে বাদীকে দেখেছিল। এটা স্বীকৃত যে সেখানে ছিল। সেও সন্দেহ করেছিল যে বাদী মেজকুমার হতে পারে

সন্ন্যাসী সেখানে আধঘণ্টার মত ছিল এবং তারপর চলে যায়। সে তার পরিচিত সন্ন্যাসীর পোশাকে ছিল-- লেঙটি, লম্বা জটা ও দাড়ি।

এরপরে যা ঘটে সেটাও স্বীকৃত। ৩০ এপ্রিল, সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে আগমন করে এবং জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে আসে। কে তাকে নিয়ে আসে সেটা গোলমেলে। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে সে অতুলবাবুকে পাঠিয়েছিল সন্ন্যসীকে বাড়িতে নিয়ে আসতে। অতুলবাবু এসে বলে যে সেও সাধুকে মেজকুমার বলে সন্দেহ এবং তাকে আনতে রাজি হয়। তারপর সে ও বুদ্ধু ঢাকায় যায় এবং লোকাল ট্রেনে করে সন্ন্যাসীকে নিয়ে আসে যেটা সন্ধ্যা ৭/৭-৩০ মিঃ জয়দেবপুরে পৌছায়। অতুলবাবু অস্বীকার করে যে সে তাকে এনেছিল-- কোন সূত্র ছিল না যে কে তাকে এনেছিল। কিন্তু যেই এনে থাকুক সে শুধু তাকে কাশিমপুরে এনেছিল, যদিও এই কার্যে বুদ্ধু তার সাথে ছিল। কয়েকদিন পরে প্রত্যেকের মুখে শুধু বাদীর কথা এবং যে সমস্ত লোক এই উত্তেজনাকর ঘটনার আগে সন্ন্যাসীর যা কিছু দেখেছিল তার সব কিছু ভালভাবে হয়ত মনে করতে পারে। বাঃ সাঃ নং ৬০২ ভুতনাথবাবু, যে ছিল ঢাকা রেলস্টেশনের পার্সেল কর্মী, তার মনে পড়ে যে সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে যাচ্ছিল ৭ আপে, স্টেশনে ভিড় ছিল, ভিড়ের মধ্যে সে সন্ন্যাসীকে একপলক দেখতে পেয়েছিল। বাদীপক্ষের আরেকজন সাক্ষী গোপাল বসাক (২৩৭), বুদ্ধু ও আরেকজন লোকের সাথে সন্ন্যাসীকে দেখেছিল, যদিও তার নির্ধারিত তারিখ ছিল জুন বা জুলাইয়ে। সেইদিন বাদী ছিল ভস্মাচ্ছাদিত, ৪ঠা মের পর যেটা আর ছিল

না। মিঃ আবদুল মোনান বিকাল ৫টা নাগাদ একটি গাড়িতে করে সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ ও অতুলবাবুকে স্টেশনে যেতে দেখেছিলেন। বাঃ সাঃ নং ৮০৬ নগেন্দ্র সন্ন্যাসী, অতুল ও বৃদ্ধকে জয়দেবপুর স্টেশনে নামতে দেখেছিল, সঙ্গে অতুলবাবুর একজন কর্মী দুরন্ত ছিল এবং তারা সকলে সন্ধ্যা নাগাদ জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে যায়। এই সাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করলে এটা পরিষ্কার এবং মিঃ নিডহ্যামের রিপোর্ট যেটা প্রকৃতপক্ষে ছিল রায়সাহেবের ও মোহিনীবাবুর বিবৃতি যেমন তারা দেখেছিল যে বাদী এদিন বুদ্ধ, অতুলবাবু ও দুরন্তের সাথে এসেছিল। যাইহোক, বাদী সত্য বলেছিল যখন সে বলেছিল সে এই উপলক্ষে বৃদ্ধ, অতুলবাবুর সাথে জয়দেবপুরে গিয়েছিল। বাদী বলেছে সেই রাতে সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ি পার হয়ে গিয়েছিল। সেটা ছিল ৩০ এপ্রিল। সে ৪ মে পর্যন্ত অবস্থান করেছিল যেদিন সে তার পরিচয় ঘোষণা করেছিল। সমস্ত পক্ষ এ বিষয়ে একমত ছিল যে ঐ দিন এটা জানা গিয়েছিল যে সে নিজেকে মেজকুমার হিসাবে ঘোষণা করেছে।

এর মধ্যে, এই ঘটনার পূর্বে এই তিনদিন কী ঘটছিল? বাদী এই তিনদিনকে ঘটনাহীন বলে উপেক্ষা করেছে এবং যেদিন সে আত্মপরিচয় দান করেছিল সরাসরি সে দিনের প্রসঙ্গে এসেছিল। এই দিনগুলিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু তার বোন একটি সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছিল যার সত্য উদঘাটন করতে হবে।

যে তথ্য তার বোন দিয়েছিল তার প্রয়োজনীয় অংশ বাদ না দিয়ে এখানে প্রদান করা হয়েছে।

বাদীর আগমন ঘটে ৭/৭-৩০ মিঃ। বৈঠকখানায় সে আসন গ্রহণ করে। ভুলুর অফিসার দুরন্ত সেখানে ছিল। আমার অফিসার ভুলু (অতুলবাবু), জিতেনবাবু, এবং কিছু ভদ্রলোক যারা আমার ছেলের সাথে প্রতিদিন তাস খেলতে আসত এবং এমন আরো কেউ কেউ উপস্থিত ছিল।

আমি পাশের ঘরে ছিলাম, দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। আমি দেখলাম সন্ন্যাসী কাঁদছে। আমি জিতেন ভট্টাচার্যকে পাঠালাম সে কেন কাঁদছে এটা জানতে। সে বলল সন্ন্যাসী কর্তাদের কিছু ফোটো দেখছে, যেগুলি জিতেন ঢাকা থেকে এনেছিল। 'কর্তা' বলতে সে তার ভাইদের বুঝিয়েছে। সেই রাতে সন্ন্যাসীর সাথে আর কোন কথা হয়নি।

পরের দিন, সাধু দিনের আলো ফোটবার পূর্বেই চিলেই নদীতে স্নান করে ছাই মেখে ফিরল। সেইদিন ঢাকা থেকে কিছু উকিল হেনী ও ফেনীর সাথে সম্পর্কিত একটি বোনের বাড়িতে খাবার গ্রহণ করে। বাদী নিরামিষ খাবার খায় এবং বারান্দার সংলগ্ন একটি ঘরে বসে যেখানে উপরোক্ত ব্যক্তিরা খাওয়া-দাওয়া করছিল। উকিলবা চলে যাওয়ার পরে, বাদীর কাছে আসে যোগেন্দ্রবাবু। বাদী তখন হিন্দিতে বলে আমার বৈঠকখানা পরিষ্কার কর। যে ব্যাপার প্রত্যেকের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি করে।.কেন সে এমন কথা বলল?

আমি সাধুকে বলেছিলাম গায়ে ছাই না মাখতে। কারণ এতে আমি তার গাত্রবর্ণ দেখতে পারিনি। সে বলেছিল, 'কেন?' হিন্দিতে। পরের দিন, সে ছাই মেখে স্নান থেকে ফিরে এল।

তরপর আমি বললাম, আমি মানা করেছিলাম গায়ে ছাই মাখতে, তাও তুমি সেটা করলে। কালকে অবশ্যই তুমি এটা কোরো না।

পরের দিন : (৩ মে) -- যখন সে স্নান করতে গেল, তার পুরানো খানসামা আনন্দ ও নগেন্দ্র ভট্টাচার্য তার সাথে গেল। সে ছাই না মেখে ফিরে এল।

তারপর আমি তার গাত্রবর্ণ দেখলাম, এটা মেজকুমারের পুরানো গায়ের রঙের মতো এবং মনে হল ব্রহ্মচর্যের কারণে কিছুটা বেশি উজ্জ্বল। তারপর ছাইবিহীন মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে মনে হল সে রমেন্দ্রের মতো দেখতে। আমি দেখলাম তার গায়ের রঙের চেয়ে তার চোখের পাতা ঈষৎ কালো। গাড়ির চাকার আঘাতের চিহ্ন দেখলাম বাঁ দিকে এবং কব্জি ও পায়ের পাতা খসখসে ও রেখাযুক্ত। আমার আত্মীয়স্বজন, ঠাকুমা ও বাদবাকি সকলে তাকে দেখেছিল এবং সনাক্ত করেছিল, যেমন আমি করেছিলাম।

তারপর জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে বহু বয়স্ক স্ত্রীলোক যারা কুমারকে জানত এবং অনেক প্রতিবেশী ও প্রজা যারা নিকটে বাস করত এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। তারা সকলে বলেছিল, সে কুমার। কমপক্ষে ১০০/১২৫ জনের মত প্রজা উপস্থিত ছিল।

এই দিন, ৩ মে, জ্যোতির্ময়ীদেবী চেষ্টা করেছিল তার ছেলেকে মেজকুমারের শরীরের সমস্ত চিহ্ন দেখাতে যা সে সাক্ষ্য দিয়েছিল, কিন্তু সাধু তাকে দেখাতে রাজি হয়নি।

পরের দিন : (৪ঠা জুন)-- বৃদ্ধ এইসব চিহ্ন দেখতে চেষ্টা করেছিল এবং এই দিন সাধু বাধা দেয়নি। জ্যোতির্ময়ীদেবী তার ছেলে ও জব্বুকে এই ধরনের সব চিহ্ন দেখতে বলেছিল যেগুলির নাম সে বলেছিল। এটা ঘটেছিল সকাল ৭টা নাগাদ যখন কোন আগন্তুক সেখানে উপস্থিত ছিল না। জ্যোতির্ময়ীদেবীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যদি সে তাকে সনাক্ত করে থাকে তবে কেন সে চিহ্নগুলি দেখেছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছিল যে 'আমি এমন করেছিলাম এইজন্য যে বিষযটি অত্যন্ত গুরুতর এবং আমরা মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম, যাতে আমাদের মনে কখনো কোন প্রশ্ন উঠতে না পারে।

একই দিন পরে বেলা ৯টা-- লোকজন আসতে শুরু করল। বাদী 'সন্ধ্যা' সমাপ্ত করার পর (একটি অনুমোদিত ব্রাহ্মণোচিত প্রার্থনা) যখন লোকজন প্রাঙ্গণে ছিল ও সে পশ্চিমদিকের ঘরেব ছিল আমি তার সাথে কথা বললাম। পরিবারের সদস্যরা ঐ ঘরে ছিল। আমি বললাম; "আপনার চিহ্ন ও হাবভাব আমার মেজোভাইয়ের মতো। আপনি নিশ্চয় সে। আপনার পরিচয় ঘোষণা করুন।"

সে বলল, "না, না, অমি সে নই। কেন আমাকে বিবক্ত করছ? আমি চলে যাব!" আমি বললাম, "তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে তুমি কে?"

আমি আমার ছেলেকে বললাম লোকেদের বলতে যারা সেখানে এসেছিল যে মেজোকুমারের শরীরের সমস্ত চিহ্ন তার মধ্যে আছে। আমার ছেলে ও বোনের ছেলে সমবেত লোকেদের আমি যা বলতে বললাম তা বলল। আমি চিকের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম।

ঐ দিন, আমার ভাই, বাদী, প্রজাদের মধ্যে বসে ছিল ও তারা পীড়াপিড়ি করছিল তাকে

বলতে সে কে। বিকাল-বেলায় সে ঘোষণা করল। আমি তাকে বললাম যে আমি খাবার খাব না যতক্ষণ না সে বলবে সে কে!

সে তার পরিচয় প্রকাশ করল, সে বলল, সে রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, তখন বেলা ৪/৫ ঘটিকা।

সে বর্ণনা করেছে কিভাবে ভিড়ের মধ্যে এই ঘোষণা করেছিল যখন সে তার বাড়ির সামনে উঠানে বসেছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবী বারান্দায় ছিল আরো অনেক স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে। বাদী উন্মুক্ত স্থানে বসেছিল! কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল : আপনার নাম কি?

সে বলেছিল : রমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী।

আপনার বাবার নাম কি?

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী।

আপনার মায়ের নাম কি?

রাণী বিলাসমণিদেবী।

ভিড়ের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি এই প্রশ্ন করেছিল এবং সে এই উত্তর দিয়েছিল এবং তারপর কেউ বলেছিল : "প্রত্যেকে রাজা ও রানীর নাম জানে ; কে আপনাকে এনেছে?"

বাদী উত্তর দিল : অলকা।

তারপর সমবেত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল, 'মধ্যম কুমারের জয়।' এবং নারীরা উলুধ্বনি দিল। বাদী একটি আরামকেদারায় বসে ছিল, মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাবে। জ্যোতির্ময়ীদেবী তার দিকে ছুটে গেল এবং মানুষ তাকে পথ করে দিল। প্রায় ২/৩ হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছিল। যখন আমি (জ্যোতির্ময়ীদেবী) বাদীর কাছে গেলাম মেঘনামালা আমার সাথে এসেছিল। আমি তাকে বাতাস করলাম ও তার মাথায় গোলাপজল ঢাললাম। প্রায় দশমিনিট ধরে আমি জল ঢাললাম। আমি একটি চেয়ারের উপরে বসলাম। যখন সে সুস্থ হল, তখন সে ছোটবোন, মাতরের বাড়ি চলে গেল যেখানে কোন ভিড় ছিল না। জনতা সেখানে তাকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের অনুরোধ করা হল উত্তেজনা সংবরণ করতে।

এই তথ্য সে (জ্যোতির্ময়ীদেবী) তার আত্মপরিচয়ে প্রদান করেছিল। সে বলেছে রায়সাহেব এই আত্মপরিচয়ে উপস্থিত ছিল, এবং সাধু যতদিন সেখানে ছিল রায়সাহেব প্রত্যেকদিন এসেছে সেখানে। সে এও বলেছে, কুমারের মামা বসন্ত যে কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের অনুমতিক্রমে রাজবাড়ির মধ্যে বাস করত, যেভাবে রায়সাহেব বাস করত, এই বসন্তও এই চুক্তিতে উপস্থিত ছিল। এটা আশ্চর্যজনক কোন পক্ষ তাকে ডাকেনি এবং তার নাম এই মামলার সাথে জড়িত অন্য কোন ঘটনার সাথে সামান্যতম উল্লেখিত হয়েছে। যদিও সে ছিল প্রতিবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। এখন এই তথ্য অবশ্যই ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা হবে শুধু সত্যের প্রতি পৌছাবার জন্য নয়, এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে। তোমাকে অবশ্যই এই দিনটির আবেগকে অনুভব করতে হবে, জটা ছাইও দাড়ির চিন্তা করতে হবে, এবং ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করে এর সম্ভাব্যতা বিচার

করতে হবে, যেগুলি সে নিজের চোখে বিশ্বাস করতে পারছে না। সর্বোপরি, এটা জানা প্রয়োজনীয় যে এই চুক্তির কতটা অকাট্য যাতে এই প্রসঙ্গে সন্দেহকে সীমিত করা যেতে পারে।

এই দিনের প্রসঙ্গে প্রদত্ত তথ্য কমিশনের সামনে বিস্তৃতভাবে অনন্তকুমারী, মোক্ষদাসুন্দরী, নগেন্দ্র, লালমোহন গোস্বামী, অবিনাশ, সাগর, বিলু দ্বারা সত্য বলে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে। এদের কেউ পূর্ববর্তী তিনদিনের সম্বন্ধেও বলেছে এবং তারা সকলেই একমত যে এই 'আত্ম-পরিচয়' সংঘটিত হওয়ার সময় সেখানে ভিড় ছিল। এটাও স্বীকৃত যে সব প্রজা সে সময়ে উপস্থিত ছিল এই উপলক্ষে তারা 'নজর' প্রদান করেছিল বাদীকে এবং একটি অন্য ঘটনা-- আত্মপরিচয়ের মুহূর্ত থেকে বাদী বাঙলায় কথা বলতে শুরু করে, যদিও হিন্দি ঘেঁষা এবং তার কথার ভঙ্গি স্বভাবগত নয়। বিভিন্ন সাক্ষী কথার দ্বারা এগুলি বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছিল, 'আটকা, আটকা,', 'ভার, ভার', যেন মুখের মধ্যে নুড়ি আছে।

এই দিনের তথ্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ সাক্ষীর উপর নির্ভর করবার দরকার নেই। নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত সাক্ষীদের মধ্যে দু'জন বৃদ্ধা মহিলা ও নগেন্দ্র ছাড়া সবাই চক্রীদলের অনুগামী ব্যক্তি এই অর্থে যে তারা বাদীর সাফল্য সম্বন্ধে কৌতূহলহীন নয়-- বোন ও তার জামাই, সত্যভামাদেবীর এক আত্মীয়, নগেন্দ্র ঘোষের এক কর্মচারী যে সাধুব গোঁড়া সমর্থক। কিন্তু মামলা ও অন্য পক্ষের সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করা যাক।

প্রতিবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে যে বাদী এই উপলক্ষে একজন ওঝা-সাধু হিসেবে এসেছিল, চটানে তিনদিনের জন্য সন্ন্যাসী হিসাবে অবস্থান করেছিল, সামনে ধুনি জ্বলছিল এবং ৪ মে ৪র্থ দিনে সে নিজেকে মেজকুমার বলে ঘোষণা করবার পর ধুনিটি বের করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের আরো বক্তব্য হচ্ছে যে তাকে দেখতেও অন্যরকম এবং একটি বাঙলা কথাও বলতে পারেনি, বুঝতেও পারে না।

পূর্বোক্ত ফণিবাবু ছাড়া তারা এই প্রসঙ্গে দু'জন সাক্ষীকে তলব করে। তাদের সাক্ষ্য ৪ মের পূর্বেকার প্রসঙ্গে। তাদের একজন তাসারুদ্দিন। সে বলেছে যে সে ২¹/₂ বছর ধরে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ির ভৃত্য ছিল, প্রায় ১০ মে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ১৫ মের সাক্ষাৎকারের ৩/৪ দিন পূর্বে সে কাজ ছাড়ে যে প্রসঙ্গে পরে আসা হবে। সে বাড়িতে রাত কাটাত না, কিন্তু খুব ভোরে চলে আসত এবং রাত ১০টার সময় চলে যেত। সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ি সম্বন্ধে বলেছে-- কাদার দেওয়াল, টিনের ছাদযুক্ত বাংলো, ৭টি কক্ষ-মধ্যবর্তী কক্ষের দু'পাশে দুটি ঘর, উত্তরে-দক্ষিণে একটি করে বারান্দা, দুই বারান্দার দুপাশে দুটি ঘর। বাড়িটি দক্ষিণমুখী ও সামনে একটি বারান্দা। পূর্বদিকের ঘরে সাগরবাবু তার স্ত্রী সহ বাস করত এবং পশ্চিমদিকের ঘরে বুদ্ধুবাবুর ঘর। জ্যোতির্ময়ীদেবী ও ছেলেমেয়েরা মধ্যবর্তী হল ঘরে ঘুমাত যেটা শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত।

এবার এই সাক্ষী তাসারুদ্দিন বলেছে যে পূর্বোক্ত তিনদিন ধরে বাদী বাড়ির সামনে চটানে বসত। সে বলেছে ২/৩ দিন ধরে নিশ্চিতভাবে তাকে জেরা করা হয়-- ভস্মাচ্ছাদিত, লেংটি পরিহিত, সামনে ধুনি, তার চিমটাগুলি সামনে মাটির মধ্যে গাড়া ও তার কমণ্ডলু। এই

তিনদিন ধরে সে রাস্তা ধরে শ্মশানের দিকে যেত তথা নদীর দিকে এবং সাক্ষীর সাথে বাদীর দেখা হয়েছে যখন সে বৃদ্ধুর বাড়িতে এসেছিল অর্থাৎ ভোরবেলায়। এই তিনদিন কোন দর্শনার্থী আসেনি সেখানে। ৪র্থ দিন থেকে পরিবারটি তাকে মামা বলে ডাকতে শুরু করে এবং সে লেংটি পরিত্যাগ করে ও সাগরবাবুর শোবার ঘরে অবস্থান ও ঘুমাতে শুরু করে। এই খবরটি ছিল জ্যোতির্ময়ীদেবীর কন্যা মণির। সাক্ষী বলেছে এই 'মামা' ও 'মেজকুমার' বলে ডাকা এই দিন সকালে শুরু হয়, বিকালবেলা ১৫/২০ জন লোক ছাড়া আর কেউ দেখা করতে আসেনি। পরে, অধিক সংখ্যায় লোকজন আসতে শুরু করে।

বাদী সেখানে তিনদিন ছিল এবং খুব ভোরে 'চিলেই' নদীতে স্নান করতে যেত ; চতুর্থ দিনে তাকে তার পরিচয় ঘোষণা করতে বলা হয়, সে লেংটি ছেড়ে ধুতি পরে, এবং তাকে মামা বলে ডাকা শুরু হয়। সাক্ষী অস্বীকার করেনি যে সত্যভামা এই সময়ে ঐ বাড়িতে ছিল– কেউ অস্বীকার করেনি যে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে বাস করত না।

৪ মে পর্যন্ত প্রকাশ্য এই সন্ন্যাসীর ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, এক সাক্ষী এসে বলেছে যে ঐ সময়ে একদিন সে সেই বাড়িতে যায় এবং দেখে সন্ন্যাসী লেংটি পরে চটানের উপর বসে আছে। সাক্ষী মজ্জার অসুখের জন্য ওষুধ চায়, কিন্তু যেহেতু সাধু বাংলা বুঝত না, সেহেতু বুদ্ধু তাকে হিন্দিতে বলে এবং সাধু সাক্ষীকে একটি ওষুধ দেয় (প্রঃ বাঃ সাঃ নং ১০৮)।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, ফণিবাবুর পূর্বোক্ত সাক্ষ্য ছিল যে ঐ দিনগুলির মধ্যে একদিন সে সন্ন্যাসীকে দেখেছিল, চটানে বসে ছিল, আমগাছের তলায়, লোকদের ওষুধ দিচ্ছিল এবং একটি দুটি ক্ষেত্রে হিন্দিতে বোঝাতে হয়েছে তাকে। সে যোগ করেছে যে ঐ সময়ে সামান্যতম মতামত বা সন্দেহ দেখা দেয়নি যে সে মেজকুমার এবং লোকজন তাকে দেখতে আসত সন্ন্যাসী হিসাবে।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, রায়সাহেব ও মোহিনীবাবু বলেছে যে ৪ মে পর্যন্ত তারা শোনেনি যে সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং এতে সে কোন গোলমাল করছে বা কথা বলছে না। মোহিনীবাবু জানত না লোকে তাকে দেখতে আসছে, "আমি যা শুনেছি যে সন্ন্যাসী আবার জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে এসেছে, আমি কৌতূহল অনুভব করেছি যে সে কেন আবার এসেছে। ভেবেছি সে কোন রোগের চিকিৎসা করতে এসেছে এবং চিন্তা করিনি যে সাধুর প্রত্যাবর্তন লোকের কাছে কোন দারুণ খবর।" এই দু'জন সাক্ষী যোগ করেছে যে ৪ মে বিকালে তাদের কাছে সংবাদ আসে যে সাধু নিজেকে মেজকুমার বলে পরিচয় দিয়েছে। এবং কিছু সাক্ষ্যও প্রদত্ত হয়েছে।

প্রতিবাদীপক্ষের বক্তব্য ছিল যে বাকল্যান্ড বাঁধের সন্ন্যাসীকে চিকিৎসক হিসাবে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কাশিমপুরে, শৈবালিনীর বাড়িতে, জয়দেবপুরে, কুমার হিসাবে কেউ তাকে সন্দেহ করেনি, দ্বিতীয়বার কয়েকজন ব্যক্তিকে চিকিৎসা করবার জন্য জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে থাকতে আসছে, দেখা গেছে মানুষ তাকে ওষুধের জন্য ডাকছে। ৪ মে পর্যন্ত-- এই সন্ন্যাসী, একজন পাঞ্জাবি, এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলেছে, কুমারের থেকে

সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখতে, হঠাৎ ঘোষণা করল বা ঘোষণা করানো হল যে সে হচ্ছে মেজকুমার, এটা না জেনে যে মেজকুমার লম্বা না বেঁটে, কালো না ফর্সা, বৃদ্ধ না যুবক, বিবাহিত না একাকী। এক তরফে জ্যোতির্ময়ীদেবী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য, অন্য তরফে প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী প্রদত্ত তথ্য এবং তারপর দেখা যাক পরের ৫ মে কালেক্টরের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে কী বলা হয়েছে :

জয়দেবপুর

৫ মে ১৯২১

গোপনীয়

প্রিয় শিশুকে,

একটি অত্যন্ত আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক ব্যাপার, এখানে ঘটেছে যেটা পূর্ব বাংলা ও বাইরে, এক অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছে।

প্রায় ৫ মাস আগে এক ফর্সা ওষুধ প্রদানকারী সাধু ঢাকায় আসে, হরিদ্বার থেকে এটা জানানো হয়, এবং নদীর ধারে ঠিক রূপবাবুর বাড়ির বিপরীতে অবস্থান করতে থাকে তখন কাশিমপুরের জমিদারবাবু সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাকে কাশিমপুরে নিয়ে আসে। সে কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে। ঢাকায় ফেরার পথেসে জয়দেবপুরে মাধববাড়িতে অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীর মত অবস্থান করে। মাধববাড়িতে থাকাকালীন তাকে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সাধুর সাথে তার মৃত মেজভ্রাতার সাদৃশ্য দেখে জ্যোতির্ময়ীদেবী অশ্রুপাত কবতে শুরু করে ও সাধুও অশ্রপাত করতে থাকে। এই ঘটনা বাড়ির বাসিন্দাদের মনে কিছু সন্দেহের উদ্রেক করে। এরপর মেজকুমারের ফোটো সাধুকে দেখান হয়, সে সজোরে কাঁদতে শুরু করে, এটা এই সন্দেহকে আরো জোরালো করে তোলে। এরপর বাড়ির বাসিন্দারা তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করে যে সে প্রকৃতপক্ষে কে, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে সে তড়িঘড়ি ঢাকা ত্যাগ করে। কয়েকদিন সাধুর সম্বন্ধে কিছু শোনা যায়নি।

এক সপ্তাহ আগে, কাশিমপুরের জমিদারবাবু অতুলপ্রসাদ রায়চৌধুরী সাধুকে আবার জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে নিয়ে আসে এবং তখন থেকে সে সেখানে বাস করছে। সাধুকে দেখে 'সে কে' এমন একটা ভাব লোকের মনে তৈরি হয়েছে যারা প্রতিদিন শতশত সংখ্যায় তাকে দেখতে আসছে যে সে হচ্ছে মৃত মেজকুমার। এস্টেটের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রজা, বাইরের লোকও প্রচুর সংখ্যায় প্রতিদিন আসছে, সাধুকে দর্শন করে বলে যাচ্ছে সে মেজকুমার। তার উপস্থিতি এই অঞ্চলে তুমুল আলোড়ন ফেলেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় সাধুকে শতশত প্রজারা প্রবলভাবে প্রশ্ন করে। অবশেষে বেরিয়ে আসে যে তার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং তার পিতার নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তার ধাই মায়ের নাম অলকা ধাই। এরপর সাধু অজ্ঞান হয়ে যায় এবং অসংখ্য জনতা উলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি দিতে শুরু করে। যে সব মানুষ এখানে উপস্থিত ছিল তারা প্রভাবিত হয় যে সে মেজকুমার ভিন্ন আর কেউ নয় এবং উপস্থিতপ্রজারা ঘোষণা করে এমনকি যদি এস্টেট তাকে

গ্রহণ করতে না পারে, তারা তার পাশে দাঁড়াবে ও তার স্থান পরিচালনা করবে। অবস্থার গুরুত্ব দেখে, জ্যোতির্ময়ীদেবী ও মৃত ইন্দুময়ীদেবীর বাড়ির বাসিন্দারা মোহিনীবাবু ও মিঃ ব্যানার্জিকে অবগত করে যে সাধু এইসব ব্যাপার ঘোষণা করেছে। তারা তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে গমন করে ও ব্যাপারটি অনুসন্ধান করে। সাধু তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেনি। এইদিন সকালে আবার তারা সেখানে যায়, কিন্তু সাধু তাদের সংবাদ পাঠায় যে বিকালবেলা সে তাদের সাথে দেখা করবে। বাড়ির বাসিন্দারা সাধুকে ভয় দেখায় যে সে কথায় ও ব্যবহারে নিজেকে মেজকুমার বলে ঘোষণা করে বিরাট দায়িত্ব বহন করছে এবং তার নিজের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অতীত ইতিহাস না প্রদান করে সে স্থান ত্যাগ করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে সাধু-সম্বন্ধে একটি বিক্ষিপ্ত অনুসন্ধান আবশ্যক। সকাল থেকে সাধুকে দেখতে ভিড় উপচে পড়ছে এবং উত্তেজনা ও আলোচনা এত ব্যাপক যে অবিলম্বে যদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করা যায় তবে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিতে পারে।

আমি এই ব্যাপারে আপনার মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি।

আপনার বিশ্বস্ত
এফ ডাবলু নিডহ্যাম্

জে এইচ এস ক্যর, এম এ, আই সি এস
ঢাকার কালেক্টর,
মেমো নং ১২
তাং : ৫-৫-২১
অবগতের জন্য বিভাবতীদেবীকে অনুলিপি প্রেরণ করা হল।

এফ ডাবলু নিডহ্যাম
ম্যানেজার

—

এই তথ্য মেজরানী তথা অন্য দুই রানীকেও প্রেরণ করা হয়। বাদী প্রমাণ করেছিল যে কপি ১ম রানীর দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল এবং এটা শুধু সহকারী ম্যানেজারের স্বীকৃতির পর যে একটি কপি মেজরানীকে পাঠানো হয়েছিল এই কপি প্রতিবাদী পক্ষ দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল। সত্যবাবু জেরাকালীন সামান্য ইতস্তত করবার পর বলে যে তার বোন-- অনুরূপ একটা কপি পেয়েছিল এবং স্বীকার করেছিল যে এটা ছিল টাইপ করা চিঠি।

প্রতিবাদী পক্ষের বক্তব্য ছিল যে এই রিপোর্ট সহকারী ম্যানেজারের দ্বারা রচিত হয়েছিল এবং তথ্যের উপর প্রধানত নির্ভরশীল, ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নয়। সহকারী ম্যানেজার কুমারদেব জানত না, কিন্তু রায়সাহেব তাকে এই মামলার অন্যান্য সকলের মত বিনত, বোন ও অন্য আত্মীয়দের ছাড়াও সে স্থায়ীভাবে রাজবাড়িতে বাস করত ও ছোটকুমারের মৃত্যুর পর অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিল এবং সাধুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবার অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল ও মামলার প্রধান 'তদবিরকর' হিসাবে কাজ করছিল। উক্ত চিঠির মাধ্যমে মোহিনীবাবুকে প্রতিবাদীপক্ষ গ্রহণ করেছিল এবং সে নির্দেশ করেছিল কোন

অংশ তার ব্যক্তিগত জ্ঞানের মধ্যে, কোন অংশে অনুমান, কোন অংশ তথ্য এবং কোন অংশ শুধু মতামত। এই রিপোর্ট ম্যানেজার কর্তৃক কালেক্টরকে প্রদত্ত হয়েছিল।

মোহিনীবাবু বলেছিল এবং রায়সাহেব এই উক্তি সমর্থন করেছিল যে ৪ মে সন্ধ্যা নাগাদ বুদ্ধু ও জব্বু তাদের কাছে এসেছিল। তখন তারা রাজবাড়ির কাছে টেনিস কোর্টের কাছে ছিল এবং রিপোর্ট তৈরি করছিল। তারা বলে যে কী ঘটেছে। তারা জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ি যায় তৎক্ষণাৎ। যাওয়ার পথে তাদের বলা হয় প্রথম সফরে কী ঘটেছিল যার কিছুমাত্র তারা জানত না শুধুমাত্র 'মাধববাড়ি'-তে তার (বাদীর) অবস্থান ছাড়া এবং তারপর তাদের বলা হয় সাধু এমন এমন বিষয়ে বলেছে। এইদিনের পূর্বে যে শতশত লোক তাকে দেখতে আসছিল একথা তাদের জানা ছিল না। কিন্তু পরের দিন ৫ই মে থেকে প্রচুর মানুষ তাকে দেখতে আসছে, এটা মোহিনীবাবুর জানা ছিল ব্যক্তিগতভাবে। হৈ চৈ ও বিপদ সম্বন্ধে, এটাই মতামতের যে এই ধরনের কিছুই ছিল না।

চিকিৎসক-সন্ন্যাসীর কাহিনী মোহিনীবাবুকে কষ্ট দিচ্ছিল। কেউ পূর্বে তাকে কুমার বলে সন্দেহ করেনি এবং এমনকি তার পরিচয় ঘোষণাতেও নয়। যেমন, সে জেরাতে বলেছে মানুষের ভিড় তাকে দেখতে আসছে। ৫ মে থেকে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাটির তীর্থ ১০ বা ১৫ জন লোক "৫ মের পূর্ব থেকে শতশত লোক দেখতে আসছে।" এটা তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না, কিন্তু তাদের আলোচনায় ছিল। জয়দেবপুর একটি ছোট্ট গ্রাম, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানে, চেনে এবং বুদ্ধুবাবুর বাড়ি রাজবাড়ির চটানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং সেখানে এস্টেটের অফিসারদের বাড়ি ও রাজবাড়ি যাওয়ার পথে একটি 'ডেহি' অফিস ছিল। যদি বুদ্ধুবাবু বলত যে চক্করের প্রাঙ্গণে একটি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে, তাও রিপোর্টে বলা হত না।

কিন্তু এই ধরনের কিছু ঘটেনি। তৎকালীন জয়দেবপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর কর্তৃক প্রমাণিত থানায় রক্ষিত জেনারেল-রেজিস্টারের প্রতি লক্ষ্য করা যাক—

৪-৫-২১ সকাল ৯টা এক পুরুষ জটাধারী সন্ন্যাসী। নামধাম অজানা। কিছুদিন যাবৎ বুদ্ধুবাবুর বাড়িতে বাস করছে। অনেক লোক তাকে দেখতে আসছে। বেশির ভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মেজছেলের সাথে তার বিরাট সাদৃশ্য আছে এবং সাধারণ মানুষের মনোভাব যে উক্ত মেজকুমার মরেনি, বরঞ্চ গত বারোবছর ধরে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরছে। যতদিন না সে তার সফর শেষে বাড়ি ফিরে এসেছে।

(এক্সি : ২৩১)

এটা দেখা যাবে যে এই রিপোর্ট সকাল ৯টার সময়ে পরিচয় ঘোষণার পূর্বে।

৫-৫-২১ বেলা ৩টে— আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এলাকায় কোন সংক্রামক ব্যাধির খবর নেই। একজন সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে এসেছে। জনতা তাকে মেজকুমার বলে ডাকছে এবং সে নিজেকে মেজকুমার বলে ঘোষণা করছে। (এক্সি : ২৩১)

৫ মে সকালে, ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্ত, প্রতিবাদীপক্ষের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী

দার্জিলিং গিয়েছিল, যাকে কুমারের বিষ প্রয়োগের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যার সাক্ষ্য বিষয়ে পরে বলা হবে। ডাঃ আশুতোষ নিম্নোক্ত চিঠিটি লিখেছিল। ১৯২১ সালের ৫ মে ১১-৩০ মিনিটের পূর্বে এটা পোস্ট করা হয়েছিল প্রথম রানীর ভাই শৈলেন্দ্র মতিলালকে (এক্সি : ৩৯৮)।

জয়দেবপুর

৫ মে, ১৯২১

"এক আশ্চর্য ব্যাপার, রোমাঞ্চকর বইয়েও কেউ পড়েনি যা ভাওয়ালে ঘটেছে। এখানে বুদ্ধবাবুর বাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসেছে। সে ঘোষণা করেছে যে সে মেজকুমার, এবং তার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। সে তার ধাই মায়ের নামও বলেছে, অলকা। প্রজারা দু'লাখ টাকা চাঁদা তুলবে এবং তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করবে, প্রতিদিন ৫/৬ হাজার লোক তাকে দেখতে আসছে এবং তাদের কেউ কেউ 'নজর' দিচ্ছে। প্রত্যেক নারীপুরুষ দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে যে সে মেজকুমার, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এই ঘটনার ব্যাপক আলোড়ন উঠেছে। যখন আমি এসে বললাম যে এটা মিথ্যা, ভাওয়ালের হাজার হাজর লোক আমাকে দোষারোপ করছে। আমি অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে সময় কাটাচ্ছি।"

এটা পরিষ্কার যে রিপোর্ট অনুসারে ঘটনাটি তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। রিপোর্টটি রচনা করা হয়েছিল সকাল ৮-৩০ মিঃ বা এর কিছু পরে। এই আলোড়ন প্রসারিত হয়েছিল এস্টেট ও তার বাইরে। শুধু সেই রাতের মধ্যে নয়, কারণ অসংখ্য জনতা চারদিন পূর্ব থেকেই তাকে দেখতে আসছিল প্রতিদিন-- রিপোর্ট ও পুলিশ রেজিস্টার অনুসারে। সন্ন্যাসী তার পরিচয় ঘোষণার পূর্বে ৪ মে সকাল ৯টায় জ্যোতির্ময়ীদেবীর সাক্ষ্য ও থানার রিপোর্ট অনুসারে তার বাড়িতে এক সমাবেশ হয়েছিল। ভিড়ের অয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অসংখ্য নারী ও পুরুষের মাঝে পরিচয় ঘোষণা করা হল যখন জনতা ও বাদীর বোন তাকে চাপ দিয়েছিল যে সে কে এবং তখন সেখানে সবাই কাঁদছিল, জয়ধ্বনি ও উলুধ্বনি করছিল। প্রতিবাদীপক্ষ এই আত্মপরিচয়ের আর বেশি কিছু বিলোপ করতে পারেনি। এই দিন ও পরের দিনের গোলমালহীন তথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কেউ পরিষ্কার দেখতে পাবে ঘরটি লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল এবং একটা ক্ষীণ সন্দেহ থেকে যায় যে যোগেন্দ্রবাবুও সেখানে ছিল।

যাইহোক, বিষয়টি হচ্ছে জ্যোতির্ময়ীদেবী বা অন্যান্য বোনের ছেলেমেয়েরা এবং তার নিজের ছেলেমেয়েরা প্রকৃতপক্ষে বাদীকে ঐ দিন সনাক্ত করেছিল কিনা, যদিও সে বলেছিল সে হচ্ছে কুমার অথবা হয়ত তাকে, একজন পাঞ্জাবিকে, প্ররোচিত করা হয়েছিল বলতে, এক উন্মাদ প্রায় আশা নিয়ে। যদিও সে অবগত ছিল সে একজন অন্য মানুষ, দেখতে অন্যরকম, তথাপি মেজকুমারের ঘটনাটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। প্রতিবাদীপক্ষের সম্পূর্ণ গরমিলের সংজ্ঞাটি কিছুই রেখে যায় না শুধুমাত্র এক ষড়যন্ত্রের কাহিনী ছাড়া যা হঠাৎ সৃষ্টি হল বা ঐ তিনদিনেব মধ্যে সৃষ্টি হল, যখন মানুষটি চত্বরের মধ্যে বসে ছিল। একজন সন্ন্যাসী, দাড়িযুক্ত এবং ভস্মাচ্ছাদিত-- এক তুচ্ছ ষড়যন্ত্র তাকে কুমার বলে পরিচয় করাতে চাইল, যদিও সে

বাঙলা এবং এত কঠিন ভূমিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানত না। এটা অসম্ভব বলে মনে হয় এবং এটা বিবেচনা করতে হবে কেন সাদৃশ্যের পরিমাণ প্রদত্ত পরিচয়েব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের একটি ব্যাখ্যা হিসাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে না. কিন্তু অন্যান্য সূত্রগুলিকেও বিবেচনা করতে হবে।

রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি একজন কঠোর, বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী মানুষ এবং তার 'তদবির' যেটা উল্লেখ করতে হবে. প্রমাণ করে সে তেমনই তাকে যা দেখতে। এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কখন সে ও মোহিনীবাবু একত্রে বসে মিঃ নিডহামের চিঠি বর্ণনা করেছিল? এর ভিতরে সমস্ত তথ্য সম্বন্ধে তার বিশ্বাস ছিল। "আমি এই সব তথ্য বিশ্বাস করেছিলাম। মোহিনীবাবু এটা লিখেছিল যখন আমি তার সাথে ছিলাম।" সে বলেছে, "সমস্ত লোক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল যে সে মেজকুমার ভিন্ন আর কেউ নয়. বাড়ির বাসিন্দারাও।" বাসিন্দা বলতে সে বোঝাতে চেয়েছে বুদ্ধুবাবু জব্বু, জ্যোতির্ময়ীদেবী। সমস্ত মানুষসহ বাড়ি বাসিন্দারা যে সংবাদে বিশ্বাস করেছিল তাকে সে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, "আমি বিশ্বাস করি যে বাড়ির বাসিন্দারাও বিশ্বাস করে যে সাধু মেজকুমার।" সে অন্য সকলের মত মেজকুমারকে চিনত। জয়দেবপুরে প্রথম সফর থেকে সে সাধুকে দেখেছিল এবং তার আবির্ভাবের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে সে বলেছে সে লক্ষ্য করেছে বাদীর চোখ বাদামী। সে বলেছিল যে জ্যোতির্ময়ীদেবীও বিশ্বাস করেছিল যে 'সাধু মেজকুমার।' এর অর্থ সেও বিশ্বাস করেছিল, যদিও সে বিশ্বাস করে থাকে, তবে বাদীর বোন কর্তৃক সনাক্তকরণও প্রকৃত, অথবা এই মানুষটি মেজকুমারের দ্বিতীয় সত্তা। এটা দেখা যাবে যে রিপোর্টে বলা হয়নি যে মানুষটিকে অন্যরকম দেখতে বা সে দুর্বোধ্য কথা বলছে-- রায়সাহেব ও মোহিনীবাবু উভয়ে তার কথা শুনেছিল প্রথম সফরে, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তারা বলে না মানুষটি আদৌ মেজকুমারের মত নয় বা কেউ একঝলকে দেখে এটা বলতে পারে, যেভাবে প্রতিবাদীপক্ষের বেশিরভাগ সাক্ষী এজাহার দিয়েছে যে সে পৃথক। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে পুলিশকে ভিড় হঠাতে বা শান্তি রক্ষা করতে বলা হয়নি। মোহিনীবাবুকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সে এই রিপোর্ট বিশ্বাস করে কি না। সে মেজকুমারকে জানত না, কিন্তু প্রতিবেদন বর্ণনা করবার সময় সে ও রায়সাহেব একত্রে ছিল। সে বলেছে ৪ঠা মে রাতে সে নিডহ্যামের সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং তাকে বলেছে পরের দিন সকালের রিপোর্টে কি যাবে। সে যা বলেছিল নিডহ্যাম বিশ্বাস করেছিল। সে নিজেও বিশ্বাস করেছিল। তারপর সে বলে যে এটা বিশ্বাস করেনি। তারপর সে বলে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোন সময় ছিল না, বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুতর ও জরুরি। এবং এই বলে সে চিঠি শেষ করে যে সে এর একবর্ণও বিশ্বাস করেনি, এর সবটাই বাজে, মিঃ নিডহ্যামকে সে এমন কিছু বলেনি। এইভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে সে এটা নিডহামের কাছে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করে এবং জেলার কালেক্টরের কাছে তামাসা হিসাবে প্রেরণ করে। এটা দেখা যাবে যে রিপোর্টে গৌণ ও অববাস্তব চায়ের পার্টি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি যেখানে বাদী ক্ষীণভাবে বলেছিল সে একজন পাঞ্জাবি।

এই রিপোর্টটি একজন বিশ্বাসীর রিপোর্ট। এই রিপোর্ট ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়েছে যাতে কেউ এর কোন অসত্যকে তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলতে পারে এবং যে সঙ্গে সঙ্গে এর অনুসন্ধান করতে গিয়েছিল এবং সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং জেলার কালেক্টরের জন্য রিপোর্ট রচনা করতে বসে গিয়েছিল।

তর্কের বিষয় হচ্ছে বোনেরা একজন পাঞ্জাবী সন্ন্যাসীর মেজকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করবার অধিকার পোক্ত করেছিল বা বাদী কিছু ফন্দিবাদ লোকের দ্বারা বা কিছু কলিকাতার মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল যেটা প্রথম বাদীর জেরার সময় উত্থাপিত হয়েছিল। এই সূত্র পরিত্যক্ত হয়েছে। ওঝা-সন্ন্যাসীর সূত্রও পরিত্যক্ত। তাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব নিরাময় করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাকে মেজকুমারের মত দেখতে। এই জন্য তাকে কাশিমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর নিয়ে আসা হয় জয়দেবপুরে। সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে যায়। তারপর সে চলে যায়। জ্যোতির্ময়ীদেবী ঢাকায় যায়, একজন ওঝার জন্য নয়, শৈলবাসিনীর বাড়ি থেকে তাকে পেতে ; এবং যখন সে ফিরে আসে, শত শত লোক তাকে দেখতে আসতে শুরু করে এবং ৪ মে পরিচয় ঘোষণায় বিষয়টি তুঙ্গে ওঠে যখন পরিবারের লোকজন তাকে মামা বলে ডাকতে শুরু করে, যখন বোনেরা প্রকৃত বিশ্বাস করে যেমন রায়সাহেব করেছিল যে সে হচ্ছে মেজকুমার।

এই উপসংহার একটি পৃথক ঘটনার উপর ভালভাবে নির্ভর করতে পারে যে রায়সাহেব, যে কুমারকে কিছুদিন পূর্বে দেখেছিল, মনে করে যে জ্যোতির্ময়ীদেবী ও অন্যান্য বোনেদের সন্তানেরা সৎভাবে এটা বিশ্বাস করে : কিন্তু শুধু এর উপর নির্ভর করবার প্রয়োজন নেই। এমন সৎ বিশ্বাস ছাড়া কিছু ঘটনা ঘটতে পারেনি। যদিও সমস্ত জয়দেবপুরে ৪ মে-তে অবশ্যই সেখানে ছিল। প্রতিবাদীপক্ষ এমন একজন সাক্ষীকেও ডাকেনি যে সেদিন তখন উপস্থিত ছিল না। সুতরাং ঐ দিনের তথ্য, বোনেরা ও অন্যান্য সাক্ষী কর্তৃক যেভাবে প্রদত্ত হয়েছে তা পাকা এবং সেখানে বাকি থাকে শুধু চুক্তির তথ্য। প্রতিবাদী পক্ষের নিজস্ব সাক্ষী যতদূর বলে তা হচ্ছে যে ঐদিন থেকে বাদীকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হয় এবং সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর কন্যার ঘরে ঘুমাতে শুরু করে। সে বলেনি বাদী পূর্বে কোথায় ঘুমাত এবং এটা গ্রহণ করা যেতে পারে সে এর পূর্বেও এই বাড়িতে ঘুমাত। তৎক্ষণাৎ তাকে পরিবারের অন্তরঙ্গতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হল। বাড়িতে যুবতী মেয়েরা ছিল, যেখানে খুব সামান্য 'অন্দরমহল' ছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবী নিজেও যুবতী- তার বয়স চল্লিশের কাছাকছি ও সে একজন পর্দানসীন। সে চিকের পেছন থেকে লক্ষ্য করছিল সে কী ঘটে চলেছে, কিন্তু বাদী সরাসরি অজ্ঞান হয়ে পড়ল, পুরোপুরি ঘটনাচক্রে, সে বলেছে, যে জন্য তাকে বেরিয়ে আসতে হল তার কাছে, জনতা তাকে রাস্তা করে দিল যাতে সে এগিয়ে যেতে পারে। সে ছিল বিধবা এবং এই পরিবারের নারীরা ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। এই ধরনের মহিলাদের পক্ষে জাতগোত্রহীন এক যুবক ব্যক্তিকে বাড়ির মধ্যে স্থান দিতে অবশ্য ভীত হবে, এবং প্রতিবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী বাদী ছিল অজানা প্রাক-বংশ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এবং এই ব্যক্তিকে বাড়ির মধ্যে আনা হয়

এবং কুমারের ভূমিকায় অভিনয়ের সাফল্যের সুযোগে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পায়, যদিও সে একজন পাঞ্জাবি, যদিও সে পরিবার সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং যদিও তাকে দেখতে সম্পূর্ণ অন্যরকম এবং সে আশা করেছিল যে এই মানুষটি ভাওয়াল রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তাকে পুনরুদ্ধার করবে এবং বিস্মৃত হয়নি যে এস্টেটও তার শেষকপর্দক পর্যন্ত লড়াই করবে। কোন ব্যক্তি যে কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় সেও এই কাজ করতে চিন্তা করবে, বাতুল ব্যক্তি ছাড়া কেউ এতে যোগদান করবে না, কিন্তু জ্যোতির্ময়ীদেবী এটা করেছিল এবং তার সাথে লেগে ছিল, যদি বাদী জয়দেবপুর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল ৭ জুন, এবং সেই থেকে ঘর থেকে সে নির্বাসিত।

এক নির্দিষ্ট সীমার পর ষড়যন্ত্র ফলহীন হয়ে পড়ে। দেখা যায় যে এই মহিলা জ্যোতির্ময়ীদেবী সৎভাবে বিশ্বাস করত বাদী তার ভাই এবং এটা দেখা অবশিষ্ট আছে হয়ত এই বিশ্বাস প্রকৃত সনাক্তকরণ থেকে অগ্রসব হয়েছিল। মিঃ চ্যাটার্জি লড়াই করেছিল যে বোনের দ্বারা এই সৎ সনাক্তকরণ বাদীকে সমস্তরকম পথ দেখিয়েছিল। সৎ বিশ্বাস যদিও এক বোনের, উপসংহারমূলক নয়, যদিও এটা সম্পূর্ণ বিসদৃশভিত্তিক সূত্রকে ধ্বংস করে দেয়, নিঃসন্দেহে বাদীকে এটি বিস্তৃত পথে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু পার্থক্যের একটি একক সূত্র, মৃত্যুর মত, বা এক পৃথক মনের মত, যে সে বাঙালি নয়, তাকে সর্বতোভাবে স্থানচ্যুত করতে পারে।

ঘটনাপঞ্জী যা ৪ মের সনাক্তকরণের ঘোষণাকে অনুসরণ করে, যে ঘটনা উপসংহারকে নিশ্চিত করে যা শ্রেফ বোনের বিশ্বাসকে স্পর্শ করে। ৫ মে মিঃ নিডহ্যামের রিপোর্ট কালেক্টরের কাছে প্রেরিত হয় এবং মোহিনীবাবুর মতে একটি করে কপি প্রত্যেক রানীর কাছে প্রেরিত হয় এই রিপোর্ট কলকাতায় অবশ্যই ৫ মে পৌঁছেছিল। এক্সি ৩৯৮ ৫ মে জয়দেবপুরে পোস্ট করা হয়েছিল এবং ৬ মে কলকাতায় পৌঁছেছিল। এটা ছিল শুক্রবার। ৭ মে কলিকাতার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস থেকে 'দ্য ইংলিশম্যান' টেলিগ্রামে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় 'ঢাকা সেনসেশন্' (ঢাকায় হৈ চৈ) শিরোনামে মিঃ নিডহ্যামের চিঠি বা টেলিগ্রাম পেয়ে সত্যবাবু কী করেছিল? সে তার বোনকে এটা পড়ে শুনিয়েছিল। তার বোন 'আশ্চর্য' হয়ে গিয়েছিল— এবং তারপর সে কী জয়দেবপুর গিয়েছিল মানুষটির মুখোমুখি হতে, তাকে জিজ্ঞাসা করতে মানুষটি তাকে চেনে কি না, এমনকি তাকে পৃথক না দেখালেও? সে করেনি। সে বেভিনিউ বোর্ডের সম্পাদক মিঃ লেথব্রিজের কাছে গিয়েছিল এবং মেজকুমারের মৃত্যুর নথি নিরাপদে রাখতে বলেছিল, তার হাতে তুলে দিয়েছিল এভিডেভিটের কপি যা সে বীমার টাকা তোলবার সময় যোগাড় করেছিল। সে অনুরোধও করেছিল যে এগুলির মূল কপি ও বীমার কাগজপত্র এর জন্য পাঠানো উচিত যা মিঃ লেথব্রিজ করতে সম্মত হয়েছিল। সে ঢাকার কালেক্টরের কাছে এর কপি পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ১৯০৯ সালের ৭ জুলাই মিঃ কালভার্টের দ্বারা স্বাক্ষরিত মৃত্যুর এফিডেভিট সার্টিফিকেট। এই পদক্ষেপ সে গ্রহণ করেছিল বাদীর দাবী সম্বন্ধে তথ্যের নথি গ্রহণ করবার এক সপ্তাহের মধ্যে।

এই সীমা আরো নিকটতর করা যেতে পারে। সে বলেছে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াও সে মাননীয় সদস্য মিঃ লীকে দেখেছিল এবং তার উপদেশে বাদীর দাবির প্রতিবাদে 'দা ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি চিঠি প্রেরিত হয় যে বাদী মেজকুমার নয়। সে অনুমোদন করেছে। ইংলিশম্যানে এই চিঠিটি ১৯০৯ সালের ৯ মে একমাত্র চিঠি। ৮ মে ছিল রবিবার। ১০ মে ঢাকার কালেক্টর মিঃ লিন্ডসে একটি রিপোর্ট দাখিল করে এবং রায়বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ ১০ থেকে ১৫ মের মধ্যে কলকাতায় আসে পকেটে রিপোর্টটি সঙ্গে নিয়ে। সে এবং রায়বাহাদুর কলিকাতায় সাক্ষাৎ করে এবং এই দু'জন মিঃ লির সামনে রিপোর্ট পেশ করতে দার্জিলিঙে গমন করে, তাদের সাথে একজন ব্যারিস্টার যায়। সেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এন কে রায় দ্বারা মেজকুমারের মৃত্যু ও দাহের সাথে সম্পর্কিত কিছু নির্দিষ্ট সাক্ষীকে জেরা করা হয়। ১৭-৫-২১ তারিখে এদের একজনকে জেরা করা হয়। এটা অজানা যে সেই ছিল প্রথম, কিন্তু সত্যবাবু দ্বারা প্রদত্ত উপরোক্ত তথ্য 'ইংলিশম্যানে'-র চিঠি দ্বারা নিশ্চিত করা হয় এবং ১৭-৫-২১ তারিখে দার্জিলিঙে বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়। আরেকটি বিস্তৃত তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন যে সত্যবাবু ১৫ মে দার্জিলিঙে যাওয়ার পূর্বে সঠিকভাবে বলেছিল, সে মিঃ লিথব্রিজকে একাধিকবার দেখেছিল এবং এই উপলক্ষগুলির মধ্যে একটিতে সহকারী ম্যানেজারের থেকে একটি টেলিগ্রাম সহ সে দেখা করেছিল এইজন্য যে সেও আশু ডাক্তার দার্জিলিঙে মেজকুমারকে বিষ প্রয়োগের অভিযোগে জয়দেবপুরে অভিযুক্ত হচ্ছিল। ৪ মের এই ঘটনাকে তামাসা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি এবং এর সম্বন্ধে সত্যবাবু এমন কী তথ্য গ্রহণ করেছিল যাতে তাকে দার্জিলিঙ যেতে হয় মৃত্যুর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে এবং সেগুলি রাজকর্মচারীদের হাতে তুলে দিতে। মাননীয় বোর্ড অব রেভিনিউ ১০ মে বীমা কোম্পানির কাছে মূল নথির জন্য লিখেছিল।

যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে জয়দেবপুরে কি ঘটছিল? রায়সাহেব বলেছে যে ৬ই মে কোর্ট অব্ ওয়ার্ড বাদীর বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ায়। ৫ই মে এর পদক্ষেপ, কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা অজানা ছিল। ৫ই মে জয়দেবপুরে কোর্ট অব্ ওর্য়াসের অফিসারগণ কোন কাজ করেনি এবং তাদের মধ্যে অনেকেই মেজকুমারকে জানত। মিঃ নিডহ্যামের কাছে রিপোর্ট সাজানো ছাড়া ৫ই মে কী ঘটেছিল তা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অনুমোদিত। এটা স্বীকৃত যে ঐ দিন জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে যায় এবং বাদীকে দেখে। ৬ই মে মোহিনীবাবু একটি বিপোর্ট পেশ করে সেখানে কী ঘটেছিল ও মিঃ নিডহামকে দখিল করে। এই রির্পোট ছিল এই রকম--

সি এমের কাছে জমাপ্রদত্ত।

আপনার মৌখিক আদেশ পালনার্থে আমি গতকাল বিকালে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল মিঃ ব্যানার্জী, বিশেষ অফিসার, ফরেস্ট অফিসার, প্রধান কেরাণী ও অনান্য এস্টেট-কর্মচারী। উদ্দেশ্য সাধু সম্বন্ধে পুনরায় অনুসন্ধান করা, যে

মেজকুমারের স্থান নিয়েছিল, তার কাছ থেকে তার পরিচয়সম্বন্ধে কিছু নির্দিষ্ট জবানবন্দী নিতে তার কাছে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে তার প্রাক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কিছু বলতে অস্বীকার করে। সাধু নিশ্চিতভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোকের উপস্থিতিতে তার নাম বলে তার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, তার বাবার নাম রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, কিন্তু সে মেজকুমারের জীবনের কিছু পার্শ্বঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। উত্তর দিতে প্রত্যাখান করার মধ্যে একটা তাৎপর্যও আছে। বিষয়টি এমন একটা স্থানে এসেছিল যে সাধুকে অবশ্যই অভিযোগে বর্ণিত সনাক্তকরণকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অথবা মিথ্যা ব্যক্তিত্ব আরোপের জন্য তাকে অভিযুক্ত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এটা বলা নিস্প্রয়োজন যে যদি সাধুকে মিথ্যাভাবে কোন ঝুঁকি ব্যতিরেকে মৃত মেজকুমারের স্থান নিতে অনুমোদন করা হয়, এটা হবে এস্টেটের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু, এই সময়ের মধ্যে সাধু প্রজাদের সমবেদনা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে যারা মনে মনে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত যে সে মৃত মেজকুমার ছাড়া আর কেউ নয়। এই অবস্থায় আপনার সহৃদয় নির্দেশের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হচ্ছে যে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। সংবাদ পাওয়া গেছে প্রয়োজন হলে সে তার পরিচয় প্রমাণ করবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে যখন সময় আসবে।

সাক্ষর

এম এম চক্রবর্তী

৬-৫-২১

উপস্থিত ব্যাক্তিদের নামগুলি হল:—

বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্তী (প্রতিবাদী সা. ১১৭)

,, জে এন ব্যানার্জী (প্রতিবাদী সা:৩১০)

,, ফণিভূষণ মুখার্জী (প্রতিবাদী সা:৯২)

,, গৌরাঙ্গহরি কাব্যতীর্থ, সাব রেজিস্টার (বাদী দ্বারা আহবায়িত)

,, মৌলভী নূরুল হক, সাব ইন্স: অব পুলিশ, জয়দেবপুর

,, রামচন্দ্র বাগচী (অনাহূত)

,, আশুতোষ দাশগুপ্ত (প্র: সা: ৩৬৫)

,, অশ্বিনীকুমার দত্ত (অনাহূত)

,, জালাভচন্দ্র মুখার্জী (মৃত)

,, সীতানাথ ব্যানার্জী (বা: সা: ৯৭৭)

,, ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র মুখার্জী (,, ,, ৯৩৮)

,, সীতানাথ মুখার্জী (,, ,, ৯৭৩)

,, যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (অনাহূত)

,, নগু প্রধান্ত (,,)

,, অসীম মুন্সী, মোসাখালা (অনাহূত)

,, উমেদালি ভুইঞা, ভারুলিয়া (বা: সা: ২৬)

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে এই দিনের রিপোর্ট ৬ই মে লেখা হয়। মোহিনীবাবুর মতে ৬-৫-২৯ রিপোর্ট ৫-৫-২৯ তারিখের মত। ৬ তারিখে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস রায়সাহেবের সাক্ষ্য অনুসারে সাধুর বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ায় সুপারিনটেনডেন্ট ও রায়সাহেবকে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে ডাকা হয়, তাকে একটি মতামত দেওয়া হয়। এস পি-ও রায়সাহেবের পরিবর্তে প্রতিবাদীপক্ষ ৬ তারিখে আরেকটি সাক্ষী উপস্থিত করে যার বিষয়ে এখনই আসা হবে। এটা লক্ষ্য করতে হবে রিপোর্টে ব্যবহার করা হয়েছে যে বাদী তার পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন উত্তর দিতে পারেনি এবং বলা হচ্ছে এটা তাৎপর্যময় এবং অভিযোগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এটা বলা হয় না, অবশ্যই, যে মানুষটি অভিযুক্ত চায়ের আসরে বলেছিল যে সে সে একজন পাঞ্জাবী, সে হিন্দী কথা বলছিল না এবং পরিবারের আচরণ সম্বন্ধে কোনকিছু বলছিল না। ঠিক যেমনি ৫ তারিখের রিপোর্টে মতামত দেওয়া হয়েছিল যে পরিবার তাকে সনাক্ত করেনি, কিন্তু তাকে সতর্ক করছে যে নিজের পূর্ণপরিচয় প্রদান না করে সে যেতে পারে না— সম্পূর্ণ অবগত হয়ে একটি অনুচ্ছেদ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল যে পরিবার তাকে সনাক্ত করেছিল— রায়সাহেবের মতে।

৫ই মের সাক্ষাৎকার অনুসারে যেটা ৬ই মের রিপোর্টে স্থান পেয়েছিল। এটা শুধুমাত্র কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস কর্তৃক গৃহীত আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে সাজানো হয়েছিল এবং কী ঘটেছিল সত্যনিষ্ঠভাবে বাদ দিয়েছিল। আমাদের পুরোপুরি এর ভেতরে যেতে হবে, যাতে বাদীর সাথে ৫ ই মের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করা যেতে পারে এবং তার আবির্ভাবের পর তাকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এরপর সে কখনো এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি প্রতিবাদী পক্ষের কারো দ্বারা এবং এই নীতি ঠিক বিচারের সময় গৃহীত হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে যে বাদীকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কুমারের জীবনের সাথে সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন করা হয়নি, তার জীবনের বা পরিবারের কোন ঘটনা-- এই সূত্রে যে তাকে শেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরে যাওয়া হবে, কিন্তু ৫ই মের এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে বহু সাক্ষী উপস্থিত ছিল এবং যারা এর সম্বন্ধে বলেছিল।

এই সময়ে বাবু গৌরাঙ্গ কাব্যতীর্থ জয়দেবপুরে সাব-রেজিস্ট্রার ছিল এবং নিশ্চিতভাবে এই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিল। সে মেজকুমারকে জানত না এবং সনাক্তকরণের কোন সাক্ষীরূপে উপস্থিত ছিল না। তার পিতা ছিল মহামহোপাধ্যায়, সর্বোচ্চ পদবীধারী, সংস্কৃত পণ্ডিত হিসাবে সরকারের স্থাপিত এবং তার বাসস্থানের মধ্যে অবস্থিত 'টোল' লর্ড রোনাল্ডসে এবং স্যার স্টুয়ার্ট বেইলি দ্বারা পরিদর্শিত হয়েছিল। গৌরাঙ্গবাবুর নিজের পদবী সরকার দ্বারা স্বীকৃত এবং সে তখনো কর্মে নিযুক্ত ছিল। সে বলেছিল যে এই দিনে-- সে এইদিন বলতে উল্লেখ করেছে যেদিন রিপোর্টে উল্লেখিত

ব্যক্তিরা বর্তমান ছিল, সে বাদীকে দেখতে গিয়েছিল। সে তাকে ইজিচেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিল এবং শুনেছিল যে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অফিসার তাকে দেখতে আসবে। সে রায়সাহেব, মোহিনীবাবু, ডাক্তার, ডিসপেনসারির তত্ত্বাবধায়ক এবং আরো অনেকের নাম করে। সাধুকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে কে? কার পুত্র সে? কার ভাই সে? "আমি একটা প্রশ্ন করব, যদি সে উত্তর দিতে পারে তাহলে আমি তাকে কুমার হিসাবে গ্রহণ করবো।" তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, "দার্জিলিঙের বাড়ির কার্নিসে একটা পাখী ছিল, একজন তাকে গুলি করেছিল এবং আপনি কেন তাকে তিরস্কার করেছিলেন?" যখন সে এই প্রশ্ন করেছিল জনৈক বলেছিল, "উত্তর দেয়ার পূর্বে ওকে গৌরাঙ্গবাবুর কাছে নাম বলতে দাও।" আশু ডাক্তার ফিসফিস করে তার কাছে বলে, "বীরেন্দ্র ব্যানার্জী"। সাধু উত্তর দিল, "হরি সিং"। আশু বলল, "হরি সিং আদৌ দার্জিলিং যায়নি। সাক্ষী ঘোষণা করে নাম মিলছে না। কিসের জন্য বীরেন্দ্র ব্যানার্জীকে পাঠানো হয়েছিল। এবং বাদী বলেছিল হরি সিং পাখীটিকে গুলি করেছিল। বীরেন্দ্র বন্দুক চালাতে জানত না।

জেরায় সে বলেছে যে তার মনে পড়ে না যে সাধুর কাছে প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে কি না। প্রশ্নটি আধা-হিন্দী, আধা-বাঙলায় করা হয়েছিল এবং প্রতিবাদী পক্ষ মতামত দিয়েছিল এটা কোন ঘটনা নয় এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অফিসাররা বাদীর কাছে প্রশ্নটি রেখেছিল, এবং সে উত্তর দিতে পারেনি। উত্তরটি ছিল তার মনে নেই তারা কোন প্রশ্ন করেছিল কি না। তোমার নাম কি ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, কিন্তু এটা তাদের দ্বারা না ফণিবাবুর দ্বারা এটা তার মনে নেই।

রিপোর্টে বা জেরায় কী কী প্রশ্ন রাখা হয়েছিল তা ছিল না।

পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর আবদুল হামিদ ঐ সময়ে জয়দেবপুর থানার সাথে সংযুক্ত ছিল, জনৈক মৌলভী নূরুল হক ছিল ওসি। ৫ই মের সাক্ষাৎকারে উভয়ে উপস্থিত ছিল। যদিও আবদুল হামিদের নাম রিপোর্টে উঠেছে। কেউ অস্বীকার করেনি সে উপস্থিত ছিল এবং ৫ই মে বেলা ৪টের সময় গৃহীত থানার জেনারেল ডায়েরীতে বলা হয়েছে যে আবদুল হামিদ ও ওসি সাধুকে দেখতে যাচ্ছে যে নিজেকে রাজকুমার বলে ঘোষণা করেছে। অফিসার প্রবল বাধা সত্ত্বেও বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল, অবশ্যই এই চিন্তা করে যে সে সরকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে—যে চিন্তা অন্যান্য বহু সাক্ষী করেছিল। মামলাটি ছিল একটি মানহানির মামলা যেটি আশুডাক্তার ১৯২১ সালের ন'ই সেপ্টেম্বর একজন খণ্ড পুস্তিকা রচয়িতার বিরুদ্ধে এনেছিল। আশু ডাক্তারের সাক্ষ্য থেকে এটা দেখা যাবে যে এই মামলার বিষয়ে তার করণীয় ছিল খুব সামান্য, অভিযোগ করা ছাড়া। দেখা যাচ্ছে যে সে সরকারি উকিল শশাঙ্কশঙ্কর ঘোষ বাহাদুর যে মামলা পরিচালনা করছে তাকে জানে না, এবং সহকারী ম্যানেজার তার কার্যের জন্য মামলার সাফল্যে ছোটরাণীর একটি চিঠিতে প্রশংসিত হয়েছিল। পুস্তিকায় অভিযোগ ছিল যে পুস্তিকায় লেখা আছে আশু ডাক্তার দার্জিলিঙে কুমারকে বিষ প্রয়োগ করেছিল। একবার মামলাটি উঠেছিল ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম. সি ঘোষ এবং আরো একবার আর একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি. এম ঘোষের সামনে। ঢাকাতে এই মামলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই মামলায়, মৌলভী আবদুল হাকিম, সাব-ইন্সপেক্টর, আদালতে অভিযুক্তদের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে এজাহার দিয়েছিল, জেরায় সে বলে--- "একদিন সন্ধ্যায় আমি জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে গেলাম এবং দেখলাম সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবু, রায়সাহেব, আশু ডাক্তার, গৌরাঙ্গবাবু, সাব-রেজিস্ট্রার এবং আরো অনেক সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত আছে যে সে মেজকুমার কিনা। অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল তাকে। আশু ডাক্তারও এই প্রশ্ন করেছিল, "যদি তুমি মেজকুমার হও, তাহলে তুমি বলতে পারবে দার্জিলিঙে কে পাখীটিকে গুলি করেছিল।" এটা ঘটনা যে কেউ আশু ডাক্তারকে পরামর্শ দিয়েছিল কুমারের উত্তর দেওয়ার আগে সাবরেজিস্ট্রারের কাছে নামটি বলে দিতে। সেইমত সে নামটি সাবরেজিস্ট্রারের কাছে প্রকাশ করে, সন্ন্যাসী তারপর আশু ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং সম্ভবত হরি সিঙের নাম বলে পাখীটির হত্যাকারী হিসাবে। তখন গৌরাঙ্গবাবু বলে যে আশু ডাক্তার বীরেন্দ্র ব্যানার্জীর নাম প্রকাশ করেছে। পরে গৌরাঙ্গবাবুর কাছ থেকে জানা গেছে যে বাদীর উত্তরটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে সঠিক। গৌরাঙ্গবাবু বলেছিল যে বীরেন্দ্রবাবুকে ডাকা হয়েছিল এবং সে স্বীকার করে যে সাধুর উত্তর সঠিক ছিল।"

বাদী এখন মনে করতে পারে যে রাজবাড়ি চৌহদ্দির মধ্যে একটি 'মাঠ' ছিল। সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ির কথা বলেছে রাজবাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে ; রাজবাড়ির থেকে এর দূরত্বের বর্ণনা দিয়েছে সঠিকভাবে, যেখানে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অফিসাররা জড়ো হয়েছিল এবং আরো অনেকে ছিল, ভীড়ের মাঝখানে সন্ন্যাসীকে বসানো হয়েছিল এবং কেউ তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। কে জিজ্ঞাসা করেছিল সাক্ষীর তা মনে নেই, কিন্তু সে বলেছিল যে যদি সে ভাওয়ালের কুমার হয় তবে সে বলতে সক্ষম হবে দার্জিলিঙে কে পাখীটিকে গুলি করেছিল। সে মন্তব্য করেছে যে বর্তমানে খুঁটিনাটি সে ভুলে গিয়েছে, কিন্তু মানহানির মামলায় সে সব বলেছিল। তার মনে পড়ে রাজবাড়ির মধ্যে একটি মাঠে এটা ঘটেছিল, সে মন্তব্য করে পুরো জায়গাটিকেই বলা হয় রাজবাড়ি, যদি সে বলে থাকে জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়িতে এটা হয়েছিল এটাও সঠিক।

এটা পরিষ্কার যে সাক্ষী শুনেছে এই উপলক্ষে পাখীটিকে গুলি করবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিন্তু বলেনি যে প্রশ্নটি করেছিল আশু ডাক্তার, যে ব্যক্তি দার্জিলিঙ গিয়েছিল এবং ঐ দিন সকালে বেশি ১১টার হবে সে লিখেছিল যে মানুষটি (এক্সিঃ ৩৯৮)।

আরেকজন সাক্ষী এই দিনের ও পাখীটি গুলি করবার প্রশ্নের কথা বলেছে। তার নাম উমেদ আলী, ভাকুলীতে বাসস্থান এবং রিপোর্টে তার নাম বর্তমান। সে বাদীর সাক্ষী নং ২৬। সে বিবৃতিতে বিশেষ অতিরিক্ত কিছু বলেনি, কিন্তু মিঃ চৌধুরী জেরাতে বের করেছিল যে সাক্ষ্য ছিল আশু ডাক্তার এই প্রশ্ন করতে পরামর্শ দিয়েছিল কে পাখীটিকে

গুলি করেছিল তারপর কি হয়েছিল এটা মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেন. জিজ্ঞাসা করেনি অন্যান্য কী প্রশ্ন করা হয়েছিল।

এই দিন সাক্ষাৎকারে বাদীকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর (বা: সা: ৬০৬) প্রতি এইভাবে মামলা করা হয়েছিল।

(১) হিন্দীতে বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হলে বড় কুমারের নাম হিসাবে নিজের নাম বলে এবং বাবার নাম।

(২) অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে কোন উত্তর দিতে পারেনি; যখন আরো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ছিল। সে এবং তার পরিবারের লোকেরা বলেছিল; এখন সে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবে না, উচ্চ কর্তৃপক্ষের সামনে দেবে।

(৩) পরের দিন পুলিশ সাহেব, রায়সাহেব ও কয়েকজন সরকারী অফিসার এলে বাদীকে কিছু প্রশ্ন করে এবং বাদী কোন উত্তর দেয়নি তাদের তাদের বলা হয়েছিল যে সরকার দ্বারা আহূত কোন মিটিঙের সামনে ছাড়া বাদী কোন উত্তর দিতে প্রস্তুত নয়। এবং রায়সাহেবকে বাদীকে প্রশ্ন করবার জন্য মিলতে দিতে বলা হয়েছিল, সেই সঙ্গে মোহিনীবাবুও সেখানে থাকবে।

এগুলি ৬ই মের কথা, প্রমাণিত হয়নি, এবং রায়সাহেব সতর্কভাবে এই তারিখটি এড়িয়ে গেছে। সে ৫ তারিখের সঙ্গে লেগে ছিল এবং তার পরবর্তী সফর ছিল ৮ তারিখে। মোহিনীবাবুর দ্বারা দিনটি প্রদত্ত হয়েছে। ৫ তারিখে এগুলি সাজানো হয়নি। রিপোর্টে এগুলি ছিল না।

তারপর আশু ডাক্তার সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসে এবং এই সূত্রে যা কিছু বলে তা হচ্ছে . আমি বাদীকে একবার রেলস্টেশনে দেখেছিলাম, আরেকবার ১লা বৈশাখের চায়ের আসরে এবং আরো বিভিন্ন উপলক্ষে।" সে কখনো সাক্ষীকে গুলির প্রশ্ন করেনি। সে জেরায় স্বীকার করেছে যে ৫ই মের সাক্ষাৎকারে সে উপস্থিত ছিল। তার নাম রিপোর্টে ছিল।

মানহানির মামলায় সে দুবার এজাহার দিয়েছিল, একবার মিঃ এস পি ঘোষের সামনে এবং আরেকবার মিঃ বি এম ঘোষের সামনে। উভয় ক্ষেত্রেই সে বলেছিল সে বাদীকে মাত্র দুবার দেখেছিল, একবার জয়দেবপুর রেলস্টেশনে বাদীর আত্মপরিচয় ঘোষণার পূর্বে এবং আরেকবার জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে এবং এই সময়ে সহকারী ম্যানেজার ও যোগেন্দ্র ব্যানার্জী সেখানে ছিল। সে বলেছে এই সময়ে সন্ন্যাসী বলেনি সে হচ্ছে "মেজকুমার, রমেন্দ্রনারায়ণ রায়." সে কোন প্রশ্ন করেনি যেমন কে পাখীকে গুলি করেছিল; তার মনে পড়েনি কেন সে গৌরাঙ্গবাবুর কাছে ফিসফিস করে নাম করেছিল। সে প্রশ্ন করাকে ও সহকারী ম্যানেজার ও অন্যান্যদের উপস্থিতির কথা অস্বীকার করেছিল। সংক্ষেপে সে একই দিনের দুটি তথ্য প্রদান করে একবার বলেছিল - এই ৫ই মে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ি গিয়েছিল, এর পরিবর্তে আবার দরবারের বেশী যাওয়ার কথা বলে। সে সেই দিনের কথা চেপে রেখেছিল যেদিন সহকারী ম্যানেজার ও গৌরাঙ্গবাবু

সেখানে ছিল। এবং জিজ্ঞাসা করেছিল কেন সে অস্বীকার করেছিল যে বাদী নাম বলতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন সে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিল? একবার রেলস্টেশনে— কে বলেছে যে 'দেখেছিল'র দ্বারা সে অর্থ করেছিল 'কথা বলেছিল,' দুটি ঘটনা হচ্ছে সেই ঘটনা যখন সে বাদীর সাথে কথা বলেছিল এবং তাহলে দেখা যাচ্ছে সেবাদীর সাথে ৫ই মে কথা বলেছিল, সেই দিন যেদিন সহকারী ম্যানেজার ও গৌরাঙ্গ বাবু সেখানে ছিল, সে বলেছে 'দেখেছিল' দ্বারা সে 'কথা বলেছিল' বোঝায়নি। এটি এই প্রহসনের শুধু একটি ছোট্ট উদাহরণ যাতে মৃত্যুর প্রধান সূত্রগুলির উপর এই সাক্ষীর সাক্ষ্য তার প্রাক সাক্ষ্যের দ্বারা খর্ব করা হয়েছিল। সে তখন অবশ্যই চায়ের আসরের কথা বলেনি। অন্যদিকে সে বলেছিল সে রেলস্টেশনে বাদীকে দেখেছিল ১ লা বৈশাখ, যেদিন সে জয়দেবপুর ত্যাগ করেছিল।

মোহিনীবাবু, রায়সাহেব ও ফণিবাবু একটা গল্প বানিয়ে এসেছিল যেটা ঘটেছিল ৫ ই মে। বাদীকে তার নাম জিজ্ঞাসা করা হল এবং তার বাবার নাম, তার ভায়ের নাম, তার সব সে ঠিকঠাক উত্তর দিল, কিন্তু কখন রাজা মারা গেছে বা কোথায় রাণীমা মারা গেছেন তার সদুত্তর দিতে পারেনি। উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে সে ফোঁপাতে আরম্ভ করে। এই ফোঁপানির কথা রিপোর্টে ছিল না। এই তিনসাক্ষী অস্বীকার করে যে আশু ডাক্তার পাখী সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা করেছিল এবং প্রত্যেকে ১লা বৈশাখের চায়ের আসরকে সমর্থন করে এবং ফণিবাবু বাদীর প্রথম সফরের সময় জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে সংঘটিত একটি তথ্য অতিরিক্ত সংযোজন করে— যে জ্যোতিময়ীদেবী কাঁদেনি এবং সে ও সত্যভামাদেবী সন্ন্যাসীর পায়ে নত হয়— যে তথ্য রায়সাহেব তার থেকে শুনেছিল · তথ্যের পুরো বিষয়টিই চায়ের আসরের চেয়ে খুব বেশী সত্য নয় যেখানে বাদীকে অনুমোদন করতে বলা হয়েছিল যে সে একজন পাঞ্জাবী— এই বিষয়টি যা সাক্ষাৎকার বা মোহিনীবাবুর রিপোর্টে কেউ উল্লেখ করেনি, যদিও দেখা যাচ্ছে এটি একটি অভিযোগ। দেখা যায় যে পাখীকে-গুলি বিষয়ক প্রশ্ন এদিন বাদীকে করা হয়েছিল গৌরাঙ্গবাবু ও আবদুল হাকিমের মতে এবং বাদী উত্তর দিয়েছিল, তা সে সঠিক বা ভুলই হোক না কেন। বীরেন্দ্রবাবু অস্বীকার করেছিল যে তাকে এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। হরি সিং নামটা নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। হরি সিং নিশ্চিতভাবে দার্জিলিঙে গিয়েছিল যা বর্তমানে অনুমোদিত, যদিও তখন আশু ডাক্তার কর্তৃক অস্বীকৃত হয়েছিল। এরপর আসে ৮ ইমে মোহিনীবাবুর তথ্য। সে অবশ্যই ৬ বা ৭ তারিখে যায়নি। এস. সি এসেছিল ৬ই মে। ৮ই মে যেটুকু ঘটে তাহল যোগেন্দ্রবাবু যে তার সাথে ছিল, সে ভিতরে গেল সাধুর সাথে কথা বলতে, বাইরে বেরিয়ে এল, এবং বলল যে তাদের মধ্যে কিছু অনাবশ্যক কথাবার্তা হয়েছে, ঐ সূত্রে কিছু হয়নি। যোগেন্দ্রবাবু এটা সমর্থন করে ও বলে যে জনৈক মোহিনীবাবু যে একটি 'খাতায়' জনতার সই সংগ্রহ করছিল, বলে: "কুমার আপনাকে দেখতে চায়।" সে ভেতরে গেল, পূর্বদিকের ঘরে ঢুকল— সাগরের শোবার

ঘর। দেখল সাধু জ্যোতির্ময়ীদেবী ও বৃদ্ধর সাথে বসে আছে এবং সে (যোগেনবাবু) এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল যে কেন সে এতদিন বাড়িতে আসেনি, কেন সে লেখেনি যে দার্জিলিং থেকে সে কোথায় গিয়েছিল এবং সাধু তার দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কথা বলেছিল, অবশেষে বলেছিল, "পরে বলব" এবং যোগেনবাবু এটাও বলেছিল যে সাধু কখনো চিঠি লেখেনি।

এই দুজন সাক্ষী বলেছে যে তারা অন্য একদিন ঐ বাড়িতে গিয়েছিল অর্থাৎ ৯ই মে— যখন তারা দেখেছিল একজন মুসলমান বক্তৃতা দিচ্ছিল এবং একজন সুধনা নামে লোক রাণীদের, আশু ডাক্তার, সত্যবাবু, যোগেন্দ্রবাবুকে গালিগালাজ করে একটি কবিতাকে গানরূপে গাইছিল এবং "আমরা গান ও বক্তৃতার মাঝখানে চলে এলাম।" ফণিবাবুও এইদিনটি সম্বন্ধে এবং ৬ তারিখে তার দর্শন সম্বন্ধে বলেছে যে সে এই পরিবারকে অনুযোগ করেছে যে তারা কী করছে। সে মতামত দিয়েছিল যে এই পরিবারের পক্ষ থেকে রাণীদের লেখা উচিত ছিল। এবং ৮ই মে র সঙ্গে সম্পর্কিত এই সাক্ষ্যের সপক্ষে প্রতিবাদীপক্ষ বিলম্বের ব্যাখ্যা দর্শিয়ে একটি রিপোর্ট উপস্থাপিত করেছিল যা মোহিনীবাবুকে রচনা করতে বলা হয়েছিল, ৬ তারিখের রিপোর্টের মত। জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে-- এই দৃষ্টিভঙ্গীতে এটা অনুমোদনে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং তারপর এই মামলা অন্যদিকে মোড় নেয়। বাহ্যত সমসাময়িক একটি পরিকল্পিত রিপোর্টের সুচিন্তিত মতের দ্বারা কেউ প্রভাবিত হয়নি।

এই দুটি তারিখের সম্পাদিত কর্মের কিছুই অবশ্য বাদীর প্রতি আরোপিত হয়নি এবং এগুলি পূর্বে কৌসুলী বা তার মক্কেলের সামনে উদ্ধৃত হয়নি।

৬ই মের রিপোর্টে যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কোন সত্য তথ্য প্রদত্ত হয়নি। এটা ৬ ই মে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আচরণের ও পরবর্তী আদেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাজানো হয়েছিল। মতদ্বন্দ্বের শুরু হয় সম্ভবত ৬ই মে, যদিও মিঃ চৌধুরী মতামত দিয়েছিল তরা জুন, মতদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হিসাবে, সে যতদূর সম্ভব পিছনে নিয়ে যেতে পছন্দ করেছে বিবৃতিগুলিকে সেকসন তিনের অন্তর্ভুক্ত না করতে, কিন্তু ৫ই মের ঘটনা মনে হয় তখনকার নয়। এটা মেনে নেওয়া যায় মতদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২১ সালের ৫ই মে। কেউ ৪ তারিখে এর সূত্র নির্দেশ করতে পারে। -- পরিচয় ঘোষণার দিন- যে ধরনের মামলা এটা ছিল তার প্রতি দৃষ্টি রেখে, যাতে যারা মৃত বা নিখোঁজ এমন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে ৬ই মে যা মিঃ চৌধুরী, মিঃ কিউয়ার্রি ও রায়সাহেবের জন্য ফাঁকা রেখেছিল, কিন্তু মিঃ কিউয়ার্রি যা পূর্ণ করেনি, পূর্ণ হয়েছিল অন্য এক সাক্ষী মিঃ কিরণ ঘোষের দ্বারা যে ঢাকার কো-অপারেটিভ সংস্থার ইন্সপেক্টর ছিল ঐ সময়ে এবং তারপর সরকারী মুদ্রণ বিভাগের ম্যানেজার হয়। সে বলেছে সে বালীগঞ্জে কর্মরত ছিল। তখন কালেক্টর মিঃ লিন্ডসেও সেখানে উপস্থিত ছিল। সকাল ৯ টার সময় সে একটি বন্ধ চিঠি পায়, একজন পত্রবাহক

এটি দিয়ে যায়। মিঃ লিন্ডসে ডি এস. পি মিঃ চন্দকে নির্দেশ দেয় জয়দেবপুরে গিয়ে সাধুর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে। এবং সাক্ষী ও টমাসরঞ্জন তার সাথে জয়দেবপুরে আসে, যদিও সেখানে তাদের কোন কাজ ছিল না, বাদীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল, তার সাথে কথা বলেছিল এবং কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। বাদী তাদের কাছে কোন উত্তর দেয়নি। এই সাক্ষাৎকার বাদীর প্রতি আরোপিত ছিল না, জ্যোতির্ময়ীদেবীর প্রতিও নয়, কিন্তু এক ধরনের বিকল্প পদ্ধতি তার প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। এটি লন্ডনে মিঃ লিন্ডসের কাছে উপস্থিত করা হয়নি। এই বিষয় কোন রিপোর্টে সমর্থিত নয়। এই তথ্য জ্যোতির্ময়ীদেবীর নিজের মুখে কিছু শব্দ আরোপ করে। এবং ঘটনাচক্রে এটা স্থানচ্যুত হয়েছে যে চিঠিটি (এক্সি. ৫ নং) বালীগঞ্জে মিঃ লিন্ডসেকে প্রদান করা হয়। একজন ডি এস পি-র দ্বারা এটা পরীক্ষিত হয়েছিল, যে এই পরিবার সম্বন্ধে কিছুই জানতো না, যে এই রিপোর্ট জয়দেবপুরে সকাল ৯টায় লেখা হয়েছে. সহকারী ম্যানেজার মোহিনীবাবুর সাক্ষ্য অনুসারে তার অভিযোগে বর্ণিত যাত্রার সময়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মিঃ গুপ্ত এই সময় সম্বন্ধে কোন ভুল করেনি।

ইতিমধ্যে, ৪ঠা মে থেকে ৭ই জুনের মধ্যে যখন বাদী ঢাকার উদ্দেশে গমন করে, জনতার স্রোত, তাদের মধ্যে শতশত মানুষ বাদীকে প্রতিদিন দেখতে আসছিল। এদের মধ্যে বেশীরভাগই প্রজা, কিন্তু ঢাকা ও অন্যান্য স্থান থেকে অসংখ্য লোকজনও আসত। দর্শনার্থী ছাড়াও উভয়পক্ষের সাক্ষীরাও এসেছিল। এদের মধ্যে বেশিরভাগই তাকে দেখেছিল ৪ঠা মে থেকে ১৫ই মের মধ্যে। ১৫ই মে জয়দেবপুরে বিশাল জনসমাবেশ ঘটেছিল। মোক্তার গোবিন্দবাবুর পুত্র ও সাধুর অনুগতদের সংবাদ ও নোটিশের দ্বারা গোবিন্দবাবুর পরামর্শক্রমে এই সমাবেশ ডাকা হয়েছিল। এর বাহ্য উদ্দেশ্য ছিল বাদী সমবেতদের সামনে উপস্থিত হবে যাতে তারা তাকে দেখতে ও গ্রহণ করতে পারে (বা. সা: ২৮৮)। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে জনতার ভীড় বাদীকে দেখতে আসছিল-এর মধ্যে কোন গোলমাল নেই এবং পুলিশ রেজিস্টারে এই তথ্য ছিল —

১০-৫-২১-বেলা ৩ টে— গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়নি। যে সাধু জয়দেবপুর রাজবাড়িতে ঘোষণা করেছিল যে সে ভাওয়ালের মেজকুমার, এখনো সেখানে আছে। দূর-নিকট থেকে বহু-সংখ্যক মানুষ তাকে দেখতে আসছে। বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে সে রাজকুমার। এলাকায় কোন দুর্ঘটনার খবর নেই। ১ টাকায় ৬ সের চাল বিক্রি হচ্ছে।

১১-৫-২১ — আকাশ পরিষ্কার। এলাকায় কোন সংক্রামক রোগ বা দুর্ঘটনার খবর নেই। একজন সন্ন্যাসী জয়দেবপুরে এসেছে। অসংখ্য লোক বিভিন্ন জায়গা থেকে তাকে দেখতে যাওয়া আসা করছে। ১৫ আনা মানুষ তাদের মতামত প্রকাশ করছে যে সে হচ্ছে মেজকুমার, রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। জনস্বাস্থ্য ভাল নয়। 'আমন' ধানের সম্ভাবনা খারাপ নয়। মোটা চাল টাকায় ৬ সের করে বিক্রি হচ্ছে।

১৩-৫-২১ বেলা ২-৩০ — সংবাদ পাওয়া গেছে পরের রবিবার প্রজাদের সাধারণ কমিটির বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে সন্ন্যাসীকে কুমার বলে গ্রহণ করবার জন্য যে নিজেকে মেজকুমার বলে ঘোষণা করেছে। ব্যাপক সমাবেশের আশা করা যাচ্ছে।

এটা নির্দেশ করছে ৪ঠা মে থেকে ১৫ই মে কী ঘটেছিল। বাদী বুদ্ধবাবুর বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বা বাইরে 'উঠানে আমগাছের নিচে' বসেছিল, প্রায়ই তার চেয়ার একটি চৌকির উপর বসানো হত যাতে জনতার ভীড় তাকে ভালভাবে দেখতে পারে। একজন সাক্ষী বলেছে (বা: সা: ৮২) মানুষ তাকে দেখতে আসছে কেননা তারা না দেখে বিশ্বাস করতে পারছে না— একজন মৃত মানুষ জীবন ফিরে পেয়েছে। আরেকজন সাক্ষী বলেছে (বা: সা: ২৩) প্রত্যেকের মুখে 'কুমার ফিরে এসেছে'। একজন সাক্ষীর (বা: সা: ৫৯) বক্তব্যে ছবিটি চোখে ভেসে ওঠে—

''আমি তাকে দেখেছিলাম, একজন সন্ন্যাসী 'উঠানে' বসে আছে। ৫০০/৬০০ লোক সেখানে ছিল, সন্ন্যাসীর পোশাকে শুধু একজন মানুষই ছিল। সে কুমার নিজে। আমি তার গায়েরও বৈশিষ্ট্য দেখেছিলাম এবং তাকে চিনতে পেরেছিলাম।'' এক সাক্ষী বলেছে যে বাদী তাকে উদ্দেশ করে কিছু অনুসন্ধান করেছিল। ''যখন বাদী আমাকে উদ্দেশ করে এই প্রশ্নগুলি করছিল, দেখলাম সে একই ব্যক্তি, মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাব। আরেকজন বা: সা: ৫৫ ''আমরা তার সাথে কোন কথা বলিনি। মন খুলে আমরা কাঁদলাম। সেও কাঁদল, এবং চোখের জল তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল।'' এই আবেগ মিঃ নিডহ্যাম তার রিপোর্টে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে।

দিনের পর দিন এটা চলছিল এবং বাদীর সম্পূর্ণ ব্যবহার বিচার-বিবেচনার মধ্যে গ্রহণ করতে হলে যে এটা অস্বাভাবিক ব্যবহার ছিল কিনা - এই দৈহিক লক্ষণ, এক স্থানে বসা এবং লোককে দর্শন দেওয়া,এই কান্না, সাধারণ লোকের সাথের এই কথাবার্তা ইত্যাদি। কেন সে ঠাণ্ডা মাথায় মিঃ নিডহামের কাছে যায়নি এবং এস্টেটের অধিকার দাবী করেনি? মিঃ চৌধুরী এই প্রশ্ন বিবেচনা করতে বলেছিল। এই সমস্ত তথ্যের মধ্যে অনেক বিসদৃশ্য ও এই আচরণের মধ্যে বহুল অস্বাভাবিকত্ব দেখা দেবে যা এমনকি অবিশ্বাস্য। যদিও ২৫ দিন পরে বাদী কালেকটার মিঃ লিন্ডসের সাথে দেখা করল। বিচারক ২½ বছর ধরে মামলাটি শুনেছিল, তার সম্বন্ধে সাক্ষ্য থেকে জেনেছিল, সবলোকের চেয়ে হয়ত বেশী, তাকে মেপেছিল এবং এখন বলবে সে কি ধরনের মানুষ ছিল এবং তারপরে তার আচরণ সম্বন্ধে বিচার করবে যখন এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে কুমারের কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল, এবং বাদীর সাথে তুলনা করা হল, কোন সমর্থন তার পক্ষে দাঁড়াবে না। এখন এটা নয় শুধু বিবেচনা করতে হবে কুমার প্রকৃতপক্ষে কী রকম ছিল বরঞ্চ ১২ বছর নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর সে কী রকম হয়েছিল।

১৫ তারিখ পর্যন্ত মানুষের ভীড় তাকে দেখতে আসছিল এবং তারপরে ৭ই জুন জয়দেবপুর ত্যাগ করা না পর্যন্ত; কিন্তু ১৫ ই জুন মিটিং হল। ঐ দিনে সত্যবাবু ও

রায়বাহাদুর দার্জিলিঙে ছিল মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এবং আশু ডাক্তার কলকাতায়। সে ৫ই মের ৪/৫ দিন পর চলে গিয়েছিল এবং সত্যবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। আশুবাবুর কম্পাউন্ডারের সাক্ষরিত চিঠিগুলি, যে ইংরেজী জানত না, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল, যা আশুবাবু স্বীকার করেছে। বাদীর সপক্ষেও প্রচার আরম্ভ হল, কিন্তু সংবাদপত্রে চিঠি লেখালেখি ছাড়াও, বই ও অবাঁধাই পুস্তিকার মাধ্যমেও প্রচার আরম্ভ হল। প্রতিবাদীপক্ষ মতামত দেয়, জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ ১৫ ই মের। মিঃ নিডহ্যামের রিপোর্ট নির্দেশ দেয় যে, এটা আরম্ভ হয় ৩০ শে এপ্রিল জয়দেবপুরে বাদীর ২য় সফরের শুরু থেকে। ১৫ই মের পরে গদ্যপদ্যের অনেক বই দেখা গিয়েছিল, প্রতিবাদীপক্ষের চেয়ে বাদীর পক্ষে বেশী। কিন্তু মিটিংয়ের পর এই প্রচার তো আরো একটু বেশী আলোচনা করা উচিত।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে মিটিং রাজবাড়ির সামনে সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল। বড়িশবার তালুকদার আদিনাথ চক্রবর্তী মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেছিল। সব জায়াগা থেকে মানুষ এসেছিল; বিশেষ ট্রেন চলেছিল। পুলিশ রেজিস্টারের মতে দশহাজারের মত লোক এসেছিল, প্রতিবাদীপক্ষ জেরার দ্বারা প্রকাশ করেছিল যে রাজবাড়ি বিশেষভাবে প্রহরারত ছিল। একজন সাক্ষী বলেছিল, একটাকা সের চিড়ে বিক্রী হচ্ছিল এবং প্রতিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী, কমিশনে পরীক্ষিত, এই মিটিঙের কথাও এর আকৃতি অনুমোদন করেছিল। এটা উল্লেখ করা অতিপ্রয়োজনীয় যে অসংখ্য সাক্ষী এতে যোগদান করেছিল ও এর সম্বন্ধে বলেছিল এবং সাক্ষ্য দিয়েছিল যে বাদী ও বৃদ্ধ এখানে একটি হাতীতে চড়ে এসেছিল এবং চাতালের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছিল, তখন লোকে তার জয়ধ্বনি দিচ্ছিল এবং তাকে কুমার বলে আহ্বান করছিল, বৃষ্টি এল ও মিটিং ভেঙে গেল। বাদীপক্ষের সাক্ষী, ঢাকার সার্বডিভিশনাল অফিসার মিঃ হরেন্দ্র ঘোষ অকুস্থলে কতর্ব্যরত ছিল, মিটিঙের সাথে নয় বরঞ্চ এই মামলার সাথে সম্পর্কিতভাবে সে হলফ করে বলেছিল বাদী মিটিঙে ৪ টে নাগাদ এসেছিল এবং আর যা যা অন্য সাক্ষীরা বলেছিল। বিচারকের পক্ষে এটা বোঝা কষ্টসাধ্য ছিল কেন প্রতিবাদীপক্ষ মিটিংকে আক্রমণ করছিল। প্রতিবাদীপক্ষের ৪০৭ জন সাক্ষী বলেছিল বাদী আদৌ মিটিঙে আসেনি। এস্টেটের একজন ভৃত্যসাক্ষী প্রতিবাদীপক্ষের জগদীশ সহ প্রচুর সাক্ষীর সাক্ষ্যকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি এবং অনেক ভদ্রলোক সহ যে বাদীকে মিটিঙে আসতে দেখেছিল কারণ সে চারদিক ঘুরেছিল। প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা শুধু জমায়েতের শেষপ্রান্ত দেখেছিল। (প্রতিঃ সাঃ ১৯,৪০,৪৮,৮৪,১০০,১০৮,২২০,৩৫০,৩৭৪,৩৭৯) এবং একজন 'চাতানের' উপর একটিও মূর্তি দেখতে পায়নি যদিও সে ১২টার পর এখান দিয়ে গিয়েছিল যখন সাক্ষ্য অনুসারে অবশ্য এটি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

ভীড়ের দ্বারা জয়ধ্বনি বাদীর পরিচিতিকে প্রমাণ করে না। এই মজার মামলার একদম শেষে বলা হয়েছিল যে বাদী ঢাকা বা কলকাতার কিছু ব্যক্তি দ্বারা সাজানো। এটা

সম্পূর্ণ রূপে বাতিল হয়েছে ঘটনার দ্বারা। এটা ধারণা করা উপযুক্ত হবে যে বাদী, একজন পুরাদস্তুর বিসদৃশ্য মানুষ, কিছু লোকের দ্বারা সাজানো ষড়যন্ত্রের ফল, যে প্রজারাও তাকে আদৌ চেনে না! এটা পরে দেখা যাবে যে তারা তাকে বড় অঙ্কের 'নজর' ও খাজনা প্রদান করেছিল। এটা সম্ভবত আশংকা করা হয়েছিল কারণ নায়েবদের প্রতি আদেশ জারী করা হয়েছিল (Ex.353(1) এটা দেখতে যে কোন প্রজা বা অন্য কেউ তার হয়ে সাক্ষ্য না দেয় এবং বিচারক অবাক হয়নি যে প্রতিবাদীপক্ষ আদালতকে সাক্ষ্যের জোয়ার থামাতে আদেশ দেওয়ার জন্য বলা শুরু করেছিল। সংকীর্ণ ষড়যন্ত্রের মামলা ভেস্তে যাচ্ছিল এবং এটা বলা উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য হচ্ছিল যে কতিপয় সাক্ষী কী বলতে পারে যে তারা দেখছে যে বাদী স্বতন্ত্র কিন্তু বলছে একই মানুষ।

মিটিঙের দিনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে ঢাকার বিখ্যাত উকীলবাবু আনন্দবদ্রি রায়, যে রাজপরিবারকে জানত ঘনিষ্ঠভাবে—কুমারেরা তাকে কাকা বলে ডাকত-- এসেছিল এবং বাদীর সাথে ঘণ্টাখানেক কথা বলে ছিল এবং বেরিয়ে গেছিল এবং সকালে বাড়িতে জমায়েত ভদ্রলোকদের কিছু বলেছিল। সে বলেছিল সন্ন্যাসীই মেজকুমার, তবে ইতিমধ্যে সন্দেহ শুরু হয়ে গিয়েছিল, কোন সাক্ষ্য নেই, এমনকি বিচারের দিনে বাবু আনন্দ রায় বয়সোচিত কারণে তার সাক্ষ্যদানের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিল। যাই হোক এটা স্বীকার্য যে সে বাদীর একজন গোঁড়া সমর্থক হয়ে উঠেছিল এবং মিঃ লিন্ডসে তার একটি চিঠিতে এই ঘটনা (Ex 435) উল্লেখ করেছে এবং প্রতিবাদী এর একটি সূত্র তৈরী করেছিল যখন বাদীর গুরুর সফরের সাথে সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট সূত্র আলোচনা করছিল।

মিঃ আনন্দ রায়ের সম্পূর্ণ তথ্য এই সূত্রের প্রতি গমনরত সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে (বা: সা: ৯৯৭, ৯৮৫, ৮৫২, ৮০৬, ৯০৯, ৯৫৯, ৯৬১, ৯৬৭, ৬৩) এবং বিচারক এই বিষয়ে তাদের সাক্ষ গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে প্রাক্তন পৌরসভা— কমিশনার ও ঢাকার একজন সম্মানিত নাগরিক মিঃ সতীশচন্দ্র দের সাক্ষ্য উল্লেখ করা যেতে পারে বিশেষভাবে।

আরেকটি বিষয় ঐ দিনটির সাথে জড়িত, তা হচ্ছে ব্রজবাবু, রাজার কনিষ্ঠ কন্যার স্বামী, ঐ দিন বাদীকে দেখতে এসেছিল। সে এর আগে আসেনি, তার স্ত্রীও নয়, যদি তাদের পূর্বে অবগত করা হয়েছিল (P.938) কিন্তু বিষয়টি অবগত করার নয়। তার স্ত্রী বাদীকে মিটিঙের প্রায় ৩দিন পরে দেখতে এসেছিল। কোন পক্ষের দ্বারা তারা পরীক্ষিত হয়নি বা সাক্ষ্য দিতে পারেনি। কারণটি নীচে দেখা যাবে।

১৫ তারিখে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩ তারিখের পূর্বে স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের দাবী ছিল যে, বাদীকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে কিনা। এই মতামত ১৩-৫ ২১ তারিখের .(Ex.357)। এই মতামত দেওয়ার পর অনেক ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু তার জয়দেবপুর যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার পেছনে কোন অভিযোগ ওঠেনি। ১০ই মে মিঃ লিন্ডসে বাদীর

বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করল। রায়বাহাদুর, G.P., কলকাতায় গেল, সত্যবাবুর সাথে সাক্ষাৎ করল এবং উভয়ে ব্যারিস্টার সহ দার্জিলিং গেল মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রমাণ যোগড় করতে। ১৫ তারিখে তারা দার্জিলিং ছিল। ১৬ তারিখে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ রাণীকে বিধি লিখলেন, ঠাকুমাকে ১৯১৭ সালে তার অনুসন্ধানের উল্লেখ করে এবং তাকে সতর্ক করলেন, "সাধুর গুণে যেন না ভোলেন," বরঞ্চ নিজের বিচার বিবেচনা গঠন করতে বললেন। দেখা যাচ্ছে সে হচ্ছে পরিবারের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সদস্যা এবং সে কী বলবে সকলের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে (Ex.266)। সনাক্তকরণ বিষয়ে এই চিঠি কোন সাক্ষ্য নয় এবং কোন সাক্ষ্য নেই যে মহারাজা ও জি. পি যারা দার্জিলিঙে ছিল, সাক্ষাৎ করেছিল কিনা।

সত্যভামামর প্রতি এই সতর্কবার্তা সাধুর প্রতি তার স্বীকৃতির ফল ছিল। বাদী জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়িতে অবস্থান করছিল। জনস্রোত অব্যাহত ছিল। বিচারক বিশ্বাস করেনি এস্টেটের কোন নীচু অফিসার ৫ই মের পরে তার কাছে গিয়েছিল যেহেতু ৬ই মে সাধুর প্রতি কোর্ট অব ওয়ার্ডের মনোভাব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, রায়সাহেবের মতে। তাদের কেউ ১৫ই মের মিটিঙে যায়নি, এবং একজন অফিসারের বাবা যে টাঙ্গি থেকে এসেছিল মিটিঙে যোগদান করার জন্য, সেখানে যাওয়ার পূর্বে তার ছেলের বাসায় গিয়েছিল এবং আর বাইরে বেরোয়নি (প্র: সা: ২৮৩)। একজন অফিসার সম্ভবত এটা দেখতে বাইরে বেরিয়েছিল এবং ফলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল ১৫-৬-২১ তারিখে (এক্সি ২০৪)। ২৮ মে কালেকটারের কাছ থেকে একটি সৌজন্যমূলক আদেশ এল যে রেভিনিউ বোর্ড সাধুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এবং যতক্ষণ না স্থির হয় সে মেজকুমার, অফিসাররা বিশ্বাস করবে না যে সে মেজকুমার।

ইতিমধ্যে বাদী অবস্থান করছিল, এবং ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজাসমিতির দ্বারা আহূত একটি সমিতি গড়ে উঠল কুমারকে তার ন্যায্য অধিকার আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে (বা. সা: ২২৪)। একটি বৃহৎ ও সুপরিচিত ভাওয়ালের তালুকদারবাবু দিগেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এর সভাপতি হলো এবং সে ছিল বাদীর দৃঢ় সমর্থক। তার জন্য মেজকুমার একটি দলিল সম্পাদন করেছিল (এক্সি.৭) ১২-৪-০৯ তারিখে এটা দার্জিলিঙে যাওয়ার পূর্বে কুমারের শেষ ব্যবসায়িক আদানপ্রদান সমিতির দৈনন্দিন দপ্তর চালু হয়েছিল, ৪ ঠা জুন (এক্সি ২১) এর প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হল এবং লোকজন নিয়োগ করা হল চাঁদা ওঠাতে, প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হল। জয়দেবপুরে এক মিটিং সম্পন্ন হল ১৯২২ সালের নভেম্বরে খোলাখুলি, এর পরে ঢাকার অফিসে এবং এই কার্যক্রম নেওয়া হয় যাতে বাদী খাজনা গ্রহন শুরু করে (বা: সা: ২২৮)। বাদীর খাজনা আদায় প্রশ্নটি বিতর্কিত, কিন্তু বাদবাকী ঘটনা প্রশ্নাতীত এবং এটা দিগেন্দ্রবাবুর ও প্রাক্তন সদস্য জগদীশবাবুর সাক্ষ্যে দেখা যাবে, কিন্তু প্রতিপক্ষের দ্বারা কমিশনে পরীক্ষিত হয়েছিল।

মিটিঙের ৩/৪ দিন পর ছোটবোন তারামযীদেবী ঢাকা থেকে এল। সে ঢাকায় তার

স্বামী, উকীল ব্রজলালবাবুর সঙ্গে বাস করছিল। সে বাদীকে দেখে তার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। সে মাটিতে উপুড় হয়ে তার মাথা বাদীর উপরে রেখেছিল। যে ভাবে ছোট বোনেরা রাখে ও জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কী করে এতদিন বাইরে থাকতে পারলে?" মিঃ লিন্ডসে তারাময়ীর পরবর্তী আচরণ সম্পর্কে নিজের সাক্ষ্যে এর সত্যতা স্বীকার করেছিল। তথাপি তারাময়ী কোন কারণে সাক্ষ্য দেয়নি। সে জ্যোতির্ময়ীদেবী ও গোবিন্দবাবুর সাথে কালেকটারের কাছে একটি দরখাস্ত পেশ করেছিল ২৩ শে মের পূর্বে যে বাদীর পরিচিতির বিষয়ে একটা অনুসন্ধান হওয়া উচিত। মিঃ লিন্ডসে এটা স্বীকার করে। সত্যবাবুও এর কথা শুনেছিল। কালেকটার এই দরখাস্ত উপস্থাপিত করে। সাধু সম্পর্কিত সমস্ত কাগজপত্রের জন্য একটি ফাইল প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং এর দায়িত্বে ছিল ডেপুটি কালেকটর। মিঃ আর সি দত্তও এটা স্বীকার করেছে (বা: সা: ৪৩৫)। যদিও দার্জিলিঙে মৃত্যুর বিষয়ে প্রমাণ করতে অসংখ্য সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হচ্ছিল, বোনেদের বা বাদীকে এর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে ঢাকা জয়দেবপুরের কাউকে আদৌ পরীক্ষা করা হয়নি সনাক্তকরণের প্রশ্নে। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের প্রতি কোন দোষারোপ করা হয়নি কী অনুসন্ধান তারা বা সত্যবাবু করতে চেয়েছে। তারা বাদীকে আদালতে যেতে বলেছিল, পরে যেটা বলেছিল। কিন্তু মিথ্যা আশা জাগিয়েছিল। এটা ধারণা করা উচিত হবে যে অনুসন্ধান খাতায়-কলমে কালকেটারের দ্বারা ও প্রকৃতপক্ষে সত্যবাবুর ও জি পি-র দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যারা স্বীকৃতভাবে মেজরাণীর স্বার্থ দেখছিল, যেটা পরে আলোচনাকালে দেখা যাবে।

দরখাস্তের কোন উত্তরের পরিবর্তে আদেশ এল যে বোর্ড নির্ধারণ করতে যাচ্ছে বাদী কী মেজকুমার? বা নয়? এটা ২৮ শে মের ঘটনা। মিঃ লিন্ডসে ১০ তারিখের পূর্বে তার মনকে তৈরি করে নিলো। সে দেখেছিল ১৯০৯ সালের ৯ই মে দার্জিলিঙে কোন বৃষ্টিপাত হয়নি। মনে করা হয়েছিল শ্মশানে এই বৃষ্টিপাতের ঘটনা একটা গল্প এবং প্রভাবিত করেছিল যে মানুষটি একজন প্রতারক। সে তার বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হিসাবে বৃষ্টির রিপোর্টের উপর নির্ভর করে। কেউ তার সাক্ষ্যের প্রতি নজর দিয়ে মনে করবে কর্নেল কালভার্টের রিপোর্টে তার দরকার ছিল যেটা সে নিজেও দেখেছিল। সত্যবাবু এটা কলকাতা থেকে পাঠায় এবং মিঃ লেথব্রিজের হাতে তুলে দেয়।

যে সব লোক তাদের ব্যাপারে কিছু জানত, তাদের বিবৃতি গ্রহণ ছিল সত্যবাবু ও জি পি-র মতলব, ঐ সব আঞ্চলিক লোকের সমর্থনে সন্দেহহীনতা প্রতিপাদন করা। মিঃ লিন্ডসে এই বিবৃতিগুলি গ্রহণ করে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয় ২৫ শে মে, ১৯২১ সালে (এক্সি ৯৩৬)। তার মন প্রভাবিত হয় ঐ দিন যে বাদী, একজন প্রতারক। তার নিজের সাক্ষ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

যখন মিঃ লিন্ডসে পাঞ্জাবে একজন পুলিশ পাঠিয়ে সন্ন্যাসীর পূর্বসূরীদের খোঁজ করতে মনস্থ করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে পুলিশ অফিসার ৩১ মে কোর্ট অব্

ওয়ার্ডসের একজন অফিসারসহ ঢাকা ত্যাগ করে। তাহলে বলতে হয় কখন সে জানল, কার কাছ থেকে যে বাদী একজন পাঞ্জাবী? সে জয়দেবপুর ত্যাগ করেছিল ২৭ শে মে ব্রজবাবু কর্তৃক জ্যোতির্ময়ীকে লিখিত "কুমার' সহ তাকে ঢাকায় আসতে বলে'। ২৯ শে মে দুজন উকীল ও একজন আঞ্চলিক জমিদারের সামনে বাদী নিজে মিঃ লিন্ডসের সামনে উপস্থিত হয়। মিঃ লিন্ডসে এভাবে সাক্ষাৎকারটি নথিবদ্ধ করে— (এক্সি ৩৫৮)।

"আজ বেলা ১১ টা নাগাদ সাধুবাবু, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু পিয়ারীলাল ঘোষ, মনে হয় কাশিমপুরের ম্যানেজারের সঙ্গে এসেছিল। সে বলেছিল তার এস্টেটের বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করতে চায় যাতে প্রজারা উপকৃত হতে পারে। আমি বোঝালাম রেভিনিউ বোর্ড অবশ্যই তাকে মেজকুমার হিসাবে গ্রহণ করবে না কারণ তারা অনেক বছর ধরে এই ধারণার ভিত্তিতে এস্টেটের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম সে আদালতে কোন মামলায় নিজের পরিচিতি পেশ করতে পারে বা সে আমার সামনে তার সাক্ষ্য পেশ করতে পারে যদি সে পছন্দ করে। আমি এটা রেকর্ড করতে ইচ্ছা করছি। সে পরের পদ্ধতিতে রাজি হল এবং তার উকীলরা বলল তারা কালকে এমন এক অনুসন্ধানের জন্য একটি দরখাস্ত ফাইল করবে। তারা জিজ্ঞাসা করল যে রেভিনিউ বোর্ড ব্যয় বহন করতে পারে কিনা এবং আমি উত্তর দিলাম যে যদি তারা এ বিষয়ে দরখাস্ত করে, আমি ব্যবস্থা করে দেব।"

"(মেজকুমার) আমার প্রশ্নের উত্তরে শুধু আমাকে বলল যে সে দার্জিলিঙে চেতনা হারাবার পূর্বে ২/৪ দিন নিউমোনিয়াতে অসুস্থ ছিল। সে দার্জিলিঙে কোথায় বাস করত, সেই বাড়ির নাম মনে করতে পারল না। সে জয়দেবপুর থেকে দার্জিলিঙে গিয়েছিল, তখন সে অসুস্থ ছিল না, শুধু ডানহাঁটুর ঠিক উপরে একটা ফোস্কা ছাড়া। যেটা তার যাত্রার ১০ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়েছিল। এই ফোস্কার একটা বিশেষ কারণ ছিল, সে মনে করতে পারে না কখন সে কলকাতায় ছিল। তার চেতনা ফিরে পাবার পূর্বে পাহাড়ে এক সাধুর দেখা পায় যে তখন থেকে তার গুরু, এই সাধু বলেছিল সে ৩/৪ দিন সংজ্ঞাহীন হয়ে ছিল, সেই সাধু বলেছিল সে তাকে মাটির উপর শায়িত দেখতে পেয়েছিল যেন তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তার দেহ বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল যেহেতু তার দেখার পূর্বে সেখানে বৃষ্টি হয়েছিল, সাধু বলেনি যে সে দিনে বা রাতে কখন তাকে দেখেছিল।"

সাক্ষর. জে এইচ লিন্ডসে

২৯-৫-২১

"সাধু রাজী হয়েছিল যে খাজনা চিরাচরিতভাবে এস্টেটে অফিসার দ্বারা সংগৃহীত হওয়া উচিত। উকীলরা পরামর্শ দিয়েছিল যে প্রজাদের খাজনা দিতে কম আসাও হবে যদি যদি বিভাবতীদেবীর নামে রসিদ দেওয়া হয়।"

সাক্ষর ঐ

তার নথির ধারে সে লিখছে--

''সাধুকে দেখা যাচ্ছিল ভিন্নদেশীয়, চমৎকার পরিষ্কার ত্বক সহ উপদংশের কোন চিহ্ন নেই। লালের চেয়ে তাব চুল বরঞ্চ সোনালী, আতি কুল্লাহর মত।''

সাক্ষর ঐ

বিচারক এই তথ্যের সঙ্গে বাদীর অন্যান্য স্বীকৃতির আলোচনা করার প্রস্তাব করেছে। কিন্তু এটা এখন বলা যথেষ্ট যে মিঃ লিন্ডসের এ বিষয়ে স্বাধীন স্মৃতি নেই, শুধু হিন্দীতে আলোচনার ব্যাপার ছাড়া। যে তিনজন ব্যক্তি বাদীর সাথে এসেছিল, তারা সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিল না। বাদী. তার গুরু ধর্মদাস নাগার নাম উল্লেখ করেছিল, তার বাহুতে উল্কি করা ছিল গুরুর নাম। বাদীর সুন্দর সোনালী চুল ছিল এবং সুন্দর ত্বক। এটা দেখতে হবে মিঃ লিন্ডসে কতদূর তাকে বুঝতে পেরেছিল এবং মনে করে রেখেছিল যা সে বলেছিল। দেখা যাচ্ছে যে মিঃ লিন্ডসে নিশ্চিত নয় যে সে সাক্ষাৎকারের সময় তথ্য নথিবদ্ধ করেছিল কিনা। যদিও এটা ঐ দিনে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যাই হোক, দুটি বিষয় পরিষ্কার। বাদী পাঞ্জাবী বলছিল না বা অতুলবাবুর মতে অদ্ভুত-- বোকাবোকা— হিন্দী যেটা প্রতিবাদীদের বক্তব্য ছিল। মোদ্দাকথা, তাকে একটি পুতুলের মত বর্ণনা করা হয়েছে, যেন পেছনে ছিল কিছু সাহসী লোকের সমর্থন।

২৯ শে মে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। নীচের বাংলা নোটিশে তার অভিব্যক্তি দেখা যায়—

২৯ শে মে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। নীচের বাংলা নোটিশে তার অভিব্যক্তি দেখা যায়—

নোটিশটি এখানে প্রদত্ত হয়েছে যে বোর্ড উপসংহারমূলক প্রমাণ পেয়েছে যে মেজকুমারের মৃতদেহ ১২ বছর আগে দার্জিলিঙে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেজন্য যে সাধু নিজেকে মেজকুমার বলছে সে একজন প্রতারক। কেউ তাকে 'খাজনা' বা 'চাঁদা' দেবে তার নিজের ঝুঁকিতে।

বোর্ড অব্ রেভিনিউয়ের অনুমতিক্রমে

লিন্ডসে

কালেকটার, ঢাকা

৩-৬-২২

এই নোটিশকে উল্লেখ করা হয়েছে ৩ রা জুনের প্রতারকের প্রতি নোটিশ হিসাবে। ৭ই জুন বাদী জয়দেবপুর ত্যাগ করেছিল। তারিখটি বিতর্কিত নয় এবং এটা জানা যায় ৮ই জুনের সত্যভামাদেবীর একটি চিঠিতে (এক্সি ৫৪)। চিঠিটি এইরূপ—

''.... তুমি আমার হারানো সম্পদ।তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি পাগলিনীর মত বেঁচে আছি। আমাকে জানাও তুমি কখন বাড়ি আসছ।''

মহিলা অশিক্ষিত , শুধু নাম সই করতে পারে। চিঠিতে তার সই নিয়ে কোন প্রশ্ন

নেই এবং চিঠির বিবৃতি সাক্ষ্য নয় যদিও সে মৃত, কিন্তু আচরণ নিশ্চিতভাবে এই এবং একে একে এটা দেখা যাবে। প্রতিবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে ১৯২২ সালে মৃত এই মহিলা ছিল বৃদ্ধ ও অন্ধ, বা অন্ধের মতন। পরে এ প্রসঙ্গে আসা যাবে যে সে অন্ধ কিনা বা কতদূর। ধরে নেওয়া হচ্ছে বাদী তার নাতি, কিন্তু বক্তব্যে মনে হবে সে একটা ভুলের মধ্যে পাতিত হয়েছিল।

এটা স্বীকৃত যে বাদীকে, ৭ই জুন তার ঢাকায় আগমন থেকে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি।

সে স্থায়ী বাসা বেঁধেছিল ৪, আর্মেনিটোলা, ঢাকাতে, ভাড়া বাড়িতে, আর্মেনিয়ান গীর্জার পরে, জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ির একজন সদস্য হিসাবে। এখানেও জয়দেবপুরের মতো অসংখ্য দর্শনার্থী তাকে দেখতে আসত এবং এর বাইরে প্রচুর সংখ্যক সাক্ষী, অন্যপক্ষের সাক্ষীসহ, তাকে দেখতে এসেছে। সে বাইরের ঘরে বসত এবং দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলত, যদিও প্রশ্ন উঠেছে সে বাংলায় বা হিন্দীতে কথা বলেছে কিনা। বাদীব বক্তব্য হচ্ছে যে সে ৪ ঠা মে আত্মপরিচয় থেকে বাংলাতে কথা বলছিল, যদিও সে হিন্দীর প্রভাব একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি। প্রতিপক্ষ অনুসারে সে বাংলা লিখতে বা বলতে পারে না তাকেই, ১৯২১ সাল এমনকি ১৯২৪ সালেও সে পারত না, যদিও ১৯২৪ সালে বিচারের সময় থেকে কেউ কোন কিছু অস্বাভাবিকতা দেখেনি। এ বিষয়ে পরে আসা যাবে।

সঠিক কোন সময়ে বলা অসম্ভব, কিন্তু মের শেষাংশে তা বাঁধাই গদ্য বা পদ্যের আবির্ভাব হতে শুরু করে বাদীর বিষয়ে এবং সাধারণত কেউ যতদূর নমুনাগুলি থেকে সম্ভব প্রচলিত বাদীর সপক্ষে বিচার করতে পারে (বা· সা: ৩৩, ৯, ২২০, ৩২৬ ৯১) হকাররা এগুলি সর্বত্র বিক্রি করছিল। একজন সাক্ষী গান (বা· সা: ৩০) রচনা করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান গাইত, আরেক জন এগুলি তার কবিগানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। চাঁদা তুলতে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দেওয়া হত (পি ৬৩৩, ২২১)। বাদীর বিরুদ্ধেও ছড়া বা পদ্য ছিল "ভাওয়ালে ভূতের কাণ্ড" যদিও একটি পক্ষের কিছুই ছিল না যা গাওয়া যেতে পারে।

বাদী প্রতারক বলে ঘোষিত হয়েছিল ৩রা জুন। বাদী ৭ই জুন জয়দেবপুর ত্যাগ করেছিল। ১০ই জুন একটি নোটিশ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছিল মির্জাপুরের একটি রায়টকে নিয়ে এবং ঝুমুর আর্দালি পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল (বা: সা: ৩)। ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্মচারীদের সতর্ক করা হল, ১ই জুন যদি তারা প্রত্যক্ষ করে তারা অপসারণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে (এক্সি ২০৭)। প্রজারা বাহ্যত বাদীর নামহীন খাজনা রসিদে খাজনা দিতে প্রত্যাখ্যান করছিল (এক্সি. ৩৪৩)। প্রতিবাদী পক্ষের একজন সায়েবকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সে বলেছিল যদি সে অনুমোদন করে বাদীই কুমার তবে সে 'অবশ্যই' তার পদ হারাবে (প্র: সা. ৩০৯)। নায়েবদের প্রতি আদেশ জারী

করা হয়েছিল যে এস্টেটের কোন প্রজা বা কোন সাক্ষী বাদীর হয়ে যাতে সাক্ষ্য দিতে না পারে। একজন নায়েবকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল কেন তাকে অপসারণ করা উচিত হবে না এবং প্রমাণিত হয়েছিল সে সাধুকে সমর্থন করছিল [এক্সি ৩৫৩, ৩৫৩(১)] । কেউ নিজের নিয়মে চাকর রাখতে পারে, কিন্তু যদি সে সাক্ষ্য দিতে আসে, আদালত নিশ্চয় নিয়ম কানুন দেখবে।

বাদী ১৯২১ সালের ৭ই জুন থেকে ঢাকায় অবস্থান করছিল ১৯২৪ সালের জুলাই আগস্ট পর্যন্ত। জ্যোতির্ময়ী, সাগরবাবু, মনমোহন রায়-সহ সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে এটা উঠে আসে এবং এটা বিতর্কিত নয়। এই দিনে সে কলকাতায় যাত্রা করে।

এর পূর্বে ঢাকার কতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেক সম্মানিত ব্যক্তি বাদীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত। যেমন মিঃ কে সি চন্দর, আই সি এস এছাড়া হেমবাবু— ধানকোরার জমিদার, বাবু আশুতোষ ব্যানার্জি (বা: সা: ৯৫১)— ঢাকার একজন অত্যন্ত ধনী জমিদার ইত্যাদি লোককে বাদী আমন্ত্রণ করত যারা তার পরিবারকে জানত। বাদী অনুষ্ঠানে যোগদান করছিল। যেমন, সে মিঃ পাকড়াশীর গৃহে ফণিবাবুর ছেলের উপনয়নে যোগদান করেছিল। কিন্তু ফণিবাবু ও মিঃ পাকড়াশীর পরিবারের কেউ সাক্ষ্য দিতে আসেনি। সে নিজে ঢাকার রাস্তায় টমটম চালাত ১৯০৯ সালে মেজকুমারের মত (বা: সা: ৭২৬, ৬৬৬, ৭৩৯, ৪৫০, ৪৭২, ৬০২, ৭৮৯, ৮৩৩, ৯১৫, ৯০১, ৭৯২, ৮০৬, ৯৬১, ৯৭৭, ১০০২, ৯৭০, ৯৭৬, ৯১৮, ১০০৯, ১০১৫, ৯১৯)। কেউ এটা অস্বীকার করতে আসেনি। মিঃ মেয়ের প্রতিবাদীপক্ষের মিঃ সর্বমোহন চক্রবর্তীও এটা দেখেছিল। সাক্ষ্য অনুসারে বাদীর টমটম চালানোর ক্ষমতা ছিল।

ঢাকায় আসার পরও বাদীর দাড়ি-লম্বাচুল ছিল। সে তার গুরু ধর্মদাস নাগার নাম হাতে উল্কি করে রেখেছিল। বাদীর মতে ঐ গুরু চারজন সন্ন্যাসীর একজন যে দার্জিলিঙের শ্মশান থেকে তাকে উদ্ধার করেছিল। সে এই উল্কি দেখিয়েছিল মিঃ লিন্ডসেকে ১৯২৫ সালের মে মাসে। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর সমর্থক দল ঘোষণা করল বাদীর গুরু ধর্মদাস এখানে আসবে (এক্সি. ২১২)। জ্যোতির্ময়ী তাকে দেখার ও ঢাকায় আনবার আয়োজন করল। সাগরবাবু, অতুলবাবু, একজন সাধু, মহাবীর গুরুকে ঢাকায় আনল ১৯২১ সালের ভাদ্রের এক দিনে। মিঃ লিন্ডসের বিধি অনুসারী পরের দিনটি ছিল ২৬ শে আগস্ট, ১৯২১। 'গুরু' ৩১শে চলে গিয়েছিল।

গুরুর আগমন একটি স্বীকৃত ঘটনা। বাদী বলেছে সে পুলিশের ভয়ে চলে গিয়েছিল। প্রতিবাদীদের বক্তব্য ছিল সে চলে গিয়েছিল কারণ সে পাঞ্জাবে একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিবৃতি দিয়েছিল যে বাদী তার একজন 'চেলা' সুন্দরদাস, সাধু হবার পূর্বে সে ছিল লাহোরের তাজলার একজন রাখাল এবং নাম ছিল মাল সিং। ঘরে এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন হবে।

ইতিমধ্যে ১৯২১ সালের ১ লা জুলাই সহকারী ম্যানেজার সুরেন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর

কাছ থেকে একটি রিপোর্ট পাওয়া যায় যে ইন্সপেকটর মমতাজউদ্দীনের সাথে পাঞ্জাব গিয়েছিল। ওরা যাত্রা করেছিল ৩১ শে মে সে বাদীর নাম সুন্দর দাস, এবং সে হচ্ছে ধর্মদাসের একজন চেলা (এক্সি ২৩৪৭)। ২রা জুলাই ম্যানেজার মেজরাণী বিভাবতীদেবীর কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পায় যে লোকটির পূর্ব ইতিহাসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

এ সবই ১৯২১ সালে। এই বছর ও পরের বছরের কিছু সময়, দার্জীলিঙে মৃত্যুকে প্রমাণ করতে সংগৃহীত সাক্ষ্য বাদীর পেছনে পেছনে ধাওয়া করছিল। এস্টেটে চাঁদা সংগ্রহ রোধে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল যেটা সর্বসাকুল্যে ১ / লাখ টাকা, চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ হতেই খাজনা আদায় শুরু হল। প্রতিবাদীগণ মতামত দিয়েছিল চাদা থেকে বাদী ১০,৯৯১ টাকা মানহানি মামলায় খরচ করেছিল। উক্ত ডা. আশুতোষ দাশগুপ্ত পুস্তিকা রচয়িতা, (ফকির বেশে প্রাণের রাজা) পূর্ণ ঘোষের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিল এবং মুদ্রক সতীশ রায়ের বিরুদ্ধেও ৯-৯-২১ তারিখে।

অভিযোগ ছিল বইয়ের মধ্যে লেখা আছে যে ডাক্তার কুমারকে বিষ দিয়েছিল দার্জীলিঙে। এস্টেট মামলাটি চালিয়েছিল বা চালাতে সাহায্য করেছিল এবং বাদী ছিল প্রতিপক্ষ। আরেকটি মামলা ১৯২১ সালে রুজ করা হয়েছিল এবং ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে শুনানি হয়েছিল যে, আশুবাবু ও বীরেন্দ্র দুজনেই দার্জিলিঙে গিয়েছিল, মেজকুমারের অসুস্থতা ও মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতির একটা তথ্য দিয়েছিল যেটাকে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম সাক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এটা আশ্চর্যের ব্যাপারে পূর্বে এই মামলা মিঃ লিন্ডসে শুনে প্রথম রানীর কাছে লিখেছিল এবং তার কাছ থেকে মেজকুমারের অসুস্থতা ও মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত টেলিগ্রাম বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিল (এক্সি ৫৫)। তখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস রত আশুবাবুকে ১৭-১ ২২ তারিখে জয়দেবপুর ফার্মেসীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত করা হয় ৩-১১-২১ তারিখের ডিসপেনসারী কমিটির প্রস্তাব পাশ হবার পর (এক্সি, ৩৪৬)।

১৯২১ সালটিকে বিয়োগান্ত বছর বলে চিহ্নিত করা হয়। ২৪-৯-২১ তারিখে মুকুন্দ গুঁইকে সেক্রেটারী, যে দার্জিলিং গিয়েছিল, ঢাকার রাস্তায় হত্যা করা হয়। তার মৃত্যুকালীন ঘোষণা ছিল তার কোন শত্রু নেই। কিন্তু সে বাদীর বিরুদ্ধে কাগজে লিখেছিল (প্রঃ সা. ৪০৫)।

১৯২২ সালে বাদী ঢাকা ত্যাগ করল। ১৪ই জুলাই ঠাকুমা সত্যভামাদেবী ঢাকায় আগমন করল। একটি তারিখহীন চিঠি ২৪-৭-২২ তারিখে ১৯, ল্যান্সডাউন রোডে তার কাছে সমর্থনের জন্য পেশ করা হয় যেহেতু সে অনুমোদন করতে এসেছিল, কিন্তু সে অনুমোদন করতে প্রত্যাখ্যান করল। চিঠিটি এরূপ— (এক্সি ৫৮ (৫৮)

আশীর্বাদ সূচক,

বিভাবতী দেবী,

আমার পুত্র, রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র, রমেন্দ্রনারায়ণ রায় জীবিত।

যে মানুষটি একবছরেরও কিছু আগে সন্ন্যাসীর বেশে ঢাকায় এসেছিল এবং যাকে ভাওয়ালের অসংখ্য প্রজা ঢাকার অনেক ভদ্রলোক মেজকুমার বলে স্বীকার করেছিল আমি তাকে ভালভাবে দেখেছি। আমি তাকে জয়দেবপুরে প্রথম দেখি এবং শেষ কদিন ঢাকার বাসায় প্রতিদিন দেখেছি। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই সে আমার মেজ নাতি রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। যদিও আমি বৃদ্ধা, আমার দৃষ্টি, আমি মনে করি এখনো ভাল এবং তুমি খুব ভাল করে জান কীভাবে তার অভিযুক্ত মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের দিনে তার 'কুশপুত্তলিকা' দাহে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং কেন এটা ঘটল না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তোমার প্রয়োজন শুধু এসে তাকে দেখা এবং কোন্ সন্দেহ তোমার মনে রয়ে যাবে না। তার ঢাকায় আগমনের থেকে তোমাদের কেউ তোমাদের নিজের চোখ দিয়ে দেখোনি। হতে পারে তুমি শুধু লোকের মুখ থেকে শুনেছ এবং সংবাদপত্র থেকে পড়ে।

'সেজন্য আমি তোমাকে কায়মনোবাক্যে আসতে আমন্ত্রণ করি যে তাহলে সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে' সেজন্য এস, নিজের চোখে সব দেখ এবং আমার স্বামীর পরিবারের সম্মান ও খ্যাতি রক্ষা কর যা তুমি তোমার বিচার ও ধর্ম অনুসারে কর্তব্য বলে মনে কর।'

শ্রী সত্যভামা দেবী

অবিনাশচন্দ্র মুখার্জি, তার ব্যবসায়ী ও সর্বক্ষণের সাহায্যকারী বলেছে যে সে সত্যভামাদেবীর নির্দেশ অনুযায়ী চিঠিটি লিখেছিল এবং সে এই চিঠির সম্বন্ধে পুরো তথ্য দিয়েছে। এটা রাণীর সত্যকারের মতামত কিনা সে বিষয়ে গিয়ে লাভ নেই, দেখা যাচ্ছে তার মতামত সাক্ষ্য নয়। তার সত্যকারের মতামত নির্ধারণ করতে হবে তার প্রমাণিত আচরণ থেকে। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে মেজরাণী জানত যে চিঠিটি এসেছে সত্যভামাদেবীর কাছ থেকে, যেমন সে বলেছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিল এটা।

ঢাকায় এসে সত্যভামা দেবী চিঠি লেখে ও আরো দুটি কাজ করেছিল। ১৯২২ সালের ২০ শে জুলাই সে ঢাকার সিভিল সার্জেনের দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে একটি সার্টিফিকেট নেয় তার দৃষ্টি বিষয়ে (এক্সি.৭৪)। বিচারে সাক্ষ্য নেওয়া হয় তার দৃষ্টিশক্তি খারাপ। অন্য কাজটি হচ্ছে সে ২৯-৭-২২ তারিখে ডাঃ ড্রামন্ডকে এক দীর্ঘ চিঠি লেখে। এটা আদালতে দাখিল করা হয়নি (এক্সি ২৭৪)। এই চিঠির খানিকটা অংশ এরূপ--

মহাশয়,

"যথাসময়ে আপনার ২৫ শে মের চিঠি পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ আপনি আমার অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন, যদিও নিয়মমাফিক কারণে আমার ৮ই জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে উল্লেখিত অনুরোধ মেনে নিতে অক্ষম হয়েছিলেন।

আপনার পরামর্শমত কাজ করে আমি ঢাকা আসার কষ্ট স্বীকার করেছি এবং সাধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছি।" তারপর সাধুর সাথে প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎকার ও তার পরিবারের

কথা ও বিভাবতীদেবীর ভাইয়ের কথা, বাদীর বিরুদ্ধে মেজরাণীর মামলার কথা লিখেছে। আরো লিখেছি তার চোখের দৃষ্টিশক্তির কোন দুর্বলতা নেই। সেজন্য সে মিসেস ড্রামন্ডাকে এসে তাকে পরীক্ষা করতে লিখেছে।

এই চিঠির কোন নোটস্ গৃহীত হয়নি। ১৫-১২-২২ তারিখে সত্যভামাদেবীর মৃত্যু হয়। হঠাৎ তার মৃত্যু হয় এবং বাদীর বাড়িতে যেখানে সে ঢাকায় আসা থেকে অবস্থান করছিল। তার আচরণ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। তবে এটা স্বীকৃত যে সকলে তার আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। তার বিবৃতিকে বাদ দিয়ে একটা বিষয় বিবেচনা করতে হবে যে রাজার ৮০ বছরের বিধবা পত্নী, প্রাসাদে বাস করতে অভ্যস্ত, স্বামীর স্মৃতিকে ঘিরে জীবনধারণ করত সে কেন ঢাকার ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে বাস করতে গেল শেষপর্যন্ত।

রানীর মৃত্যু হয় রাত ১১ টা নাগাদ। বাদী তার শববাহকদের মধ্যে একজন এবং শেষকৃত্য সেই সম্পন্ন করে। তারিণীদেবী, জ্যোতির্ময়ী, সত্যভামাদেবীর ভাইয়ের ছেলে সেখানে উপস্থিত ছিল (বা: সা: ৮০৬, ৯৩৭, ৬৪৫, ৯৩৮, ৯৭৭)।

একটি ফোটোতে (এক্সি ১৪) প্রজ্বলিত চিতার নিকটের একটি দৃশ্য ছিল। সকলে এটা স্বীকার করেছে এবং প্রতিবাদী পক্ষ এর উপর জোর দিয়েছিল। যখন দার্জিলিঙের সাথে সম্পর্কিত একটি সূত্রের বিষয়ে এটার প্রয়োজন হয়েছিল যে একজন ব্রাহ্মণের দেহ কোন অ-ব্রাহ্মণের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না, শাস্ত্র বা ধর্ম এটা অনুমোদন করে না। প্রতিবাদীর বক্তব্য ছিল যে কোন পাঞ্জাবি বা অজানা বংশোদ্ভুত মানুষের দ্বারা মুখাগ্নি অবিচার। কোন সাক্ষ্য ছিল না কেউ এতে প্রতিবাদ করেছিল।

সত্যভামা দেবীর শ্রাদ্ধ বাদীর দ্বারা যথাবিহিত নিয়মানুসারে মৃত্যুর ১১ দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার বাংলাবাজারে এক বিশাল বাড়ির উঠোনে। অসংখ্য সাক্ষী, প্রায় তিনহাজার নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, সমাজের সর্বস্তরের যোগদান করেছিল। অনুষ্ঠানটির ছবি তোলা হয়েছিল (এক্সি ৫, ৬, ৭, ৮)। প্রতিবাদীপক্ষ একজন সাক্ষীকেও হাজির করতে পারেনি যে এটা অস্বীকার করবে। তাদের বক্তব্য এটা আরেকটি অবিচার। কিন্তু এ রকম শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত বা এরকম কাজ করে কেউ কুমার বলে গণ্য হতে পারে না। তবে যখন মানুষটি স্বতন্ত্র দেখতে বা কাউকে ষড়যন্ত্রের প্রশ্নকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, তখন এটার প্রতি চোখ পড়ে।

১৯২৩ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল । রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য আই সি এস মিঃ কে সি দে ঢাকায় এলে জ্যোতির্ময়ীদেবী তার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করল ও চিঠিটি এরকম (এক্সি.২০০)—

ঢাকা

৭-৮-২৩

" আমি আপনার ২৯ মে শ্রাবণের চিঠি পেয়েছি।" মিঃ দে চান নি জ্যোতির্ময়ী তার

সাথে দেখা করতে সার্কিটহাউসে আসুক। ''আপনি পরের বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টার সময় আপনার পালিত পুত্রকে পাঠাতে পারেন এবং আপনি যা বলতে চান সবই তার কাছে বলুন। আমি সব শুনব সে যা বলবে এবং উপযুক্ত মতামত পাঠাব।

সাক্ষর / K. C. De

সদস্য, রেভিনিউ বোর্ড

মিঃ চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী পালিত পুত্রের, সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল, সে যাই হোক না কেন, মিঃ কে. সি. দে এটা স্বীকার করেছে। যদিও আদালতের মিঃ দে প্রথমে পালিত পুত্রকে চিনতে পারেনি। সাক্ষাৎ হয়েছিল ৪৫ মিঃ যাবৎ। মিঃ দে মতামত দিয়েছিল যে অন্য কারো দরখাস্তে যখন কোন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে না, তখন বাদীর উচিত একটা দরখাস্ত দাখিল করা। মিঃ ব্যানার্জী চেয়েছিল একটা অনুসন্ধান হোক। কিন্তু মিঃ দে এতে রাজী হয়নি। বলেছেন যে এ বিষয়ে বাদীকে উদ্যোগ নিতে হবে। মিঃ দে ১৯২৬ সালে আরেকটি সাক্ষাতকারের কথা বলেছে যেখানে বাদী উপস্থিত ছিল। কিন্তু পরে আলোচনাকালে এটা দেখা যাবে, যে সাক্ষাৎকারের কথা মিঃ দে বলেছিল সেটা প্রকৃতপক্ষে ১৯২৩ সালে। এখানে তার স্মৃতি তাকে ফাঁকি দিয়েছিল।

১৯২৩ সালের এই সাক্ষাৎকারের পর চন্দ্রশেখর বাবু মামলা না করে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল রেভিনিউ বোর্ডের কাছে ৮-১২-২৬ তারিখে বাদীর পরিচিতি সম্পর্কে একটি তদন্তের কথা বলে।

বাদী ১৯২৪ সালে কলকাতায় গিয়েছিল কিন্তু কোন মাসে গিয়েছিল তার একমাত্র সাক্ষ্য বড়রানী সরযূবালা দেবীর সাক্ষ্যে পাওয়া যায় অর্থাৎ জুলাই বা আগস্ট মাসে। প্রতিবাদীপক্ষে তখন প্রতিবাদিনী মেজরানী তাকে ১৯২৪ বা ১৯২৫ সালের শীতকালে দেখেছিল। কলকাতা পৌরসভার জেলা ইঞ্জিনীয়ার মিঃ গুপ্ত তাকে দেখেছিল ১৯২৪ সালে আগস্টে। কলকাতায় বাদী বোসপার্কে, হরিশ মুখার্জি রোডে, একটি বাড়িতে জ্যোতির্ময়ী, তার পুত্র বুদ্ধু, জব্বু কুমারের এক ভাগ্নে, দিগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বা: সা: ২১২), দুর্গানাথ চক্রবর্তী ও মনমোহন রায় — বাদীর দুজন অফিসার ছিল বাদীর সাথে।

কলকাতায় পৌঁছানোর দিনই বড়রানী - সরযূবালা দেবী তাকে তার বাড়ি, ৮ মধু গুপ্ত লেনে ডেকে পাঠায় এবং সে বাদীকে চিনতে পারে। মহিলা তার সাক্ষ্যে এটা বলেছে।

মাঝে দুবার ঢাকাতে (জানু, ১৯২৮/এপ্রিল, ১৯২৯) আসা ছাড়া বাদী ১৯২৯ সালের অক্টোঃ পর্যন্ত কলিকাতায় বাস করেছিল। তারপরে বাদী ঢাকায় জ্যোতির্ময়ীদেবীর পরিবারে বাস করতে থাকে।

কলকাতায় থাকাকালীন বাদী সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল। এই মেলামেশা প্রমাণ করে না সে কুমার, কিন্তু সে নিজেকে লুকায় নি।

বাদী ৮-১২-২৬ তারিখে রেভিনিউ বোর্ডের কাছে অনুসন্ধানের জন্য দরখাস্ত ও তার সম্বন্ধে প্রতারক নোটিশটি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করে। কিন্তু বোর্ড জানায় যে এতে কোন ফল হবে না। যদি প্রমাণিত হয় সে প্রতারক তাহলে এটা হবে সময়ের অপচয়, যদি প্রমাণিত হয় সে কুমার — তাহলেও বোর্ড তাকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

১৯২৯ সালের অক্টোবরে বাদী ঢাকায় ফিরে আসে। ইতিমধ্যে ব্রজবাবুর এক পুত্র ঢাকায় একটি মামলা রুজু করে। মামলাটির বিষয়বস্তু কুমারেরা সকলে মারা গিয়েছে বা একজন মেয়ের পুত্রেরা উত্তরাধিকারী হবে না। কিন্তু মামলাটি খারিজ হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকা ফেরার পর বাদী খাজনা আদায় করতে একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রতিবাদীদের বক্তব্য ছিল সে একটি পয়সাও খাজনা আদায় করতে পারেনি, কিন্তু এই চেষ্টার কথা তারা স্বীকার করেছিল। বাদী খাজনা আদায়ের কাগজপত্র দাখিল করেছিল এটা দেখাতে যে সে খাজনা আদায় করেছিল। অনেক প্রজা এই বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তারা খাজনা প্রদান করেছিল। এস্টেটের তরফ থেকে খাজনা সংগ্রহের প্রতিরোধে যে আদেশ বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এই সময়ে তাও প্রমাণিত হয়েছিল (Ex. 217, 214, 276, 360)। বড়রানী ও সরকারের কাছে এস্টেটের দ্বারা প্রজাদের উপর চাপ দেওয়ার অভিযোগ পাঠানো হয়েছে টেলিগ্রাম ও চিঠির দ্বারা। বাদীর প্রতি দুটি আদেশ জারী হয়-- প্রথমটিতে জয়দেবপুরে যেতে মানা ও দ্বিতীয়টি খাজনা আদায় করতে মানা (Ex. 276/360)।

প্রথম আদেশ তুলে নেওয়া হয়েছিল বাদীর বিবৃতির উপর যে তার জয়দেবপুর যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। আর দ্বিতীয়টির বিষয়ে ৬ই ফেব্রুঃ ১৯৩০ সালে নিম্নোক্ত প্রশ্ন রাখা হয় বঙ্গীয় আইন সভায় --

"রেভিনিউ বোর্ডের সম্মানিত সদস্য কী অবগত যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাওয়াল প্রজাদের এক বৃহৎ অংশ একজনকে খাজনা প্রদান করছে যে নিজেকে ভাওয়ালের মেজকুমার বলে স্থাপিত করেছে এবং যে নিজেকে ভাওয়ালের এস্টেটের সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের সঠিক দাবীদার বলে ঘোষণা করেছে?"

সম্মানিত স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র উত্তর দিয়েছিলেন -- 'হ্যাঁ' (Ex. 263)।

মামলাটি রুজু করা হয়েছিল ২৪-৪-৩০।

বিচারের বর্ণনায় অংশ হিসাবে এখানে প্রধান তারিখগুলি উল্লেখ করা উচিত যেটা বিচারক বিবেচনা করেছে পরিচিত বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের সঠিক অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয়।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরের কিছুদিন -- বাদীকে বাকল্যান্ড বাঁধে দেখা গেল।

১৯২১ " ৫ই এপ্রিল নাগাদ -- বাদী কাশিমপুরে যায়।

" " ১২ ই " " --- বাদী জয়দেবপুর আগমন করে মাধববাড়িতে অবস্থান করে।

" " ১৩ই " " -- জ্যোতির্ময়ীর সান্নিধ্যে বাদী।

" " ১৪ই " " -- বাদী জয়দেবপুর ত্যাগ করে।

" " ২৪শে " " -- শৈবলিনীর সান্নিধ্যে বাদী।

" " ৩০শে " " -- বাদী জয়দেবপুরে এসে জ্যোতির্ময়ীর বাড়িতে অবস্থান করে।

" " ৪ঠা মে " -- বাদী নিজেকে মেজকুমার বলে ঘোষণা করে।

৫-৫-২১ থেকে ৭-৫-২১ -- সত্যবাবু মিঃ লেথব্রিজকে বলে জীবনবীমার অফিস থেকে মৃত্যুর এফিডেবিট সংক্রান্ত নথি আনাতে।

৯-৫-২১ -- টেলিগ্রামে সত্যবাবুর চিঠি।

১০-৫-২১ -- রেভিনিউ বোর্ড বীমার কাগজপত্র চায়।
G P. দ্বারা মিঃ লিন্ডসের রিপোর্ট প্রেরণ।

২১ সালের ১৫ই মে-র পূর্বে -- সত্যবাবু, G P. ও একজন ব্যারিস্টার দার্জিলিঙে যায় এবং মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করে।

১৫-৫-২১ -- জয়দেবপুরে জমায়েত।

১৬-৫-২১ -- বর্ধমানের মহারাজা সত্যভামাদেবীকে লেখে।

১৯২১ সালের
১৬ থেকে ২১ শে মের মধ্যে -- দুই বোন ও গোবিন্দবাবু কালেক্টারের কাছে তদন্তের জন্য আবেদন করে।

২৯-৫-২১ -- বাদী ও মিঃ লিন্ডসের সাক্ষাৎকার।

৩১-৫-২১ -- সাব ইন্সপেক্টর বাদীর পূর্ব ইতিহাস খুঁজতে যাত্রা করে।

৩-৬-২১ - মিঃ লিন্ডসের দ্বারা বাদী প্রতারক বলে ঘোষণা।

৭-৬-২১ - বাদী ঢাকায় যায়।

২৬-৮-২১ ধর্মদাস নাগা ঢাকায় আসে।

১৪-৭-১৯২২ - সত্যভামাদেবী ঢাকায় আসে।

১৪-৭-২২ - তার চিঠি মেজরাণীকে প্রদান করা হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৫-১২-২১ -- সত্যভামার মৃত্যু।

২৫-১২-২১ - তার শ্রাদ্ধ।

৯-৯-২৩ - মিঃ কে. সি. দের সাথে সাক্ষাৎকার।

জুলাই/অগাস্ট ১৯২৯ -- বাদী কলকাতায় গিয়ে প্রথম রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

৮-১২-১৯২৬ -- স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

৮-৪-১৯২৭ -- স্মারকলিপি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অক্টোবর ১৯২৯ — বাদী ঢাকায় ফিরে আসে।
১৯২৯ — বাদীর খাজনা আদায়।
২৪-৪-১৯৩০ — মামলা রুজু করা হয়।

সনাক্তকরণের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য।

১৯৩০ সালের ২৭ নভেঃ শুনানি শুরু হয়। ১০ম সাক্ষী বাদী, ১১ই ডিসেম্বর কাঠগড়ায় আসে। তিনদিনের কিছু বেশী সময় যাবৎ তাকে পরীক্ষা করা হয়। ১৫ তারিখে তার জেরা শুরু হয় এবং এটা চলতে থাকে ১৬, ১৮, ১৯, ২০ তারিখ পর্যন্ত। ২০ তারিখের দিনের শেষে এটা বন্ধ হয় এবং তারপর কিছু পুনঃপরীক্ষার পর আবার জেরা করা হয় যেহেতু একটি নতুন সনাক্তকরণ চিহ্ন এসে পড়ে। সংক্ষেপে জেরা চারদিনের কিছু বেশী সময় চলে। জেরা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রতিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী একটি বিবৃতি দেয়, কিছু অস্বাভাবিক, যা সে অবশ্যই বোঝেনি।

জেরা করা হয়েছে সাধারণত মনের প্রতি, শরীরের প্রতি নয়। এটা প্রদর্শন করার মনস্থ করা হয়েছিল যে (এ) বাদী বাঙালি নয়; (বি) সে ফুটবল, টেনিস, ক্রিকেট, পোলো, বিলিয়ার্ড কিছুই জানে না, শিকার বা বন্দুক সম্বন্ধে কিছুই না; ঘোড়া সম্বন্ধে না, ইংরেজি পোশাক ও খাওয়া সম্বন্ধে না, ইংরেজি আসবাবপত্রের বিষয়ে কিছু না; ফটোগ্রাফির সম্বন্ধে কিছু না; ঘোড়দৌড়ের সম্বন্ধে কিছু না; এটা প্রদর্শন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে সে আদৌ শিক্ষিত নয়, শুধুমাত্র নাম সই করা ছাড়া বাংলা ও ইংরেজিতে এমনকি যে অক্ষরগুলি দ্বারা ইংরেজি সই করত তার জ্ঞানও নেই। ব্যতিক্রম হচ্ছে 'এন' অক্ষর। এটা দেখতে উক্ত বিষয়ে বাদীর অজ্ঞতা কতদূর। এই অজ্ঞতা কী ইংরেজি নামের জন্য? যেমন সে 'বুলস আই' না জেনেও ভাল শিকারী হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটা বলা যথেষ্ট যে বাদী কোন খেলাধুলা জানত না। শুধু সামান্য পোলো ছাড়া বা খেলাধুলার পরিভাষাও না। অন্যান্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হবে যখন বিচারক 'মনের পরিচয়' শিরোনামে জেরার বিষয় বিশ্লেষণ করবে। জেরাতে যে কুমারকে উপস্থিত করা হয়েছিল সে ১৯৩৩ সালে মিঃ ঘোষালের কাছে উপস্থাপিত কুমার — "একজন সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, অভিজাত বাঙালি যুবক; একজন চৌকশ খেলোয়াড়" (মিঃ লাহিড়ী কর্তৃক - ৯৪৫) একজন 'তাজা'র পুত্র হিসাবে বিখ্যাত (অনেক সাক্ষী কর্তৃক উক্ত — বা: সা: ৬৬০, ৪০২, ৪৩৩, ৪৬১, ১১২, ৫১৪)। বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজি কেতাব অভ্যস্ত। জেরার সময়ে বাদীর শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য কম ছিল না, কিন্তু পরে প্রতিবাদীপক্ষ শুধু স্বল্প-শিক্ষাকে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগল। কৌঁসুলী ব্যাখ্যা করেছিল বাদীকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করার যথেষ্ট সময় ছিল। যেটা একটা ঘটনা, এবং সেজন্য কৌসুঁলি ফাঁদে পড়তে যাবে না। সত্যি কথা বলতে গেলে বাদীকে কুমারের স্মৃতির বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কতগুলি প্রশ্ন ছাড়া যেগুলির উত্তর সে দিয়েছিল যা পরে সঠিকভাবে দেখা যাবে।

মন্তব্যের সম্পূর্ণ ন্যায্যতা পরে জেরা বিষয়ে আলোচনায় দেখা যাবে, কিন্তু ধরে

নেওয়া হচ্ছে এতে কিছুই হবে না। সনাক্তকরণের প্রশ্ন প্রাথমিকভাবে হচ্ছে শরীরের সনাক্তকরণের প্রশ্ন। কেউ একজন মৃত বা উন্মাদ মানুষকে সনাক্ত করে, কিন্তু যখন সনাক্তকরণের প্রশ্ন ওঠে এবং এই বিষয়ে দ্বন্দ্বমূলক সাক্ষ্য দেখা যায়, তখন কেউ মনের দিকে লক্ষ্য করবে যেখানে এই মামলায় মনের ব্যাপারটি দারুণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এই ভিত্তিতে যে বাদীর ভেতরে কুমারের সম্পূর্ণ স্মৃতিকে শিখিয়ে পড়িয়ে সঞ্চিত করা হয়েছে এবং কোন উপায়ে এটা কল্পনা বলে প্রদর্শন করা যেতে পারত না। শরীর হয়ে উঠেছে প্রধান বিবেচ্য। সেজন্য জেরা ও এমনকিছু স্বীকৃতির মধ্যে যেতে হবে যা সে বিচারের পূর্বে সাক্ষীদের কাছে বলেছিল, কিন্তু শরীর দিয়ে অবশ্যই শুরু করতে হবে।

বিচারক বাদীকে তার পরীক্ষাকালে ও আনুষঙ্গিক উপলক্ষে দেখেছিল যখন সে বিচারের সময় থেকে উপস্থিত ছিল। বিচারককে মাঝে মাঝে তার খুব কাছে যেতে হয়েছিল এবং তার শরীরে চিহ্ন দেখতে তাকে স্পর্শ করতে হয়েছিল। কলকাতার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার মিঃ উইন্টারটন (বা: সা: ৭৮৮) কর্তৃক ২৮-৪-৩৪ তারিখে গৃহীত LX চিহ্নিত ছবিতে যেমন তাকে দেখা গেছে, সে তেমনই দেখতে। সে মোটা, সুগঠিত ও সে যা বলেছিল সেই বয়সী। তার চুল, শুধু ধূসর হওয়াগুলি ছাড়া, ঘন বাদামী, লালের ছিটে সহ কালো এবং ঢেউ খেলানো। তার গোঁফ হাল্কা বাদামী। বিচারকের সামনে ডাক্তারের দ্বারা আদালতে তার উচ্চতা মাপা হয়েছিল ৫´ ৬´´ জুতো ছাড়া। তার একটি হাত সামান্য খাটো। তার জুতোর মাপ ৬ নং। তার গায়ের রঙ অত্যন্ত ফর্সা এবং গোলাপী। কিন্তু বিচারক তার সঠিক শেড্ নির্দেশ করেনি। তার নাক চওড়া। যতদূর সম্ভব ত্রুটিহীনভাবে এগুলি বলা গেছে।

মিঃ চৌধুরী মতামত দিয়েছিল যে বাদীর চুল কালো ছিল, কিন্তু তেলের অভাবে অবহেলার দ্বারা বাদামী হয়েছিল। তার সাক্ষী বলতে শুরু করেছিল বাদীর সাথে মেজকুমারের কোন সাদৃশ্যই নেই, শুধু তার চুলের রঙ ছাড়া যেটা ছিল পিঙ্গল — বাদামীর আঞ্চলিক রঙ বলে স্বীকৃত।

উভয়পক্ষে মেজকুমার ও বাদীর কিছু আলোকচিত্র ছিল যেগুলি ছবিতে পাওয়া সম্ভব নয় সেগুলির জন্য মৌখিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। যেমন, গায়ের রঙ, চুলের রঙ, চোখের রঙ। প্রতিবাদীর বক্তব্য ছিল মেজকুমারের চোখের রঙ ছিল নীল যেটা বাদীকে স্থানচ্যুত করতে পারে। এটা ছবির উপর দেখা যেতে পারে না। প্রথিতযশা ফটোগ্রাফার মিঃ জে. পি. গাঙ্গুলি ছবি দেখে মতামত দিয়েছিল যে একক বাদীর ও একক মেজকুমারের ছবিতে ব্যক্তি একই। মিঃ পারসি ব্রাউন, সরকারী আর্ট কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল বলেছিল দুটি ছবির দুটি ব্যক্তি পৃথক, এদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। মিঃ উইন্টারটন ও মিঃ মুশেলের মতামত পরস্পরবিরোধী। মিঃ চৌধুরী মিঃ উইন্টারটনের সাথে একমত। X(49), X(48) চিহ্নিত দুটি ছবির বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছে প্রথম দৃষ্টিতে ছবি দুটি একই লোকের পৃথক ছবি বলে মনে হবে না। মিঃ উইন্টারটন ও

মিঃ গাঙ্গুলির মতে একই লোকের জীবনের বিভিন্ন পর্বের ছবি এ দুটি। ছবিগুলি দীর্ঘ বিরতির পর গৃহীত হয়েছে। কেউ যদি কারো বাল্যকালের ছবি দেখে যৌবনের চেহারার সাদৃশ্য বিচার করে, সেটা ভুল হবে। যদি সারাজীবন ধরে কাউকে দেখা যায় তবে ছবিতে কেউ তার পরিবর্তন বুঝতে পারবে। মেজকুমারের ৮টি ছবির কথাই ধরা যাক। Ex. I তে সে ছোট বালক, Ex. XL-এ সে ১৪ বছরের বালক, Ex. (15) তার সাম্প্রতিক ছবির মধ্যে একটি, Ex. II তারও পরের, বাদী বলেছে দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বে। এখন এই ছবিগুলির মধ্যে কোনটিই কোন আগন্তুকের এক বলে মনে হবে না। যারা কুমারকে চিনত তাদের পক্ষে সবগুলিতে কুমারকে চেনা কষ্টসাধ্য নয়। রানী XL ছবিতে তার স্বামীকে চিনতে পারেনি। সে তাকে ১৪ বছর বয়সে দ্যাখেনি। এই ছবিগুলির মধ্যে শুধু দুটি ছবি, ফ্রক কোট পরিহিত মেজকুমার ও বাদীর ছবি মনে হবে একই ব্যক্তির। মিঃ চৌধুরীর প্রচেষ্টা ছিল এই সনাক্তকরণকে এটা দেখিয়ে নাড়াচাড়া দেওয়া, যে সকল সাক্ষীরা এই বিষয়ে কথা বলেছে, তারা বিশ্লেষণ করতে পারেনি বা বর্ণনা করতে পারেনি। ওদের চেনা যেতে পারে। একটি স্বরকে বর্ণনা না করেও চেনা যেতে পারে। বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যেতে পারে বা ছবিতে রাখা যেতে পারে। কিন্তু বর্ণনা করা যেতে পারে না। কেউ বর্ণনা থেকে ছবি আঁকতে পারে না। খুব কম লোকই একটি বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করতে পারে, যতক্ষণ না এটা খুব অদ্ভুত হয়। কেউ মুখ দেখে। যেমন মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কি রূপ বাবু ও রাজার মধ্যে পার্থক্য বলতে পারেন? এ সমস্তই সে করেছিল সম্পূর্ণ 'বিসদৃশ্য' সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

যে সমস্ত প্রজা সাক্ষীরা বলেছে তারা কুমারকে মানে ও এদের বেশির ভাগ শুধু দৃষ্টির দ্বারা। বিচারক বিস্তারিতভাবে এদের সাক্ষ্য আলোচনা করার প্রস্তাব করেনি। বাদীপক্ষ এই ধরনের ৪৭৩ জন প্রজাকে পরীক্ষা করেছে এবং প্রতিবাদীপক্ষ ২১৯ জন এরূপ প্রজাকে। উভয় সাক্ষীর দলই বাদীকে ১৯২১ সাল নাগাদ দেখেছিল। তার আগমনে, বেশির ভাগ জয়দেবপুরে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে ৩৯ দিন থাকার সময়।

বাদীপক্ষের সাক্ষীরা কিছুক্ষণ দেখার পর তাকে চিনতে পেরেছিল ও প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষীরা বলেছিল বাদী সম্পূর্ণ পৃথক, আদৌ মেজকুমার নয়।

এই দুই পক্ষের সাক্ষ্যকে বিচার করতে হলে দুটি চিঠিকে অবশ্যই তথ্যের মধ্যে আনতে হবে। একটি চিঠি ১৯৩৩ সালের ৩১ মে রায় সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জি কর্তৃক নায়েবকে বাংলায় লিখিত। চিঠিটির একটি অংশ ছিল -- "তোমার দ্বারা নির্বাচিত সাক্ষীদের বিবৃতি নাও এবং আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তাদের। আমি বিবৃতির একটি নমুনা পাঠাচ্ছি, কিন্তু দেখ প্রত্যেকটির ভাষা এক না হয়।"

সংশ্লিষ্ট নমুনা - Ex. 309 (1)

"বয়স.. ..আমি প্রদান করি---রাজসরকারের প্রতিপালনা হিসাবে। মৃত মেজকুমারের সময়ে আমি রাজবাড়ীতে বহু দরবার করেছিলাম। আমি তিনজন কুমারকেই চিনি এবং

তারাও আমাকে চেনে। মৃত মেজকুমার 'বিচার' করত ইত্যাদি। আমি তার কাছে বহুবার গিয়েছি এবং বাস্তবিক তাকে খুব ভাল করে চিনি। এই সন্ন্যাসী হিন্দীতে কথা বলে। মৃত মেজকুমার আমাদের সাথে বাংলায় কথা বলত। সন্ন্যাসীর কথা ও চেহারা মেজকুমারের সঙ্গে আদৌ মেলে না। মেজকুমারের মৃত্যু ও সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের মধ্যে আমি কোন গুজব শুনিনি যে তাকে দাহ করা হয়নি বা সে মরেনি। আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে সন্ন্যাসী মেজকুমার।"

রায়সাহেব ছিল এই মামলায় প্রতিবাদীদের প্রধান 'তদবিরকারী' এবং এই চিঠি লেখার কথা স্বীকার করেছে (Ex. 309)।

অন্য চিঠিটি (Ex. 353(1)) এস্টেটের একজন ইন্সপেক্টর কর্তৃক এক নায়েবের নামে লিখিত যেটা নির্দেশ করেছে — "পূর্বের নির্দেশ মত ব্যবস্থা নাও যে এস্টেটের কোন প্রজা বা কোন সাক্ষী বাদীর জন্য সাক্ষ্য না দেয়। অন্য পক্ষের সাক্ষীদের নামের তালিকা ইতিমধ্যে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

এই নায়েবের অঞ্চল থেকে একজন সাক্ষী এসেছিল যে সন্ন্যাসীকে সমর্থন করেছিল এবং তাকে কর্মচ্যুত করা হয়েছিল। সুতরাং এটা মনে হয় প্রতিবাদীদের প্রজাসাক্ষীরা এই চিঠির ফসল।

মেজকুমারকে সর্বত্রই দেখা যেত। প্রতিবাদীপক্ষের বেশীর ভাগ সাক্ষীই এটা স্বীকার করেছে এবং বাদবাকীরাও অস্বীকার করেনি। প্রতিবাদীপক্ষও এটা আটকাতে পারেনি। যে সমস্ত প্রজাদের প্রতিবাদী পক্ষ ডেকেছিল, কুমারকে তাদের চোখের আড়ালে রাখার চেষ্টা করা উচিত ছিল। কিন্তু যে সব সাক্ষী বাদীকে চিনতে অস্বীকার করেছে তাদের অধিকাংশই রায়সাহেবের নমুনাসাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি করে গেছে। একজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল -

প্র· -- তুমি একনজরে দেখেছিলে যে মেজকুমার নয়?

উ· -- কেউ একনজরে দেখতে পারে না। এখানে তাকে আমি অনেক সময় ভাল করে দেখেছিলাম -- যে সে মেজকুমার নয়।

সাক্ষী আদালতের সামনে সমস্যাকে নির্দেশ করেছিল। সাদৃশ্যের হার যাই হোক না কেন এ কি একই মানুষ? জ্যোতির্ময়ীদেবীকেও মাঝে মাঝে বলা হয়েছে বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। বাদীর বিষয়কে সরিয়ে রেখে, এটা একটা ঘটনা যে মেজকুমার, ছোটকুমার ও বুদ্ধুর চেহারার সাধারণ সাদৃশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রায় ১০০শত সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এর সম্বন্ধে। ৪ ১-৩৪ তারিখে বাদী একটি দরখাস্ত ফাইল করেছিল যে প্রতিবাদীদের মামলা কী এখনো সম্পূর্ণ বিসদৃশ্যভিত্তিক ? এ বিষয়ে কোন সূত্র ছিল না।

বিচারক একমত ছিল না যে আদালতকে দুটি বিকল্পের মধ্য থেকে নির্ণয় করতে হবে, সম্পূর্ণ বিসদৃশ্য ও পরিচিতি এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে পরীক্ষা করে বিচারক মনে করতে

পারেনি যে সাক্ষীরা হয় মিথ্যা কথা বলছে বা বাদী একই মানুষ যদিও প্রতিবাদীপক্ষ এই ধরনের বিষয় সংঘটিত করতে পারত।

উভয়পক্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে পরীক্ষা করা যাক। কিন্তু এটা সংক্ষেপে করা যেতে পারে। বাদী ১০৬৯ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছে, ২৭ জনকে কমিশনের সামনে। এদের মধ্যে ৯২ জন অসনাক্তকৃত যেমন বিশেষজ্ঞ, দুজন দার্জিলিঙের সাক্ষী ছাড়া এবং ১০ জন কিছুই প্রমাণ করেনি। সেজন্য এটা বলা যেতে পারে ৯৬৭ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিল যে বাদী হচ্ছে একই মানুষ। এদের মধ্যে ৪৭৩ জন সাধারণ মানুষ, ইতিমধ্যে উল্লেখিত। বাদবাকী পড়ে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে —

আত্মীয়স্বজন	—	১৮ জন
পুরাতন অফিসার	—	৬৬ জন
ভৃত্য	—	৩৩ জন
ব্যক্তিগত ভৃত্য	—	১০ জন
রেলকর্মচারী, জয়দেবপুরে কর্মরত	—	১৯ জন
ব্যবসায়ী, বাদক, ঢুলী ইত্যাদি	—	৪১ জন
সাধারণ ভদ্রলোক	—	৩৩ জন
তালুকদার	—	২১ জন
ঘনিষ্ঠ বন্ধু	—	২ জন
ধনী পেশাদারী মানুষ	—	৫৮ জন।

সর্বসাকুল্যে ৩০১ জন। প্রত্যেকটি সাক্ষীকে নিয়ে আলোচনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং এখানে কিছু সাক্ষীকে আলোচনা করা যেতে পারে। বিচারক এদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে : (১) যারা নিশ্চিতরূপে কুমারকে জানত এবং সম্ভাব্যরূপে তাকে ভুল করতে পারে না, (২) যাদের কৃতিত্বকে গুরুত্বপূর্ণভাবে যাচাই করা যেতে পারে না। এবং কুমারকে জানত এবং শুধুমাত্র জিজ্ঞাস্য কতদুর তারা তাকে মনে রেখেছে।

১. বাদীর সাক্ষীরা যারা নিশ্চিতভাবে কুমারকে জানত :

(১) বাঃ সাঃ ৬৬০, জ্যোতির্ময়ীদেবী, কুমারের বোন। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত সাধু তার ভাই।

এই মহিলাদের বিরুদ্ধে সওয়ালে এটা বিবৃত হয়েছিল যে সে, তার বোন ও তাদের পরিবার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের ভাইদের মৃত্যু পর্যন্ত রাজবাড়িতে বাস করত। তারপর তারা রাজবাড়ির বাইরে চলে আসে। দত্তক গ্রহণে তাদের আশা নির্মূল হয়। এটা সত্য যে তারা তাদের ভাইদের পরিবারের সদস্যদের মত বাস করত। কিন্তু তাদের রাজবাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া হয়। এটা নিদারুণ অসত্য। কারণ ছোটকুমারের মৃত্যুর পর তারা কখনো রাজবাড়ি বা ঢাকার লালগোলার বাড়িতে পা রাখেনি। এই তথ্য কেউ এমনকি রায়সাহেবও অস্বীকার করেনি। মিঃ চৌধুরী বলেছিল জ্যোতির্ময়ীদেবীকে লালগোলার

বাড়ি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, এরকম কেউ বলেনি। অন্যদিকে প্রতিবাদীপক্ষ বলেছিল বোনেরা বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল অশোভন দ্রুতভাবে, যদিও তৃতীয় রানী তাদের থামাতে চেয়েছিল।

যাইহোক একটি ঘটনা বাকী থাকে যে একজন ভাই তাদের খুব ভালভাবে দেখাশুনা করত, কিন্তু ১৯০৯ সালে তারা দত্তক গ্রহণের ফলে তাদের পুত্ররা উত্তরাধিকারী হয়। যদিও জ্যোতির্ময়ীদেবীর একপুত্র বিচারের আগে মারা যায়।

(২) সরযূবালা দেবী, বড়রানী।

এই মহিলাকে কমিশনের সামনে পরীক্ষা করা হয় এবং সে দেখিয়েছে যে বাদী হচ্ছে মেজকুমার, তার দেবর।

১৯১০ সালে স্বামী মারা যাবার পর বড়রানী জয়দেবপুর ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসে, আর ফিরে যায় না। ২৬-২-২৫ এর পরে কোন একটি দিন পর্যন্ত সে ৮নং, মধু গুপ্ত লেনে বাস করছিল এবং তারপর উঠে যায় ১১২, রিপন স্ট্রিটে। আশুডাক্তার মধু গুপ্ত লেনেই তার ভাইকে উদ্দেশ করে একটি চিঠি লিখেছিলো (Ex. 398)।

বড়রানী ১৯১০ সাল থেকে কলকাতায় বাস করছিল। তার বাবা ছিল একজন উকীল। একসময় সে ভাওয়ালের ম্যানেজার ছিল। প্রকৃতপক্ষে বড়রানী ভাওয়ালে আগন্তুক হয়ে উঠেছিল। সে মেজরানীর মত এস্টেটের আয় গ্রহণ করতো। এবং বর্তমান বিতর্ক তার স্বার্থকে প্রভাবিত করেনি এবং তাকেও আদৌ প্রভাবিত করতো না যদি না সে বাদীকে সমর্থন করত।

এই মহিলা তাব জেরায় উক্ত সাক্ষ্যে বলেছে যে ঢাকায এসেছিল এবং বাদীকে দেখেছিল এবং সে-ই কুমার এবং সেটা সে অন্য লোকের মুখ থেকেও শুনেছিল। "আমি শুধু শুনেছিলাম ও এটাই সব," এর অর্থ সে বাস্তবিকভাবে উৎসাহী ছিল না। তাবপর ১৯২৪ সালের আষাঢ় বা শ্রাবণের একদিন সন্ধ্যাবেলা যখন সে শুনল যে সন্ন্যাসীকুমার তাকে ডাকছে এবং কিছু প্রতিবেশী তাকে দেখতে এসেছে। সে তাকে উপরে আনতে পাঠাল ও তাকে দেখল। চিনতে পারল এবং তাকে গ্রহণ করল মেজকুমার হিসাবে। ঐ দিন থেকে ১৯২৪ সালের জুলাই আগস্ট থেকে ১৯২৯ সালের অক্টোঃ পর্যন্ত বাদী তার কলকাতায় অবস্থান কালে মাসে ২/৩ বাব তার কাছে গিয়েছিল, বডরানীও এটা স্বীকার করেছে।

এই মহিলাকে স্যার এন. এন. সরকার ও তারপর অ্যাডভোকেট জেনারেল জেরা করেছিল। একটা ক্ষনিক জেরায় জ্ঞানগোচর হয়েছিল যে এই মহিলা ম্যানেজার ও রেভিনিউ বোর্ডের কাছে অগণিত চিঠি লিখেছিল ব্যয়ের বিষয সম্বন্ধে অভিযোগ করে যা সে মনে করত ছোটরানীর অনুকূলে যাচ্ছিল যে ঢাকায বাস করত। তাছাডা সে দত্তক পুত্রের ব্যাপারটাও মেনে নিতে পারেনি। এ ব্যাপারে বড় ও মেজরানী একমত ছিল। ১৯২৪ সালে সাধুর এই ব্যাপারে বড়রানী নিশ্চিতভাবে মেজরানীর বিপক্ষে ছিল না।

তারপর সে বলেছে সে বাদীকে দেখেছিল ও তাকে কুমার হিসাবে চিনতে পেরেছিল। ২৭-১০-২১ তারিখে বড়রানী কালেক্টর মিঃ লিন্ডসেকে দার্জিলিঙে মেজকুমারের অসুস্থতা ও মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত চিঠিসহ এক নালিশ পাঠায়। অন্যপক্ষে মতামত ছিল ১৯২৮ পর্যন্ত সে তার পক্ষে যাযনি এবং অনেক চিঠি এটা দেখাতে দাখিল করা হয়েছে, এমনকি ১৯২৪ সালের পরেও সে প্রস্তাব দিয়েছিল বা অভিযোগ বা আইনী মতামত গ্রহণ করেছিল এই ভিত্তিতে যে মেজকুমার মৃত। ২৬-৭-২৯ এক মামলায় বড়রানী দত্তকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল এর আইনী বিষয় নিয়ে এবং এই মামলায় এই মতামত দেওয়া হয়েছিল যে বড়রানীর বাবা চেয়েছিল ছোটরানী তার একটি নাতিকে দত্তক গ্রহণ করুক-- এই ঘটনা বড়রানী অস্বীকার করেছিল।

মতামতটি হচ্ছে বড়রানী সরাসরি অন্যপক্ষে চলে যায় যখন সে দেখল মেজরানী তার সাক্ষ্যের দ্বারা দত্তককে সমর্থন করছে যা তর্কযোগ্য নয়। সে মনে করল 'একঢিলে দুই পাখী মারতে।' — সাধুর বিষয়ে ঘোষণা করে। অর্থাৎ ছোটরানী যে দত্তক গ্রহণ করেছিল এবং মেজরানী যে এটাকে সমর্থন করছে। সত্যবাবুর কোন ধারণা ছিল না বড় রানীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। বড়রানী বলেছিল গত দশবছর ধরে তার সাথে মেজরানীর সম্পর্ক খারাপ। এটা অসত্য — এবং একমাত্র বিষয় যা তার ভাবমূর্তিকে খর্ব করে প্রত্যক্ষভাবে। সে তার পূর্বের সাক্ষ্যেও এটা বলেনি, এমনকি তার সাক্ষ্যের একমাস পূর্বে কমিশনের সামনেও নয়। যেটা অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে এই দুই রানীর সম্পর্ক খারাপ ছিল না, যদিও বিভেদ অবশ্য দেখা গিয়েছে, ১৯২৪ সালে, বড়রানীর বাদীর বিষয়ে ঘোষণা করার পর। বিভেদ হচ্ছে ফল, কারণ নয়। জেরায় ছিল যে সে বাদী দ্যাখেনি বা ১৯২৪ সালে তাকে চিনতে পারেনি এবং কোন কারণের জন্য সে ১৯৩৫ সালে সাধুর পক্ষে গিয়েছিল এবং এই কারণেই সে ছোটরানী বা তার দত্তক গ্রহণ অপছন্দ করেছিল।

১৯২৪ সালে তার সাথে বাদীর সাক্ষাৎকার মামলার দ্বারা স্থানচ্যুত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সে কোন অফিসিয়াল চিঠি লেখেনি। সে সত্যনিষ্ঠভাবে বলেছিল যে সে অফিসিয়ালদের কাছে বলেছিল যে সে বাদীকে চিনতে পেরেছিল। প্রতিবাদীপক্ষের মিঃ গুপ্তকে কমিশনের সামনে এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। মিঃ কে. সি. দে বলেছিল যে ১৯২৫/২৬ সালে কলকাতায় বড়রানীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের সময় বলেছিল বাদীকে সে চিনতে পেরেছে। তার আচরণ মিঃ ড্রামন্ডের কাছেও ১৯২৫ সালে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ২৭-৩-২৪ তারিখে সে উল্লেখ করেছিল যে সে মেজকুমারকে মৃত বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না এবং বাদীর স্মারকলিপির কথা উল্লেখ করছিল। বিচারক পুরো ব্যাপারটিকেই কতকগুলি লোকের দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একগুচ্ছ বিভ্রান্তিকর উদ্যোগ বলে দেখেছে। বিচারক দেখেছে যে বড়রানী সৎভাবে মেজকুমারের বোনের মত বিশ্বাস করেছে বাদী মেজকুমার। ৩য় প্রতিবাদী ও ১ম প্রতিবাদী (মেজরানী) ১ম রানীর এই সনাক্তকরণের বিষয় তাদের

সওয়ালে 'মিথ্যা' হিসাবে বলেছিল এটি অবশ্যই পরোক্ষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে বা বাদীর পক্ষ থেকে যা তার সমর্থকদের দ্বারা চাপের ফলাফল বা ভুল।' দেখা যাচ্ছে মামলাটি কিছু লোকের সংকীর্ণ ষড়যন্ত্রের একটি নিদর্শন হতে যাচ্ছিল যারা অতৃপ্ত প্রজাদের বা অখুশী আত্মীয়স্বজনদের ব্যবহার করেছে।

(৩) কমিশনের সামনে পুরসুন্দরী দেবী।

সে মেজরানীর ১ম মামাতো বোন, তিনমামার এক মামা প্রতাপনারায়ণ মুখার্জির এক কন্যা, অন্য দুজন মামা সূর্যনারায়ণ ও রামনারায়ণ।

সাক্ষী পুরসুন্দরী দেবী কলকাতায় তার উকীল স্বামীর সঙ্গে বাস করত। তার ১৯ বছর বয়সে মেজরানীর বিবাহ হয়, মেজকুমার প্রায় তার বয়সী। প্রতিবাদীপক্ষ প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে তার স্বামী ছিল 'ঘরজামাই'।

এই মহিলা বলেছিল যে সে বাদীকে চিনতে পেরেছিল, সেই কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। সে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল এবং বাদী তাকে দিদি বলে ডেকেছিল। তার জেরায় কী মতামত দেওয়া হয়েছিল যে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যেহেতু তার স্বামী ধনী নয় এবং যেহেতু তার স্বামী একবার অপমানিত হয়েছিল প্রতাপনারায়ণের বাড়িতে তার পুত্রের অন্নপ্রাশনে। সংক্ষেপে মতামত ছিল যে সে প্রতাপনারায়ণের পরিবারে ছিল গুরুত্বহীন কন্যা। কিন্তু মতামতটি প্রতাপনারায়ণের বিধবার দ্বারা স্থানচ্যুত হয় বিচারকের সামনে সাক্ষ্যের দ্বারা। এটি অবশ্যই দারুণ আবিষ্কার।

(৪) সরোজিনীদেবী বিচারকের সামনে পরীক্ষিত।

এই মহিলা ২য় প্রতিবাদীর মামীমা, মৃত প্রতাপনারায়ণের বিধবা পত্নী। সে বিবাহ উপলক্ষে জয়দেবপুর এসে মেজকুমারকে দেখেছিল এবং উত্তরপাড়া গমনকালেও তাকে দেখেছিল এবং তাকে রাতের আহারের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এমন কোন মতামত ছিল না সে মেজকুমারকে দ্যাখেনি। মহিলা মেজকুমার হিসাবে বাদীর পরিচিতি হলফ করে বলেছিল। তার শেষ উত্তরপাড়ায় গমন ছিল দার্জিলিং যাবার ২/২½ মাস পূর্বে। সে ও মেজরানী বিভিন্ন উপলক্ষে একে অপরের বাড়িতে যাতায়াত করত। সে নিজে থেকে তার কাছে বাদীর প্রসঙ্গ তুলত না যে সেটা মেজরানীর কাছে যন্ত্রণাদায়ক হবে। যদিও মনে মনে চেয়েছিল লোকটিকে দেখতে এবং এই বিষয়ে ছেলের কাছে ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু বলা হয়েছিল মানুষটিকে প্রতারক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিচার চলাকালীন বাদীকে উত্তরপাড়ার বাড়িতে ডাকা হয়েছিল এবং সাক্ষী পর্দার আড়াল থেকে তাকে মিনিটখানেক দেখেছিল, তারপর চিনতে পেরে ঘরের ভেতর এসে তার সাথে কথা বলে অন্দরে ডেকে জলখাবার খেতে দিয়েছিল। বাদী তাকে বলেছিল, "মামীমা তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো। তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।" সে বলেছিল, "আমাকে ডেকো, প্রয়োজন হলে, আমার সত্য ছাড়া কিছুই বলার প্রয়োজন নেই।"

মিঃ চৌধুরী তার সওয়ালে বিচারককে বিবেচনা করতে বলেছিল এই ঘটনাটি, যে

মহিলা এত পথ পাড়ি দিয়ে ঢাকায় এসেছিল সাক্ষ্য দিতে, সেটা ভাগ্নের সাথে কোন শত্রুতার প্রমাণ নয়। দেখা যায় এই মহিলা সত্য বলেছিল যে বাদীই মেজকুমার।

নিম্নোক্ত আত্মীয়রাও বাদীকে ভাওয়ালের মেজকুমার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল —

(৫) সোনামাসি, কুমারদের মায়ের বোন (কমিশন)

(৬) শুধাংশুবালা, কুমারদের মায়ের আরেক বোন (কমিশন)

(৭) কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য, কুমারদের মায়ের একজন ভাই (বা: সা: ৩৩)

(৮) রাধিকা গোস্বামী, সত্যভামাদেবীর ভাইয়ের ছেলে (" " ৪)

(৯) মুকুন্দমোহন গোস্বামী, " " " (" " ৩৫)

(১০) লালমোহন গোস্বামী " " " (" ৮৫২)

(১১) সুরেশ মুখার্জি, কৃপাময়ীর পালিত পুত্র (" ৫)

(১২) বসন্ত মুখার্জি, ১১ নং খুড়তুতো ভাই (" ৭১)

(১৩) জীতেন্দ্র, বিলু নামে কথিত, কুমারদের ভাগ্নে, ইন্দুময়ীর পুত্র (" ৯৩৮)

(১৪) চন্দ্রশেখর (পি ৯৫৯)

(১৫) সাগরবাবু, জ্যোতির্ময়ীদেবীর জামাই (" ৯৭৭)

(১৬) কুলদাসুন্দরী (৮০) প্রসন্ন কুমার মুখার্জির বিধবা, রাজা রাজেন্দ্রর ১ম মামাতো বোন

(১৭) অখিল পাকড়াশী, স্থলের একজন জমিদার, বিলুর শ্বশুর (বা: সা: ৩৭)

(১৮) কমলকামিনীদেবী, ফণিবাবুর মায়ের বোন, উভয়পক্ষে পরীক্ষিত;

বিচারক দূরের আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেনি। তবে অনন্তকুমারী দেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। সে মেজকুমারের সমস্ত জীবন জানত, কারণ তার ছয়মাস বয়সের সময় অনন্তকুমারীর বিবাহ হয়।

ফণিবাবু তার বোন শৈবলিনীদেবী ও পরে জামাই ছাড়া আর কোন আত্মীয়স্বজনকে প্রতিবাদীপক্ষের থেকে জেরা করা হয়নি। আরো আশ্চর্যজনক যে প্রতিবাদী নং ১ এর নিজের ও পাড়ার লোকজন আসত না এবং এই অভিযুক্ত প্রতারককে বার করেনি। শুধু একজন পিসী সুকুমারী দেবী ছাড়া। যার সাক্ষ্য পরে দেখা যাবে। তারিণীময়ী দেবীকে কোন পক্ষ থেকে ডাকা হয়নি, কেন সে সাক্ষ্য দিতে পারে একথা আগেই নির্দেশিত হয়েছে। সে মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিল। ১৯২১ সালে মে মাসে অনুসন্ধানের জন্য দরখাস্তে সে অংশগ্রহণ করেছিল।

উপরোক্ত সাক্ষীদের মধ্যে কেউ কলকাতায়, কেউ ঢাকায়, কেউ জয়দেবপুরে বাদীকে দেখেছিল ও চিনতে পেরেছিল (বাদীও তাদের চিনতে পেরেছিল। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সত্যভামার ভাগনে এবং কৃপাময়ীর পালিত পুত্র সুরেশ সারাজীবন জয়দেবপুরে বাস করেছিল। এদের মধ্যে সুরেশের উল্লেখ করা যায় বিশেষভাবে। কারণ কৃপাময়ীর সম্পত্তি নিয়ে একদিকে সে ও অন্যদিকে জ্যোতির্ময়ী, তার বোন ও বোনের পুত্রের মধ্যে মামলা

বেধেছিল। জয়দেবপুরের প্রবীণ মহিলাদের মধ্যে অনন্তকুমারী, মোক্ষদা এবং কুলদার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এরা বিবাহ থেকে সারাজীবন রাজবাড়ীর কাছাকাছি বাস করেছে ও পরিবারের সাথে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এরা কুমারকে প্রায় জন্ম থেকে দেখেছে।

আরেকজন আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করা যায়, সে হচ্ছে কমলকামিনী (প্র: সা: ৯৮) ফণিবাবুর মায়ের বোন। সে স্বর্ণময়ীর দুটি মেয়ের একজন। সে মেজকুমারকে সারাজীবন দেখেছে। বাদীকে সে হলফ করে মেজকুমার হিসাবে উল্লেখ করেছে। বিচারক তাকে অবিশ্বাসের কোন কারণ দ্যাখেনি।

কিছু এমন সাক্ষীর উল্লেখ করেছে বিচারক যারা আত্মীয় নয় অথচ কুমারকে চিনতে ভুল করবে না। এরা হচ্ছে পুরাতন অফিসার, ব্যক্তিগত ভৃত্য, সমস্ত চাকর বাকর, গ্রামবাসী, এস্টেটের তালুকদার, পরিবারে বহু সামগ্রীর যোগানদার ইত্যাদি। প্রজাদের বেশিরভাগ দৃষ্টির দ্বারা মেজকুমারকে চিনত। মিঃ চৌধুরী এরা ছাড়া সনাক্তকরণে ঝুঁকির কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু সাক্ষীরা বিচারকের সামনে কুমারকে সাধারণ দৃষ্টিতে দ্যাখেনি, যেমনভাবে রাস্তাঘাটে, বাড়িতে, ঘোড়ার পিঠে, টমটমে, হাতির পিঠে এক বিখ্যাত পরিবারের পরিচিত ব্যক্তিকে কেউ দ্যাখে।

এবার বিচারক এমন কিছু ব্যক্তির নাম করবে যাদের প্রতি এটা বলা যাবে না যে তারা কুমারকে জানে না বা তাকে ভুলে গেছে। যেমন —

(বা: সা: ৬২) — ঢাকায় বর্ষীয়ান উকীল রেবতীমোহন ঘোষ। বাল্যকাল থেকে সে কুমারের পরিবারকে জানত। জয়দেবপুর স্কুলে শিক্ষক থাকাকালীন সে মেজকুমারকে 'ইংরেজি শেখাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেউ সম্ভাব্যভাবে মতামত দিতে পারে না সে কুমারদের পরিবারকে জানত না। তার অযোগ্যতার একমাত্র বিষয় হল একটি মামলায় মুন্সীগঞ্জের মুনসেফ তাকে বিশ্বাস করেনি। মুনসেফ ছিল প্রতিবাদী।

(বা· সা: ৬১) — ৭৭ বছর বয়স্ক ভাওয়ালের একজন সম্মানিত তালুকদার পরেশ ন:থ বিশ্বাস। কোন কিছুই তার যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(বা: সা: ৬৩) — ময়মনসিংহের ৬৩ বছর বয়স্ক মোক্তার রাজকুমার মুখুটি। বাদীর একজন অফিসার ছিল সে।

(বা: সা: ১১২) — ৪৯ বছর পয়স্ক মিঃ ভি. জে. স্টিফেন। স্থানীয় আর্মেনিয়ান গীর্জার সভাপতি। কোনকিছুই তার যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(বা: সা: ১৫৫) — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ৪৭ বছর বয়স্ক মণীন্দ্রমোহন বোস। সে জয়দেবপুরে থাকাকালীন প্রায় প্রতিদিন মেজকুমারকে দেখেছে। কোনকিছুই তার যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(বা: সা: নং মেষব্বাহা উদ্দীন, ৪৫ বছর, ভাওয়ালের ফুলদীর সম্মানিত তালুকদার।)

(বা: সা: ৪২৬) — নবেন্দু বসাক, ঢাকার জমিদার।

(বা: সা: ২৬৭) — জমিদার হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী।

(বা: সা: ২৬২) — জয়দেবপুর রানী বিলাসমণি হাইস্কুলের যোগেশচন্দ্র রায়।

(বা. সা: ৩২৬) — বাবাকপুর সরকারি পার্ক স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত।

(বা: সা:) — একটি বড় জমিদারীর ভাবী উত্তরাধিকারী হেমেন্দ্রলাল দাশ।

(বা: সা: ৪৫৮) — ঢাকায় প্রয়াত সরকারি উকীল রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের পুত্র ভূপেন্দ্রমোহন ঘোষ।

(বা: সা: ৪৫৯) — ব্যারিস্টার অ্যাট ল, মিঃ এন. কে. নাগ।

উপরোক্ত কারো কোন যোগ্যতাই অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মিঃ নাগ ছিল মেজকুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে জেরায় স্বীকার করেছিল যে সে মাঝে মাঝে মেজকুমারের সঙ্গে 'নিষিদ্ধ আনন্দ'তে সংযুক্ত হত। বিচারক মনে করে না এই ব্যক্তি জনসাধারণের সামনে তার ব্যক্তিগত জীবনকে উন্মুক্ত করবে যাকে সে একজন প্রতারক বলে বিশ্বাস করত।

সে বাদীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কী করে জানলেন যে আমি নাগা?" বাদী মিঃ নাগকে 'নাগা' বলে সম্বোধন করত পূর্বে। সে মিঃ নাগের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে সব উত্তর দিয়েছিল। মিঃ নাগ বলেছিল যে এসবই সে জানতে পেরেছে যে করেই হোক। তখন বাদী তার মধ্যরাতের অভিযানের কাহিনী বলল। সাক্ষী ফিরে গিয়ে মিঃ এস. আর. দাশকে বলেছিল বাদী প্রকৃতই কুমার।

(বা: সা: ৬৬৬) — জমিদার রমেশচন্দ্র চৌধুরী, কুমারের ঘনিষ্ঠ।

(" " ৬৩১) — পুলিসের অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর, সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য।

(" " ৭৯২) — ঢাকায় রামনাথের সুপরিচিত পরিবারের সঙ্গে যুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী। সে বাদীকে মেজকুমার বলে বিশ্বাস করত না।

(" " ৮১৩) — ঢাকার জমিদার ব্রজগোপাল বসাক।

(" " ৮৯০) — ইটের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম।

(" " ৯০৩) — একজন অবসরপ্রাপ্ত সার্জন রায়সাহেব আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী। সে শুধু একদিন আদালতে মামলার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিল।

(" " ৯০৯) — ঈশ্বরগঞ্জের উকীল, যোগেশচন্দ্র রায়।

(" " ৯২১) — ঢাকার হিরণ্ময় বিশ্বাস।

(" " ৯০৮) — অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীমোহন সেন। অন্যান্যদের তুলনায় সে কুমারকে কম দেখেছে সুতরাং যদিও সে সম্পূর্ণ বিসদৃশ্য সংজ্ঞার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে যথেষ্ট ভাল, তবুও সনাক্তকরণের প্রশ্নে কেউ তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজ করতে ইতস্তত করবে।

হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট গোবিন্দচন্দ্র রায়। সে কুমারদের বহুবার কলকাতায় সফরকালে দেখেছিল।

চুঁচুড়ার অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জন ডঃ নবেন্দ্র মুখার্জি।

এই সব ভদ্রলোকেরা অবশ্যই কুমারকে জানত এবং যারা, সম্ভাব্য ব্যতিক্রম সহ কালীমোহনবাবু ও রায়সাহেব আনন্দ গাঙ্গুলী, সম্ভবত তাকে ভুল করতে পারে না। এছাড়া আরো অসংখ্য মানুষ ছিল যারা তাকে ভুলতে পারে না। এই তালিকার মধ্যে বিচারক আরেকজন সাক্ষীর নাম উল্লেখ করেছে সে হল মনিপুরী জকি চন্দ্রনাথ সিং (বা: সা. ১৬২) পোলোর বিষয়ে তার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। ব্যক্তিগত ভৃত্যের মধ্যে প্রতাপ ও প্রভাত ব্যক্তিগতভাবে মেজকুমারের উপদংশের সূত্রপাতের তথ্য প্রদান করেছে। এ বিষয়ে রাজবাড়ি ডিসপেনসারীর কম্পাউন্ডার উপেন্দ্র (বা: সা: ৭৪) সামান্য তথ্য দিতে পারত।

কেউ এই সব সাক্ষীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে যে (বা: সা: ৪৫, ৫৪, ৫৭, ৭৭, ২৩৭, ৩০৬, ৪৩৮, ৪৮৩, ৫৬৫, ৬০২, ৬২০, ৬৪৫, ৬৫১, ৭৩০, ৭৫৬, ৮২৫, ৮৫৪, ৯০৬, ৯৮২) মেজকুমারের প্রিয় যাতায়াতের স্থান ছিল রেলওয়ে স্টেশন। মেজকুমার স্টেশনে গিয়ে সকলের সঙ্গে মেলা মেশা করত। স্টেশন মাস্টার আশুবাবু বাদীকে জ্যোতির্ময়ীর বাড়িতে দেখতে গিয়েছিল। বাদী তাকে চিনতে পেরে বলেছিল, "সে আশুবাবু," "কিন্তু আপনার দাড়ি কোথায়?"

পুরাতন অফিসারদের মধ্যে নাম করা উচিত —

(বা: সা: ১) — সদরের প্রধান ম্যানেজারের অফিসের কেরানী ৬৪ বছর বয়স্ক বিপিন।

(" " ২) — সার্ভেয়র সুরেন্দ্র অধিকারী।

(" " ৬৬) -- রমেশচন্দ্র ঘোষ, নায়েব।

(" " — সদরের কেরানী হরনাথ ধর গুপ্ত।

(" " ৩৮৭) — নায়েব অরুণকান্ত নাগ।

(' " ৬৬৪) — পূর্ণচন্দ্র দত্ত।

(" " ৯০৭) — ১৩০৯ সালের সহকারী দেওয়ান রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়।

(" " ৯২৫) — মোক্তার দুর্গাশঙ্কর চ্যাটার্জি।

তালুকদারদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম খাজনার তালুক ১০,০০০টাকার তালুক ছিল হরবিভের বাবু দিগেন্দ্রনারায়ণ। সে প্রথম থেকেই বাদীর দৃঢ় সমর্থক ছিল। তার আনুগত্য তার বিশ্বাস থেকে এসেছে বলে মনে করে বিচারক, কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য থেকে নয়। সে ৩২,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা ধার করেছিল বাদীকে স্থান দিতে।

ঢাকা থেকেও অসংখ্য সাক্ষী এসেছিল সাক্ষ্য দিতে। সেখানে অসংখ্য লোক তাকে অসংখ্যবার দেখেছিল। কুমার প্রায়ই ঢাকায় যাতায়াত করত। জয়দেবপুর থেকে ঢাকা একঘণ্টার পথ। সে লালগোলা নদীর ধারে বাড়িতে, যাকে বলা হত 'নির্ণিবাস', আশ্রয় নিত। সে টমটম চালাত, পার্টিতে যোগদান করত, রক্ষিতাদের বাড়ি যেত, নদীবক্ষে মেয়েদের সাথে ভ্রমণে বার হত, সাধারণত নৌকায় বা লঞ্চে, বাড়ির পিছনে নদীতে স্নান

করত। তাকে বেশির ভাগ দেখা যেত বাড়ির পেছনে আস্তাবলে। সে ঢাকার বার্ষিক মিছিলে তার সজ্জিত হাতিতে চড়ে যাতায়াত করত। এই সব সাক্ষীদের নাম বলা বা বিস্তৃতভাবে তাদের সাক্ষ্যকে আলোচনার কোন দরকার নেই। এটা মনে করা বিপজ্জনক হবে যে এরা সকলেই সনাক্তকরণ পরীক্ষার যোগ্য।

এই ব্যক্তিদের মধ্যে, শুধু এদের নাম করা উচিত —.

বা.সা— সুবোধকৃষ্ণ বোস, কলকাতার একজন সম্মানিত ব্যক্তি। জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। রাজা বিনয়কৃষ্ণর ভাইপো। ১৯০৫/০৬ সালে মেজকুমারের সাথে সাক্ষাৎ করে, এবং পুনবায় ১৯০৮ সালে। ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে তার সাথে মেজকুমারের সাক্ষাৎ ঘটেছিল ধর্মতলা হাউসে যেখানে ১৯০৬ সালে কুমার বাস করত এবং সে ১৯০৭ সালে কলকাতায় যায়নি।

বা: সা:— ৬০৬ — ময়মনসিঙের সেন বাড়ির রমেশচন্দ্র।

,, ,, — ৪৬১ — কলকাতার ইঞ্জিনিয়ার পি সি গুপ্ত।

এই ব্যক্তি কুমারের বন্ধুর মতো ছিল প্রায় ও তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছিল, কিন্তু তার বয়স যখন প্রায় ১৭ বছর, কুমার দার্জিলিঙে গমন করেছিল। সে ঘোড়ায় চড়ত কুমারের সাথে এবং রাজবাড়িতে ও ঢাকায় দেখা কবতে যেত। কুমার তাকে নিজেব বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাত। কিন্তু সে বাদীকে দেখে ১৯২৪ সালে, প্রায় ১৭ বছর পর।

বা: সা: ৫৮০— ঢাকার একজন ধনী ব্যবসায়ী প্রিয়নাথ সাহা বণিক। এর মস্ত বাড়ি-সম্পত্তি ও বড় ব্যবসা ছিল, কিন্তু কুমাবকে শুধু রাস্তায় বা দরজার বাইরে দেখেছিল।

বা: সা: ৮৯— জীবনবীমার দালাল মিঃ জি. সি. সেন যে ১৯০৫ সালে মেজকুমারের বীমার বিষয়ে কাজ করেছিল। ১৯৩৪ সালে সে বাদীকে দেখবার পর সন্তুষ্ট হয়েছিল যে এই সেই ব্যক্তি, কিন্তু তাকে জেরার জন্য প্রশ্ন করতে হয়েছিল এবং সনাক্তকরণ হিসাবে এটা সন্তোষজনক ছিল না।

বা: সা: ১৮৯— পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর শরৎ ঘোষ (৬২) বাদীকে সাধারণত রাস্তায় দেখেছিল এবং আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে লালগোলার বাড়িতে শুধু দুবার দেখেছিল। সে মেজকুমারকে বিভিন্ন উপলক্ষের মধ্যে একবার বন্ধু ও ৪/৫ জন পতিতার সাথে একটি ঘরে দেখেছিল।

এমন কাউকে বিবেচনা করা যাচ্ছে না যে বাদীকে শুধু রাস্তায় বা সাধারণত রাস্তায় দেখেছে।

বা: সা: ৮৯৪— কলকাতা ও ঢাকার বণিক ও ব্যবসায়ী মাখনলাল দের (৫০) কলকাতায় ও ঢাকাতে স্থাবর সম্পত্তি ছিল।

বা: সা: ৯৪৮— ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত এজেন্ট রমণীমোহন বসাক।

বা: সা: ১০০১— মুন্সীগঞ্জের উকিল, উপেন্দ্রচন্দ্র চ্যাটার্জি, বি এল।

বা: সা: ১০১২— সন্নাসীবরণ রায়, উকীল।

বা: সা: ১০২৪ — রমণীমোহন গোস্বামী, উকীল।

এদের মধ্যে সন্ন্যাসীবাবু বিশ্বাসের পেছনে ছুটবে না, এই তালিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম হচ্ছে বাবু আশুতোষ ব্যানার্জি , ঢাকার জমিদার , শহরের একজন সর্বোচ্চ পদমর্যাদার ভদ্রলোক। সে বাঃ সাঃ নং ৯৫১। সে সুপরিচিত মুরাপাড়া জমিদার পরিবারের সন্তান, জমিদারি থেকে তার বার্ষিক আয় ১.৫ লাখ টাকা, ঢাকার বাড়ি সম্পত্তি এবং জমিদারি ছাড়াও অন্যান্য আয় প্রায় ৪০০০ টাকা। ভাওয়াল পরিবারের সাথে এই পরিবারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

এজাহার প্রদানের সময় সাক্ষীর বয়স ছিল ৪৪ বছর কেননা মেজকুমার যখন দার্জিলিঙ গমন করে তার বয়স ছিল ১৯ বছর, সে তিনকুমারকে মজলিশ, শোভাযাত্রা ও গাড়িতে দেখেছিল। সে বলেছে প্রত্যেক কুমারের উপস্থিতি তার মনে পড়ে। সে মিঃ র‍্যামকিনের বিদায় অবসর পার্টিতে মেজকুমারকে দেখেছিল যেখানে ২৭-৭-০৫ তারিখে নর্থব্রুক হলে মেজকুমার নিঃসন্দেহে যোগদান করেছিল (দ্রষ্টঃ প্রঃ সাঃ ৩৯০ রায়সাহেব)। সাক্ষী মেজকুমারকে শেষ দেখেছিল ১৯০৯ সালে, স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের প্রতি প্রদত্ত একটি উদ্যান-মজলিশে।

সে কখনো মেজকুমারের সাথে কথা বলেনি। সে বাদীকে তার নিজের বাড়িতে দেখেছিল ১৩২৮ সালের ভাদ্রমাসে অর্থাৎ সনাক্তকরণ ঘোষণা করবার প্রায় চারমাস পরে। সাক্ষী বলেছে যে সে তাকে চিনেছিল এবং তাকে তার মা ও ঠাকুমার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে তাকে বাড়িতে ডাকা হয়েছিল।১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে সে বাদীকে জিজ্ঞাসা করে যদি সে মনে করতে পারে কোথায় সে তাকে প্রথমবার দেখেছিল। বাদী উত্তর দিয়েছিল যে মিঃ র‍্যামকিনের বিদায়-অবসর পার্টিতে সে সাক্ষীকে দেখেছিল। মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেছিল:

"আমরা কী বুঝব যে আপনি নিশ্চিত যে বাদী হচ্ছে মেজকুমার কারণ সে মিঃ র‍্যামকিনের এ ব্যাপারটি উল্লেখ করেছে?" এই সমস্ত সাক্ষ্য কিছু স্বার্থপর ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রকে উপযুক্ত রূপ দিতে সাজানো হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত খুব একটা বেশি চিন্তা ব্যতীতই প্রযোজ্য হয়েছিল। সাক্ষীর জোয়ারের প্রতি লক্ষ্য করে যেভাবে আমি (বিচারক) মামলাটি শুনেছিলাম এবং সর্বস্তরের ও অবস্থার সাক্ষী, বেশীরভাগের বয়স ৫০-এর বেশী এবং খুব কমলোকের বয়স ৪০-এর নীচে, অনেক রাশভারী, বয়স্ক লোক যাদের একজনকেও রোমাঞ্চকর বলে সন্দেহ হয় না, মনে হয় যেন কেউ বুড়িগঙ্গাকে অস্বীকার করেছে এবং সাক্ষীরা এর মধ্যে জল ঢালছে এটা বলতে যে নদীটি এখানে ছিল ।

কিছু সাক্ষীর নাম প্রদান ছাড়া এই সব সাক্ষীর সাক্ষ্য আলোচনা করা হয়নি, যেন তাদের সাক্ষ্য ভেতর থেকে মিথ্যার কোন চিহ্ন প্রকাশ করেনি, শুধুমাত্র সনাক্তকরণের এই একক ঘটনার প্রতি নয়, পারিবারিক ইতিহাস বা এরকম অন্য ঘটনার প্রতিও। যাইহোক সনাক্তকরণের পক্ষে বিপক্ষে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য ছিল। সংখ্যা গোনা হয়নি। আদালতকে উভয়পক্ষের সাক্ষের মানকে দেখতে হবে— সাক্ষীদের কৃতিত্ব, তাদের পদমর্যাদা, শিক্ষা, পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, কুমারকে কতদূর তারা স্মরণ করতে পেরেছে, অসত্য বলবার কারণ,

তাদের সাক্ষ্যে কোন প্রমাণিত মিথ্যা— যেমন কুমারের পোশাক বা শিক্ষা সম্বন্ধীয়, বা কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য-- যেমন, তার চোখের রঙ, বা নাকের আকার।

সুতরাং পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যে সব সাক্ষীদের নাম করা হয়েছে বা নাম করা হয়নি তাদের কোন কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। তারা নিশ্চয় কুমারকে জানত এবং তাকে ভুলবে না। সাধারণভাবে তাদের কৃতিত্ব না দেওয়ার কিছুই নেই যতক্ষণ তারা যা বলেছে সে বিষয়ে তাদের কৃতিত্ব না দেওয়া হয়, যেমন কুমারের শিক্ষা বা অন্য কোন গোলমাল ব্যাপারে। যখন এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে তখন এটা প্রকাশিত হবে।

সনাক্তকরণের নাকচে প্রতিবাদীপক্ষের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য

প্রতিবাদীপক্ষ সর্বমোট ৪৭৯ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছে, কমিশনের সামনে ৪৪ জনকে। যে সব সাক্ষীকে এই জন্য ডাকা হয়েছিল যে বাদী ওজলার মাল সিং কিনা এটা প্রমাণ করতে বা যারা সনাক্তকরণের ব্যাপারে আদৌ কোন কথা বলেনি তাদের একমুহূর্তের জন্য পাশে রেখে যারা বলেছিল যে তারা মেজকুমারকে জানে এবং বাদী ও মেজকুমার একই ব্যক্তি নয়, তাদের সংখ্যা ৩৭৪ জন।

এদের মধ্যে ৫৬ জন 'ভদ্রলোক', এস্টেটের কার্যে রত নয়, যদিও এই সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাদবাকী হচ্ছে প্রজা বা এস্টেটের কর্মচারী বা কৃষক— এরা এই ধরনের কিছুলোক যারা প্রজাদের তালিকাভুক্ত হবে। মিঃ চৌধুরী প্রজাদের একটি তালিকা দিয়েছিল যেখানে তাদের সংখ্যা ছিল ২১৯ কিন্তু এই তালিকার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। মিঃ চৌধুরী ২১ জন চাকরবাকরের একটি তালিকা দিয়েছিল। এদের মধ্যে ১০ জন এস্টেটের কার্যে রত এবং একজন বাদে সবাই প্রজা। ব্যতিক্রম ছিল প্র: সা: ১৩২, দরকার মত এস্টেটে কাজ করত। সে মোট ৮৩ জনের একটি তালিকা প্রদান করেছিল, কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ ছিল এবং ৮৩ জনের এই তালিকায় ৪২ জন নায়েব বা অনান্য কর্মচারীরা তখনো এস্টেটে কার্যরত ছিল।

প্রজা-সাক্ষীরা, সাধারণভাবে বলতে গেলে, নিশ্চিতভাবে রায়সাহেবের উপরোক্ত 'নমুনা সাক্ষ্য পত্রের উৎপন্ন বস্তু। তারা নায়েবের দ্বারা পিওনের অধীনে আদালতে প্রেরিত হত। বাদীর দ্বারাও একই ধরনের দল সৃষ্ট হয়েছিল এদের মধ্যে পার্থক্য হল পরবর্তী দল (বাদী) এমন একজন মানুষের জন্য সাক্ষ্য দিতে এসেছিল যে ক্ষমতায় ছিল না তা সে ১৯২৯ সালে বাদীর দ্বারা খাজনা আদায়ের আইনগত প্রভাব যাই হোক না কেন এবং পরবর্তী তিনটি বছর নায়েবদের প্রতি আদেশ ছিল যে তাদের দেখা উচিত এস্টেটের একজন প্রজাও যেন বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়। প্রতিবাদী সাক্ষ্য দলের থেকে তাদের পার্থক্যও, সাধারণভাবে বলতে গেলে, বেশী বাস্তববাদী, প্রতিবাদী পক্ষের প্রজা-সাক্ষীবা, সাধারণভাবে বলতে গেলে, দরিদ্রতম শ্রেণীর প্রজা। পীরাজুলির একজন প্রজা শুধু ব্যতিক্রম। কোনকিছুই নির্ণয় করা যেতে পারে না তাদের প্রকাশ্য সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে এইরূপ ঘটনাগুলি ছাড়া। হতে পারে, জেরা দ্বারা যেগুলির সারাংশ বের করা হয়েছিল।

একই মন্তব্য নায়েব ও এস্টেটের অন্যান্য কর্মচারীদের প্রতিও প্রযোজ্য। তাদের প্রতি

আদেশ ছিল যে তাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যেন তাদের এলাকা থেকে বাদীর হয়ে সাক্ষ্য না দেয়। তারা তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়নি। একজন নায়েবকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছিল কেন তাকে পদচ্যুত করা উচিত নয়, কেননা একজন মানুষ তার এলাকা থেকে পলায়ন করে বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। একজন নায়েব জেবায় স্বীকাব করেছিল যে যদি সে বলে বাদীই কুমার তবে সে অবশ্যই তার চাকরি হারাবে। বা: সা: ৩২৯)। প্রাক্তন সহকারী ম্যানেজার , মি: মোহিনীমোহন চক্রবর্তীও বাহ্যত একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। সে বলেছে তাব দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে যে যদি কোন কর্মচারী কেবলমাত্র বলে বাদী হচ্ছে মেজকুমাব, সেটা হবে নিছক প্রচার; তারা সৎভাবে যা বিশ্বাস করত তা অবশ্যই খোলাখুলি বলবে না; যদি তারা এমন করত, তবে তারা এস্টেট থেকে সঙ্গতভাবে কর্মচ্যুত হত না; যদি যাদের অধীনে তারা কাজ করত তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজেদের বিশ্বাস না মিলত, তবে তারা এটা প্রকাশ করত না। বাহ্যত এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ও এর সামান্য পশ্চাতে গিয়ে, সে ১৪৪ ধারার অন্তর্গত একটি মামলার সাক্ষ্য দিয়েছিল, যখন বাদীর বিরুদ্ধে একটি নিয়ন্ত্রণাদেশের প্রয়োজন ছিল যে সে বাদীর সাথে কথা বলেছিল যদিও তার বর্তমান সাক্ষ্য ছিল, কথা বলেনি। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব নিয়মে চাকরবাকর রাখতে পারে, কিন্তু তাদের সাক্ষী হিসাবে পেশ করতে পারে না। কোনকিছুই এদেব প্রকাশ্য সাক্ষ্যের উপরে নির্ণয় করা যেতে পারে না যতক্ষণ না ঘটনা, প্রমাণিত , এটাকে সমর্থন করে।

আরেকটি সাধারণ মন্তব্য হচ্ছে যে ঢাকার কোন একজন নাগরিককেও, যেখানে মেজকুমাব ছিল এক সুপরিচিত ব্যক্তি, প্রতিবাদীর তরফে সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হয়নি, একজন ব্যতীত, ব্যতিক্রমটি (বা: সা: ৭৯, মাধব) একটি তামাসার মতন। সে বলতে শুরু করে যে ঢাকা শহরে সোনাকুঠিতে সে বাস করে। এটা জানা যায় তার বাড়ি সেখানে সে আবার বলেছে যে কাছেই আরেকটি বাড়ি আছে যেটা এখনো তার নিজের রয়েছে, কিন্তু যেটা সে বেনামদারের কাছে বিক্রী করেছে, যে দলিলটি রেখেছে সেটা ১৪ বছরের জন্য বেনামদারের অধীন, যখন থেকে সাক্ষী একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করছে আসাম থেকে ফেরবার পর। সেখানে সে কবে গেছে বলতে পারে না। সে অস্বাকীব করেছে যে কোন এক সময়ে সে এক উকীলের কেরানি ছিল এবং তাবপর সে তার ডায়েরির কথা স্বীকার করে যেটা সে রাখত ১৯২৯ সালের ১২ নভেম্বর পর্যন্ত। তথাপি এই সাক্ষী যে কুমার সম্বন্ধে কিছুই জানত না, তার সম্বন্ধে দেখা যাচ্ছে সে এসেছিল কুমারের বৈশিষ্ট্যসমূহকে বিস্তারিত প্রমাণ করতে। সাক্ষী বর্তমানে বেকার এবং কেউ জানে না কিভাবে সে জীবনযাপন করছে। সে স্বীকার করেছে প্রতিবাদী পক্ষের একজন দালালের দ্বারা সে ঢাকার একটি পানের দোকানের মালিক হয়েছিল।

এস্টেটের কর্মচারীদের এক মুহূর্তের জন্য পাশে সরিয়ে রেখে অবশিষ্ট থাকে আদালতে জেরাকৃত ৪০ জন সাক্ষী, তৎসহ কমিশনের সামনে পরিচিতির প্রশ্নে জেরাকৃত ১৫ জন সাক্ষী---

১. লেফটানেন্ট কর্নেল পুলি।

২. মিঃ র‍্যামকিন, আই সি এস অবসরপ্রাপ্ত (প্র বা: সা: ২)

৩. মিঃ কে সি দে, আই সি এস (বা: সা:)

৪. মিঃ জে এন গুপ্ত, আই সি এস , অবসর প্রাপ্ত (কমিশনের সামনে)

৫. মিঃ মেয়ের, ভাওয়ালের প্রাক্তন ম্যানেজার (কমিশনের সামনে)

৬. মিসেস মেয়ের (কমিশনের সামনে)

৭. মিঃ শরদিন্দু মুখার্জী, কলকাতার একজন সম্মানিত ভদ্রলোক (প্র: সা: ১২০)

৮. লেফটানেন্ট হোসেন, ময়মনসিঙের একজন জমিদার (প্র: সা: ৬)

একদা এক জমিদার

তার নিজের সাক্ষ্য ছিল তার ছোট্ট সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে, গভীর ঋণে সে নিমজ্জিত। অনুমোদিত ডিক্রী সর্বসাকুল্যে ১,৬৩,০০০ টাকা এবং আরেকটির অঙ্ক অজানা। তার জমিদারী সব বিকিয়ে গেছে।

পরস্পরবিরোধী বিবৃতি

১৯০৪ সালে সে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করে। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে। পুনরায় কলেজে পড়বার জন্য ঢাকায় আসে এবং সেখানে ১৯০৮ সালের শেষ পর্যন্ত পড়ে। ঢাকার কলেজে সে যোগদান করেছিল ১৯০৮ সালের মে বা জুন মাসে। অথচ ১৯০৬ বা ০৭ সালে কুমারের সাথে তার ফোটো পেশ করা হচ্ছে যখন সে আদৌ ঢাকায় ছিল না। ১৯০৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ সালে কলকাতায় কুমারের সাথে নৈশাহারের কথা বলা হয়েছে, এ কথা সে জানত না যে আদালত কুমারদের কলকাতা সফরের সঠিক বিস্তারিত বিবরণ অবগত আছে। সে এগুলির সাথে পরস্পরবিরোধী প্রচারে জড়িয়ে পড়েছে, যখন এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হবে তখন ইংরাজি খানার বিষয়ে আলোচনায় আসা যাবে।

প্র: বা: সা: (৯) কালিপ্রসন্ন চক্রবর্তী, সহকারি শিক্ষক, রানী বিলাসমণি হাইস্কুল, এন্ট্রাসে অকৃতকার্য। তার সাক্ষ্য নীচে বিবেচনা করা হবে।

(১০) প্র: সা: ৩ — যোগেন্দ্র সেন (৬৪), এস্টেটের একজন কর্মচারী, সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত। বিচারের সময় তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়, সে জয়দেবপুরে বাস করত তার ভাগ্নের সাথে যে ছিল এস্টেটের সহকারী রেকর্ড-রক্ষক। একজন দোকানদার তার বিরুদ্ধে একটি ডিক্রি পায় এবং সে তার ঘরটি দিয়ে এটা মেটায়।

একজন পদচ্যুত নায়েব

(১১) প্র: বা: সা: ২২— রাইমোহন মজুমদার (৫১) একজন প্রাক্তন নায়েব, এস্টেটের দ্বারা পদচ্যুত হয়েছিল, পরবর্তী নিয়োগকর্তা দ্বারাও পদচ্যুত হয়েছিল।

তৃতীয়ের দ্বারাও কর্মচ্যুত হয়েছিল; প্রতিমাসে পেত ১৫ টাকা এবং খাদ্য। বাড়িটি বন্ধক প্রাপ্ত ছিল।

একজন জালিয়াত

(১২) প্র: সা: ২৩— আবদুল ওয়াজিদ, নিজেকে বলত তালুকদার, খাজনা পেত বছরে ১০৮ টাকা। ভুলে গিয়েছিল কখনো সে জেল খেটেছিল। কিন্তু চাপ দিলে স্বীকার করেছিল মুদ্রা জাল করার জন্য ৭ বছর সাজা হয়েছিল। ফণীবাবুর একজন প্রজা।

একজন নীচুজাতের ব্রাহ্মণ

(১৩) প্র: সা: ৩২— শরৎ চক্রবর্তী (৭৫), একজন নমশূদ্র ব্রাহ্মণ, সাক্ষ্য দিয়েছিল, সত্য বা মিথ্যাভাবে। কুঁড়েতে জিনিসপত্র বিক্রি করত। ১০ টাকার ডিক্রী মেটাতে ৪ বছরের কিস্তি নিয়েছিল।

(১৪) প্র: সা: ৪২— শ্রীনাথ রায় (৪১), ১৯০৬-০৮ সাল পর্যন্ত জয়দেবপুর স্কুলে ছিল। বর্তমানে বেকার। ৮ কাঠা জমি আছে। আশু ডাক্তারের হয়ে বর্গা সংগ্রহ করে এবং যখন সে কলকাতায় যায়, তার ভাইয়ের বাড়িতে অবস্থান করে।

(১৫) প্র: সা: ৭৭— বসন্ত বল (৫০), এস্টেটের কর্মচারী, ১৩১৩ থেকে ২১ সন পর্যন্ত কেরানিগিরি করেছে। বর্তমানে ১৮ টাকা বেতনে কোথাও কোন কাজ করে, বলেছে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু অস্বীকার করবার পর আবার স্বীকার করে। বর্তমানে বেকার। বছরে ৭০ টাকা ছাড়া আর কোন উপার্জন নেই, যদি এটা সত্য হয় । জমি থেকে ৪০ মন ধান পাওয়া যায়।

অসময়ের মৃত্যু নয়!

(১৫) প্র: সা: ৭৮— মনমোহন ব্যানার্জি (৬৫), ফরিদপুরবাসী। সে স্বীকার করেছে ঢাকাতে সে জামাইয়ের কাছে বাস করে কিন্তু বলেছে সে টাকা কম পড়লে প্রদান করে। সে বলেছে গ্রামের বাড়িতে তার একটি অংশ আছে । বাড়িটি তৈরি করেছে তার ভাই এবং তার ছেলেরা , কিন্তু সে বলেছে ২০ টাকা মাইনে থেকে সে কিছু ব্যয়ভার বহন করেছে। বিশ্বাস করা যায় এইসব সাক্ষীরা প্রত্যেকে কুমারকে জানে বা দেখেছে। এটা বিবেচনা করতে হবে যে তারা সত্য বলছে কিনা কিন্তু এই সাক্ষী কুমারকে দেখেও নি বা তার সম্বন্ধে কিছু জানেও না। সুতরাং সন্দেহ করা হয় যে বালিগঞ্জে আদৌ কাজ করত কি না, তার মতে সে করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সে বলেছে, সে জয়দেবপুরে উপস্থিত ছিল যখন কুমারের মৃত্যু সংবাদ এসেছিল। কিন্তু সে বলতে পারে না এটা অকালমৃত্যু।

একটি ফৌজদারী মামলার একজন অভিযোগকারী

(১৭) প্র: সা: ৮৭ সৌভাগ্যচন্দ্র শেঠ (৪৫), লাভচাঁদ মতিচাঁদের পুত্র, রত্ন প্রতিষ্ঠান যার কথা আগে উল্লেখিত। সে কুমারকে শেষবার কলকাতায় দেখে যখন তার বয়স ১৮ বছর। তার কাকা মতিচাঁদ, একজন অংশীদার, জীবিত এবং তার তথ্য অনুসারে কুমারকে দেখার অনেক সুযোগ ছিল। তাকে ডাকা হয়নি। যদিও ভাগ্নেকে না ডাকার ভাল কারণ ছিল। আলিপুর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সত্যবাবুর সামনে একটি ফৌজদারি মামলায় সে একজন অভিযোগকারী ছিল এবং ৪-৪-৩৪ সালে সে ঢাকায় আসে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং মামলাটি মুলতুবি রাখার সময় সে ফিরে যায়। এই তালিকায় কিছুই নেই, কিন্তু এই মামলাটি চলাকালীন সে একজন সাক্ষী হিসাবে নির্বাচিত হয়।

পরমসেবার জন্য পুরস্কার

(১৮) প্র: সা: ৯২— ফণিভূষণ ব্যানার্জি (৪৮)। সে হচ্ছে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের সৎ বোন পূর্বোক্ত স্বর্ণময়ীদেবীর নাতি। এটা স্মরণ হবে যে এই মহিলা তার স্বামীসহ রাজবাড়ির একটি অংশে ১৩০০ বা ১৩০৩ সাল পর্যন্ত বাস করেছে। এরপর সে নয়াবাড়ি বলে পরিচিত জয়দেবপুরে নদীর ধারে অবস্থিত তার নিজের বাড়িতে উঠে যায়। এই মহিলার দুই কন্যা ছিল, কমলকামিনী ও মোক্ষদা। কমলকামিনী বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং ফণিবাবু ও তার বোন শৈবলিনী প্রতিবাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল এরা হল মৃত মোক্ষদার সন্তান। স্বর্ণময়ী সম্পত্তির একটি বড় বিষয় রেখে গিয়েছিল, যার খাজনা ছিল ১০,০০০ টাকা এবং ফণিবাবু স্বীকার করেছে যে দলিলে এমন একটা সুযোগ ছিল যে এটা বোনের ছেলেদের অংশে যাবে না। যাইহোক কোর্ট অব ওর্য়াডস্ ১৯১৭ সালে স্বর্ণময়ীদেবীর মৃত্যুর পর এই গোলযোগ এড়াতে একটি মামলা আনে যে স্বর্ণময়ীদেবীর সম্পত্তি হিসাবে তার শর্ত অনুসারে বর্তমানে এটা ফণিবাবু ও তার ভাইয়ের ছেলের দ্বারা দেখাশোনা করা হবে। এই মামলা তুলে নিয়ে বাহ্যত আরেকটি নতুন মামলা আনা হয় যে একজন কন্যা হিসাবে কমলকামিনী এখনো জীবিত এবং এটা তুলে নেওয়া হয়েছে নির্বাহক পাকড়াশীর অনুরোধে যে ফণিবাবুর শ্বশুর। এটা হয়েছিল ১৯২৪ সালে এবং মতামত হচ্ছে যে ফণিবাবু এই সমস্ত সুবিধা পেয়েছিল যেমন বকেয়া খাজনার বিশাল অঙ্কের সুদ মকুব, সাধুর বিপক্ষে তার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে। ফণিবাবু একথা স্বীকার করে। সে স্বীকার করেছে ৬০০০ টাকা মকুবের কথা, কিন্তু স্বীকার করেনি যে এটা সাধুর বিপক্ষে তার কাজের জন্য নয়। একটি চিঠিতে (এক্সি ২২০৮) এই মকুবের কারণ এবং সহজ কিস্তি বিষয়ে বলা হয়েছে "এস্টেটের প্রতি বর্তমান প্রতিকূল অবস্থায় ফণিবাবুর বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সেবা।" প্রত্যেকে জানে সাধু ছাড়া আর কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু যে ব্যাপারটি বাকী থাকে তা হচ্ছে যে ফণিবাবু পুনরধিকারের ঝুঁকি জানত যার জন্য ১৯২৪ সালে প্রথম রানীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হচ্ছিল, এমনকি পূর্বতন মামলা তুলে নেওয়ার পরেও। সে স্বীকার করেছে যে তার এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দ্বারা অধিগৃহীত হওয়া উচিত, যেটা করা হয়েছিল, বিবদমান স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ১ম রানীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও। যদিও 'সিরাম' কে অধিগ্রহণের বাইরে রাখা হয়েছিল এবং ফণিবাবুর দ্বারা অনুমোদিত এক অপ্রতিরোধ্য কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। যাইহোক, ফণিবাবু সেজন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি বা রানীদের দুজনকে অখুশী করতে পারেনি। এই সাক্ষীর কৃতিত্ব পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছিল। এক ধরনের অনুশীলন পুস্তক তার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে সে মেজকুমারের শিক্ষা ও সাধাবণ জ্ঞান সম্বন্ধে ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে নীচে বলা হবে।

(১৯) প্র: সা: ৯৩ গিরিশ বিশ্বাস, জয়দেবপুরে এস্টেট দ্বারা কার্যবত জকি মাইনর বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। তাকে এস্টেটের একজন কর্মচারী বলা যায়।

একজন অধ্যাপক

(২০) প্র: সা. ৯৮, আশুতোষ দাশগুপ্ত (৪৭), কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের একজন অধ্যাপক।

(২১) প্র: সা· ১০০, রমেশ সরকার (৪৫), যার পিতা জীবিত ছিল। পুত্রকে শিক্ষিত করবার কোন উপায় ছিল না। পিতা, একজন সামান্য মানুষ। প্র: বা: সা: ১০৮-এর সম্পর্কিত।

(২২) প্র: সা: ১০৮, উমেশচন্দ্র দে সরকার (৪৮) , রাজপরিবারের পূর্বোক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আরেকজন পণ্ডিত। বেতন ২০ টাকা। উল্লেখ করা হয়েছে ওঝার ঘটনার সাথে এই সাক্ষীর সম্পর্ক ছিল, কোন গোলমাল নয়, কোন প্রভাব নয়, কেউ ১৯২১ সালের ৪ঠা মে পর্যন্ত তাকে মেজকুমার সন্দেহ করে দেখতে আসেনি।

(২৪) প্র: সা: ১২২, রমানাথ বিশ্বাস (৫৫), গিরিশ বিশ্বাসের ভাই।

তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বী

তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বী, যদিও নিজেকে বলে তালুকদার।

(২৪) প্র: সা: ১২৪, সতীশ মিত্র (৫৪), ১৩১৯ সালে ভাওয়ালে কায়েম হয়েছিল। যে বলেছে ১৩১৪ সালের ফাল্গুন মাস থেকে জমিটি পেতে যাওয়া আসা করছিল এবং ১৩১৯ সালে এটা পেয়েছিল অর্থাৎ মেজকুমারের তথাকথিত মৃত্যুর তিনবছর পর। নিজের কোন বাড়ি ছিল না। কুমার সম্বন্ধে অবশ্য কিছুই জানত না (যতদিন না জমি পেতে যাতায়াত করছিল) কিন্তু নাক, ঠোঁট ইত্যাদির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি প্রমাণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

(২৫) প্র: সা: ১২৯, যোগনেশ্বর চক্রবর্তী (৬০), আরেকজন তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বী, ছয় মাস সংস্থানের জন্য যথেষ্ট জমি ছিল এবং তার শিষ্যের কথা বলেছে ও তার ছেলের বেতন ৮০ টাকা। তার নিজের ধার ছিল ৩০০০ টাকা।

(২৬) প্র: সা: ১৫৮, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী (৫২), ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এস্টেটের একজন সার্ভেয়ার রূপে কাজ করেছে। ঋণের জন্য তার অবস্থা অবশ্যই খারাপ ছিল এবং যা সে বলেছে তার একটি বাড়ি ও একটি তালুক থেকে বছরে ২৫০ টাকা আয় হত। কমিশনের সামনে জেরা করে জানা গিয়েছিল সর্বমোহন চক্রবর্তীর একজন আত্মীয়।

(২৭) প্র: সা: ১৮৩, সুরেশচন্দ্র ঘোষ (৪৯), নিজেকে তালুকদার বলে পরিচয় দিত, কারণ তালুক থেকে সে বছরে ৪০০ টাকা আয় করত। এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, কেননা তাকে ঢাকায় আনা হয়েছিল একজন পিওনের দ্বারা।

(২৮) প্র: সা: ২৮০ সুকুমারী দেবী (৪২), ১ নং প্রতিবাদীর একজন সম্পর্কিত বোন। ১৩০০ সনে তার জন্ম, ১৩১৩ সালে বিবাহ এবং এর দুবছর পর স্বামীর বাড়িতে গমন করে এবং এই সময়ে সে মেজকুমারকে দেখেছিল।

(২৯) প্র: সা: ২৮১ প্রমথ চক্রবর্তী (৪৮), মাসিক ৭ টাকা মাইনের একজন শাখা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার। বলেছে বার্ষিক ৪৫০ টাকার একটি তালুক এবং জমি ছিল। সর্বমোহন চাক্রবর্তী তার বোনের স্বামী, কমিশনে জেরাকৃত।

এক বিচিত্র সাক্ষ্য

(৩০) প্র: সা: ২৮৩ কালীমোহন চক্রবর্তী। তার ছেলে এস্টেটের একজন কেরানি ছিল। সে নিজেকে রাজ পরিবারের আশ্রিত বলত এবং প্রমাণ করতে এসেছিল মেজকুমারের শ্রাদ্ধে কী ঘটেছিল ও বলেছিল টাঙ্গি থেকে এ বি রেলে সে এসেছিল, তাকে রেলের ভাড়া দেওয়া হয়েছিল, যদিও এ বি রেলের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি পরে।

(৩১) প্র: সা: ২৯২, এ-এম এ হামিদখান সাহেব (৪৫), বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেজকুমারকে দেখেছিল। সে বলেছে, " আমি মনে করি, তাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে একটি ভাল মতামত আছে আমার। " চিন্তা করেনি বাদী হচ্ছে মেজকুমার, কিন্তু স্বীকার করেছে সে ভুল করতে পারে।

প্রধান তদবিরকারী

(৩২) প্র: সা: ৩১০, রায়সাহেব যোগেন্দ্র ব্যানার্জি। ১৯০৪ সাল থেকে এস্টেস্টের সেবায়। সেক্রেটারি বলে পরিচিত। ১৯৩৩ সালে পদচ্যুত হয়েছিল। তখন থেকে এই মামলার জন্য এস্টেটের প্রধান তদারককারী ছিল। পুনর্নিয়োগের জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছিল। কিন্তু আশা করেনি গৃহীত হবে, সে বলেছে।

(৩৩) প্র: সা: ৩৪৮, রায়সাহেব উমেশ ধর। ২০ বছর ধরে কালিগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি; এখনো ইউনিয়ন কোর্টের সভাপতি কালিগঞ্জ রাজেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যালয়ের সভাপতি যেটা এস্টেট থেকে ব্যাপক সাহায্য পেয়েছিল। কালিগঞ্জ রাজ-ঔষধালয়ে আর একজন ভাই কর্মরত ছিল, এক বোনের ছেলে সেখানে ডাক্তার ছিল, আরেকজন ভাই ছিল নায়েব যখন সে কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিল। পাঁচভাইয়ের একজনের এক তালুক ছিল যার বার্ষিক আয় ছিল ২,৫০০ টাকা।

সে বলেছে, ফণিবাবুর দ্বারা আহ্বায়িত একটি মিটিঙে সে সভাপতিত্ব করেছিল ১৯২১ সালে, আগস্ট মাসে। সেখানে ঘোষণা করেছিল সাধু একজন ঠগ এবং সাধুর বিরুদ্ধে কিছু আঞ্চলিক মত আছে। এই মিটিঙে আর কেউ বিবৃতি দেয়নি।

বহুকথিত ডাক্তার

(৩৪) প্র: সা: ৩৬৫, ডা: আশুতোষ দাশগুপ্ত যে মেজকুমারের সাথে দার্জিলিঙে গিয়েছিল।

(৩৫) প্র: সা: অবনীকান্ত মুখার্জি; (৪৬), অন্যায়ভাবে তার বয়স বাড়িয়েছিল। দেখা যাচ্ছে সে বলেছে সেও তারিণীময়ীদেবীর সমান বয়স্ক যে ১৮৯৩ সালে জন্মেছিল। ১৯০৯ সালে সে ১৫ বছর বা এই রকম বয়স্ক ছিল, কিছু তালুকের কথা বলেছে, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সন্দেহমূলক তথ্য দিয়েছে— বেকার,

(৩৬) সৈয়দ আলি হোসেন, সদস্য, ইউনিয়ন বোর্ড,অন্য পক্ষের প্রচুর সাধারণ প্রজার চেয়ে কিছু উত্তম।

(৩৭) জয়কালি কোহলী, উকীল, এস্টেটের একজন কর্মীর জামাই।

(৩৮) মেজরানী ।

(৩৯) তৃতীয় রানী।

(৪০) গৌর মজুমদার, কলকাতার সাধারণ মানুষ, বলেছে ১৯০৫, ৬, ৮ সালে সে কুমারকে দেখেছিল কলকাতায় এবং ১৯০৬ সালে জয়দেবপুরে । এদের অতিরিক্ত কমিশনে ১৩ জন সাক্ষী ছিল। এদের সঙ্গে ছিল মিঃ ও মিসেস মেয়ের ও মিঃ জে এন গুপ্ত সহ ১৬ জন সাক্ষী, কমিশনের সামনে যাদের জেরা করা হয়েছিল ও যারা সনাক্তকরণ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল।

গণ্য সাক্ষ্য

এই ৫৩ জন সাক্ষীর মধ্যে শুধু নিম্নোক্তরাই গণ্য, বাদবাকীরা হচ্ছে এমন মানুষ যে তাদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরুদ্ধমত কোন কিছুই নির্ণয় করতে পারে না। এটা বলা যেতে পারে কিছু সাক্ষীকে কমিশনের সামনেও জেরা করা হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু বিচারক তাদের দেখেনি, সেহেতু তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা উচিত। এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে বর্তমানে মেজকুমারের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বা বাদীর কথা বা অন্যান্য বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে না। এই জন্য সাক্ষ্যের ভেতরে যেতে হবে, যখন যে বিষয়টি উত্থাপিত হবে, কর্মীদের সাক্ষ্য এবং এমনকি সাধারণ প্রজাদের সাক্ষ্য সহ। এটা এখন বিবেচনা করা হবে সনাক্তকরণের বিষয়ে তাদের প্রকাশ্য বিরুদ্ধ মতামত কতদূর আদালতের কাজে লাগবে, কতদূর এটা সেইসব মানুষের বিরুদ্ধমত যারা মেজকুমারকে মনে রেখেছে বা যারা তাদের প্রকৃত মতামত জাহির করতে পারে তাকে।

এদের দুটি শ্রেণীতে ফেলার পরিবর্তে আমি (বিচারক) সেই সমস্ত সাক্ষীদের উল্লেখ করব যাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠেনি বা যাদের কৃতিত্ব অনভিযোগ্য বলে বিবেচিত; যে কোন স্মৃতিলোপের বা ভুলের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য উপস্থিত হতে পারত; এবং এটা দৃষ্ট হবে, অবশ্যই, যে শুধু একজন সাক্ষী পরিচয় ঘোষণা করতে অসমর্থ।

একজন এ ডি সি

(১) প্র: সা: ১ , লেফটানেন্ট কর্নেল পুলি (৪৮)।

যাকে সবচেয়ে আগে জেরা করা হয়েছিল এই মামলায় যখন সে ইংল্যান্ড যাওয়ার পথে। ১৯১৯ সালে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত। ১৯১৪ সালে অক্টোবরে ভারতে আগমন। বাঙলাভাষা জানে না।

সে বলেছে, ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে সে স্যার ল্যান্সলটের এ ডি সি হিসাবে যোগদান করে এবং ১৯১২ সালের মার্চ পর্যন্ত কাজ করে যখন রাজ্যটি বাজেয়াপ্ত হয়। সে, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সম্মানিত লেফটানেন্ট গর্ভনরের সঙ্গে ঢাকায় কাটায়। সে বলেছে, ১৯০৯ সালে সে কুমারদের খুব কাছে আসে, সম্ভবত এক সামাজিক অনুষ্ঠানে গভর্নর হাউসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে লর্ড কিচেনারের শিকারের সম্পর্কে। লর্ড কিচেনার জয়দেবপুরে শিকারে যাচ্ছিল এবং এর পূর্বে, সাক্ষী মেজকুমারের সাথে প্রায় ৬ বার শিকারের ব্যাপারে দেখা করে— আয়োজন সম্পূর্ণ করতে। ক্যাপ্টেন ডেনিং, ব্যক্তিগত সচিবকে এই

আয়োজন করতে হয়েছিল এবং সাক্ষীকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। মেজকুমার তার সাথে ইংরেজিতে কথা বলত এবং প্রত্যেক কুমারই তাই বলত এবং "যে ভাবে তারা কথা বলত, তাতে আমার মনে করা উচিত তাদের একজন ইংরেজি শিক্ষক ছিল বা কোন ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করত।"

সে মনে করে বাদী মেজকুমার নয়। এই তথ্যের প্রত্যেকটি কথা স্থানচ্যুত হয়েছে কিছু তারিখ ও সাক্ষীর নিজের অনুমোদনের দ্বারা। সে বলেছে, 'সে লোকটা পিয়ার্সের এ ডি সি হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। আসাম গেজেট (১৯০৮, ৩০ শে ডিসেঃ) প্রমাণ করে লেফটানেন্ট পিয়ার্স ১৯০৯, ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকরী ছুটির জন্য অনুমোদিত হয়েছিল বা যে কোন দিন সে স্থানটি নিতে পারত এবং সম্মানিত লেফটানেন্ট গভর্নরের ভ্রমণসূচী প্রমাণ করে যে ক্যাপ্টেন পুলি ১৯০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তার একজন কর্মী হিসাবে ঢাকায় অবতরণ করে। স্বীকার করে সে এইদিন আগমন করে, তার পূর্বে নয়, এই স্বীকৃতি এই তারিখের পূর্বে কুমারের সাথে তার সমস্ত সম্পর্ককে মুছে ফেলে।

কতদূর সঙ্গতিপূর্ণ

লর্ড কিচেনার নারায়ণগঞ্জ থেকে বিশেষ ট্রেনে করে জয়দেবপুরে এসেছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা থেকে নয়। কুমার ১০ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে ফিরেছিল (এক্সি: ৬৮ দেখ এবং উপরোক্ত তারিখের পূর্ণ বিবরণ)। এইভাবে কুমারদের সাথে কর্নেল পুলির সাক্ষাৎকারের ও ১২ই ফেব্রুয়ারি বা পরের দিন ঢাকায় আগমনের সময় স্থগিত শিকার বিষয়ে আলোচনার এক সম্ভাবনা বাকি থাকে। পুলি জ্যেষ্ঠ কুমারকে এক কাউন্সিলের মিটিং-এর মধ্যে দেখেছিল প্রথমে যখন সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এবং শৌচাগারে যাওয়ার পথ খুঁজছিল। সেদিন বড়কুমার প্রথমবার বিধান পরিষদে বসেছিল। গেজেটে দেখা যাচ্ছে সে স্বীকার করেছিল যে সে প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন ভুল দিয়েছিল। এই আলোচনা ছিল শিকার বানচাল হওয়ার ব্যাপারে।

এখন কেন এই ভদ্রলোক যে ঢাকায় এসেছিল, ১৯ বছরের এক যুবক অফিসার হিসাবে ১২ই ফেব্রুয়ারি এবং যে ২২শে জুনের আগে বড়কুমারকে ছাড়া আর কোন কুমারকে আদৌ দেখেনি এবং সেই দিন কুমারদের সাথে তার সাক্ষাৎকার শিকারের আয়োজন বিষয়ে আলোচনা করতে। সুতরাং লর্ড কিচেনার এক সপ্তাহের জন্য ঢাকায় অবস্থান করছিল বা তার পূর্বে সে কী আদৌ কুমারকে জেনেছিল? কারণ পরিষ্কার। তাকে বলা হয়েছিল কয়েকটি ব্যাপার ঘটেছে এবং সবকিছু তার সময়ে। উদাহরণস্বরূপ তাকে বলা হয়েছিল যা সে স্বীকার করেছে যে কুমারদের একজন ইংরেজি শিক্ষক ছিল এবং যেভাবে তারা ইংরেজি উচ্চারণ করত তাতে সে মনে করেছিল যে তাদের একজন ইংরেজি শিক্ষক ছিল বা তারা কোন ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছে। সে বলেছিল যে প্রথম কুমার অন্য দুই কুমারের চেয়ে ভাল ইংরেজি বলে, তবে তার ইংরাজি গতানুগতিক ও ভুল উচ্চারণবিশিষ্ট, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হয়ত সে আগেরদিন আদালতে স্বতন্ত্র কিছু বলতে চায়নি,

সে জানত না, কি বলতে হবে যতক্ষণ মিঃ চৌধুরি তাকে কোন পরামর্শ দিয়েছিল এবং সাক্ষী এটাকে আঁকড়ে ধরেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষক বলতে সে ইংবাজি শেখানোর ভারতীয় শিক্ষক বুঝিয়েছে কি না, সে স্বীকার করেছিল যে সে এটা বলতে চায়নি এবং এই বলে শেষ করেছিল যে তাকে বলানো হয়েছিল কুমারদের একটা ইংরাজি শিক্ষক ছিল এবং যা থেকে মনে হয়েছিল যে ভাবে তারা কথা বলেছে তাতে তারা অবশ্যই শিক্ষকের থেকে এটা শিখেছে। এটা মনে করা হয় না যে এই ভদ্রলোক ভেবেছিল যখন সে কিচেনারেব শিকার সম্বন্ধে কথা বলছিল বা এটা ঘটার পূর্বে কুমারদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করছিল বা ইংরাজি উচ্চারণের কথা, তখন সে আদালতেব কাছে 'অসত্য বহন করছিল।' সে যা বলেছিল তা একজন 'সুশিক্ষিত , সুমার্জিত অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে খাপ খায়। এটা পরিষ্কার এবং প্রমাণিত হয়েছিল যে ২রা ফেব্রুয়ারির পূর্বে কোন কুমারকে দেখেনি, ঐ দিন শুধু বড়কুমারকে সে দেখেছিল এবং যদিও ২২ ফেব্রুঃ ও ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে মেজকুমারকে দেখার একটি সম্ভাবনা ছিল যখন মেজকুমার দার্জিলিঙে যাত্রা করছিল, এটা বাদ দেওয়া হয়নি, সে নিশ্চয় ছোটকুমারকে মেজকুমারের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিল যাকে সে নিশ্চিতভাবে জানত— ১৯১৩ সালে ছোটকুমারের মৃত্যু হয় বা সে বলত না যে বাদীর সাথে মেজকুমারের সাদৃশ্য স্থূলতায়— "এদের উভয়েই সামান্য মোটা।" এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে মেজকুমার সুগঠিত, সুকাঠামোযুক্ত, মোটা নয়, ছোটকুমার যেরকম ছিল এবং মিঃ চৌধুরী তার মতামতে বাদীর এই স্থূলতা একটি বৈসাদৃশ্য হিসাবে ধরেছিল।

এই সাক্ষী, মনে করা হচ্ছে এবং ১৯০৯ সালে সে মেজকুমারকে দেখেছিল ২রা ফেব্রুয়ারি পর এবং বাদীকে দেখেছিল ১৯৩৪ সালে আদালতে এবং তার সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে সে সনাক্তকরণের ব্যাপারে বলার অযোগ্য। এটা পরিষ্কারভাবে নিশ্চিত যে অন্যান্য বিষয়ের মত তাকে বলানো হয়েছিল বাদী একজন প্রতারক, কেননা সে বলেছে যে সে জানত কখন সে আদালতে আসবে বাদীকে দেখতে ও তার পরিচয় সম্বন্ধে কথা বলতে যে তার সাক্ষ্য বাদীর বি পক্ষে যাচ্ছে।

অদ্ভুত প্রভাব

(২) প্রঃ সাঃ— জে এন গুপ্ত, আই সি এস, (অবসরপ্রাপ্ত)

১৯০৮ সালের গ্রীষ্মকালে বিশেষ কার্যে ঢাকায় আসে এবং প্রায় ১৫ দিন এখানে থাকাকালীন মিঃ আলটাপ আলি তাকে শিকারের জন্য জয়দেবপুরে নিয়ে যায়। হাতিতে চড়ে শিকারে গমন, সাথী তিনজন কুমার। এটাই ছিল কুমারদের সাথে তার সামগ্রিক পরিচয়। সে বাদীকে দেখল ২৫ বছর পর ১৯২৫ সালে বিচারক দ্বারকা চক্রবর্তীর কাছ থেকে পরিচয় শোনার পর, কিছু বার্তা বিনিময় হল তার সাথে, দেখল সে বাঙলা বলতে পারেনা বা হিন্দী উচ্চারণে বাংলা বলে এবং দু-এক মিনিট লাগল সিদ্ধান্ত নিতে এই টুকু সময়ই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল— মানুষটি একজন প্রতারক। বিধিসম্মতভাবে বিষয়টি তার সামনে ঘটেনি, সুতরাং সে বলেছে; সে পর্যাপ্ত সতর্কতা নেয়নি তার মতামতের জন্য। এটাই হচ্ছে তার সাক্ষ্য। এটা

সাক্ষীর বক্তব্যের সূত্র থেকে বিবেচনা করা হবে, কিন্তু সনাক্তকরণের সাক্ষী হিসাবে সে অব্যবহার্য। সাক্ষী স্বীকার করেছে বাদীর সাথে মেজকুমারের একটি সাধারণ সাদৃশ্য আছে— শুধু এই একমাত্র সাক্ষীই এটা স্বীকার করেছিল, জ্ঞাতানুসারে, কিন্তু তাকে মোটা দেখাচ্ছিল— তা হচ্ছে ২৪ বছরের যুবকের চেয়ে মোটা, যাকে সে ১৯০৮ সালে শিকারের সময় দেখেছিল। এমনকি এটা সাময়িকভাবে মেনে নেওয়া যেতে পারত রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য হিসাবে সে সাক্ষ্যটি দেখেছিল, যা সংগ্রহ করা হয়েছিল ও ১৯২৫ সালের পূর্বে বোর্ডের কাছে প্রেরিত হয়েছিল এটা প্রদর্শন করতে যে কুমার মৃত।

একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভিস কর্মী

(৩) মিঃ কে সি দে, আই সি এস (অবসরপ্রাপ্ত) রেভিনিউ বোর্ডের একজন সদস্য। তার কার্যক্ষেত্র ছিল ঢাকায় ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১১ সালের মার্চ বা এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের সমবায় সমিতির রেজিস্টার হিসাবে এবং তার প্রধান কার্যালয় ছিল ঢাকা বা শিলঙে। ঢাকার অবস্থান ছিল নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কর্নেল পুলি যেমন বলেছিল।

এই ব্যক্তি ১৯০৬ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা রেলস্টেশনে কুমারকে একবার দেখেছিল এবং আরো একবার একই মাসে বা পরের মাসে সরকারী বাড়িতে এক উদ্যান মজলিশে। দুটির একটি উপলক্ষে সে তিনজন কুমারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল ও সে ইংরাজিতে তাদের সাথে কথা বলেছিল। পরবর্তী অনুষ্ঠানে তারা সাধারণ লোকের মত বাগানে পায়চারী করছিল। তারপর সে আরো বলেছে যে বিভিন্ন সামাজিক ও বৈষয়িক অনুষ্ঠানে অবশ্যই কুমারদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। কিন্তু কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা মনে করতে পারে না।

সে বলেছে সে বিভিন্ন উপলক্ষে সাধুকে দেখেছিল, ১৯২৪ সালে কলকাতায় প্রথম যখন হেতমপুরের রাজার দ্বারা সাধুকে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং পরে কলকাতার এক অনুষ্ঠানে, কলকাতার রাস্তায় ও সবশেষে ১৯২৬/২৭ সালে সে মতামত দিয়েছিল যে বাদী, যদি সে কোন তদন্ত বা কিছু চেয়ে থাকে, তাহলে তার আবেদন করা উচিত ছিল এবং এই দরখাস্ত ৮-১২-২৫ সালে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং যা সে শুনেছিল প্রত্যাখান করেছিল ১৪-২-২৭ তারিখে এই ভিত্তিতে যে বোর্ডের তদন্ত করবার কোন ক্ষমতা নেই।

স্মৃতির চাতুর্য

সাক্ষী সাময়িকভাবে সাক্ষ্যের মধ্যে সুস্থাপিত হয়েছিল যা বাদীর মৃত্যুকে ও তাকে বাঙালি বলে প্রমাণিত করতে সংগৃহীত হয়েছিল, দরখাস্ত ও কমিশনারের কাছে রিপোর্টে ও আদালতে তার সাক্ষ্যে এটা দেখা যাচ্ছে।

১৯২৫, আগস্টে বাদীর সাথে ঢাকাতে অভিযোগে বর্ণিত সাক্ষাৎকার উল্লেখ করা হবে সংক্ষিপ্তভাবে যেহেতু এটা সনাক্তকরণের ব্যাপারে তার সাক্ষ্যের মূল্যকে বহন করবে। সে বলেছে ১৯২৬/২৭ সালে ঢাকাতে বাদী তাকে দেখেছিল। সে বলেছে বাদী একজন উকীলের সাথে এসেছিল। সে বলেছে যে খুব সম্ভবত জ্যোতির্ময়ীদেবীর কাছ থেকে একটি চিঠির উত্তরে

এই সাক্ষাৎকার গ্রাহ্য হয়েছিল। চিঠিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে জ্যোতির্ময়ীদেবীর তার নিজের পরিবর্তে সার্কিট হাউসে জামাইকে পাঠানো উচিত ছিল এবং জামাই চন্দ্রশেখর বাবু গিয়েছিল। এই সাক্ষ্য সে বহুদিন পূর্বে দিয়েছিল। এবং এই সাক্ষাৎকারে মিঃ দে বাদীকে স্বয়ং, রাম বা শ্যামের দ্বারা নয়, তদন্তের জন্য একটি দরখাস্ত দিতে পরামর্শ দিয়েছিল। মিঃ দে সবকিছু স্বীকার করেছে এবং বলেছে এই উপলক্ষে বাদীও এসেছিল এবং জামাই ও উকীলও এসেছিল। তারপর আবার বাদী ১৯২৬ সালে একজন উকীলের সাথে এসেছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে কী চায়, বাদী বলেছিল "আমি ফকির মানুষ, টাকাপয়সা নিয়ে কী করব?" মিঃ দে পরামর্শ, উপদেশ দিয়েছিল একটি দরখাস্তে জানাতে সে কী চায়। যাই সে চাক না কেন সে সংগ্রহ করতে পারবে এবং এই কারণে সে একটি দরখাস্তের পরামর্শ দিয়েছিল যাতে বাদী ফিরে আসতে পারে। সে বলেছে ১৯২৫ সালের এই সাক্ষাৎকারে বাদীর গেরুয়া আলখাল্লা ও লম্বা চুল ছিল।

এটা পরিষ্কার যে ১৯২৬ সালের এই সাক্ষাৎকার কোন ঘটনা ছিল না। সে ১৯২৩ সালের সাক্ষাৎকারের সাথে এটাকে গুলিয়ে ফেলছিল যখন জ্যোতির্ময়ীদেবী জানায় তাকে সার্কিট হাউসে দেখেছিল এবং যে সাধুকে সে প্রথমবার কলকাতায় দেখেছিল তার সাথে মিশিয়ে ফেলেছিল। যখন এই পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্যের সম্মুখীন হল, তখন ঢাকাতে বাদীর সাক্ষাৎকারের সাথে এর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করল এমন সব কথা বলে যা কেউ বুঝতে পারল না এবং তারপর ফলস্বরূপ সাক্ষাৎকারের বছর হিসাবে ১৯২৬ সালকে স্থির করা হয় যেখানে বাদী বলেছিল সে একজন ফকীর। কেননা সে তাকে আদৌ দেখেনি পূর্বে, যখন ১৯২৪ সালে সে কলকাতায় ছিল। কিন্তু ঘটনার পরস্পরবিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল যে বাদী ১৯২৬ সালে কলকাতায় ছিল। মিঃ দে যে বলেছে শুরু থেকেই সে প্রভাবিত ছিল না অর্থাৎ ১৯২৪ সালে কলকাতায় তাকে দেখার সময় থেকে— ১৯২৬ সালে সাক্ষাৎকারের দ্বারা এই দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চিত হয় যে বাদী একজন ঠগ, কিন্তু পরামর্শ দিয়েছিল তদন্তের জন্য দরখাস্ত করার— কিন্তু সমস্ত দিন দরখাস্ত শোনবার পর সিদ্ধান্ত নেয় তদন্ত কোন কাজের হবে না কেননা সে তার ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে বিশ্বাস করেছিল বাদী একজন ঠগ। কিন্তু মনে হয় মিঃ দে নিজের প্রতি সুবিচার করেনি। ১৯২৩ সালে সে দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়েছিল এটা সে স্বীকার করেছে, যখন সে বাদীকে আদৌ দর্শন করেনি, আবার এও স্বীকার করেছে যে সে বাদীকে প্রথম দেখেছিল ১৯২৪ সালে এবং কলিকাতায় এবং দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার হয়েছিল এবং ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার মতামত দিয়েছে যেটা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। স্মৃতি তার সাথে এক অদ্ভুত ছলনার খেলা খেলেছিল, এই সাধুকে ১৯২৩ সালের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে মিশিয়ে এবং তারপর এটাকে স্থাপন ১৯২৬ সালে, ঢাকায় তাকে গেরুয়া পরিয়ে, জটা আবৃত করে যা সাধুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, যদিও এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে বাদী বাবু হয়ে যাচ্ছিল, ১৯২৪ সালে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করবার পূর্বে বাঙালির মত পোশাক পরিধান করছিল এবং বাঙলা কথা বলেছিল মিঃ চন্দরের সাথে তা সে যে উচ্চারণেই হোক বা যে ধরনের বাঙলা হোক না কেন।

একটি অব্যবহার্য সাক্ষ্য

বাদীকে দেখবার পর এবং তার সম্বন্ধে গোপনে সংগৃহীত তথ্য পড়বার পর তার মনে সত্যিই কী ঘটেছিল তা এখানে ফুটে ওঠে।

জেরায় সে বলেছে "আমার মতে বাদী মেজকুমার নয়।"

প্রঃ- কেন না?

উঃ- কারণ মেজকুমার মৃত।

প্রঃ- ভাওয়ালের মেজকুমার ও বাদীর মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে?

উঃ- উভয়ে ফর্সা, উভয়ের নীল চোখ, কিন্তু সন্ন্যাসীকে মোটা দেখতে, অশিষ্ট হাবভাব, মনে হয় চাষার ছেলে, রাজার নয়।

জেরায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল :

প্রঃ- যে কেউ বাদীর সাথে মেজকুমারের সনাক্তকরণ সম্বন্ধে এজাহার দিয়েছিল, তা কি অবশ্যই অসত্য বলে মেনে নেবেন আপনি?

উঃ- নিশ্চয় না। আমার ভুল হতে পারে। মিঃ ঘোষালের ভুল হতে পারে। এটা ছিল মিঃ দে-র মনে যখন সে তদন্তের জন্য দরখাস্তের কথা শুনে বসে পড়ে। সনাক্তকরণে, তার সাক্ষ্যের কোন দরকার ছিল না আদালতের। যদিও অন্যান্য সূত্রের জন্য এর ভেতরে যেতে হবে যেমন মেজকুমারের শিক্ষা। সে স্বীকার করেছে, যে রুক্ষতার কথা সে বলেছে তাকে দেখতে একজন জাঠ কৃষকের মত, রাজার ছেলের মত নয়। একটি পাঞ্জাবি রিপোর্টে বাদীর সম্বন্ধে এটা বলা হয়েছে। রিপোর্ট নিম্নরূপ—

একজন পক্ষপাতপূর্ণ সাক্ষী

(৪) মিঃ মেয়ের (কমিশনে)

১৯০২ সালের নভেম্বর থেকে মিঃ মেয়ের রানী বিলাসমণির ব্যক্তিগত ভৃত্য হিসাবে এস্টেটের ম্যানেজার রূপে নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। তারপর তাকে তার নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য বরখাস্ত করা হয় এবং কালেক্টারের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়, এর একটি অংশ ইতিমধ্যে বিবৃত হয়েছে। ১৯০৪ সালে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ কর্তৃক এস্টেটের অধিকার নেওয়া হয়, মিঃ মেয়ের কিভাবে, যদিও এটা তার কাজ ছিল না, এই উপলক্ষ্যে রানীর পতনের উপর বিদ্বেষ উদ্গীরণ করতে গিয়েছিল কীভাবে রানীকে দশ মিনিট সময় দেওয়া অধিকার ত্যাগ করতে। এটা চিন্তা করা উচিত যে সময়ের এই স্বল্পতার মিঃ মেয়ের কোন তিক্ততা রেখে যাবে। কিন্তু তার সাক্ষের মধ্যে এরূপ তিক্ততার খোঁজ পাওয়া যায়। সে এই চুক্তির সাথে সম্পর্কিত একটি বাস্তব ঘটনাও স্বীকার করে না, যদিও মিঃ র‍্যামকিনের সাক্ষ্য স্পষ্টত প্রদর্শন করে যে রানীর সাথে এই ঝগড়ায়, প্রথম কুমার ও মিঃ মেয়ের একদিকে এবং অন্য দুই কুমার ও রানীরা অন্যদিকে। অনেক প্রতিকূলতার পরে মিঃ মেয়েরকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে এইসব চিঠিগুলি, "প্রচুর পরিমাণে কাদা ছুড়েছিল এই আশায় যে কিছু এতে আটকাতে পারে এবং এটা সঠিকভাবে পরিষ্কার যে উক্ত ঘটনার পর,

মিঃ মেয়েরের নাম এই পরিবারে এক অভিশপ্ত বস্তু হয়ে উঠেছিল।" সত্যবাবু তার ডায়েরিতে (এক্স: ৩৯৯) উল্লেখ করেছে কীভাবে ১৯০৯ সালে জনৈক ব্যক্তি এই গল্প প্রচার করেছিল যে মিঃ নিডহ্যাম, যে ম্যানেজার হয়ে আসছিল তার সাথে মিঃ মেয়েরের একটা সংযোগ ছিল এবং এটা পরিবারকে আতঙ্কে পূর্ণ করেছিল। মিঃ মেয়রের অনুভূতির দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই। কারণ যখন সে বলেছিল যে সে সাধুকে বাকল্যান্ডে বাঁধে দেখেছিল এবং খুব ঘনিষ্ঠভাবে। সে বলেছিল সাধু নিজেকে মেজকুমার বলে সম্বোধন করছিল এবং সে খুশী হয়েছিল যে সে একজন ঠগ, যখন সে এটা বলছিল, সে সত্য বলছিল না, কারণ ১৯২২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর, তার ১৯ মাস পরে, মিঃ মেয়ের ঢাকাতে একজন অধস্তন বিচারকের আদালতে নিম্নরূপ সাক্ষ্য দিয়েছিল (এক্সি. ২৯০)

আমি ভাওয়ালের মেজকুমারকে জানতাম।

প্রঃ- যে সাধু এখানে এসেছে তাকে আপনি দেখেছেন এবং যার সম্বন্ধে এটা বলা হয়েছে সে কী মেজকুমার?

উঃ- হ্যাঁ। আমি লোকটিকে দেখেছি। আমি রাস্তায় সাধুকে দেখেছি, এবং যতখানি আমি তাকে দেখেছি, আমি কোন নিশ্চিত মতামত দিতে পারি না যে সে মেজকুমার কি না বা নয়; কিন্তু আমার মন বলছে যে সে মেজকুমার নয়। কিন্তু যদি আমি তাকে দেখতে পারি যেমনভাবে আমি সরকারী উকীলকে দেখছি এবং আদালতের কর্তব্যরত বিচারককে, ৫ মিনিটের জন্য এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারি, তাহলে আমি সুনিশ্চিত মতামত দিতে পারি। যতদিন সাধু ঢাকায় এসেছে, সে কখনো আমাকে দেখতে আসেনি।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই মিঃ মেয়ের মেজকুমারকে না জানত এবং বলতে সক্ষম হওয়া উচিৎ ছিল যে বাদী মেজকুমার কিনা বা মেজকুমার নয়। যদি সে তাকে দেখতে পারত যেমনভাবে সে বিচারককে দেখছিল এবং ৫ মিনিট ধরে কথা বলত। সে কখনো এমন করেনি এবং সনাক্তকরণ বিষয়ে তার সাক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে তার নিজের মতামত নয় এবং অকেজো। সে উপরোক্ত সাক্ষ্য স্বীকার করেনি যেহেতু এটা ছিল অনুলিপি এবং উপরোক্ত সাক্ষ্যের পরে তাকে দেখার অন্যান্য সুযোগের কথা বলেছিল।

মিসেস মেয়েরের স্বামীকে সমর্থন

(৫) মিসেস মেয়ের (কমিশনে)

সে নিশ্চয় মেজকুমারকে দেখেছিল জয়দেবপুরে যখন মিঃ মেয়ের সেখানে ছিল, কিন্তু স্বামীর সেখানে থাকাকালীন সে ইংল্যান্ডে গমন করেছিল, আর কখনো জয়দেবপুরে ফিরে আসেনি। সে ১৯০৪ সালে যাত্রা করেছিল।

সে বলেছে যে সাধু মেজকুমার নয়। সে সাধুকে বাকল্যান্ড বাঁধে দেখেছিল, কেবল একজন সাধু হিসাবে, পরবর্তীকালে রাস্তায় হাঁটতে বা গাড়ী চালাতে। সে তাকে পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করেছিল যখন সে বাঁধে বসে ছিল এবং এর কারণ ছিল সে এর পূর্বে একজন সাধুর এত কাছে আর আসেনি। মিসেস মেয়েরের একটি পৃথক কারণ ছিল।

বাঁধে কেউ তাকে মেজকুমার বলে চিনতে পারেনি,পরেও না যতক্ষণ না তার শরীর-ছাইমুক্ত হয় এবং সে মেজকুমার হতে পারে এটা একটা গম্ভীর ধারণা হয়ে উঠেছিল এবং কেবল একটা সন্দেহ বা সম্ভাব্যতা নয়। এই মহিলা একজন ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীকে মেজকুমার হিসাবে চিন্তা করতে পছন্দ করবে না, যদি সে প্রকৃতই মেজকুমারের চিন্তা ছাড়া তাকে দেখে থাকে এবং এমন কি ঐ চিন্তার সাথে তাকে রাস্তায় দেখে থাকে, খুব বেশীদূর এগোবে না এই চিন্তাধারা বাদীকে মেজকুমার মনে করে। সে বলেছে, উদাহরণস্বরূপ, যে যখন সে জয়দেবপুরে ছিল সে মিঃ হোয়ারটনকে সেখানে দেখেছে কুমারের শিক্ষক হিসাবে যদিও মিঃ হোয়ারটন ১৯০২ সালে জুলাইয়ের শেষে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মিঃ হোয়ারটনের ইস্তফাপত্র তখন দাখিল করা হয়নি। এবং সে বলতে চেয়েছে যে তিনকুমার ভাল ইংরেজি বলত। যদিও প্রতিবাদীগণের বাদীর বিপক্ষে জেরাকে মানানসই করবার জন্য দরকার পড়বে খুব ভাল ইংরেজির।

(৬) প্র: সা: ২৮০. আলতাদেবী, সুকুমারী বলেও ডাকা হত।

এই মহিলা রামনারায়ণ মুখার্জীর (মেজরাণীর মামা), কন্যা। তার পিতার বাড়িতেই মেজরানী ও তার ছেলেমেয়ে পরবর্তীকালে বাস করেছিল এবং একটি বাড়ির সন্ধান করেছিল।

১৩১৩ সনের ফাল্গুন মাসে সুকুমারীদেবীর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু সে বলেছে যে সে প্রায় দুবছর স্বামীর ঘরে যায়নি। ১৩০০ সনের কার্তিক মাসে তার জন্ম হয়, সেজন্য সে সঠিকভাবে বলেছে যে সে মেজকুমাকে দেখেছিল যখন তার বাস ৯ বছর । ১৫ বছরের পূর্বে সে প্রায় এক ডজনবার মেজকুমারকে দেখেছিল । সে প্রথমবার বাদীকে দেখে যখন সে বোস পার্কে বাস করছিল। পেছন দিকে তার বাড়ি সংলগ্ন একটি বাড়ি ছিল। সে তার শোবার ঘর থেকে একটি লোককে দেখত যখন সে লোকটি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকত— এর মধ্যে কিছুই ছিল না, কেউ একজন প্রতারক সম্বন্ধে কৌতূহলী হতেই পারে— কিন্তু যখন তাকে জেরা করা হচ্ছে, বাদী তার সামনে দাঁড়িয়ে এবং সাক্ষী তাকে দীর্ঘসময় ও উত্তমরূপে দেখেছিল এবং তারপর তাকে জেরা করা হয়েছিল।

প্রঃ- উনি কি মেজকুমার?

উঃ- আমি মুখের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখি না।

সে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং মনে হয় না সে প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল, সেজন্য সে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেনি; "কেন , মানুষটি সম্পূর্ণ রূপে আলাদা।" তার মনে কি ঘটছিল এটা পরিষ্কার জেরায় সে যা বলেছিল তার থেকে।

প্রঃ- আমি আপনার কাছে সর্বশেষ এটা রাখছি যে আপনি বলতে পারেন যে বাদী মেজকুমার হতে পারে বা নাও পারে?

বিরতি

প্রঃ- আপনি বলতে পারেন না কে মেজকুমার নয়, বলতে পারেন না সে মেজকুমার-- এটাই কি চরম আ পনি বলতে পারেন?

বিরতি

উঃ- কিভাবে নাকটা এত চওড়া হতে পারে? মুখের সবকিছুর পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু নাকের পরিবর্তন হতে পারে?

তখন প্রতিবাদীপক্ষের একজন উকীলের দ্বারা সামান্য হস্তক্ষেপ করা হয় যে বলেছিল: সাক্ষী বলেছিল: নাক ও চোখের পরিবর্তন হতে পারে না। এটা সাক্ষীর শুনানির সময় বলা হয়েছিল এবং সাক্ষী বলেছিল, অনুসন্ধানে, যে সে বলেছিল। নাক ও চোখের পরিবর্তন হতে পারে? তার সূত্রকে সমর্থন করতে এটা একটি সাধারণ মন্তব্য। কীভাবে নাক এত চওড়া হতে পারে? এটা সন্দেহ হতে পারে— যদি সে দীর্ঘকাল ধরে কুমারকে জানত, এটাকে সন্দেহ বলা যাবে না। তাহলে অন্য ব্যবহার করত, কিন্তু সে করেনি। সে সনাক্তকরণের প্রশ্নে অব্যবহার্য। নিম্নোক্ত সাক্ষীরা নিশ্চয় কুমারকে জানত ; কিন্তু তাদের প্রকাশ্য নেতিবাচক সাক্ষ্য অন্য পক্ষের সাক্ষ্যকে ছাপিয়ে যেতে পারে না:

(৭) শ্যামাদাস ব্যানার্জি ৪৮ (কমিশনে),সত্যবাবুর মায়ের এক সম্পর্কিত বোনের ছেলে। উত্তরপাড়ায় বাস। মেজকুমারের বিতর্কিত মৃত্যু ও অসুখের সময় দার্জিলিঙে ছিল। এই বিষয়ে একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। তছরূপের দায়ে সরকারী চাকরী থেকে বরখাস্ত। প্রচুর আয়ের কথা বলত কিন্তু কোন আয়কর দিত না।

একজন পলায়নকারী

(৮) জগদীশ চৌধুরী, উকীল, প্রেসিডেন্সি নিম্ন আদালত, ধীরাশ্রমের সঙ্গে সহযুক্ত, জয়দেবপুর সংলগ্ন একটি গ্রাম। জয়দেবপুর স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বিদ্যালয় আশ্রমে বাস করত। ছাত্র ও আবাসিক হিসাবে অর্থ লাগতো না। মেজকুমার তাকে তার বইপত্র ও আশ্রমের খরচের জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। তার যখন প্রায় ১৩ বছর বয়স তখন মেজকুমার দার্জিলিঙে গমন করে।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধুর সমর্থক। সংবাদপত্রে লিখেছিল যে সাধুর একজন গোঁড়া সমর্থক। সাধুর জন্য অর্থ-সংগ্রহ তহবিলের সমিতির সদস্য। সে বলেছে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে তার দল ত্যাগ করেছিল। তার সাক্ষ্যে বাদী ছিল একজন দুষ্কর্মের সহযোগী এবং তার পূর্ব-সাক্ষ্য ও আচরণের সাথে তার বর্তমানে মতের গরমিল ছিল, যদি এটা তার মতামত হয়।

(৯) দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস (কমিশনে),৭৮ বছর, পুবেল জমিদারের একজন পেশকার বা ম্যানেজার এবং ১৭ টাকা পেনসনপ্রাপ্ত অবসরের পর।

বাদীর বাড়িতে যায় তাকে দেখতে। হঠাৎ আবার তাকে দেখতে যায়। আরো দুদিন গিয়েছিল 'কীর্তন' শুনতে। বাদীর তখন দাড়ি ও লম্বা চুল ছিল, সুতরাং এটা অবশ্যই ১৯২১ সালের কথা এবং ভাদ্রমাসের পূর্বে এবং সত্যভামাদেবীর উপস্থিতিতে ঢাকাতে সে প্রথম বাদীকে দেখেছিল। সত্যভামাদেবী ১৯২২ সাল পর্যন্ত ঢাকায় আসেনি!

একজন ক্ষুদ্র তালুকদার

(১০) শিবচন্দ্র মিত্র বিশ্বাস (কমিশনে) ৭০ বছর।

ব্রাহ্মণগাঁয়ের ছোট তালুকদারের মনে পড়ে না তার মুদীর দোকান ছিল কিনা। মনে পড়ে না সে কোন ফৌজদারী মামলা দেখেছে কিনা —স্বীকার করেছিল এটা প্রাক্তন ঘটনার মধ্যে।

(১১) সর্বমোহন চক্রবর্তী ৪০ বছর ধরে এস্টেটের মোক্তার ছিল, ৮০ বছর বয়স। একজন তালুকদার। তালুক থেকে ১০০০ থেকে ১২০০ টাকার মত আয়। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে সরকারের কাছে কোন দরখাস্তে স্বাক্ষর করেছিল কিনা এই অনুমোদন করে যে বাদী হচ্ছে কুমার । এটা তার মনে পড়ে না। জটাবিহীন সাধুকে দেখার কথা বলেছে। কিন্তু জয়দেবপুরে আগমনের সময় দাড়ি ছিল ।

(১২) রমানাথ রায় (কমিশনে) ৮৩ বছর। একজন বড় তালুকদার, খাজনা আদায়ের পরিমাণ ৭০০০ টাকা, অন্য আয় ছাড়াও। ভাওয়াল এস্টেটের কাছ থেকে ঋণের জন্য সাক্ষ্যের দুমাস পূর্বে গ্রেফতার হয়েছিল। ভাওয়াল চেষ্টা করছিল তার দলের একটি অংশ করতে এবং এই পূর্বের এই গোলমাল চাপা দেওয়া হয়েছিল। কুমারদের অবশ্যই দেখে থাকবে, তবে তার তাদের বা তাদের পরিবার সম্বন্ধে স্বল্পজ্ঞান, বলতে পারে না কবে মেজকুমারকে শেষ দেখেছিল, বলেছে দার্জিলিঙে যাওয়ার পূর্বে তাকে শেষ দেখেছে, কুমার তখন অসুস্থ ছিল। অথচ কুমার তখন বাঘ শিকার বা এই ধরনের কাজ করছিল। তার বাঙলা শব্দে সিফিলিস বা কোন ক্রনিক রোগের কথা বোঝা যায় না।

(১৩) ডেভিড মাসুক (কমিশনে) ১৯০৬ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ভাওয়ালের একজন কর্মচারী ছিল। বর্তমানে কষ্টকর পরিস্থিতিতে আছে, তার সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে।

(১৪) শৈবলিনী দেবী (কমিশনে) ফণিবাবুর ভগিনী। তার সাক্ষ্য নিচে আলোচনা করা হবে।

(১৫) ডাঃ জ্যোতিন্দ্রমোহন সেন, ফণিবাবুর একজন বন্ধু, চিটাগাঙে কর্মরত। একজন উপ-সহকারী শল্যচিকিৎসক, আশু ডাক্তারের একজন দূরসম্পর্কিত আত্মীয়।

(১৬) অ্যান্থনি মোরেল (৬৪), বেকার। মেজকুমারের সাথে দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। মেজকুমারের মৃত্যুর পর পর্যন্ত ভাওয়াল এস্টেটের সেবায় ছিল। ভাওয়ালের একজন অধিবাসী ও ভারতীয়, যদিও জন্মসূত্রে সে বলেছে গোয়ানিজ। তার সাক্ষ্য নীচে আলোচনা করা হবে।

একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট

(১৪) বালির রাজেন্দ্র শেঠ, জেলা হুগলী, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রাক্তন সভাপতি বালি পৌরসভা, বাহ্যত একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। সত্যেনবাবুর একজন বন্ধু, মেজকুমারের সফরের সময়ে দার্জিলিঙে ছিল। দার্জিলিঙের ঘটনার একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। সনাক্তকরণ বিষয়ে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে বোর্ডের কাছে এমন একজন ব্যক্তি যে বাদীকে সনাক্ত করেছিল এবং গালভরাভাবে বন্ধু বলে উল্লেখ করেছিল। তার নিজের সাক্ষ্যে সে মেজকুমারকে তার

জীবনে তিনবার দেখেছিল স্টেপ অ্যাসাইডে যেখানে মেজকুমার অবস্থান করছিল এবং ৯ মে সকালে দাহের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এই ব্যাপারে ও নির্দিষ্ট ব্যাপারে তার সাক্ষ্য মেজকুমারের শরীরগত বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে যাচ্ছিল। কিন্তু তার নিজস্ব সাক্ষ্যে সে বাদীকে দেখেছিল যখন সে কলকাতায় অবস্থান করছিল, সে প্রতিবাদীদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়নি আদৌ সনাক্তকরণের ব্যাপারে, কিন্তু জেরায় প্রতিবাদীপক্ষ তাকে এই ব্যাপারে বিশ্বাস করেনি।

আমি এখানে বলতে পারি যে সে সনাক্তকরণের ব্যাপারে বলেছে । সে কৌতূহলে বাদীকে দেখতে গিয়েছিল মিঃ দ্বারিক চক্রবর্তীর ছেলের সাথে। তার সংক্ষিপ্ত তথ্য এই রকম—

“প্রবেশ করা মাত্র আমি একজন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে বিস্মিত হলাম যার চুল লালচে এবং চোখ ‘কটা’, কুমারের মত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ও কি কুমার? কেউ বলল; না, ও ভাগ্নে। তখন মানুষটি, যাকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম, এল। সে জিজ্ঞাসা করল:

‘ কি, কেমন, চিনতে পারো? আমি বললাম : না, আমি কেমন করে পারব?

তখন বাদী বলল, তোমার সন্দেহ দূর করতে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সত্যেন দার্জিলিঙে কি ধরনের টুপি পরত? সে বলল: ‘ দাড়াও’, উপরে গেল, ফিরে এল কাগজে মোড়া একটি টুপি নিয়ে। এটা ছিল একটি দামি টুপি, সোনার জরি দেওয়া, আমি অবাক হলাম যে সতেন্দ্র এই ধরনের টুপি ‘গোরখা টুপি’ ব্যবহার করত এবং ইংরেজি পোশাক। বাদী বলল : এটা আমাদের পারিবারিক ‘ টুপি’। সত্যেন এটা ব্যবহার করত।

আরেকটি প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সাধারণত আপনি কীভাবে পোশাক পরতেন স্টেপ্ অ্যাসাইডে ? সে বলল : ‘ কোমরের চারপাশে একটি রেশমী কাপড় জড়াতাম এবং একটি রঙীন জামা।’

উত্তরটি একেবারে সঠিক ছিল— এই ধরনের পোশাক মেজকুমারের পরনে দেখেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : “ কিন্তু আপনি লুঙি পরতেন, কাপড় নয়।” সে বলল : “আমি লুঙির মতন করে কাপড় পরতাম।”

সাক্ষী বলেছে যে এই সাক্ষাৎকারের অনেক পরে সত্যবাবুর কাছে এই আলোচনার কথা বলেছিল এবং সত্যবাবু বলেছিল: “ হ্যাঁ, সে এইভাবে কাপড় পরত, কিন্তু কে না এটা জানে।”

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখেছিল কিনা, সে বলেছে যে দেখা যাচ্ছে ভাগ্নের সাথে কিছু সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বাদীর সাথে একটুও না।

এছাড়া, উপরের তথ্যে কী আছে? সাক্ষী বলেছিল যে যখন সে দার্জিলিঙে মেজকুমারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল, সে দেখেছিল তাকে লুঙ্গির মত কাপড় পরিহিত এবং একটি রঙীন জামা এবং সে বিস্মিত হয়েছিল, যেহেতু এটা দার্জিলিঙ, এবং সাক্ষী তাকে গরম পোশাক পরতে বলেছিল।

এটা এখন বিবেচনা করা হচ্ছে না তার আলোচনার কতটা স্মৃতি বা কতটা অসত্য, কিন্তু দুটি ঘটনা, এই সাক্ষ্য থেকে বেরিয়ে আসছে; যে মেজকুমার দার্জিলিঙে রঙীন লুঙ্গি পরত এবং সত্যবাবুর কথা অনুসারে সবাই এটা জানত: যে সত্যবাবু তার ইংরেজি পোশাকের সাথে মাথায় সোনার কাজ করা টুপি পরত। বাহ্যত সত্যবাবু সাক্ষ্যের কারণে এটা অস্বীকার করেনি। কোন সাধারণ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ এই ধরনের টুপি পরে না— এটা একটা দেখার মত — যতক্ষণ না মানুষটি হবে রামা, বা কুমার বা ঐ অবস্থার এমন কোন মানুষ। এটা পরে দেখা যাবে কুমারের বয়সী এই যুবক কতখানি ইংরেজি পোশাক , সোনার কাজ করা টুপি ও ইংরেজি কথা বলত, দার্জিলিঙে যেটা মিঃ শেঠও বলেছে। দার্জিলিঙের অন্যান্য সাক্ষীরাও এটা বলেছে যে তারা কুমারকে পথে ও হোটেলে দেখেছিল। তাদের সাক্ষ্য ভিত্তিতে মেজকুমার সাম্প্রতিক ইংরেজি বলতে অসমর্থ ছিল এবং পরে এটা দেখা যাবে সে আদৌ ইংরেজি বলতে পারত না, ভাল বা যে কোন রকম।

এই সাক্ষ্যের আরেকটি মূল্যবান জিনিস হচ্ছে বাদীর সাথে কথোপকথনের ভাষা ও ধরন। হিন্দীর কোন প্রসঙ্গ আদৌ ছিল না এবং এর এক অংশে ছিল অদ্ভুত বাংলা। উদাহরণস্বরূপ 'কি, কেমন চিনতে পারো?' সাক্ষীরা এটা বলে আসছে যে বাদী আদৌ অল্প বাংলা মিশ্রিত হিন্দী ছাড়া আর কিছু বলতে পারত না। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে বাদী যখন কলকাতায় মিঃ ঘোষালের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল আদৌ বাংলা বলতে পারত না। যদিও মিঃ ঘোষাল , কলকাতার একজন অভিজাত-ধনী পরিবারের ভদ্রলোক হলফ করে বলেছিল যে বাদীর সাথে বাংলায় তার কথোপকথন হয়েছিল। যাইহোক এই বিষয়টি ব্যাপক ও সচরাচর ঘটে না এমন স্বার্থসম্পন্ন এবং অবশ্যই একে সঠিকভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। মিঃ আর এন শেঠও বাদীকে দেখার অন্তত ১৫ দিন পূর্বে মেজকুমারকে সাধারণভাবে দেখেছিল। সে সনাক্তকরণের প্রশ্নে একজন ব্যবহার্য সাক্ষী কিন্তু এইরূপ সাক্ষী হিসাবে সে অন্যপক্ষের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট

(১৮) মিঃ এম পি ঘোষ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের আমলের পুরানো ম্যানেজার রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বাহাদুরের ছেলে, সে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মরত ছিল। ঢাকায় রায়বাহাদুরের এক বাড়ি ছিল। কিন্তু সে জয়দেবপুরে সাধারণভাবে বাস করত।

কুমারের জন্মের সময় সে সেখানে ছিল এবং পুত্রবৎ তাদের জানত এবং কোন সন্দেহ নেই এই সাক্ষী মিঃ ঘোষ তার ভাইয়ের মত কুমারদের জানত।

এই ভদ্রলোক বলেছে যে তার ঢাকায় আসবার সামান্য পরে সে বাদীকে দেখেছিল আনন্দবাবুর বাডিতে। সে তার ভাইয়ের সাথে সেখানে গিয়েছিল। ভাই ঢাকার পাবলিক প্রসিকিউটর রায় সত্যপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ও ঢাকার আরেকজন উকীল মিঃ খগেন্দ্র মিত্র সঙ্গে ছিল। বাদী বহু লোকের সাথে সন্ধ্যায় এসেছিল এবং সাক্ষীর নিকটে বসেছিল।

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে তাদের চেনে নাকি। সে বলেছিল, ''জানি না।'' সাক্ষী তৎক্ষণাৎ সেখানে বলেছিল যে চেহারা আদৌ মিলছে না। পূর্বোক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র ধীরেনবাবু সেই সময় সেখানে ছিল, সাক্ষী যদিও বলেছে যে তার বড় ভাই অন্য প্রশ্ন করেছিল অন্যান্যদের মধ্যে, উল্লেখ করেনি কী প্রশ্ন এবং সে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল এই মনোভাব নিয়ে যে মানুষটি একজন প্রতারক। ১৯০১ সালে রানী বিলাসমণির দ্বারা সাক্ষীর পিতা বরখাস্ত হয়েছিল। তহবিল তছরুপের অভিযোগে, তার পেনসন বাতিল করা হয়েছিল যা রাজা তার উইলে তার জন্য নির্ধারিত করেছিল। মামলাটি একটি তহবিলের জন্য, ৫০০০০ টাকার ডিক্রিতে সমাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু কুমারদের দ্বারা এটা লাঘব করা হয়েছিল বা রানীর দ্বারা। কুমারগণই রানীর কাছে একটি চিঠির দ্বারা অনুরোধ করেছিল। এই পরিবার মেজকুমারের বীমা-অর্থ তুলে নেবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং সত্যবাবুর ডায়েরি ও মিঃ নিডহ্যামের চিঠি অনুসারে এস্টেটের দ্বারা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ঘোষ পরিবার এই কার্য করেছিল সত্যবাবুর জন্য দুজন জীবিত কুমারের বিরুদ্ধে। সুতরাং দেখা যায় ঘোষেরা মেজরানীর পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এটাও ঘটনা ছিল যে মিঃ ঘোষ, যে ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিল ও ঢাকায় কর্মরত ছিল ১৯০৭ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত এবং আবার ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল এবং সাধুর সাথে সম্পর্কিত গোপনীয় কাগজপত্র ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল। ১৯২২ সালে শোনা যায় মানহানিকর মামলায় তাকে সোপর্দ করা হয়, যে মামলায় সাধুর সনাক্তকরণের প্রশ্ন উত্থাপিত তার অসুস্থতার পরিস্থিতি ও বিতর্কিত মৃত্যুর প্রসঙ্গও হয়েছিল।

বর্তমানে ঢাকার এই সাক্ষীটি বলেছে সে কখনো শোনেনি সাধু বাকল্যান্ড বাঁধে ছিল বা ঢাকায় জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে, যদিও তার নিজের বাড়ি ছিল ঢাকায় খুব নিকটে যখন সাধু বাকল্যান্ড বাঁধে বাস করছিল ততক্ষণ সে তাকে দেখেনি, 'আত্মপরিচয়' দানের পূর্বে সে তাকে দেখেছিল যখন সে আদৌ তার পরিচয় ঘোষণা করেনি। বাদী শুধু তখন শুধুমাত্র এক ক্ষুদ্র গোঁড়া সমর্থক দলের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। সমস্ত ঘটনা, এক্সি-৫৯ ও ১৯২১ সালে লিখিত মিঃ লিন্ডসের চিঠি সত্ত্বেও এবং অবশেষে, সে বলেছে আদৌ কোন সাদৃশ্য নেই। এই সমস্ত সাক্ষ্য সৎ-মতামত হিসাবে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিবৃত হতে পারত বাদীকে দেখার পর, বিশেষত যদি সে তাকে না চিনতে পারত বা হিন্দী বলত, কিন্তু সাক্ষী বলেছে , সে বাদীকে সম্ভবত শীতকালে দেখেছিল, এটা ছিল প্রতারক ঘোষণার পূর্বে এবং সে জানত না কোথা থেকে সে এসেছিল, সেজন্য যদি সে বাকল্যান্ড বাঁধ থেকে এসে থাকে তখনও সে স্বীকার করছিল না সে ছিল মেজকুমার। এই অস্পষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা চিন্তা করা উচিত ছিল যে তার বড় ভাই, রায়বাহাদুর সতেন্দ্র প্রসন্ন ঘোষকে, যে কুমারকে জানত, ডাকা হবে, অথবা অন্তত খগেনবাবুকে ডাকা হবে। যাইহোক এটা দেখা যাচ্ছে, পরিচিত ঘোষণার পূর্বে যতক্ষণ না অস্পষ্টতা কেটে গিয়েছিল

মামলাটি বাদী, বিরুদ্ধে গিয়েছে যে সে মেজকুমার বলে সন্দেহকৃত নয়, এমনকি যখন সে বাকল্যান্ড বাঁধের উপরেও ছিল।

মিঃ র‍্যামকিন

মিঃ র‍্যামকিন, আই সি এস, অবসর প্রাপ্ত ৬৩ বছর, (প্র:সা:২) ইনি ইংল্যান্ড থেকে এই মামলার সাক্ষ্য দিতে এসেছিল, এবং শোনা গিয়েছিল গভীর দুঃখের সাথে সে তার সাক্ষ্যের অব্যবহিত পরেই মারা গিয়েছিল ক্রনিক রোগের ফলে।

১৮৯২ সালে সে অবসর গ্রহণ করেছিল। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিল ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি বা মার্চ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত। ২৭-৭-০৫ তারিখে তার বিদায় অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় নর্থব্রুক হলে যেখানে মেজকুমার যোগদান করেছিল। ১৯০৫ সালের শেষ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সে বোর্ড অব্ রেভিনিউয়ের সেক্রেটারি ছিল এবং সরকারি কর্মচারী হিসাবে শীতকালে ঢাকায়, গ্রীষ্মে শিলঙে গমন করত। এই সাক্ষীর যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু তার স্মৃতি! সে বলেছে যে কালেক্টর হিসাবে সে রাজাকে ও তার জীবিতকালে পুত্রদেরও দেখেছিল, কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর সে বহুবার ঢাকা তথা জয়দেবপুরে তাদের দেখেছিল : তার বাড়িতে যখন কুমারগণ সৌজন্যমূলক আহ্বানে যেত, ঘৌড়দৌড়ের অনুষ্ঠানে যেত এবং জয়দেবপুরে যেখানে সে ' অতিথিশালায়' উঠত ও শিকার বা ভ্রমণে যেত এবং মেজকুমার তার সাথে থাকত। কালেক্টর হিসাবে অব্যাহতি দেওয়ার পর কিছু পার্থক্য অবশ্যই দেখা গিয়েছিল, দেখা যাচ্ছে যে সেক্রেটারি হিসাবে এই পরিবারের সাথে বা এর কার্যের সাথে তাব কোন প্রথাগত সর্ম্পক ছিল না এবং যখন কুমারেরা সাধারণত কলকাতায় থাকত শীতকালে, সে থাকতো ঢাকায়, এও দেখা যাচ্ছে মিঃ মেয়ের যে, সে বলেছে, তার বন্ধু ছিল, ১৯০৪ সালে জয়দেবপুর ত্যাগ করে, এবং পরিবারটি ছিল কলকাতায় যতদিন প্রথম কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল এবং তারপর যে সমস্ত ম্যানেজার ভারতীয় ছিল যাদের সাথে মিঃ র‍্যামকিন সমমর্যাদায় সাক্ষাৎ করত না বা যাদের সাথে সে তেমনি ব্যবহার করত না যেমনিভাবে সে মিঃ মেয়েরের সাথে করত যে বড় দালান নামে পরিচিত একটা বাড়িতে বাস করত যাকে মিঃ র‍্যামকিন 'অতিথিশালা' নামে উল্লেখ করেছে। মিঃ র‍্যামকিন ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয়গণও এই বাড়িটি ' অতিথিশালা' হিসাবে উপেক্ষা করত, কিন্তু যাকে বড় দালান বলা হত, সেই বাড়িটির নাম এটা ছিল না; প্রত্যেক সাক্ষী, দু-একজন ছাড়া, এটা বলেছে।

একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব

যাইহোক না কেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ও গোলমালও নেই যে মিঃ র‍্যামকিন কুমারদের, তাদের বাড়ি ও তাদের সম্বন্ধে সবকিছু জানত কালেক্টর হিসাবে বিশেষত এই ব্যক্তিই যে পুলিশের সাথে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তরফে এস্টেটের অধিকার নিতে গিয়েছিল। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাদী মতামত দিয়েছে যে এই ঘটনাকে তারা মনে করেছে তাদের মায়ের অপমান বলে, যদিও এটা ছিল আকস্মিক সফর এবং মেজ ও তৃতীয় কুমার বরঞ্চ মিঃ র‍্যামকিনকে এড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা পরস্পরকে চিনত, বরঞ্চ বেশী — কেননা কারণটি ছিল পরিষ্কার।

র‍্যামকিন অবশ্যই ১৯০৭ সালে শেষবার মেজকুমারকে দেখেছিল। দেখা যাচ্ছে কুমারেরা ১৯০৯ সালের শীতকালে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে সে ১৯০৯ সালে তাকে দেখেছিল। ডিসেম্বরে প্রথমে তার চলে যাওয়ার পূর্বে বা তার প্রত্যাবর্তনের পরে হতে পারে।

র‍্যামকিন প্রায় ২৬ বছর পরে আদালতে বাদীকে দেখল, ইংল্যান্ড তার অবসর কাটানোর বছরগুলি সহ যার অর্থ ভারতের সাথে সম্পর্কচ্যুতি ও এর স্মৃতির অস্পষ্টতা সহ। র‍্যামকিন কখনো মেজকুমারের সাথে মিশত না, সামাজিকভাবে, কারণ ১৪ বছরের ছোট ছিল মেজকুমার। সে তার ঢাকার বাড়িতে সাধারণত বড়কুমারের সাথে সৌজন্যমূলক আহ্বানে আসত — বাদী সর্বদা বলেছে এবং সেখানে তার সাথে কেউ থাকত, সম্ভবত তার ইংরেজিতে সাহায্য করতে, র‍্যামকিন যা বলেছে।

অতীত স্মৃতি মনে পড়েছিল

২৫ বছর পরে আদালতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বাদী, যে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, কী কুমার। র‍্যামকিন বলেছিল, ' আমি তা মনে করি না। আমি মেজকুমারের সাথে তার কোন সাদৃশ্য দেখি না'। জেরায় র‍্যামকিনকে বলানো হয়েছিল বহু মানুষ, শপথপূর্বক বাদীর পরিচয় সম্পর্কে বলেছিল এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

"আপনি কি বলেন যে সাক্ষ্য মিথ্যা যখন থেকে আপনি বাদীকে দেখেছেন?"

উঃ— আমি মনে করি না আমি বলতে পারি যে কেউ এই সাদৃশ্য সম্বন্ধে মতামত দিক না কেন তা মিথ্যা সাক্ষ্য।

আবার ঃ— যদি কোন ব্যক্তি বলে থাকে তাকে মেজকুমারের মত দেখাতে পারে। সে সত্য বলতে পারে।

যেহেতু আশা করা যেতে পারে, র‍্যামকিনের এমন কোন সুযোগ ছিল না সে সনাক্তকরণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট মতামত দিতে পারে। যদিও সাক্ষ্য দিতে আসবার পূর্বে তাকে মেজকুমারের কিছু ফোটো দেখানো হয়েছিল। X সহ-- যেখানে মেজকুমারের বয়স ১৪ বছর এবং যেটা রানী চিনতে পারেনি এবং বাহ্যত র‍্যামকিন যা মনে করেছিল, দেখা যাচ্ছে সে কুমারকে তার পিতার মৃত্যুর পূর্বে দেখেছিল।

প্রঃ সাঃ ১২০, কলিকাতার একজন সম্মানিত ভদ্রলোক শরদিন্দু মুখার্জি (৪৭) ১৯০১ সালে মেজকুমারকে দেখেছিল যখন সে ৪/৫ দিনের জন্য জয়দেবপুরে সফরে গিয়েছিল। সাক্ষীর বয়স তখন ১৩ বছর। ১৯২৫ সালে বাদীকে দেখেছিল কলকাতায়। তাকে মনে করেছিল হিন্দুস্থানী, যেহেতু সে হিন্দীতে কথা বলছিল বাংলা মিশিয়ে। তার সাক্ষ্যের শেষ সূত্রটি বিবেচিত হবে যখন বাদী হিন্দুস্থানী কিনা এই প্রসঙ্গে আসা হবে। কিন্তু সনাক্তকরণের সাক্ষী হিসাবে সে অব্যবহার্য।

অতুলপ্রসাদ রায়চৌধুরী (৪৩) কমিশনে, বাদীর কাশিমপুর ও জয়দেবপুর ভ্রমণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে উপরে উল্লেখ করেছিল। গোমস্তা পাঠিয়ে সে বলেছিল সে অসুস্থ। সে নিজে

বাদীকে কাশিমপুরে বা জয়দেবপুরে নিয়ে গিয়েছিল তা অস্বীকার করেছিল, অদ্ভুত হিন্দীর কথা বলেছিল যা বাদী বলত, যেটা বিচারের একটি পর্বে সম্পূর্ণ বিসদৃশভাবে দেখা গিয়েছিল। বলেছিল বাদী জয়দেবপুর সফরের সময় তাকে নিজের নাম বলেছিল সুন্দরদাস, যদিও এই নাম ২৭ জুন পাঞ্জাবে রিপোর্টে প্রথমবার বলেছিল সুন্দরদাস, যদিও এই নাম ২৭ জুন পাঞ্জাব রিপোর্টে প্রথমবার উত্থাপিত হয়েছিল। তার সাক্ষ্যের অনেক অন্যান্য সূত্র নিচে উল্লেখিত হবে এবং ওগুলি একত্রে তার সুনামহানি করে।

কুমারের প্রত্যাবর্তন— রানীর পক্ষে চরম দুর্দশা

যে সমস্ত প্রজা নায়েবদের তত্ত্বাবধানে রায়সাহেবের 'নমুনা' সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি করতে প্রেরিত হয়েছিল তারা সাক্ষী হিস্যাবে গণ্য হচ্ছে না। মেজরানীর নিজের লোকেদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র একজন ভাইঝি ছাড়া উত্তরপাড়ার আর কোন সাক্ষী ছিল না যে মেজকুমারকে শেষ দেখেছিল যখন তার বয়স বড়জোর ১৫ বছর। মেজরানীর অন্য দুজন মামাতো পিসী, সূর্যের ও বামবাবুর বিধবা পত্নী জীবিত ছিল। মর্যাদাসম্পন্ন এমন কোন স্বাধীন অনুৎসাহী মানুষ ছিল না যে মেজকুমারকে জানত যার এখনো তাকে মনে আছে এবং তাকে ভুলতে পারে না, শুধু মিঃ এস পি ঘোষ ছাড়া, যার স্বাধীনসত্তা প্রশ্নের বাইরে। অন্যপক্ষে, বোনের সাক্ষ্য। তার বিশ্বাসের সততা শুধু তার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে নি। বরঞ্চ ৪ ও ৫ই মে-তে উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল ছিল যেটা ইঙ্গিত করেছিল মিঃ নিডহ্যাম্ এবং রায়সাহেব নিজে এই সততায় বিশ্বাস করত এবং একই সঙ্গে মানুষটির পরিচিতিতে যতক্ষণ না পর্যন্ত ৫ ই ৬ই মে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছিল। এবং এটা নিশ্চিত হয়েছিল অসংখ্য মানুষের আচরণে এবং বহু স্বাধীন নরনারীর সাক্ষ্যে এর মধ্যে আছে, রানীর নিজের ভাইঝি ও পিসী। যাদের সাক্ষ্য অন্তর্নিহিতভাবে অসত্যের কোন চিহ্ন প্রকট করেনি এবং যারা সম্ভবত কুমারকে ভুল করতে পারেনি। এটা বলা অসম্ভব যে এই সমস্ত কিছু সনাক্তকরণের দ্বারা ব্যাখ্যা যোগ্য নয়। প্রত্যেকে বোন নয়। সেখানে অবশ্যই অস্বীকৃতি ছিল অন্যপক্ষের সাক্ষীদের দ্বারা, এবং রানী ও তার ভাইয়ের দ্বারাও অস্বীকৃতি ছিল। রানীর দ্বারা অস্বীকার ও বাহ্যত এবং তথাকথিত মৃত্যুর পক্ষে প্রয়োজন হচ্ছে এই মামলার সূক্ষ্ম পুনর্বিচার এবং সাক্ষীদের একক কৃতিত্বের উপর। সিদ্ধান্তের নির্ভর করার প্রয়োজন নেই বা তাদের অবস্থা বা পদমর্যাদার উপর নির্ভর করার দরকার নেই। যদি সনাক্তকরণের সপক্ষে এই পুনর্বিচার দাঁড়ায়, যদি ঘটনার দ্বারা এটা নিশ্চিত হয় যেমন বাদীর চিহ্নগুলি যেগুলি তাদের মতে কখনো দ্বিতীয়ত সৃষ্ট হতে পারে না যদি মৃত্যু স্থানচ্যুত হয়, রানী বা তার ভাইয়ের অস্বীকার বাদীর পথে অন্তরায় হবে না, এমনকি সত্যবাবুর পক্ষেও, যে সম্পত্তি ভোগ করছিল। রানীর নিজস্ব কোন উইল ছিল না যতদূর তার ভাই জানে এবং রানী অনুভব করবে কুমারের প্রত্যাবর্তন চরম দুর্দশার থেকে কম নয়, রানীর যে ধরনের বিবাহিত জীবন ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে, যে জীবন সে ব্যবহারের জন্য পেয়েছিল। ১৯২১ সালের মে মাসে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিষপ্রয়োগের অভিযোগ টেলিগ্রাম করে তাকে জানানো হয়েছিল যার জন্য তার অনুভব হতে পারে সে একই শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত

হতে যাচ্ছে, যদিও এমন কিছু হয়নি। বা কুমারের স্ত্রীর চেয়ে সতাবাবুর বোন হিসাবে বেশী সম্মান করেনি।

আচরণের দ্বারা মতামত জাহির

সত্যাভামা দেবী,

এটা অস্বীকার করা হয়নি যে, সত্যভামাদেবী বাদীর জয়দেবপুরে প্রথম সফরের সময় জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে বাস করছিল এবং দ্বিতীয় সফরের সময় থেকে ৭ জুন এটা শেষ হওয়া পর্যন্ত। ৪ মে 'আত্মপরিচয়ের' দিনে সে উপস্থিত ছিল। এটা জ্যোতির্ময়ীদেবীর সাক্ষ্য। সে বলেছে যে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে 'চক্করে' তার বাড়িতে ওঠার পর সত্যভামাদেবী বেনারস থেকে ফিরে যেখানে গিয়েছিল কৃপাময়ীদেবীর সাথে। সাধারণত সে তার বাড়িতে থাকত। রায়সাহেব যে রাজবাড়িতে তার পরিবারসহ বাস করত এটা অস্বীকার করেনি যে ১৯২১ সালে সে এই বাড়িতে বাস করত এবং ফণিবাবু বাদীর প্রথম ও দ্বিতীয় সফরের সময়েও সত্যভামাদেবীকে এই বাড়িতে দেখেছিল।

সাধুকে চিনতে পেরেছিল সত্যভামাদেবী

জ্যোতির্ময়ীদেবী, ভাগ্নে ও অন্যান্য কয়েকজনের সাক্ষ্য ছিল যে এই বৃদ্ধা তার নাতি হিসাবে বাদীকে চিনতে পেরেছিল। তার বিবৃতিকে বাদ দিয়ে শুধু তার আচরণকে উল্লেখ করা উচিত। সে বাদীকে ডাকছিল 'খোকা' বলে এবং তার সাথে একই ঘরে ঘুমিয়েছিল।

জ্যোতির্ময়ীদেবী বাদীর ঢাকা যাবার পরদিন লিখেছিল এবং ১৯২২ সালের জুলাইমাসে মেজরানীকে লিখেছিল, মিঃ ড্রামন্ডকে লিখেছিল, মিসেস ড্রামন্ডকে পাঠিয়ে দিতে ও তাকে দেখতে, অনুসন্ধানের জন্য দরখাস্তে যোগদান করতে, বাদীকে ডেকেছিল সত্যভামাদেবীর মুখাগ্নি করতে যখন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তার মৃত্যুর পূর্বদিন সে বাদীর সাথে ঠাকুমাসুলভ আচরণ করেছিল। যদি এটা বাস্তবিকভাবে সত্য না হত, অন্যপক্ষ বলত না যে সত্যভামাদেবী ছিল অন্ধ এবং তার কর্মশক্তি যথোপযুক্ত ছিল না এবং সে তার চোখ লেফটাঃ কর্নেল ম্যাককে লাভ দ্বারা পরীক্ষা করিয়েছিল। সে ছিল ঢাকার সিভিল সার্জন, ২০-৭-২২ তারিখে লিখিত তার সার্টিফিকেট (এক্সিঃ-৭৪) প্রদর্শন করে যে তার মত বয়সী স্ত্রীলোকের পক্ষে তার দৃষ্টিশক্তি ভাল ছিল এবং সে বিন্দু গণনা করতে পারত ও মুখ চিনতে পারত। এখানে তার দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে কিছু ছেলেমানুষী হয়েছে কেননা একজন ঠাকুমার তার নাতিকে জানার জন্য পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তির দরকার হয় না। ধরে নেওয়া হচ্ছে সে ১২ বছর পরে ফিরেছিল। ছেলেমানুষটার চেয়ে কম কি সে, যে সে তার উইল পরিবর্তন করেনি যা সে ১৯১৩ সালে প্রস্তুত করেছিল এই ভিত্তিতে যে মেজকুমার মৃত, যদিও সাক্ষ্য আছে যে সে উইল পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, হঠাৎ ও আশাতীতভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল (বাঃ সাঃ ৪ ও ৮৫২); মতামত ছিল যে সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর প্রভাবগ্রস্ত ছিল। যাইহোক, তার এই আচরণের মধ্যে কোন গোলমাল ছিল না যে সে তার স্বামীর জয়দেবপুরের বাড়ি ছেড়ে ঢাকাতে একটি ছোট বাড়িতে বাস করতে এসেছিল কারণ বাদী ওখানে ছিল এবং বাড়ি ছেড়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবীর

প্রভাবের প্রসঙ্গে দেখা গেছে এই মহিলা ফন্দিবাজ ছিল না, সে বিশ্বাস করত বাদী তার ভাই। সিভিল সার্জনের সার্টিফিকেট ও সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলে এটা বিশ্বাস হয় না যে তার অন্ধ ভালবাসা ছিল (বাঃ সাঃ নং ৩৪, ১২, ১৮, ২০, ৩৩, ৬০৮, ৯৩৭, ৯৩৮, ৩৭, ৮৭, ৮৪৭, ৩৫৮, ৬০৮)। তার সমশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখা যায়, তার বোন তারিণীময়ীদেবীর অনুরোধে কিছু অযৌক্তিকতা নেই।

একটি অদ্ভুত মতামত

মামলার ঠিক প্রারম্ভে প্রতিবাদী পক্ষের কৌঁসুলী মতামত দিতে আরম্ভ করেছিল যে সে , তারিণীময়ীদেবী, বাদীকে গ্রহণ বা সনাক্ত করেনি এবং তার স্বামী, ব্রজবাবু একটি নোটিশ দাখিল করে যে বাদী একজন প্রতারক ছিল (বাঃ সাঃ ৪,৫,৪৩৮)। কোন পক্ষ তাকে ডাকেনি বা কৌঁসুলী তাকে বা তার স্বামীকে তার তর্কের মধ্যে উল্লেখ করেনি। আদালতের বাইরে এদের কোন বিবৃতি কিছুই কাজে লাগেনি। কিন্তু বোন বাদীকে পরিত্যাগ করেছিল এটা একটা অদ্ভুত মতামত। ৪ নং প্রতিবাদীর সওয়াল জবাবে দেখা যাচ্ছে যে বাদীকে তার বোনেদের দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এক্সিঃ ৩৭১-এ এই মহিলা, প্রতিবাদী নং ৪, সাধুর জন্য বোনেদের প্রতি অভিযোগ করছে। মিঃ চৌধুরীরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে যে শুধু চিঠি নয়, একটি নথিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ৯-৮-২১ তারিখের একটি চিঠিতে মিঃ লিন্ডসে লিখেছে ঃ " এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মেজকুমারের বোনেরা ও বাবু আনন্দচন্দ্র রায় প্রকাশ্যেই সাধুর ব্যাপারে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল। (এক্সিঃ ৪৩৫) বাদী তাকে সত্যভামাদেবীর সৎকারে নিয়ে গিয়েছিল। এই সাক্ষ্য গ্রহণীয় যে বাদীর দ্বারা অনুষ্ঠিত তার শ্রাদ্ধে সে গিয়েছিল। ফোটোর মধ্যে সে ছিল (এক্সিঃ ১৪) (বাঃ সাঃ ২, ৩, ৪, ৫, ৩৫, ৬৪, ও ২৩ ও আরো অনেকে।) সে অনুসন্ধানের জন্য দরখাস্তে যোগদান করেছিল, এ ব্যাপারে কোন গোলমাল নেই। ১৯২১ সালের মে মাসে সে যখন জয়দেবপুরে যায় এবং বাদীকে দেখে, সে কেঁদেছিল এবং তার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল। যখন বাদী ঢাকায় ছিল, সে তাকে ডেকেছিল এবং তার থালা থেকে অবশিষ্ট খাদ্য খেয়েছিল (বাঃ সাঃ নং ৬৫০, ৯৭৭)। সে তাকে রাত্রে খেতে ডেকেছিল এবং 'ভাইফোঁটা' ও 'ভাইছাতু'তেও ডেকেছিল। এর জন্য জ্যোতির্ময়ীদেবীর একাকী সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করার দরকার নেই। তারিণীময়ীদেবীকে দেখা গিয়েছিল একা বাদীর সাথে একটি আবৃত গাড়ীতে ঢাকার কোন এক সারদা গাঙ্গুলীর বাড়ির বিবাহ অনুষ্ঠানে যেতে (বাঃ সাঃ ১০০৪; ১০০৫; ৯১৩)। সত্যভামাদেবীর মৃত্যুর পর ৩ নং প্রতিবাদী, দত্তক ছেলে, প্রধান নাতি হিসাবে এক তিনদিনের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত করেছিল এবং এই উপলক্ষে তিনজন ভদ্রলোক ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত হয়। তারা দেখেছিল তারিণীময়ীদেবী বাদীর সাথে তার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখছিল (বাঃ সাঃ নং ১০০৪, ১০০৮, উভয়ে আদালতের উকীল)। এই মতামত দেওয়া অমূলক যে এই মহিলা বাদীকে পরিত্যাগ করেছিল। যে সাক্ষ্য দিতে পারেনি যেহেতু তার স্বামী ১৯২৫ সালে মামলাটি এনেছিল দত্তক গ্রহণকে অগ্রাহ্য করতে। এটা আন্দাজ করার দরকার নেই কেন সে এমন করল, হয়তো সে মনে করেছিল যে বাদী কখনো

আইনগতভাবে দাবি করবে না বা তার সাফল্য থেকে কোন সুবিধা পাওয়ার সামান্যতম সুযোগ ছিল। দেখা যাচ্ছে পরিবারের সাথে তার কখনো বেশী সংযোগ ছিল না, বড় কুমারের একটি উইলের সত্যতা প্রমাণার্থে আদালতে পেশ করার চেষ্টা করেছিল। কয়েকটি নির্দিষ্ট চিঠির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ২৭-৫-২১ তারিখের পূর্বে সে বাদীকে মেজকুমার বলে উল্লেখ করছে।

হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (মৃত)

ধানকোরার জমিদার। সে বাদীকে নৈশাহারের জন্য আমন্ত্রিত করেছিল, আভ্যন্তরীণ কক্ষে নিয়ে গিয়েছিল, অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং বাদী তাকে কাকা বলে ডাকত ও সে তাকে মেজকুমার বলে সম্বোধন করত। এসবই ১৯২১ সালের কথা যখন বাদী ঢাকায় ছিল (বাঃ সাঃ ২২০, ৪৭৩)।

এড়ুইন ফ্রেসারের আচরণ পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা উচিত যে বাদীকে জয়দেবপুরে দেখে কান্নায় ফেটে পড়েছিল (বাঃ সাঃ ২১২) এবং অনুকূল ঘোষ, কুমারদের পুরাতন শিক্ষক যে বাদীকে আরমেনিটোলাতে দেখেছিল (বাঃ সাঃ ৩১)।

এবার দুটি শরীরের তুলনার বিচার করে দেখা যাক যে তারা একই কিনা।

বাদীর শরীরের সাথে কুমারের শরীরের তুলনা

(ক) ফোটো ; (খ) শরীরের সম্বন্ধে নথিভুক্ত বিস্তৃত বিবরণ যেটা জুতো প্রস্তুতকারক বা দর্জির খাতায় থাকতে পারে; (গ) পোশাক বা জুতোর অর্ডার থেকে (ঘ) গোলমাল সৃষ্টি হবার পূর্বে তার বর্ণনার যে কোন দলিল, এই মামলায় যেমন ছিল বীমাডাক্তারের রিপোর্ট (ঙ) গোলমাল সৃষ্টি হবার পর যে কোন দলিল (চ) সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য যারা তাকে জানত। এই সব থেকে কুমারের শরীরের ছবি আঁকা বা সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে।

এটা উল্লেখযোগ্য ও বাধ্যতামূলক তাৎপর্যের একটি ঘটনা যে যদিও "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের দ্বারা একটি অত্যন্ত সামগ্রিক অনুসন্ধান সংঘটিত হয়েছিল, সত্যবাবুর মতে, ইউরোপীয়ান দর্জি, মুচি এবং এই অনুসন্ধান দুই বা তিন বছরের জন্য টিকে ছিল। সত্যবাবু এই অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং মিঃ চৌধুরী, প্রতিবাদীদের কৌসুলীও অবশ্যই এইসব দলিলপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, প্রতিবাদীদের দ্বারা এইসকল দলিল পত্রের বাইরে কোন তথ্য বিস্তারিতভাবে প্রমাণিত হয়নি, শুধু এটা ব্যতীত যে মিঃ চৌধুরী, মিঃ জে সি ঘোষালের কাছে বলেছিল কুমারের জুতোর নাম্বার ছয়। মিঃ চৌধুরী মিঃ ঘোষালের কাছে এই মাপের কথা বলেছিল যেহেতু বাদী সেখানে ছিল এবং তার জুতো বড় দেখাচ্ছিল। যার অর্থ ছয় নম্বর বলার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি যা সত্যবাবু মনে করেছে অনুসন্ধানের সঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে বাদী বীমাপত্রের একাংশের উপর নির্ভর করত যার মধ্যে যে কোন ব্যক্তিগত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটা মনে করতে হবে যে বাদী ৪ঠা মে তার পরিচয় ঘোষণা করেছিল। সত্যবাবু এই সংবাদ পেয়েছিল, তার নিজের মতে, মিঃ নিউহ্যামের রিপোর্ট থেকে যেটা ৬ মে তার কাছে

পৌঁছেছিল সর্বপ্রথম। সে তৎক্ষণাৎ শুল্ক কমিটির মিঃ লেথব্রিজের সাথে দেখা করে অনুরোধ করেছিল যে মৃত্যুর নথি রক্ষা করা উচিত, বীমার এফিডেভিটগুলি তার কাছে হস্তান্তরিত করেছিল— তার কপিগুলি ১৫ই মের পূর্বে একজন ব্যারিস্টার সহ পদক্ষেপ নিয়েছিল। ১০ই মৃত্যুর নথি সংগ্রহ করতে মিঃ লেথব্রিজ বীমা কোম্পানির কাছে মূল কাগজপত্রের জন্য লিখেছিল এবং তাকে জানানো হয়েছিল কাগজপত্র স্কটল্যান্ডে আছে এবং এগুলি আসলে শুল্কবোর্ডের কাছে পাঠানো হয় ১৪-৭-২১ তারিখে (এক্সিঃ ৪৫০)। বোর্ড কাগজপত্র ফেরত পাঠায়, মেডিক্যাল রিপোর্ট সহ ১৫-৭-২১ তারিখে, সঙ্গে মন্তব্য ছিল যে এগুলি কোম্পানিতে রাখা উচিত। মামলার সময়ে প্রতিবাদীপক্ষ বীমাপত্রের ছয়টি নথি নির্বাচন করেছিল ও আনিয়েছিল। দুটি মৃত্যুর সার্টিফিকেট, দুটি দাহ্যের সার্টিফিকেট, দুটি সনাক্তকরণের সার্টিফিকেট, মেডিক্যাল রিপোর্ট নয়। এই শেষটি বাদী ১৯৩৪ সালে মামলার শেষ সময়ে আনিয়েছিল এবং এটি আগত হয়েছিল এডিনবার্গ থেকে, ১৫-১২-৩৪ সালে তাদের আঞ্চলিক শাখার মাধ্যমে। এই সকল দলিলের মধ্যে বীমার সাথে সংযুক্ত দলিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল যে কোন ব্যক্তিগত বিস্তৃত বিবরণ— কুমারের শরীরের যে কোন বিস্তৃত বিবরণ, বাদীর দ্বারা স্বীকৃত। এই দুটি সনাক্তকরণের এফিডেভিট প্রতিবাদীপক্ষের দ্বারা চাওয়া হয়েছিল এবং মেডিক্যাল রিপোর্টটি তারা আদৌ চায়নি। বাদীর বক্তব্য ছিল যে এফিডেফিট ছিল শবদাহের সনাক্তকরণ, অন্য এফিডেভিটটি চাওয়া হয়েছিল প্রতিবাদীপক্ষের রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের দ্বারা, যাকে বিদ্যাসাগরও বলা হত এবং প্রতিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী বলেছিল যে সে এটা অনুমোদনের সমর্থ ছিল না। এটা বলা হতে পারে যে বাদী এইরূপ বিস্তৃতি বিবরণের উপর নির্ভরশীল ছিল যা দলিলের মধ্যে উপস্থাপিত হয় পুরানো পোশাক ও জুতোর পরিপ্রেক্ষিতে। কোন প্রশ্ন নেই, যে পুরানো পোশাক ও জুতো দাখিল করা হয়েছিল তা সেই মেজকুমারের এবং এগুলি নিয়ে নীচে আলোচনা করা হবে। এটাও ঘটনা যে অত্যধিক অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত ফলাফলের বাইরে একটিও বিস্তারিত বিবরণ প্রতিবাদীপক্ষের দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। এগুলির বাইরে শুধু একটি পৃথক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে— জুতোর ছয় নম্বর মাপ, বাদীর পক্ষে মানানসই, নীচে দেখা যাবে এবং এটি প্রকাশ পেয়েছিল। বলা বাহুল্য প্রতিবাদীপক্ষ কোন কিছুই দাখিল করেনি যেমন একজোড়া জুতো, বা একটি কোট, বা একজোড়া ট্রাউজার, যেমনভাবে এই দেশের এবং সম্ভবত সারা বিশ্বের বিধবারা যা স্মৃতি হিসাবে রাখে। রাজবাড়িতে একটি কক্ষ আছে যেখানে রাজার পুরাতন বস্ত্রসমূহ বহুদিন সংরক্ষিত ছিল (প্রঃ সাঃ নং ৯৮ ও বাঃ সাঃ ৯৭৭)। তিনজন যুবতী রানী এটা দেখেছিল এবং এই ধারণা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, এমনকি যদিও এটা মানবিকতার কোন সাধারণ প্রেরণা থেকে আবির্ভূত হয়নি।

এখন দলিলগুলিকে একপাশে রেখে, যার মধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ বর্ণনা উত্থাপিত হয়েছে দেখা যাক কিভাবে এগুলির মধ্যে বীমার ডাক্তারের মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রত্যক্ষভাবে বাদীর গোচরে এনে সাক্ষ্যকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। এখন ফোটোগ্রাফ ও মৌখিক সাক্ষ্যের

দিকে নজর দেওয়া উচিত। ফোটোগ্রাফগুলি সম্বন্ধে পড়ার পূর্বে সূত্রগুলি নির্দেশ করা উচিত যাতে চোখ জানতে পারে যে কী দেখতে হবে।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর এইভাবে তার ভাইদের বর্ণনা করেছে :

	সাক্ষী	মেজকুমার	ছোটকুমার	বুদ্ধু
গাত্রবর্ণ	খুব ফর্সা বিন্দুহীন	খুব ফর্সা ঈষৎ লালচে	খুব ফর্সা ফর্সার সঙ্গে	মেজকুমারেব মত ফর্সা কিন্তু লালচে নয়
চোখ	সাদা, রঙহীন কটা রঙ দিতে পারে না	এবং হলুদ আভা বাদীর মতে কটা	গোলাপী আভা হালকা নীল কটা	কটা নীল
চুল	কটা হালকা বাদামী	কটা বাদামী বাদীর মতো	কটা হালক বাদামী	মেজকুমারের মতো কটা, ছোটর চেয়ে কালো

সংক্ষেপে সে বলেছে যে বাদীর গাত্রবর্ণ, চোখ ও চুল হচ্ছে বাদীর চোখ, চুল ও গাত্রবর্ণ। তার মতানুসারে সে একই ব্যক্তি, সুতরাং তার সাক্ষ্য বর্ণনা নয়, বরঞ্চ মানুষটিকে নির্দেশ করছে। সে বলেছে বর্তমানে সে অপেক্ষাকৃত শ্যামলা, কিন্তু ১৯২১ সালে মনে হয় এর থেকে উজ্জ্বলতর ছিল।

সে বলেছে যে নাকটিও একই রকম যদিও কিছু লোক চওড়া বলে অভিলিত করেছে। সে এটাকে চওড়া দেখেনি, কিন্তু বলিষ্ঠ হওয়ায় চওড়া দেখাচ্ছে।
মেজকুমারের উপস্থিতি হিসাবে তার সাক্ষ্যের কোন মূল্য বা উপযোগিতা নেই বিশ্লেষণ হিসাবে। সে স্বয়ং মানুষটিকে ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু অন্য তিনজনের সম্বন্ধে এই তথ্য উপযোগ। সে ও মেজকুমার ও ছোট কুমারের প্রায় একই ধরনের চুল বাদামী ও বাদামীধাঁচের এবং যাকে বাঙালিরা বলবে প্রায় একই ধরনের কটা চোখ, বাঙালিদের মত চিরাচরিত কালোচোখ নয়। মামলার একটি স্তরে মিঃ চৌধুরী 'কটা', 'পিঙ্গলা' শব্দগুলির অর্থ নিয়ে গোলমাল করছিল, চুলের ক্ষেত্রে যা বাদামী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যতক্ষণ না তার নিজের সাক্ষীরা বাদী ও মেজকুমারের চোখকে 'কটা'র মতো বর্ণনা করতে শুরু করেছিল। কেউ সন্তুষ্ট হয়নি যে যার অর্থ প্রতিবাদীপক্ষের মামলার পরিসমাপ্তি যে মেজকুমারের চোখের রঙ নীল বা পরে এটা হয়েছে, বীমাডাক্তার গ্রের মেডিকাল রিপোর্ট আসার পর। মিঃ এস পি ঘোষ (প্রঃ সাঃ কমিশন)। ১৯৩২ সালে সাক্ষ্য দিয়েছিল, যে মেজকুমার, তার বোন জ্যোতির্ময়ীদেবী, ছোটকুমার ও বুদ্ধুর চোখকে কিছুটা কটা ধরনের মত বর্ণনা করেছিল। যখন চোখ ও চুলের বিষয়ে আলোচনা করা হবে তখন এই সূত্র আলোচনা করা হবে এবং দেখা যাবে যে 'কটা' বা 'করঞ্জা' শব্দদুটি সব রঙের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, সাধারণ কালো ছাড়া, যতদূর সম্ভব এটা চোখের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত এবং এটা প্রকাশ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যে এর অর্থ নীলের একটি শেড বা একটি বিশেষ রঙ, পরবর্তীকালে এই তথ্য হয়েছিল বা এর প্রয়োজন হয়নি।

তারপর এটা কোনও অর্থে অনুমোদিত ঘটনা ছিল না যে মেজকুমার, ছোটকুমার, বুদ্ধু ও জ্যোতির্ময়ীদেবীর একই ধরনের চেহারা ছিল— অত্যন্ত ফর্সা রঙ, বাদামী ও ঐ রকমের চুল, কটা চোখ। রমানাথ রায় (প্রঃ সাঃ কমিশন) অস্বীকার করেছিল যে বুদ্ধ ও মেজকুমারের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল। যদিও এই দেশে এই ধরনের বা যে কোন ধরনের গায়ের রঙ লোকের জমি আকর্ষণ করে এবং পরে বাদীর একজন সাক্ষী তিনজনের মধ্যে সাদৃশ্যের নির্দেশ করেছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে রাতকানা কি না। শতশত সাক্ষী এসেছিল ও এর সম্বন্ধে বলেছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটনা হয়ে উঠেছিল একটি অনুমোদিত ঘটনা বা একটি ঘটনা যার সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। দেখা যাচ্ছে প্রতিবাদীপক্ষের কিছু সাক্ষী এটা অনুমোদন করেছিল এবং কেউ এটা অস্বীকার করেনি, শরৎ (বাঃ সাঃ ৩২) বলেছে যে বুদ্ধু, ছোটকুমার ও মেজকুমারের গাত্রবর্ণ একই রকমের চুল ছিল— 'লালচে' এবং বাদীর চুলও 'লালচে'।

লেফটা হোসেন বলেছে ঃ

বুদ্ধুর সাথে মেজকুমারের মিল অত্যধিক। যেমন মেজকুমারের, বুদ্ধু ও ছোটকুমারের গাত্রবর্ণ, চুল ও চোখ ছিল, বাঙালিদের মধ্যে অত্যন্ত দুর্লভ।

যেটা বাদীর পক্ষের সাক্ষ্যকে নিশ্চিত করে যে সাক্ষীরা বাঙালিদের মধ্যে এই ধরনের চেহারা দেখেনি।

" আমি বুদ্ধুবাবু ও ছোটকুমারের চেহারা দেখেছিলাম, আমার মনে পড়ে এদের — এবং মেজকুমারেরও প্রায় একই ধরনের চেহারা। আমি এই ধরনের চেহারা অন্য লোকেদের মধ্যে দেখিনি," কলিমুদ্দীন বলেছে (প্রঃ বাঃ সাঃ ৩৬)।

মিঃ এস বি ঘোষ (প্রঃ বাঃ সাঃ কমিশন) বলেছে, "মেজকুমার, ছোটকুমার, বুদ্ধুবাবু ও জ্যোতির্ময়ীদেবীর মধ্যে চোখ, চুল ও গাত্রবর্ণের সাদৃশ্য আছে। প্রতিবাদীপক্ষ সত্যসত্যই বলেছে যে "মেজকুমার সাহেব-সুবোর মত দেখতে, এই দেশের মানুষের মত নয়," (প্রতিঃ সাঃ ৮২)।

ঘটনা ও প্রতিবাদীদের সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মেজকুমারের সাথে বাদীর সাদৃশ্য আছে এবং প্রতিবাদীপক্ষের নিজের সাক্ষ্যে ঈঙ্গিত করা হয়েছে সাদৃশ্য কতদূর গিয়েছে। "প্রথম দৃষ্টিতে তাকে মনে হবে একই মানুষ," (প্রঃ সাঃ ৩৩৬)। " যদি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত," আরেকজন সাক্ষী বলেছে (প্রঃ সাঃ ২০১)। অন্য সাক্ষী বলেছে, " আমি তাকে মেজকুমার বলে বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম।" " তার নিকটে যাওয়ার পব ১৫ /২০ মিনিট ধরে তাকে দেখে আমি মনে করেছিলাম জ্যোতির্ময়ীদেবী ও বাদবাকীরা ভুল করেছিল" (প্রঃ সাঃ ৩৮৬)। সুকুমারীদেবী জিজ্ঞাসা করেছে "কীভাবে নাক চওড়া হতে পারে " (প্রঃ সাঃ ২৮০)। এই ধরনের অভিব্যক্তির গুণিতক কোন কাজের নয়।

প্রতিবাদীপক্ষের মামলা যে বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে পার্থক্য প্রধান জেরাকাবী অতুলবাবুর কাছে প্রথমে উত্থাপিত হয়েছিল যে প্রায় অন্য সকলের মত মেজকুমারকে জানত। যে পার্থক্যের সূত্রগুলি দেয় এইরূপভাবে :

	মেজকুমার	বাদী
নাক	পাতলা ও তীক্ষ্ণ	সমতল ও চওড়া
চুল	বাদামী	কালো
চোখ	বড়, টানা, সাহেবদের মত সামান্য নীলচে	গোল, ছোট, পাণ্ডুর
গাত্রবর্ণ	সাহেবদের মত লালচে	সাদা
ঠোঁট	পাতলা	ভারী
গোঁফ	মোটা বাদামী, প্রসাধনের দ্বারা সাঁটা	পাতলা
চলন ভঙ্গি	হেলে দুলে	সাধারণ
উচ্চতা	———	হয়ত বেশী
ছাতি	লোমহীন	লোমশ
কপাল	সম্পূর্ণ সমতল	উঁচু
ভ্রূ	পুরু ও দেখায় যেন চিত্রিত	পাতলা ও লোমহীন

এই মামলা প্রস্তুত হয়েছিল ৮-৩-৩৩। সনাক্তকরণের অন্যকোন সাক্ষীকে পূর্বে জেরা করা হয়নি, মিঃ এস পি ঘোষ ছাড়া (কমিশনে) এবং তার দ্বারা প্রতিবাদীপক্ষ এই মামলার কোন অংশ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেনি যদিও সে এমনকি অতুলবাবুর চেয়ে যোগ্য ছিল বা সম্পূর্ণযোগ্য।

কমিশনে অন্যান্য সাক্ষীগণ মেজকুমারের উপস্থিতি সম্বন্ধে বলেছিল, তাদের মধ্যে একজন শৈবলিনীদেবী, জেরায় সে কিন্তু সামান্য পার্থক্যের কথা বলেছিল। তার পার্থক্যগুলি হল :

	মেজকুমার	বুদ্ধু	বাদী
চোখ	নীলচে	নীলচে	সাদাটে
গাত্রবর্ণ	হলুদ	অত্যন্ত ফর্সা	লাল
চুল	লালচে, সূক্ষ্ম, সুন্দর সমত লভাবে আঁচড়ানো	লালচে	ঘনলাল, ভারী, শেষে খাড়া, রুক্ষ।

লেফটাঃ কর্নেল পুলি বলেছে :

জ্যেষ্ঠ কুমার ঃ

উল্লেখযোগ্য মুখ, একদিকে লাফাত, সাক্ষী মনে করে ডান দিক, অদ্ভুত চোখ, ঈষৎ টেরা— দুটি চোখ মনে হত একই দিকে নেই। উচ্চতা- ৫'৯/১০"।

মেজকুমার ঃ

এত লম্বা নয়, কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য— সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখলে। বাঙালিদের মধ্যে অত্যন্ত ফর্সা। গাত্রবর্ণের সামান্য মতভেদ ছিল যে ঈষৎ গোলাপী।

চোখ— পাণ্ডুরতা ধুয়ে নীলের আভাকে দিয়েছে।

মুখ— ডিম্বাকৃতি

নাক— খড়্গনাসা। অত্যন্ত সৌম্য।

তৃতীয় কুমার ঃ মেজকুমারের মতো, অত্যন্ত ফর্সা, কিন্তু বেঁটে ও বলিষ্ঠ। দেখা যাচ্ছে বাদী আদালতে বলেছে যে তার চুল কালো থেকে ধূসর রঙে পরিণত হয়েছে, গায়ের রঙ সম্পূর্ণ অন্যরকম, চোখ পুরোপুরি অন্য রঙের, নাকের আকৃতি পুরোপুরি অন্যরকমের, চোখ হালকা বাদামী, সবুজের রেখা আছে। সে কোন সাদৃশ্য দেখেনি, মেজকুমারের মতো একই উচ্চতা ব্যতীত উভয়ে কিছুটা মোটা। প্রতিবাদীপক্ষের সম্ভাব্য মামলা হিসাবে লেফটাঃ কর্নেল পুলির এই সাক্ষ্য উল্লেখ করা হচ্ছে, এই কারণে নয় যে পুলির মেজকুমারের সম্বন্ধে প্রকৃত স্মৃতি ছিল। সে একটি পার্থক্য অঙ্কন করেছিল যা মনে হয় খুব আকর্ষণীয়, কিন্তু সে অনেক বিষয়ে বলেছিল যা প্রকৃতপক্ষে ও অনুমোদন সাপেক্ষে তার স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, যেভাবে আগে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এবং এটা সন্দেহজনক হয়ত মেজকুমারের কোন প্রকৃত স্মৃতি তার ছিল কিনা।

পার্থক্যগুলি হল ঃ

	বাদী	মেজকুমার
চুল	গাঢ় বাদামী	হালকা
নাক	মোটা	চোখা
নাসারন্ধ্র		পৃথক
চোখ		নীলচে
চোখের আকৃতি		পৃথক
চোখের পরিমাপ		বৃহত্তর
কান		পৃথক
গোঁফ		পৃথক
চোখের গোলক		পুরো ঘন এবং শেষের দিকে বক্র বাদামী
মুখের রঙ		পরিষ্কার, কিন্তু লালচে হচ্ছে রোদে পোড়া

জ্যোতির্ময়ীদেবী অস্বীকার করেছে যে বাদীর চোখ নীলচে, সে এই পার্থক্য অস্বীকার করেছে এবং গাত্রবর্ণ হিসাবে সে বলেছে যে এটা বাদীর মতন এবং কেউ জানে না বাদী রোদে পোড়া কিনা, এটা বোঝা মুসকিল কেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল যে বাদী রোদেপোড়া কি না, দেখা যাচ্ছে যে এটা হয়ে উঠছিল একটা সাধারণ মত যে কুমারের মুখ ফর্সা ও লালচে, পার্থক্য সংঘটিত হচ্ছিল যে কুমারের মুখের উপর লালচে আভা রোদে পোড়ার ফল।

বাদী বাঙালিদের পক্ষে ফর্সা, মেজকুমার এমন ছিল। মেজকুমারের গাত্রবর্ণ রক্তিমাভ, শরীর হলদে মুখ রোদে পোড়া সেজন্য লালচে।

উভয়ের চোখ— কালো নয়, কুমারের চোখ ধূসর।

উভয়ের চুল — বাদামী, শেড, পৃথক।

"আমাদের মামলা হচ্ছে যে মেজকুমার দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন, কাটা কাটা চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক, বড় চোখ। সব মিলিয়ে তাকে ভদ্রলোকের মত দেখাত। বাদীকে দেখতে পালোয়ানের মত।" সে ভদ্রলোকের মত দেখতে নয়, বাঙালি নয়।"

মেজ রানীর প্রধান জেরায় বক্তব্য এই :

মেজকুমার ঃ

গাত্রবর্ণ— অত্যন্ত ফর্সা, হলদে আভা যুক্ত। যদি কেউ বলে, লালচে আভাযুক্ত ফর্সা, ঠিক নয়।

পুনর্জেরায় জিজ্ঞাসা করা হয়—

প্রঃ— আপনি কি বলতে পারেন আপনার স্বামীর মুখের রঙ কী?

উঃ— রোদেপোড়া (সাক্ষীর দ্বারা উক্ত)।

প্রঃ— আদালতের প্রতি ঃ লালচে ধরনের, যেমন রোদেপোড়ার জন্য হয়।

নাক— 'টিকালো।'

চোখ — ভাসা, টানা, নীলাভ, যাকে বলা হয় নীলচোখ (সাক্ষীর অভিব্যক্তি)

চুল — লালচে

গোঁফ — লালচে, যাকে বলা হয় 'বাদামী'।

চোখের ভ্রূ — লালচে (বাদামী)। দীর্ঘ, পাতলা, বাঁকা যেন আঁকা।

কপাল— গতানুগতিক, উঁচু নয়।

ঠোঁট— পাতলা।

কান— গতানুগতিক।

ছাতি — লোমহীন।

পাথর্ক্যের সূত্র — প্রথমগুলি নির্ণয় করতে অগ্রসর হওয়া যাক যেগুলিতে ফোটোগ্রাফ অব্যবহার্য। রঙ এখানে কোন কাজ করেনি।

বয়স— মেজকুমার, যদি আজ বেঁচে থাকত, ১৯৩৫ সালের ২৯ শে জুলাই ঠিক ৫২ বছরের হত। বাদীকে দেখতে এই বয়সী।

উচ্চতা— বাদীর উচ্চতা ৫´ ৬˝ । উচ্চতা আদালতে জুতোছাড়া মাপা হয়।

১৯০৫ সালের ২ এপ্রিল মেজকুমারের জীবনবীমার জন্য বীমাডাক্তার আর্নল্ড ক্যাডি তার গোপনীয় মেডিক্যাল রিপোর্টে জুতো ছাড়া তার উচ্চতা লিখেছিলেন ৫´ ৪˝ (এক্সি ২৩০)। ঐ দিন মেজকুমারের বয়স ছিল ২০ বছর ৮ মাস ও ৫ দিন। তার জন্ম তারিখ ২৮-৭-১৮৮৪। ব্যপার হচ্ছে সে এক ইঞ্চি বৃদ্ধি হতে পারত কিনা এবং আজকে ৫´ ৬˝ হতে পেরেছিল।

যদিও প্রতিবাদীপক্ষ সতর্কভাবে এই রিপোর্ট ' দাবি করা থেকে বিরত থেকে ছিল, তার জানত কুমার ও বাদীর মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য এই মামলার একদিন পূর্বে দেখা গিয়েছিল এই

মতামতের জন্য যে বাদী অপেক্ষাকৃত লম্বা। মিঃ চৌধুরী জিতেন্দ্রকে (বাঃ সাঃ ৯) জিজ্ঞাসা করেছিল কোন বয়স পর্যন্ত সে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং আরেকজন সাক্ষী; একজন চাষীকে জিজ্ঞাসা করেছিল। কত বয়স পর্যন্ত সে বৃদ্ধি পেয়েছিল? উত্তরগুলি কোন কাজের ছিল না।

বাদীর পক্ষ থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য দিয়েছিল সাধারণ প্রশ্নের ভিত্তিতে যে কত বয়স পর্যন্ত একজন মানুষ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিপক্ষের সাক্ষী এই বিষয়ে কিছু বলেনি যাতে এটা বলা হতে পারে যে সাধারণ প্রশ্নে বিশেষজ্ঞদের মত পার্থক্য নেই। লেফটাঃ কর্নেল ম্যাক গিলক্রিস্ট, এম এ এম ডি (এডিনবার্গ), ডি এস সি (এডিন), এম আর সি পি (লন্ডন), আই এম এস (অবসরপ্রাপ্ত) যার পূর্ণ যোগ্যতা দিতে হবে যখন কুমারের অভিযুক্ত মৃত্যু-বিষয়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ছিল ৮ বছর ধরে, বলেছে যে শারীরবিদ্যায় দৈহিক উচ্চতার পঠন নিশ্চিত করে, যে এই দেশে একজন মানুষ ২৫ বছর পর্যন্ত বাড়ে এবং একজন মানুষ ৫′ ৫″ ২০/২১ বছরে, বেড়ে ৫′ ৬″ হতে পারে ২৫ বছর বয়সে বা উচ্চতা ৫ বা ৬ ইঞ্চির মাঝে যে কোন উচ্চতায় বৃদ্ধি পেতে পারে। এই বৃদ্ধি বন্ধ হয় যখন কিছু নির্দিষ্ট হাড়ের বৃদ্ধি পায়। মতামত দেওয়া হয়েছিল উরুর হাড় , যা তিনটি স্থানে বৃদ্ধি বন্ধ হয়। যেমন, ইংল্যান্ডে ২০ থেকে ৫০ বছরে উচ্চতা বৃদ্ধির হার ১/৪ ইঞ্চি, বিভিন্ন জাতির মধ্যে "একই বয়সে উচ্চতা বৃদ্ধির হার বিভিন্ন," উচ্চতার উপরে রুডলফ মার্টিনের একটি বই আছে। আরেকজন বিশেষজ্ঞ ডাঃ ব্র্যাডলির মতে ১২ থেকে ২১ বছর উচ্চতার বৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকরী পর্ব, অন্যান্য শর্ত যেমন খাদ্য ইত্যাদি সম হওয়া উচিত। আমরা সাধারণত আশা করি ২২/২৩ বছরে বৃদ্ধি বন্ধ হয়, কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতানুসারী ও নৃতাত্ত্বিক হিসাব অনুসারে ২১ বছরে বড়জোর ৩০ বছর পর্যন্ত উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সাক্ষী বিবেচনা করে— ৩০ বছরকে ব্যতিক্রম হিসাবে, দীর্ঘ হাড়গুলি ২৪ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সে জানে না কেন একজন মানুষের ২১ থেকে ২৫ বছরে বাড়া উচিৎ নয়, বিশেষ করে যদি সে বাহ্যিক জীবনযাপন করে, শিকার করে, ঘোড়ায় চড়ে, গাড়ী চালায়, কুমারের মতো। এবং সে তার নিজের পুত্রের উদারহরণ দিয়েছে, সে অভিবাসী নয়। সে তার ২০ বছরের পুত্রের থেকে লম্বা ছিল। বর্তমানে পুত্র ২৫ বছর বয়সী এবং পিতার চেয়ে ১/২ ইঞ্চি বেশী লম্বা এবং বেশী ওজন।

বীমা-ডাক্তার হিসাবে সাক্ষীর বিস্তর অভিজ্ঞতা ছিল। সে জীবনবীমার বিভিন্ন মামলা দেখেছে, যেহেতু তাকে নতুন নতুন আবেদনপত্রকে পুরাতন আবেদনপত্রের সাথে তুলনা করতে হত যাতে তার মত শুধুমাত্র সে যা পড়েছে বা শিখেছে তার উপর নির্ভরশীল না হয়, বরঞ্চ অভিজ্ঞতার উপর। যেমন, সে বলেছে, জীবনবীমার ডাক্তারের বিচারশক্তি বৈজ্ঞানিক হবে আশা করা যায়, কিন্তু সে জানে যে তারা সর্বদা এমন হয় না যেমন কিছু পরীক্ষকদের কোন সুযোগ সুবিধা থাকে না, যেমন, পরীক্ষার ছক। যাইহোক এ বিষয়ে অভিজ্ঞ দুজন ডাক্তারের মতামতের উপর নির্ভর করা যায়। উচ্চতা ও ওজনের তালিকা ছিল লিয়নের

মেডিক্যাল জুরিস প্রুডেন্সের ৭ম সংস্করণের ৪৬ পাতায়। এতে উচ্চতা, ওজন বয়সের অনুপাত ইংরেজি হিসাবে দেখানো হয়েছে। অনুসন্ধানের অধীনস্থ বিষয়ে এটা কোন কাজের নয়। এই তালিকাটি ১৯৩৫ সালের ৯ ম সংস্করণের থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

এটা সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভাব্য যে ২১ বছরে ঠিক উপনীত হওয়ার পূর্বেই কুমারের বৃদ্ধি রোধ হয়নি। বাদী যদি ঠিক ৫' ৫'' হত, তাহলে এটা উত্তমরূপে তার বিরুদ্ধজনক পরিস্থিতি হিসাবে প্ররোচিত করা যেতে পারত। কিন্তু এই সম্ভাব্যতা বাদ দিয়ে, দুটি অন্য বিবেচনা আছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে যে প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষীগণ বলে না যে যখন তারা ১৯২১ সালে বাদীকে দেখেছিল সে ছিল অপেক্ষাকৃত লম্বা। অতুলবাবু কমিশনে বলেছে বাদী সম্ভবত লম্বা। সে যা বলেছে কিছুই গণ্য করা যায় না। অন্য লোক কি বলে দেখা যাক—

"বাদী সামান্য লম্বা। আমি বলি না সে আলাদা (প্রঃ সাঃ ১৪০), আমি আন্দাজ করেছি বাদী সামান্য লম্বা, কিন্তু পার্থক্য এমন নয় যে একজন অন্যজন হতে পারে না (প্রঃ সাঃ ১৫)। " " শুধু উচ্চতা থেকে একজন বলতে পারে না সে কুমার নয়।" (প্রঃ সাঃ ৬১), (একজন মাহুত যে প্রায় সারাক্ষণ কুমারের সাথে থাকত)। আশু ডাক্তার বা রায়সাহেব এই বিষয়ে কিছু বলেনি। সত্যেন্দ্রবাবু যে শুধু ১৯৩৫ সালে তাকে আদালতে দেখেছিল : "আমি তাকে লম্বা মনে করেছিলাম কিন্তু দৈহিক উচ্চতা গুরুত্বপূর্ণ নয়" অর্থাৎ কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। লেফটান্যান্ট কর্নেল পুলি মনে করে যে কুমার প্রায় বাদীর মতই লম্বা ছিল, কোন পার্থক্য পোষণ করেনি। সে তাকে ১৯০৯ সালের ১৪ ই ফেব্রুঃ থেকে ১৮ই এপ্রিলের মধ্যে দেখেছিল, যদি সে তাকে আদৌ দেখে থাকে। মিঃ র‍্যামকিন মনে করে যে বাদী প্রায় একই রকম লম্বা। প্রতিবাদীদের মধ্যে একজন সাক্ষী খুবই আকর্ষক । সে বলেছে যে বাদী সামান্য লম্বা। প্রতিবাদীদের মধ্যে একজন সাক্ষী খুবই আকর্ষক। সে বলেছে যে বাদী সামান্য লম্বা "সে কেমন করে অনেক লম্বা হতে পারে?" প্রতিবাদীদের একজন সাক্ষী বলেছে যে বাদী ৩/৪ ইঞ্চি বেশী লম্বা, বাদী এত বেশী লম্বা যে এটা দেখানোর পক্ষে যথেষ্ট যে সে ঐ মানুষটি নয়। এই দুজন সাক্ষীকে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। এমনকি অতুলবাবুও 'হয়তো'র ওপারে যেতে পারে না। ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল বয়সের প্রতি লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞের মতামত, সম্ভবত বৃদ্ধি রোধ হয়নি। ইংরেজি দর্জিদের দোকানে গভীর অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল যেখানে কুমারের পরিমাপ রক্ষিত ছিল, এবং সত্যবাবু, যে এই অনুসন্ধানের কথা স্বীকার করেছে, বলেছে যে ফলাফল অবশ্য কৌঁসুলীর সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে সে অবশ্যই জুতোর জন্য ছয়নম্বর দাখিল করেছে। উপরে বলা হয়েছে যে মিঃ চৌধুরী ব্যাখ্যা করেছিল কেমন করে সে এটা দাখিল করেছিল। ঘটনা হচ্ছে, অনুসন্ধান হয়েছে, ফলাফল ছিল এবং সত্যবাবু বলেনি যে এগুলি নেতিবাচক। দরজির কাছে পোশাক প্রস্তুত করতে সাধারণত পূর্ণদৈর্ঘ্যের উল্লেখ থাকে। এটা সদ্যপ্রস্তুত নয়। শেষ বিষয়টি হচ্ছে দরজির বিল যেটা ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট প্রতিবাদীদের দ্বারা দাখিল করা হয়েছে। এটা কলিকাতার মেসার্স ফ্রেপস অ্যান্ড কোং-এর বিল। মতামত প্রদান করা হয়েছিল যে মেসার্স ফেল্পস ও

মেসার্স থারম্যান মেজকুমারের জন্য কিছু পোশাক প্রস্তুত করেছিল। এখন এ বিষয়ে কোন গোলমাল নেই যে মেজরানী কিছু বিশেষ পোশাক বৃদ্ধকে উপহার হিসাবে দিয়েছিল ও এর কিছু আদলতে পেশ করা হয়েছিল। এই সাক্ষ্য রানী অস্বীকার করেনি বা রানী অথবা অন্য কেউ আদালতে পেশকৃত এই পোশাকের সনাক্তকরণের অস্বীকার করেনি। বিচারক এই সমস্ত পোশাক দেখেছিল। এগুলি পুরানো পোশাক। এই পোশাকের মধ্যে আছে একজোড়া ভেলভেটের 'শিকার' কোট এবং আরেকটি শিকার কোট ও একটি জমকালো দরবারী পোশাক যার সোনার কারুকার্য এখনো ম্লান হয়নি।

এক্সিঃ xxi হচ্ছে দরবার কোট এবং এক্সিঃ xxii হচ্ছে পার্শ্বে কারুকার্য করা এক জোড়া ট্রাউজার, এক্সিঃ xxvii ও xxvi হচ্ছে দুটি হলুদ শিকার কোট, প্রত্যেকটিতে মেসার্স হারম্যান ও কোং-র এবং রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নাম সাঁটা, তারিখটি ২৭-১-০৯, এক্সি xxvii হচ্ছে তৃতীয় শিকার কোট এবং এটিও মেসার্স হারম্যান এ মেজকুমারের নাম বহন করছে, তারিখ ২০-১-০৯। এগুলি মনে হয় ১৯০৯ সালে লর্ড কিচেনারের সফর উপলক্ষে প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিন্তু সাক্ষ্য হিসাবে এই ট্যাবগুলিকে ধারণা বা গ্রহণ করা যায় না, শুধু ঘটনা হিসাবে ছাড়া। এই পোশাকগুলি নিঃসন্দেহে মেজকুমারের পুরানো পোশাক। সাক্ষ্য হিসাবে এতে কোন গোলমাল নেই। অন্য দিকে, মিঃ চৌধুরী জ্যোতির্ময়ীদেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল এই পোশাকগুলি বাদীর সাথে মানানসই করার জন্য বদলানো হয়েছিল কিনা। পোশাকগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল, কোন হেরফের করা হয়নি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই পোশাকগুলি মেজকুমারের পুরানো পোশাক। বাদী যখন কলকাতায় ছিল তখন এক্সি xviii হচ্ছে সেই ফোটো। সে শিকারের কোট পড়ে xxiv চিহ্নিত একটি ফোটোতে দেখা গিয়েছে ।

এটি হচ্ছে সেই অভিন্ন 'দরবার' পোশাক ও অভিন্ন ' শিকার কোট '। জ্যোতির্ময়ীদেবীর সাক্ষ্য হচ্ছে কোন তর্ক ওঠেনি যে পোশাকগুলি পৃথক এবং এমন কোন মতামত দেওয়া হয়নি যে এগুলি মাপমতন করার জন্য কাটাজোড়া হয়েছে। বিচারক নিজে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এইসব পোশাক দেখে। ' দরবার পোশাক ফোটোতে' যে ট্রাউজার ছিল সেটা গোড়ালির কাছে জড়ো হয়ে থাকত এবং মিঃ চৌধুরী এটাকে বেঢপ বলে ইঙ্গিত করেছেন। যাইহোক এটা অবশ্যই ঠিক যে বাদী কুমারের চেয়ে লম্বা ছিল না, যদি ট্রাউজার না লক্ষ্য কর তবে তাঁকে বেঁটে বলা যেতে পারে এবং দেখা যায় এই ধরনের পোশাকের ট্রাউজার একটু দীর্ঘ করে প্রস্তুত করা হয় এবং জুতোর সোলের তলায় বন্ধনী করা হয়। ট্রাউজারের মধ্যেও বকলস্ থাকে, কিন্তু মনে হয় ফোটো তোলবার সময় বকলসগুলি আটকানো হয়নি। মেজকুমার যদি জীবিত থাকে, সে বাদীর উচ্চতা পেতে পারে এবং তার উচ্চতা তার পরিচিতিকে স্থানচ্যুত করে না।

দেহ

প্রতিবাদীদের শিক্ষি ত কৌঁসুলী তার বক্তব্যের শুরুতে পার্থক্যসূত্র হিসাবে উল্লেখ

করেছিল যে মেজকুমার ভদ্রলোকের মত দেখতে, যেখানে এই মানুষটিকে দেখতে ষণ্ডা পালোয়ানের মত। সংক্ষেপে সে মোটা।

গাত্রবর্ণ

বাদীর গায়ের রঙের বিষয়ে কোন গোলমাল ছিল না। বাদী ছিল অত্যন্ত ফর্সা এবং তার গাত্রবর্ণ যদিও বয়সের ফলে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল, তবুও একটা রক্তিমাভা ছিল। প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষীগণ এই রক্তিমাভাকে পার্থক্য হিসাবে জোর দিচ্ছিল। বাদী শুধু লালচে ছিল না, সেখানে মেজকুমার ছিল হলদেটে, কিন্তু সে ছিল শ্যামল।

জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে বাদী বর্তমানে কালো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ১৯২১ সালে যখন সে আবির্ভূত হয়েছিল, সে আগের থেকে ফর্সা হয়ে ছিল। এই সাক্ষ্যের পূর্বে এমন কোন মতামত ছিল না যে সে কম ফর্সা। অন্যদিকে, এমন মতামত ছিল সে আরো ফর্সা ছিল। শতশত সাক্ষী মেজকুমারের গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, কিন্তু কোন মতামত ছিল না যে বাদী তার চেয়ে কালো । বাঃ সাঃ ৪৩৮ যে বলেছিল যে সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে ১৯২১ সালের মে মাসে বাদীকে দেখেছিল এবং সে তাকে সনাক্ত করেছিল মেজকুমার হিসাবে, তাকে জেরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—

প্রঃ- আপনি একজন অতি ফর্সা মানুষকে বসে থাকতে দেখছেন?

উঃ- হ্যাঁ।

দেখা গিয়েছিল সমস্ত মানুষ তার প্রতি আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে। এ থেকে বোঝা গেল তারা কুমারকে দেখতে এসেছে।

প্রঃ- আপনার কোন সন্দেহ নেই যে ঐ মানুষটি কুমার?

উঃ- সন্দেহ নেই-— তার চেহারা থেকে।

দুজনের মধ্যে পার্থক্য ছিল যে মেজকুমার "লালচে ধরনের ফর্সা" যেখানে বাদী 'ফর্সা'; এটা ছিল কমিশনের সামনে অতুলবাবুর সাক্ষ্যে। শৈবলিনী দেবীই প্রথম হলুদ কথাটার সূচনার করেছিল, যে মেজকুমার ছিল হলদেটে বা হলদে, কিন্তু বাদী হচ্ছে লাল। অতুলবাবুর মত অনুসারে, বাদী যথেষ্ট লালচে নয়। শৈবলিনীদেবীর মতে বাদী অত্যন্ত বেশী লালচে ধরনের।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর প্রতি কৌঁসুলী এই ভাবে গাত্রবর্ণের বিষয়ে মামলা রেখেছিল; মেজকুমারের মুখবর্ণ ছিল "ফর্সা কিন্তু লালচে রোদে পুড়ে। রোদেপোড়া শব্দটি কৌঁসুলীর নিজস্ব শব্দ। মামলাটি হয়ে যাচ্ছিল যে মেজকুমার ছিল হলদেটে— এটা হচ্ছে রানী যা বলেছিল, কিন্তু লেফটাঃ কর্নেল পুলি মেজকুমারের গাত্রবর্ণের সম্বন্ধে সন্দেহ করেছিল। সুতরাং মুখের লালচে ভাব ছিল, কিন্তু এটা ছিল রোদেপোড়ার ফল।

এই রোদেপোড়ার ব্যাপারে পরে আসা হবে, কিন্তু যে ব্যাপারটা বাকী থাকে, এবং যা বিবেচনা করতে হবে, সেটা হচ্ছে মেজকুমারের গায়ের রঙ ফর্সা এবং হলদেটে, মুখের লালচে আভাস যেন রোদেপোড়া, মামলা হচ্ছে বাদীর গায়ের রঙ কালো যা বয়সোচিত কারণে সৃষ্ট। বাঃ সাঃ ৪৩৮-এর প্রতি আরোপিত বক্তব্য ছিল যে বাদী কুমারের মতই ফর্সা। প্রতিবাদীপক্ষ

তাদের মামলার উন্নতির সময়ে এই ভবিষ্যৎ চিন্তা নিয়েছিল এবং বাদীর দ্বারা এক দরখাস্তের উত্তরে আরেকটি দরখাস্ত করেছিল ৯-৮-৩৫ তারিখে, ডি-ফাইলের পত্রের সংখ্যা নং ছিল ৩২০৪ — এই বলে যে তাদের বক্তব্য, মেজকুমারের গায়ের রঙ সম্পর্কে , ১ নং প্রতিবাদী রানীর সাক্ষে আছে— যে সে ছিল অত্যন্ত ফর্সা মানুষ, শরীর হলুদ ছোপ সহ এবং মুখে সামান্য রোদেপোড়ার চিহ্ন " এবং তারা বলতে চেয়েছিল যে বাদী নিজে যেমন মতামত দিয়েছে যে সে কম ফর্সা। একটা পার্থক্য ছিল, যদিও অনেক মানুষ এটা চিহ্নিত করতে সক্ষম নাও হতে পারে। সেটা সময়ের এই ব্যবধান বা এর বিস্তারের ফল।

মেজকুমার সম্বন্ধে একটা বিষয় ছিল যে বিষয়ে সকলে একমত ছিল যে তার গায়ের রঙ অপূর্ব যাকে একজন নারী বর্ণনা করেছিল দুধে-আলতা গায়ের রঙ হিসাবে বা কর্ণেল পুলি বলেছিল গোলাপী। এমনকি একজন ইংরেজও তাকে ফর্সা বা অতি ফর্সা বলবে। যদি, ১৯২১ সালে, বাদীকে বেশী কালো দেখাচ্ছিল, তাহলে সেটা অবিলম্বে উল্লেখিত হয়েছে এবং বিচারের একেবারে শুরু থেকে একটি পার্থক্যসূত্র হিসাবে সাদরে গৃহীত হয়েছে। পার্থক্যের ধরন বিষয়ে কি মতামত দেওয়া হয়েছিল যে সে ছিল ফর্সা, যেখানে মেজকুমার ছিল লালচে; সে ছিল হলদেটে (পরবর্তী সময়ে) , যেখানে এই মানুষটি ছিল লালচে।

১৯২১ বা পরবর্তীকালে বাদীর গাত্রবর্ণ বিষয়ে আমরা প্রতিবাদীদের তরফে এই বিবৃতি পাই :

" সুন্দর পরিষ্কার ত্বক "— মিঃ লিন্ডসে

" স্বাস্থ্যপূর্ণ ফর্সা "— মিঃ গুপ্ত (২৫)

" সুন্দর ফর্সা ব্যক্তি " — মিঃ দেবব্রত মুখার্জি (কমিশনে)

প্রঃ- বাদীর গায়ের রঙ কি অন্যরকম?

উঃ- পুরোপুরি নয়। বাদী ফর্সা কিন্তু লালা আভা সহ।

প্রঃ- যদি কেউ বলে মেজকুমারের মুখ লালচে, ঠিক হবে?

উঃ- এটা ছিল কিছুটা লালচে ;

মেজকুমারের গায়ের রঙ ছিল ফর্সা ও লালচে। লালচের সাথে একমত হওয়া যায়। বলা হয় ' কিছুটা লালচে' যেহেতু এটা ছিল রোদেপোড়া । বাদীর মুখের রঙও ছিল ' লালচে', কিন্তু এটা ছিল সাহেবের মুখের মত লালচে। এটা রোদে পোড়ার মত দেখাত না।

এটা বলেছে কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী (বাঃ সাঃ ১৪), জয়দেবপুরের একজন শিক্ষক, যার পদ এস্টেটের ক্ষমার দ্বারা প্রাপ্ত এবং মেজকুমারের শিক্ষা প্রমাণ করতে যার চেষ্টা নিম্নে আলোচনা করতে হবে।

অভিজাত বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী গাঙ্গুলী, যার পুরো যোগ্যতা ও পদমর্যাদা নীচে উল্লেখিত হবে। যে লেডি হার্ডিঞ্জ ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিত্র অঙ্কন করেছিল এবং নিজেও ফর্সা মানুষ ছিল। সে বলেছে—

"এটা বলা যেতে পারে আমি গাত্রবর্ণের একজন ভাল বিচারক, আমি মনে করি যে বাদী বর্তমানে আমার থেকে সামান্য ফর্সা। ট্রপিক্যাল আবহাওয়ায় একজন ইউরোপীয়র এই ধরণের গাত্রবর্ণ হয়। এটা মনে করা যায় যে কোন এক সময়ে বাদী নিশ্চয় অত্যন্ত ফর্সা ছিল বাস্তবিকভাবে। সে বর্ণনা করেছে বর্তমান গাত্রবর্ণকে ফর্সা হিসাবে, বরঞ্চ রোদেপোড়া "গোলাপী ধাঁচের" বলা যেতে পারে পূর্বেকার দিনে সে নিশ্চয় অত্যন্ত গৌরবর্ণ সম্পন্ন ছিল।

এ বিষয়ে একমত হওয়া যায় এবং বলা যেতে পারে বাদীর গায়ের রঙ ছিল গোলাপী, উজ্জ্বল সাদা, হলুদ ধরনের নয় যাকে বাঙালীদের মধ্যে ফর্সা বলা যায়। এই মতামতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে গাত্রবর্ণের কিছু বৈশিষ্ট্য , প্রকৃতপক্ষে যেমন ছিল এটা। যদি বয়সের প্রভাবকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় এবং যদি তার সার্টের নীচে বাহুর প্রতি লক্ষ্য কর তাহলে এখনো এটা দেখা যায়। কারো গায়ের রঙ সর্বদা এক রকমের থাকে না। বয়সের সাথে এর পরিবর্তন ঘটে। স্বাস্থ্য, চিন্তা, দিনের ঘন্টার সাথে, আবহাওয়ার মধ্যে সৃষ্ট আলোর সাথে, গৃহীত খাদ্য পানীয়ের সাথে বয়সের পরিবর্তন হয়।

যখন আপনি কোন গায়ের রঙের বিষয়ে চিন্তা করেন বা একে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন, আপনি এই পরিবর্তনের সাধারণ রূপ দেন এবং এটা কি ধরনের বস্তু তা নির্ধারণ করেন, প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তন সত্ত্বেও, যৌবন থেকে, বিষয়টিঃ একটি নাম দেন, কিন্তু এটা একটি ধরনের দ্বারা সবচেয়ে ভাল নির্দেশ করতে পারেন। — এটা একটি গোলাপের মতন, বা দুধ ও গোলাপের মত, যদিও মাখন, জলপাই, হাতীর দাঁত, মর্মর গোলাপী, জীব ফলের মত, তামা, বাদামীর মত শব্দসমূহ কিছুদূর এই রীতির নির্দেশ করে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে বেশির ভাগ সাক্ষীর সাক্ষ্যদানে এই সমস্ত শব্দের দুর্বলতা দেখা গেছে স্বাভাবিকভাবে। সুতরাং বড়জোর তারা বলতে পারে সাহেবী অর্থাৎ ইউরোপীয় ধরনের। কিন্তু খান সাহেব এ এম এ হামিদ সবচেয়ে ভালভালে এটা নির্দেশ করেছে। সে বলেছে, "মেজকুমার দেখতে সুদর্শন ভদ্রলোকের মত, গায়ের রঙ অদ্ভুত রকমের। বঙ ছাড়া আমি স্বল্প সাদৃশ্য দেখেছি বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে। বাদী ও বুদ্ধুবাবুর মধ্যে গায়ের রঙের সাদৃশ্য আছে এবং এছাড়া কিছুই নয়।" সেইদিন সে বাদীর সাথে একই সময় ও স্থানে বুদ্ধুকে দেখেছিল এবং সে বলেছিল যে বাদী ও মেজকুমার যারপরনাই পৃথক। সে ভুল করতে পারে।

এখন, বুদ্ধুর গাত্রবর্ণ কি ছিল? এটা ছিল ছোটকুমারের মত ও মেজকুমার ও তার নিজের মত — বলেছে জ্যোতির্ময়ীদেবী। এই পার্থক্য অনুসারে, বুদ্ধু মেজকুমারের মত লালচে নয়, কিন্তু ছোটকুমার ছিল গোলাপী আভা সহ অত্যন্ত ফর্সা। মেজরানীও এটা স্বীকার করেছে। শৈবলিনী ছোট কুমারকে অত্যন্ত ফর্সা বলেছে। মিঃ র‍্যামকিন তাকে মেজকুমারের চেয়ে কালো বলেছে। কিন্তু লেফটা কর্নেল পুলি যে তাকে খুব ভালভাবে জানত — যে তার সাথে পোলো খেলেছিল এবং তার কাছে একটি ঘোড়ার বাচ্চা বিক্রি করেছিল — বলেছে সে মেজকুমারের মত ফর্সা এবং সৌভাগ্যচাঁদ (প্রঃ সাঃ ৮৭) এদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে ফর্সা বলেছে।

যাইহোক, প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য দেখায় যে বাদীর গায়ের রঙ মেজকুমারের মত। প্রতিবাদীপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত হলদেটে ছোপ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং মেজকুমারের গাত্রবর্ণের বিষয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে গোলাপী ও সাদা বা দুধ-সাদা, বাদীর একজন সাক্ষী যা বলেছে।

শৈবলিনী হলুদ দিয়ে শুরু করেছিল, লালচে মুখ ছাড়া। পুলি মেজকুমারকে একজন অত্যন্ত ফর্সা মানুষ বলেছে, গোলাপী গাত্রবর্ণের ধারণা করে। জ্যোতির্ময়ীদেবী অনেক পরে লাল-হলুদের আভা সহ, বাদীর মত, যার দ্বারা সে বোঝাতে চেয়েছিল তার গায়ের রঙ ফ্যাকাশে ছিল না বা তার মত অনুজ্জ্বল সাদা ছিল, বরঞ্চ কিছুটা আভা ছিল। এই সাক্ষী কয়েকদিনের জন্য বিচারকের চোখের সামনে ছিল এবং বিচারক দেখেছিল যে তার গাত্রবর্ণ ছিল প্রায় পুরোপুরি সাদা, প্রায় সাহেবী, কিন্তু অত্যধিক ফ্যাকাশে, কোনরকম স্বল্পতম আভা ছাড়া। সে বাদীকে পৃথক ভেবে হলুদ আভার কথা বলেনি, বরঞ্চ বাদীর গায়ের রঙকেই নির্দেশ করেছিল। মেজরানীর হলুদ গাত্রবর্ণ হচ্ছে হলদে ছোপ। যে সমস্ত সাক্ষীরা বলছিল যে মেজকুমারের গায়ের রঙ সাহেবী, তাদের মিঃ চৌধুরী এটা দেখাতে জেরা করেছিল যে কারো গাত্রবর্ণ সাহেবী হতে পারে না, তা সত্ত্বেও কেউ যদি একে সাহেবী বলতে থাকে তবে সঠিক সাহেবী ধরনকে বোঝাতে চায় যা কোন বাঙালির হতে পারে না। সাহেবী শব্দটির দ্বারা তারা নির্দেশ করছিল একটি ধরন বা উজ্জ্বল হলুদের থেকে পৃথক। যাকে এই দেশে ফর্সাও বলা হয়। প্রতিবাদীদের একজন সাক্ষী বরঞ্চ এই পার্থক্য খুব ভালভাবে নির্দেশ করেছে। সে বলেছে মেজকুমার গৌরবর্ণ নয়। বরঞ্চ সাদা ধবধবে। তার গাত্রবর্ণ এই পার্থক্যকে নির্দেশ করতে সাহেবী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

সে প্রকৃত সাহেবের মত ছিল না যা কিনা গোলাপের মত গোলাপী গাল বা তরবারির মত তীক্ষ্ণ নাক।

নীচে মেজকুমারের গাত্রবর্ণের কিছু বর্ণনা সাহেবী (বাঃ সাঃ ২১০, ৩৬৬,৪২৬,৬৬০)

সাহেবের মত ফর্সা (বাঃ সাঃ ৪৫৮: প্রঃ সাঃ ৫৭, ৬৩, ৭২, ৭৪, ৮৩, ২৭, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৫৪, ৩৭ ও অন্যান্যরা)।

ইংরেজ সাহেবের মত ফর্সা (বাঃ সাঃ ৪২৭— একজন (উকীল (৪০)। সাহেবের মত ফর্সা ও লাল (প্রঃ সাঃ ৩০, ৪২৭ একজন) উকীল; বাঃ সাঃ আবদুল মোহন ও অন্যান্য)

"তিনজন কুমারের মধ্যে মেজকুমারের গাত্রবর্ণ ছিল লাল ও পাক্কা " ..... শিবচন্দ্র মিত্র (প্রঃ সাঃ) " লালচেমত সাদা ..... (অতুলপ্রসাদ, প্রঃ সাঃ)

" নরওয়েবাসী " সাদার উপর গোলাপী ছটা (মিঃ এন কে নাগ, বার অ্যাটল, বাঃ ৪৯)

" ফর্সা বাঙালির চেয়ে ফর্সা প্রায় সাহেবের মত " (প্রঃ সাঃ লেফটাঃ হোসেন)।

" অত্যন্ত ফর্সা, গোলাপী গাত্রবর্ণের ধারণা সহ," (পুলি)

এটাই হচ্ছে বাদীর গাত্রবর্ণ। তাকে পৃথক প্রতিপন্ন করতে ' হলদে ছোপ ' উভয় পক্ষের

সাক্ষী দ্বারা হটানো হয়েছে এবং এই ধারণাকারী গোঁড়া সাক্ষীরা ছিল ছোটরানী, ফণিবাবু, রায় সাহেব (প্রঃ সাঃ ৩১০) সত্যবাবু (৩৮০), বীবেন্দ্র (প্রঃ সাঃ ২৯০), কালী (প্রঃ সাঃ ১৪), কামিনী (প্রঃ সাঃ ৩৬৪) এবং অবনী (প্রঃ সাঃ ৩২৪)। এটা উল্লেখ্য বিষয় যে এরা সকলে এস্টেটের কর্মচারী, প্রধান তদবিরকারী রায়সাহেব, সত্যবাবু, ফণিবাবু ও দুই রানী ছাড়া। বৃদ্ধ কামিনী খাজাঞ্চী (প্রঃ সাঃ ৩৬৪) বলেছে, " রোদে পোড়ার কথা কেউ শোনেনি।" যদি কেউ বলে `রোদে পোড়া', এটা মিথ্যা, এটা বলেছে সর্বমোহন (প্রঃ সাঃ ৩০৯)। মেজকুমারের গাত্রবর্ণ সাদা ও গোলাপী যেটা বাদীর গাত্রবর্ণ এবং সত্য নিহিত ছিল জেরার প্রশ্নের ভেতর যে বাদীর গাত্রবর্ণ একই রকম।

চুলের রঙ, গোঁফ ও ভ্রূ

দেখা গেছে বাদীর চুল লালচে কালো বা কালো যাতে লালের আভা ছিল, বাঙালির সাধারণ কালোচুল নয়, সাধারণভাবে বলতে।

এটা স্বীকৃত, যখন ৬৬ তম সাক্ষী জ্যোতির্ময়ীদেবী কাঠগড়ায় ছিল, মিঃ চৌধুরী মামলায় বলেছিল। যে বাদীর চুল কালো বাদামী, কিন্তু কুমারের চুল বাদামী অর্থাৎ হালকা।

পার্থক্য ছিল যে বাদীর চুল কালো, যেখানে কুমারের চুল হচ্ছে বাদামী। এটা হচ্ছে জেরায় প্রদত্ত অতুলবাবুর পার্থক্য-সূচী। এর সাথে সঙ্গতি পূর্ণভাবে দশজন লাহোর সাক্ষী, পরবর্তীকালে কমিশনে পরীক্ষিত , দেখিয়েছিল যে বাদী ওজলার একজন শিখ কৃষক যার নাম মাল সিং, বলা হয় যে মাল সিংয়ের চুল ছিল কালো। কেউ ভুলে গিয়েছিল যে মিঃ লিন্ডসে যে ১৯২১ সালের ২৯ মে এটা দেখেছিল, সনাক্তকরণের ঘোষণার ২৫ দিন পর, ঐ দিন লেখা হয়েছিল যে চুলটা ছিল সুন্দর সোনালী বাদামী। এটা ভুল, কিন্তু কালো বা সোনালী সম্বন্ধে ভুল করতে পারে না।

যুবক মাল সিং সন্ন্যাসী হয়েছিল এবং তার চুলে জট পাকিয়েছিল এবং বাদামী হয়ে উঠেছিল অবহেলা, তেলের অভাবে, ধুলো এবং সম্ভবত অল্প রোদের কারণেও। বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন তার চুল এই বারো বছর ধরে তেলের অভাবে তার স্বাভাবিক রঙ হারায়নি এবং বহু সাক্ষীর (বাঃ সাঃ ৩৫৬, ৩৬৫, ১৫৫, ৩৭৭, ৪৫৫, ৯৩৮, ও ৬৬০) কাছে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যাদের কালো চুল অবহেলার দ্বারা বাদামী হয়েছিল এবং একটি প্রস্তাব, মনে হয় একই রকম, মিঃ যামিনী গাঙ্গুলীর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল যে যদি আপনি আপনার চুলে তেল না দেন বা একে অবহেলা করেন, এটা রঙহীন হয়ে যায় এবং নোংরা বাদামী রঙ প্রাপ্ত হয়।

এবং বাদী এই মতামতে ভীত হয়েছিল, সাক্ষীদের ডেকেছিল (সাঃ ৯৬১, ১০১০, ৪৩৫) যারা কখনো তাদের চুলে তেল দেয়নি, কয়েকবছরের জন্য নয় এবং যাদের চুল সাধারণ কালো থাকে এবং জ্যোতির্ময়ীদেবী, যাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল, বলেছিল চুলে তেল না দিলে শুকনো হয়, কিন্তু লাল হয় না। মামলার পরিণতি হচ্ছিল যে বাদীর চুলের রঙ

মেজকুমারের মত এবং কিছু সাক্ষী যারা পরে প্রমাণ করতে এসেছিল যে বাদী হচ্ছে ওজলার মাল সিং, তারা বলেছিল যে মাল সিংয়ের চুল ছিল ' কাক্কা ভুরা' বা একজন সাক্ষী ব্যাখ্যা করেছিল ম্যাড়মেড়ে সোনালী, 'কাক্কা' শব্দের অর্থ সোনালী।

যেহেতু কিছু বিভিন্ন শেডের কথা বলা হয়েছিল, যদিও চুল ছিল হয় লালচে বা পিঙ্গলা এবং এর ভেতরে একটু বিস্তারিতভাবে যেতে হবে।

সাধারণভাবে বলতে বাঙালিদের চুল কালো বা একজন ইউরোপীয় সাক্ষীর কাছে দেখায় নীলচে কালো এবং বলা হয় কালো। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, শ্বেতী রোগীদের না ধরে যাদের কম দেখা যায়, এটা হয় লালচে বা এমনকি লাল এবং একে বলা হয় 'কটা'। বাদী তার চুলকে বলেছে 'কটা'।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর চুল তখন ছিল হালকা বাদামী। সে এটাকে বলেছে 'কটা' এবং তাকে রঙ নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল বাদামী বলেছে। এই সকল অংশে শব্দটি বেশি প্রচলিত 'পিঙ্গলা' বলে। কিন্তু 'কটা' শব্দটি আরো প্রচলিত পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের চুলকে নির্দেশ করতে, ' পিঙ্গলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃতভাবে ভাওয়াল সাক্ষী তথা প্রঃ সাঃ ২৯০, সুকুমারী দেবীর (প্রঃ সাঃ ২৮০) দ্বারা যেখানে 'কটা' শব্দটি ব্যবহারের আশা করা যেতে পারত। চুলের সাথে সম্পর্কিত 'কটা' শব্দটির মূলত এটাই অর্থ, যদিও চোখের বিষয়ে এর অর্থ সাধারণ কালো ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। চুলের বিষয়েও এর অর্থ এটা।

'পিঙ্গলা' শব্দটি একশ্রেণীর চুলকে নির্দেশ করে— বাদামী কিন্তু শেডকে নির্দেশ করে না। মিঃ চৌধুরীর চেষ্টাকে বাহবা জানাতে হয় যে বাদীর সাক্ষীরা বাদীর চুলকে ' পিঙ্গলা' বলে বর্ণনা করেছিল। যাইহোক এ বিষয়ে বাহবা দেওয়া যায় না যে 'পিঙ্গলা' শব্দটি আবিষ্কৃত হয়েছিল বা তুলে আনা হয়েছিল এই মামলার জন্য। সে একজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, উদাহরণস্বরূপ, কখন সে শব্দটি জেনেছিল বা কতদিন এর সাথে পরিচিত, মেজকুমারের দার্জিলিঙে যাওয়ার পূর্বে এটা তারা জানত কি না। সাক্ষীরা চেষ্টা করছিল পিঙ্গলার সঠিক শেডটি নির্দেশ করতে এবং সেখানে আবার শব্দের থেকে মেজকুমারের চুলের সমস্যার উদয় হল, কিন্তু বাদীর সাক্ষীরা যতদূর অবগত ছিল, মিঃ চৌধুরী একটি শেড পেয়েছিল। এটা প্রজ্জ্বলিত লাল ছিল না (বাঃ সাঃ ৩৫৫)। এটা 'মেণ্ডি'র মত ছিল না। কিন্তু কালো ছিল না (সাঃ ১৩৫)। এটা ছিল কালচে লাল। এটা ছিল লালচে (সাঃ ২৬৩)। এটা পয়সার বর্ণ নয়, বরঞ্চ অনুজ্জ্বল পয়সার বর্ণ (বাঃ সাঃ ১০১)। এটা ছিল তামার বর্ণ (সাঃ ২১০)। এটা ছিল পুরাতন তামার বর্ণ (সাঃ ১৩৫), পুজোর তাম্রপাত্রের বর্ণ (সাঃ ৩৫৬)। এটা ছিল তামাটে (সাঃ ৮৯)। এটা ছিল সাক্ষীর কাঠগড়ার রেলিঙের রঙ, কিছুটা এর মত (সাঃ ১২)।

সংক্ষেপে মিঃ চৌধুরী বলেছেন তামাটে। প্রতিবাদী সাক্ষের বর্ণনা একই রকম। এটা হচ্ছে 'পিঙ্গলা' বা লাল বা লালচে (প্রঃ সাঃ ১৯, ২৭, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৮, ৭০, ৭৬, ১৪০, ১৫৯, ২৯০, ৩১০, ৩২৪, ৩২৫, ৩৯৭, ৩৪৮)। সাক্ষীরা 'পিঙ্গলা'

শব্দটির অপব্যবহার করেছে। কেউ বলেছে বাদামী বা বাদামী ধরনের (প্রঃ ৩৬৫, ১২০১)। শেড্ হিসাবেও একই শব্দের ব্যবহার হয়েছে; একজন প্রাক্তন নায়েব যোগেশ (প্রঃ সাঃ ৩) বলেছে এটা তামাটে, ছোটরানী বলেছে 'তাম্রবর্ণ'। এই হচ্ছে বাদীর চুলের বর্ণ। এটা তামাটে এবং এমনকি শেডের যে কোন পার্থক্যের সম্ভাব্যতা পুরানো নায়েব, কামিনীর (প্রঃ সাঃ ৩৫৪) মন্তব্যের দ্বারা বর্জন করা হয়েছিল। যে বাদীর চুলের রঙ একইরকম। কামিনী হচ্ছে পুরানো খাজাঞ্চী, অবনী আরেকজন কর্মচারী (প্রঃ ৩৩৪), আলিমুদ্দীন 'আরেকজন বৃদ্ধ কৃষক (প্রঃ ১৪৫) একই কথা বলেছে। রায়সাহেব যোগেন্দ্র কোন পার্থক্যের কথা বলেনি। ফণিবাবু অবশ্যই এইরকম বলেছে। কিন্তু কালি, কৃষকদের একজন্য (প্রঃ সাঃ ১৪) বলেছে যে শুধু চুলের পার্থক্য থেকে আমি বলি না তারা পৃথক মানুষের একইরকম চুল থেকে দেখা গেছে বাদীর চুলের রঙ মেজকুমারের চুলের মত।

উভয়ের চুলের একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। উভয়ের চুল ঢেউ খেলানো, কোঁকড়ানো। প্রতিবাদীদের বক্তব্য যে মেজকুমারের চুল ছিল কোঁকড়ানো ঢেউ খেলানো, এবং এই মতামত ছিল যে বাদীর চুল সোজা। শৈবলিনীদেবী পার্থক্য নিরূপণ করেছে মেজকুমারের চুলকে সুন্দর, সুরক্ষিত, হালকা বলে; সাধুর চুলকে ঘন, রুক্ষ, খাড়া। প্রতিবাদীদের পক্ষে মিঃ পারসি ব্রাউন, ফটোগুলির তুলনামূলক ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে এসেছে যে বাদীর চুল সোজা এবং কুমারের চুল ঢেউখেলানো। বাদীর চুল উভয়পক্ষের উকীলের উপস্থিতিতে দেখা গেছে যে তার চুল সামনে পেছনে উভয় দিকেই ঢেউ খেলানো। এই পর্যবেক্ষণ ২৭-৪-৩৬ তারিখে নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। নথিতে ছিল তামাটে চুল ব্যতিক্রম। কোঁকড়ানো চুল ব্যতিক্রম।

গোঁফের রঙ

কুমারের ক্ষেত্রে এটা ছিল "চুলের থেকে অনেক হালকা"। কর্ণেল পুলি (প্রঃ সাঃ ১)। মিঃ গাঙ্গুলি যে মেজকুমারকে জানত না, তার চুলের বিষয়ে বলেছে সেটা বাদমী। প্রকৃত রঙ রোদে পুড়ে গেছে এবং গোঁফটা হালকা। কেউ এটা অস্বীকার করেনি। দেখা গেছে উভয়ের গোঁফ বাদামী ও চুলের থেকে অনেক পরিমাণে হালকা।

ভ্রূর রঙ

উভয়ের ভ্রূ বাদামী ধাঁচের। কোন তর্কাতর্কি ওঠেনি এর রঙ নিয়ে, যদিও এর আকার বা আকৃতি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। প্রতিবাদী সাক্ষী সর্বমোহন, কমিশনে পরীক্ষিত, এর রঙকে একটি পার্থক্যরূপে নিয়েছিল। সে বলেছে যে কুমারের সুন্দর কালো, সুছাঁদের ভ্রূ ছিল। মেজরানী নিজে বলেছে এগুলি লালচে, যা প্রতিবাদীপক্ষের কিছু সাক্ষীও বলেছে।

চোখের পাতা

এই বিষয়ে কোন সূত্র নির্মিত হয়নি। এই মতামত দেওয়া হয়নি যে কোন পার্থক্য ছিল। বাদীর পক্ষের একজন সাক্ষীকে মেজকুমারের চোখের পাতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা

হয়েছিল এবং তার উত্তর এগুলি ছিল পরিষ্কার, এর যা হোক কিছু অর্থ করা যেতে পারে এবং সূত্রটি বিশ্বাস উৎপন্ন করেনি।

চোখের রঙ

বিষয়টি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য উপস্থিত করে। বাদীর চোখের রঙ বাদামী, প্রকৃতপক্ষে হালকা বাদামী, চিত্রকর মিঃ গাঙ্গুলি যা বলেছে। এটাকে আঁকতে গিয়ে সে বলেছে, আমি পোড়া রক্তকে ব্যবহার করব (যাকে সে তার চুলের রঙ বলেছিল) কিন্তু গভীরতাকে হালকা করতে এর সাথে অন্যান্য রঙ মেশাবো। প্রতিবাদী পক্ষের রায়সাহেব বলেছে বাদামী এবং ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে ১ম জয়দেবপুর পরিদর্শনের একেবারে শুরু থেকে সে এটা উল্লেখ করেছে। এখানে কোন গোলমাল নেই যে বাদীর চুল বাদামী।

মেজকুমারের চোখের রঙের বিষয়ে, প্রতিবাদীদের বক্তব্য হয় বা বরঞ্চ ছিল যে এটা ছিল নীলচে। বীমা-ডাক্তারের মেডিক্যাল রিপোর্ট আগমনের পর দেখা যায় এতে লেখা আছে ধূসর। বক্তব্য হচ্ছে যে তার চোখের রঙ ধূসর, যেটা নীল সদৃশ এবং যাকে সাধারণ মানুষ বলবে নীলচে।

কর্নেল পুলি যে বীমা ডাক্তারের মেডিক্যাল রিপোর্ট আসবার বহু আগে তাকে পরীক্ষা করে বলেছিল মেজকুমারের চোখের রঙ পাণ্ডুর নীল। সে বলেছিল এবং এটা দেখাও গেছে পুলি একজন শখের শিল্পী এবং যদিও তার দাবি যে সে আঁকতে পারে কেমন করে একটি বালককে বৃদ্ধ অবস্থায় দেখতে হবে। কিন্তু বিচারকের একটা খটকা লেগেছিল। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তার রঙের দৃষ্টি ছিল বিস্তারিত। সে চোখকে ধূসর বলেনি এবং দেখা যাচ্ছে বক্তব্য বিষয়ে সে বিপথে চালিত হয়েছিল, যেমন কুমারদের ইংরাজি উচ্চারণ, লর্ড কিচেনারের শিকারের বিষয়ে, তার নিজের অংশগ্রহণ এবং কতগুলি বিষয়ে যেগুলি তার নিজের জানা ছিল না এবং এও দেখা যাচ্ছে যে ছোটকুমারের চোখ সম্বন্ধে সে নিশ্চিতভাবে জানত যাকে নীলচে বলা যেতে পারে। এটা দেখতে হবে মেজকুমারের পাণ্ডুর নীল চোখ সম্বন্ধে এই বিশেষ মন্তব্যও তার বিবৃতির মধ্যে অকথিত কিনা। সে বলেছে, যেমন, বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে সাদৃশ্য আছে স্থূলতায়, তারা প্রায় একই রকম স্থূল। সে বলেছে, যদিও এটা স্বীকৃত, যে বাদী মোটা, কিন্তু মেজকুমার পেশীবহুল ও সুগঠিত। ছোটকুমার মোটা, (দ্রষ্টব্য আলোকচিত্র, X.W.f Viii, Ex, L.V. Ex. a (17).। বড়কুমারের সঙ্গে কোন সংমিশ্রণ সম্ভব নয় যেহেতু সে ছিল কালো ও নৃত্যরত মুখ এবং দাড়িগোঁফহীন মুখমণ্ডল।

এই সাক্ষ্যকে এক মুহূর্তের জন্য পাশে সরিয়ে রেখে, মেজকুমারের চোখ নীল, কমিশনে অতুলবাবুর এই পার্থক্য তালিকার সাক্ষ্যে সে চোখের উল্লেখ করেছে এবং এগুলিকে সাহেবদের মত স্বল্প নীলচে বলেছে।

বিচার আরম্ভ হবার পূর্বে অন্যান্য বিবৃতিগুলি :

'নীলের একটা শেড' (শৈবলিনী)

'নীলচে' (যতীন্দ্র)

'হালকা চোখ' (মিঃ মেয়ের)

'করঞ্জা' (রমানাথ)

'কটা' (রাজেন শেঠ)

'ধূসর, সাহেবের মত' (সর্বমোহন)

'মেজকুমার, ছোটকুমার, বুদ্ধু এবং জ্যোতির্ময়ীদেবী, সকলের চোখই সামান্য কটা ধরনের' - মিঃ এস. পি. ঘোষ। 'বিড়ালের চোখ' — মোরেল ও জগদীশ।

জ্যোতির্ময়ীদেবীর চোখ হচ্ছে হালকা বাদামী রঙের, ছোটকুমারের নীলচে এবং বুদ্ধুর ঘননীল। এখানে কোন গোলমাল নেই। জ্যোতির্ময়ীদেবীর চোখ বিচারক নিজে দেখেছে এবং যেমনভাবে দেখেছেন তেমনিভাবে তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন নাম না দিয়ে। মিঃ উইন্টারটন একে হালকা বাদামী রঙের বলেছে, এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই নামটি রঙের সঙ্গে মানানসই। এটা একেবারে কৃত্রিম চোখের রঙের মত, চিহ্নিত (E.w.f.) [মূলত চিহ্নিত x (২৯৪) সনাক্তকরণের জন্য]

এবার এটা উল্লেখ করা হবে যে মিঃ এস. পি. ঘোষ এই সকল চোখকে বলছে 'কটা' এবং জগদীশ, একজন উকীল (প্রঃ সাঃ কমিশন) মেজকুমার, বুদ্ধু ও জ্যোতির চোখকে 'বেড়ালের চোখ' বলেছে। কিন্তু এটা শুরু থেকে প্রতিবাদীদের নিবৃত্ত করেনি। 'কটা' শব্দটি নীলের একটি শেডকে নির্দেশ করে বা ঐ দুটি শব্দ বাঙালি মনে একটি নির্দিষ্ট রঙকে সূচিত করে, শুধুমাত্র চোখ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণ বাঙালিদের অধিকাংশের চোখের রঙ কালো, কিছু বাঙালিদের চোখের রঙ কালো নয়।

উভয় পক্ষের সাক্ষে এটা প্রকাশ পেয়েছে। মিঃ এস. পি. ঘোষ একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ম্যাজিস্ট্রেট; বলেছে হালকা বাদামী এবং নীলচে। যেমন বলেছে জগদীশ উকীল এবং অন্যান্য বহু প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী। যদি 'কটা' শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট শব্দ বহন করত তবে বিষয়টির নিষ্পত্তিতে বেশি সময় লাগত না। প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী যা বলেছে যে বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে চোখের রঙের ব্যাপারে সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ 'কটা'। এটা বলতে হয় এগুলি সাধরণ কালো রঙ নয়। যাইহোক যদি কেউ বলে যে মেজকুমারের চোখের রঙ কটা, সে কোন একটি বিশেষ রঙকে বোঝায় না, তবে সাধারণ কালোও নয় যেটা একটি ব্যবহারযোগ্য তথ্যও বটে। বিচারক বাদীপক্ষের দীর্ঘ সাক্ষীর তালিকায় যায়নি তাদের জেরা করতে, তবে প্রতিবাদী সাক্ষীদের কতিপয়কে জেরা করে উপসংহারে সূচিত করেছে সেটা কালো নয় সেটা 'কটা' (প্রঃ সাঃ ৩২১, ১৪০)।

জ্যোতির্ময়ী ও মেজকুমারের চোখের রঙ কটা (প্রঃ সাঃ ২১)। বাদী ও মেজকুমারের উভয়ের 'কটা' চোখ (প্রতিঃ ৩২, ৫৮, ৩৭১, ৫৯, ১২২)। (প্রঃ সাঃ ১২২)। রমানাথ বলেছে বাদী ও মেজকুমারের সাদৃশ্য শুধু চুল ও চোখের রঙে ছাড়া আর কিছুতে নয়। যেগুলি 'কটা'। জব্বর খান (প্রঃ সাঃ ৫৯) বলেছে, চোখের রঙ একই রকম। প্রত্যেকে

এই অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছে যেটা কালো নয় 'কটা'।

কিছু লোক, বিশেষত মুসলমান, 'করঞ্জা' শব্দটি ব্যবহার করত। 'কটা'র পরিবর্তে এবং একেবারে একই মনোভাবে (প্রঃ সাঃ ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ৩২৩, ৩৮, ৬৪, ৬৯, ৭৯, ৩৭৩, ৩৫৪)। রমানাথ কমিশনে 'করঞ্জা' শব্দটি ব্যবহার করেছে।

'বিড়াল চোখ' অভিব্যক্তিটি স্পষ্টভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে সব চোখ সাধারণ কালো নয়, তাকে বলে 'বিড়াল চোখ'। এটা কোন বিশেষ রঙকে নির্দেশ করে না। বলা হয় যে এটা সাধারণ কালো নয়, জগদীশ বলেছে; জ্যোতি, মেজকুমার, বুদ্ধু সবার 'বিড়ালচক্ষু'। দুর্গাদাস পাল (প্রঃ সাঃ ৫৭) বলেছে যে সব চোখ সাধারণ কালো নয়। তাকেই বিড়ালচোখ বলা হয়। এগুলিকে 'কটা' ও বলা হয়। আশু ডাক্তার কোথাও বলেছিল যে মেজকুমারের চোখ 'বিড়ালচোখ' এবং বলার সময় ভুল করে ফেলেছিল যে বিড়ালচোখের অর্থ বাদামী। এটা পাঞ্জাবেও দেখা যায় রঙের ব্যাপারে চোখকে দুটি শ্রেণীতে ফেলা হয়; মামুলি বা সাধারণ কালো এবং বিল্লী, যেটা এরকম নয়। লোকটা: রঘুবীর সিং (প্রঃ সাঃ ৩৫৫) এই তথ্য প্রদান কবেছিল। সে পাঞ্জাবের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ভদ্রলোক। যখন মাল সিংয়ের প্রসঙ্গে আসা হবে তখন আবার এর উল্লেখ করতে হবে।

এবার 'কটা' চোখ, যদিও ব্যতিক্রমী, এবং যদিও একত্রে একটি নামের অধীনে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, অবশ্যই কিছু রঙ আছে এর এবং একটি অবশ্যই বিভিন্নরকম হয়, কিন্তু এই দেশে, বা বাঙলার যে কোন স্থানে এবং পাঞ্জাবের কেউ এই রঙের ব্যাপারে উল্লেখ করতে অসুবিধা বোধ করে না, যেজন্য কেউ 'কটা' চোখকে নীল বা পাণ্ডুর নীল বা জলো নীল বা ফ্যাকাশে নীল বা ধূসর বা নীলচে ধূসর বা ইস্পাত ধূসর বা হালকা বাদামী বা বেগুনি বা সবজে বাদামী বা এই রকম কিছু হিসাবে উল্লেখ করে না। সুকুমারী দেবী (প্রঃ সাঃ ২৮০) এটা স্বীকার করতে আপত্তি করেছিল, কিন্তু এর প্রভাব স্বীকার করেছিল, যখন সে বলেছিল যদি সে কোন কনে পছন্দ করে সে তার 'কটা' চোখের বিষয়ে কিছু মনে করবে না, যদি কনে অন্যান্য দিক থেকে দেখতে ভাল হয়। কেউ কটা চোখের রঙের প্রতি লক্ষ্য করে না এবং প্রত্যেকে সাধারণত তার প্রত্যক্ষ রূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকে যে তারা 'কটা'।

মিঃ এস. পি. ঘোষ যেমন, তার নিজের বাল্যকাল ১৯০১ সাল থেকে মেজকুমারকে জানত এবং পরেও তাকে দেখেছিল, এবং সে খুব ভালভাবে জ্যোতির্ময়ীদেবীকেও জানত। সে তাদের চোখকে একই শ্রেণীতে রেখেছিল, যদিও এই মহিলার চোখ ছিল হালকা বাদামী রঙের।

এবার যখন কেউ এই ধরনের সব চোখকে 'কটা' শ্রেণীতে রাখতে অভ্যস্ত এবং এই শব্দকে অনুবাদ করার উপলক্ষ থাকে, তবে সে 'ধূসর' শব্দটি ব্যবহার করবে। বাদী বলেছিল, যেমন, যে তার চোখ 'কটা'। তার এই শব্দটিকে গ্রহণ করা হলেও পাশে বন্ধনীর

মধ্যে সমশব্দ হিসাবে 'ধূসর' শব্দটি রাখা হয়েছিল। এটা অবশ্যই ভুল. কিন্তু 'কটা'র জন্য 'ধূসর' শব্দটির ব্যবহার মনে হয় সাধারণ। যোগেন্দ্র 'কটা' চোখকে 'ধূসর' চোখ হিসাবে অনুবাদ করেছে। মিঃ আর. সি. সেন, বার-অ্যাট-ল, যে আট বছরের জন্য ইংলণ্ডে ছিল তাকে তার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই আটবছর ধরে প্রতিমুহূর্তে দেখার পরও বলতে পারেনি প্রকৃত রঙটি কি ছিল। সে আরেকজনের উল্লেখ করেছে যার ধূসর বা কটা চোখ ছিল। বলা হয়েছিল প্রকৃত রঙ সম্বন্ধে বলতে, সে পারেনি বলতে। সে 'কটা' অনুবাদ করেছে ধূসর রূপে।

যাইহোক, বিচারক খুব নিকট আত্মীয় বা লোকজন ছাড়া উভয়পক্ষের কোন সাক্ষীকে জেরা করেনি যারা মেজকুমারকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত। তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে চোখ ছিল 'কটা', এমনকি পুরাতন খাজাঞ্চীও (প্রঃ সাঃ ৩৭১) এর বেশি কিছু জানত না। ইউরোপীয় সাক্ষীরাও তাদের ভাষায় শেডের উল্লেখ করার জন্য খুব বেশি শব্দ পায়নি।

যাইহোক, সেই সব সাক্ষীদের সম্বন্ধে অবশ্যই বলতে হবে যারা বলে মেজকুমার ও বাদীর চোখের রঙ একই রকম। তাদের উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। তারা অনেক। তাদের অবশ্যই মনে থাকবে।

বাদীর তরফে নীচের সাক্ষীদের উল্লেখ করতে পারা যায় যারা বলেছে বাদামী বা বাদামী ধাঁচের। —

১। জ্যোতির্ময়ী দেবী (বাঃ ৬৬০)।

২। বিলু বাবু (বাঃ ৯৩৮), বোনের পুত্র।

৩। সাগর বাবু, প্রথমজনের সৎপুত্র (বাঃ সাঃ ৯১৭)।

৪। সরোজিনীদেবী (বাঃ সাঃ ১০২৬)।

অনাত্মীয়দের মধ্যে —

৫। রেবতী বাবু, উকীল (বাঃ ৬২)।

৬। মণীন্দ্রবাবু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার (বাঃ ১৫৫)।

৭। মিঃ এন. কে. নাগ, ব্যারিস্টার (বাঃ ৪৫৯)।

৮। মিঃ হিরন্ময় বিশ্বাস, উকীল (বাঃ ৯২১)।

প্রতিবাদী পক্ষের পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে —

কর্নেল পুলি (প্রঃ সাঃ ১)।

মেজরানী।

তৃতীয়রানী।

সৌভাগ্যচাঁদ (প্রঃ ৮৭), বিপিন (প্রঃ ১৪০), একজন পুরানো খানসামা, তারপর এস্টেটের একজন দপ্তরী হয়।

রায়সাহেব যোগেন্দ্র (প্রঃ ৩১০) এই মামলার তদারককারী।

লেফটা. হোসেন (প্রঃ ৪)।

সুকুমারী দেবী (প্রঃ ২৮০) মেজরানীর মাসতুতো বোন।

শৈবলিনী, ফণিবাবুর বোন।

জিতেন্দ্র, ফণিবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

অতুলবাবু (কমিশন), ফণিবাবু (প্রঃ সাঃ ৯২), বীরেন্দ্র, এস্টেটের একজন অফিসার (প্রঃ সাঃ ২৯০)।

এদের মধ্যে জিতেন্দ্র সম্ভবত শেড সম্বন্ধে উল্লেখ করতে পারেনি, কিন্তু একটি দলিল ও নির্দিষ্ট ঘটনা আছে যা দুদলের এজাহারের দ্বন্দ্বের নির্ণয় করবে। এগুলির প্রসঙ্গে আসবার পূর্বে ইউরোপীয় সাক্ষীদের ও মিঃ কে. সি দের সাক্ষ্যের বিষয়ে নাড়াচাড়া করা উচিত। মিঃ দে যে প্রতিবাদীদের খুব কমই সমর্থন করত।

মিঃ কে. সি. দে কুমারদের সকলকে দেখেছিল এবং একত্রে, একটি রেলওয়ে স্টেশনে এবং নানা উপলক্ষে, যেমন ২৬ বছর পূর্বে উদ্যান মজলিসে, সে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মেজকুমার ও বাদীর মধ্যে কোন সাদৃশ আছে কিনা? সে বলেছে, "উভয়ে ফর্সা। উভয়ের নীল চোখ বা অন্ততপক্ষে হালকা চোখ।" সে আরো বলেছে জেরায় যে লাখ লাখ মানুষের নীলচোখ আছে। সে পার্থক্যের কোন চিহ্ন অনুভব করেনি যদিও সে রঙের কথা মনে করতে পারেনি এবং যে রঙ সে দেখেছিল তা অসাধারণ। যে নীল নিশ্চিতভাবে দেখা যায় না। এটা বলা যেতে পারে অত্যন্ত দুর্লভ।

মিঃ মেয়ের বলেছে যে মেজকুমারের চোখ হালকা এবং রঙহীন। এটি হতে পারে অত্যন্ত হালকা বাদামী, মিঃ র‍্যামকিন যা বলেছে।

কর্নেল পুলি এত বেশি বিষয় তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে যে মনে হয় না তার 'এটা ফ্যাকাশে নীল' ইংরাজি উচ্চারণের মত একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না।

এবং লর্ড কিচেনারের 'শিকারের মত' যা তার জ্ঞানত ঘটেনি। কিন্তু যা, যেটা সে সৎভাবে অনুমোদন করেছিল, তাকে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল, সেগুলি তার জ্ঞান ও স্মৃতির মধ্যে ছিল। সে তৃতীয় কুমারকে জানত, তার সাথে পোলো খেলেছিল, এবং তার চোখ ছিল নীলচে এবং এটা দেখাত যাতে সে তাকে মেজকুমারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত। দেখা যাচ্ছে সে বলেছে যে মেজকুমার ও বাদী একই রকম মোটা ছিল। ছোটকুমারও মোটা ছিল।

মিঃ র‍্যামকিন সাক্ষ্য দেবার ২৭ বছর পূর্বে মেজকুমারকে দেখেছিল। তার প্রধান সাক্ষ্যে সে বলেছে যে মেজকুমারের চোখের রঙ হালকা ধরনের। সে রঙের বর্ণনা দেয়নি। বিচারকের এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল যে হালকা ধরনের বলতে সে বুঝিয়েছে নীল বা বাদামী। তার প্রধান জেরায় ডিফেন্স তার থেকে জেনেছে যে সাক্ষীর নিজের চোখকে ধূসর বা নীল বলা যেতে পারে এবং সে অনুমোদন করেছে যে তাকে ধূসর ও নীল চোখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সাক্ষ্যে চীনা-ডাক্তারের মেডিক্যাল রিপোর্টের প্রভাব দেখা গেছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে রাজি হবে কি না এটা বলতে

যদি রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ একটি এফিডেবিটে বলে যে মেজকুমারের চোখ বাদামী ধরনের। মিঃ চৌধুরী হস্তক্ষেপ করেছিল ও বাধা দিয়েছিল এই ভিত্তিতে যে সাক্ষীদের প্রতি এটা ঠিক নয়, যেহেতু এক্ষেত্রে অন্যান্য বিবৃতি ছিল। সাক্ষী বিচারক নয় যে তার সামনে পূর্ণ সাক্ষ্য অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু বাদীর পক্ষে মিঃ চ্যাটার্জি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছিল যে এটা ধূসর বা নীল কি না। সাক্ষীর যেমন মনে পড়ে না ছোট কুমারের চোখের রঙ, যদিও সে তাকে প্রায় সমানভাবে দেখেছিল, দেখা যাচ্ছে সে বেঁচেছিল ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। এটা নিখুঁতভাবে পরিষ্কার যে মিঃ র‍্যানকিনের স্মৃতি তার প্রধান সাক্ষ্যের মত 'হালকাধাঁচের' বাইরে যায় না। বিচারক তার বিবৃতি মনে করতে পারে যে যদি কেউ বলে বাদী মেজকুমারের মত দেখতে কেননা সে তার জ্ঞাত সত্য বলতে পারছে।

দার্জিলিঙের হোটেল মালিক মিঃ প্লিভা ২৬ বছর পরে মনে রাখার দাবি করে যে মেজকুমারের চোখের রঙ 'নীল' ধূসর নয়। আরেকজন সাক্ষী, দুর্গা (প্রঃ ৫৭) যে বলেছে সে তাকে মালে দেখেছিল ৫টার পর ৪/৫ বার এবং যে তার মুখে গোলাপী আভা দেখেছিল — মেজকুমারের মৃত্যুর ৬ ঘণ্টা পর সে তার গাত্রবর্ণ প্রমাণ করেছিল।

এটা বলা যেতে পারে, যে সব সাক্ষীরা যারা 'কটা' বা 'বিড়ালচোখ' বলতে নীল বা নীলচে চোখ বুঝিয়েছে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। উভয় পক্ষের অনেক সাক্ষী বাদীর চোখকে 'কটা' চোখ বলেছে এবং একমত হয়েছে যে এই শব্দ কালো ছাড়া যে কোন রঙকে সূচিত করে। সুকুমারী দেবী, যেমন 'কটা'র উপর একটি উৎসাহজনক বিশদ তথ্য প্রদান করে। সে আকাশনীল বা হালকা নীলের মতামত দিতে চেষ্টা করেছিল যেন কেউ মেডিক্যাল রিপোর্টের 'ধূসব' শব্দটির ভিত্তিতে তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। বিষয়টি সাক্ষীর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যারা বলেছে যে 'কটা'র অর্থ সাধারণত 'নীলচে ধূসর'। তার অবস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এটা মনে হয় না যে তাকে শেখানো হয়েছিল, কিন্তু অবশ্যই সে শুনেছিল কেমন করে মামলাটি দাঁড়িয়ে আছে (প্রঃ সাঃ ৫৩)।

ভাওয়ালের পুরাতন ম্যানেজার রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ রাজার বিবাহের পূর্ব থেকে ম্যানেজার ছিল এবং প্রত্যেক কুমারকে জন্ম থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত দেখেছিল এবং তারপরে ঢাকাতেও কুমারেরা তাকে দেখত বাবার পুরানো বন্ধু হিসাবে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৬-৩-১০ তারিখে এফিডেফিট প্রদর্শন করে, সত্যবাবু কর্তৃক কুমারের জীবনবীমার অর্থ তুলে নেওয়ার পদক্ষেপের পর্বে এবং সে অনুমোদন করেছে যে এটা এই কারণে গৃহীত এফিডেফিটের একটি কপি এবং এটা ভুল বিবেচিত হয়নি। বীমার সাথে সম্পর্কিত দলিলের ও অর্থপ্রদানের মধ্যে এটি একটি এবং এটা হচ্ছে ছটি এফিডেফিটের একটি যেটি প্রতিবাদীপক্ষ ১-১২-৩০ তারিখে বীমা কোম্পানী থেকে আনিয়েছিল, বিচার শুরু হবার তিন বছর পূর্বে। প্রতিবাদীদের কৌঁসুলী প্রথমে এটা অনুমোদন করতে অস্বীকার করেছিল (Ord. No. 60 তাং- ১২-৩-৩৪), কিন্তু পরিণাম স্বরূপ গ্রহণ করেছিল এবং দলিলটি বাদীর পক্ষে সাক্ষ্যের একটি অংশ হিসাবে অনুমোদিত হয়েছিল।

নীচে এফিডেফিট থেকে একটি সারাংশ প্রদত্ত হল — "আমি রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর, সি. আই. ই. বিধিসম্মতভাবে এখানে ঘোষণা করছি যে আমি গত ২৫/২৬ বছর ধরে ব্যক্তিগতভাবে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাকে আমি তার জন্ম থেকে জানি, ১৯০৯ সালের ৮ই মে দার্জিলিঙে ২৬ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তার, তার ব্যক্তিগত উপস্থিতি হয় নিম্নরূপ —

"গাত্রবর্ণ ফর্সা, চোখ ও চুল বরঞ্চ বাদামী; — সুগঠিত, গড় উচ্চতা," প্রতিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষীর দ্বারা এই ভদ্রলোককে 'অদ্বৈত পণ্ডিত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ চিঠির ব্যাপারে নীচে আসা যাবে। কিন্তু এটা অবশ্যই যে রায়বাহাদুর সতর্কভাবে শব্দ চয়ন করে একটি এফিডেফিট শপথপূর্বক তৈরি করেছে এবং নথিভুক্ত করেছে।

'ধূসর' শব্দটি কেমন করে এসেছে ডাক্তারের রিপোর্টে এবং প্রতিবাদীপক্ষ যারা এর সম্বন্ধে জানত ১৯২১ সালের জুলাইয়ের একেবারে প্রথমে (Ex ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০), তারা 'ধূসর' এর মামলা তৈরি করেনি, কিন্তু নীলের? কেউ কি ছিল যে 'কটা' কে ধূসরে অনুবাদ করছিল, না জেনে 'ধূসর' শব্দের অর্থ কি, এর অর্থ শুধুই 'কটা'। এবং বাদীর সঙ্গে মানানসই হতে পারে? এটা সত্য যে তারা ব্যগ্রভাবে এটাকে আনতে বাধা দিচ্ছিল এবং ভেবেছিল যে এটা এডিনবার্গের অফিসে সুরক্ষিত থাকবে। তারা সেখানে নথিভুক্ত একটি নির্দিষ্ট চিহ্নের জন্য ভীত ছিল, কিন্তু এটা আদালতের সামনে আসার সুযোগ ছিল। এটা ঘটেছিল এবং তারা 'ধূসর' শব্দের সুবিধা পেতে পারত তাদের সংজ্ঞায় বাদীকে একজন প্রতারক মনে করে, মামলার শেষ দিকে এটাকে আনবার ভীতিপূর্ণ ঝুঁকি গ্রহণ করে। এটা ছিল স্কটল্যান্ডে এবং অন্য কেউ নয় কিন্তু সম্মানিত বোর্ড ১৯২১ সালের মে মাসে এটাকে আসবার পর দেখেছিল এবং তারপর ১৯২১ সালের জুলাই মাসে দেখবার পর ফেরত পাঠানো হয়। আবার ফেরত আসে এবং বাদীর মামলার শেষের দিকে ইংলন্ড থেকে পাঠানো হয়। এটা আসে এয়ার মেলে, বীমা কোম্পানীর চিঠি অনুসারে এবং আদালতে পৌঁছায় ১৫-১২-৩৪ (Papers No. ২৪০০, ২৪৩২, ২৪৪৮, ফাইল D) অনেক পূর্বে, এই সমস্ত তথ্য ৫-২-৩৪ তারিখে বাদীর জন্য পরীক্ষা করা হয়। মিঃ জি. সি. সেন ছিল বীমার দালাল যে কুমারের জীবনবীমা করিয়েছিল। তার নাম মেডিক্যাল রিপোর্টে ছিল যে ডাক্তার কুমারের পরিচয় দিয়েছিল এবং এগুলি পুরোপুরি জেনে। প্রতিবাদীগণ তাকে জেরা করেছিল এজন্য যে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। সে আদৌ দালাল নয়। কোন একজন মিঃ ভড় দালাল ছিল এবং সে তার খাতায় একটি মিথ্যা বিবরণ লিখেছে। প্রতিবাদীপক্ষ স্কটল্যান্ডে স্থিত মেডিক্যাল রিপোর্টের ব্যাপারে নিশ্চিন্তে ছিল, কিন্তু যখন এটা এল, স্বীকার করা হল যে সেই দালাল ছিল। এই সাক্ষী তখন জানত মেডিক্যাল রিপোর্টে কি আছে, কী ঘটেছিল যে ব্যাপারে সে সাক্ষ্য দিয়েছিল। এর কিছুই বাদ না দিয়ে সংক্ষিপ্ত করে নীচে দেওয়া হল।

সাক্ষী ২টো থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে কুমারকে ডাঃ ক্যাডির কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল জয়দেবপুরের মহারাজকুমার বলে। ডাঃ ক্যাডি কুমারকে সেলাম করেছিল। কুমার প্রত্যুত্তরে মাথা নত করেছিল। ডাঃ ক্যাডি তার হার্ট, লাঙস্ পরীক্ষা করেছিল, তার ওজন নিয়েছিল, ছাতির মাপ নিয়েছিল, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস ও প্রস্রাবের পরীক্ষা করেছিল। তার উচ্চতা মাপা হয়েছিল। তারপর ডাক্তার বসে বীমাপত্রের মেডিক্যাল রিপোর্ট অংশটি পূর্ণ করতে আরম্ভ করে। তারপর সে কুমারের কাছে বীমাপত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে। সে ইংরেজিতে এই প্রশ্ন করেছিল এবং আমি অনুবাদ করেছিলাম এবং কুমারকে বলেছিলাম উত্তর দিতে। সে বাংলায় উত্তর দিয়েছিল এবং আমি ডাক্তারের জন্য সেটা ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলাম। তারপর মেজকুমার তার উত্তরের নিচে সই করেছিল। এটা মনে করো না মেজকুমারের গাত্রবর্ণ, চোখ ও চুলের মত অন্য কোন মানুষকে দিয়ে নয়।

"মেজকুমারের সই করার পর, ডাক্তার আমাকে সনাক্তকরণ চিহ্ন দেখতে বলল। আমি বললাম, ফর্সা গাত্রবর্ণ, ধূসর চোখ, এবং বাদামী চুল সনাক্তকরণের জন্য যথেষ্ট ছিল, যেহেতু এগুলি বাঙালিদের মধ্যে দেখা যায় না।"

জেরা এই অংশে যায়নি। একটু সন্দেহ থেকে যায় 'ধূসর' শব্দটি সাক্ষীর শব্দ, তার 'কটার' অনুবাদ। একটা ছোট ঘটনা মনে হয় এটাকে নিশ্চিত করবে। মেডিক্যাল রিপোর্টে যেটা লেখা আছে।

"বাদামী চুল, পরিষ্কার গোঁফ। ধূসর চোখ"।

'ধূসর চোখ' শব্দটি একটি দাড়ির পর এসেছে এবং পূর্বেকার শব্দের থেকে বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। যেন এগুলি পূর্বের শব্দের সামান্য পরে লেখা হয়েছে। শব্দগুলি অবশ্যই আসল ছিল, কিন্তু এগুলি দেখা যাচ্ছিল পূর্বের শব্দের মত একনাগাড়ে লেখা হয়নি। এতে কোন সন্দেহ নেই 'ধূসর' শব্দটি মিঃ সেনের শব্দ, ক্যাডির নয় এবং তার পর্যবেক্ষণ নথিভুক্ত করা হয়নি। যে কোন ক্ষেত্রে, বিচারক বলেছে রায়বাহাদুরের এফিডেফিটকে নিশ্চিত ক্ষেত্র হিসাবে প্রাধান্য দেওয়া উচিত — যে শব্দটি বাদামীধাঁচের। "চুল ও চোখ বাদামীধাঁচের" হচ্ছে শব্দটি, একটি আনুষ্ঠানিক দলিলে, এমন একজন মানুষের দ্বারা যে কুমারকে তার জন্ম থেকে জানত, যে একটি বিশাল জমিদারী পরিচালনা করত এবং যে ছিল বিশাল জ্ঞানী মানুষ। এটা বিশ্বাস করা যায় যে তার বর্ণনা "বাদামী ধাঁচের চোখ" সত্য। সত্যকে লুকিয়ে ফেলা এত কষ্টসাধ্য যে যারা প্রকৃত রঙ সম্পর্কে জানত তারা এটা বলে ফেলেছিল। আশু ডাক্তারকে কুমারের চোখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বলেছে, এগুলি ছিল পিঙ্গলা. তা হচ্ছে নীলচে রঙের। 'পিঙ্গলা' অর্থ নীলচে রঙ — না, এটা এরকম নয়, কিন্তু তার চোখ ছিল নীলচে রঙের, 'পিঙ্গলা' হয় বাদামী, যেটা লাল লাল 'বিড়াল চক্ষু' তা নয় কিন্তু বাদামী।"

প্রবাল রায়, একজন নায়েব, যে খুব কঠোর ও পাকা এই ধরনের মানুষ খুব শান্ত।

বলেছে —

'মেজকুমারের চোখ ছিল 'কটা'।

প্র: — কি ধরনের 'কটা'?

উ: — এটা প্রকাশ করা যায় না।

"বিড়ালের চোখের মত নয়, যেহেতু সেগুলির পরিবর্তন হয়। মেজকুমারের চোখকে যে কোন ধরনের বিড়ালের চোখের সাথে তুলনা করা যায় না। মেজকুমারের চোখ কালো ছিল না, সাদাও নয়, সাদাকে অন্যকিছুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেউ এটাকে বলতে পারে না 'একটু সাদা'। মেজকুমারের চোখ লালচে নয়। কেউ এটাকে 'পিঙ্গলা বলতে পারে, লালচে নয়।"

জেরায় সে বলেছে :

প্র: — আপনি বললেন মেজকুমারের চোখ লালচে নয়, কিন্তু পিঙ্গলা। এটা কী রঙ?

উ: — সামান্য নীলাভ।

আদালতের প্রতি : 'নীলাভ' কে পিঙ্গলা বলা হয়। এটা হয় একটি হাস্যকর অনুকরণ। শ্রীপুর মামলায় সে বলেছিল :

"চোখের মণি নয় কালো, নয় বিড়ালের চোখের মত, কিন্তু সামান্য সাদাটে।" সে ব্যাখ্যা করেছে যে সে অর্থ করেছে সাদা, বিড়ালের চোখের নীলের সাথে তুলনা করে। বাদীপক্ষের অনেক সাক্ষী যারা মেজকুমারের চোখকে পিঙ্গলা বলছিল, সাদাটেও বলছিল। একজন বলেছিল 'নারিকেল চোখ,' নারকেলেব রঙ হিসাবে মতামত দিয়ে (বাঃ সাঃ ২৫০)।

রায়সাহেব বলেছে যে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে সে বাদীর চোখের রঙ দেখেছিল এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে লক্ষ্য করেছিল যে এগুলি বাদামী। যখন পরে এই সন্ন্যাসী আবার জয়দেবপুরে এল এবং তার পরিচয় ঘোষণা করল এবং সে বলল যে সে হয় কুমার।

দেখা গেছে মেজকুমারের চোখের রঙ হালকা বাদামী; বাদীর চোখের রঙ এবং 'নীল চোখ' একটি মিথ্যা বৈশিষ্ট্য যা বারংবার মেজকুমারের প্রতি আরোপ করা হয়েছিল তাকে স্বতন্ত্র করতে।

আলোকচিত্র থেকে বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিচারক রঙের বিন্যাস করেছে। এবার বৈশিষ্ট্যের দিকে আসা যাক যা ফটোর ও বিশেষজ্ঞের সাহায্যে তুলনা করা যেতে পারে, যারা এগুলি দেখেছে ও মতামত দিয়েছে।

মেজকুমারের আটটি ফটো ছিল — আটটি অভিব্যক্তি — এগুলির বেশিরভাগ কপি ও বিবর্ধিত রূপ।

বাদীর ১৬ টি ফটো ছিল; দলবদ্ধ ফটোগুলি বাদ দিয়ে। সহজে উল্লেখের জন্য এগুলিকে এভাবে নামকরণ ও সাজানো যেতে পারে —

মেজকুমারের ফটো

I — অন্তর্বর্তী ফটো -- Ex II

কপিসমূহ

XCVII — X (৪৪) (বিবর্ধিত)

LXVI --- X (49) আবক্ষ (")

IX — (ফিটড্ ক্যাপ, ঢাকা,

X (278)

LXIII — (আবক্ষ)

XLIV — গাঙ্গুলির এ

LXXXX—111-P/10 of লাহোর কমিশনাব

LXI of মিঃ উইন্ডারটর (১০-৫-৩৪ গৃহীত) বাঃ সাঃ ৭৮৮

LXXXIII — X (89)

II — ব্রীচেস পরিহিত বাঘ-শিকারের ছবি EX I(10)

১৯০৯ সালের এপ্রিলে গৃহীত, উপরে যা দেখা গেছে।

কপি

D.X — এ (২) - এক্স (৩২)

III — 'ধুতি' তে বাঘের ছবি — EX. D

কপি

LXXXIX — (আবক্ষ) ঢাকা P/6 of লাহোর

IV --- পাঞ্জাবীতে আবক্ষ মূর্তি —Ex. LXXXX p/7 of Lahore.

V — ফ্রক কোট — এ (18)

XLVI — বিবাহের পূর্বের ছবি . Ex. XCVI

VIII — মুখুটির সাথে

এই ছবিগুলির মধ্যে ১১ টি ছবি (দণ্ডায়মান) ব্রীচেসে বাঘ-ছবি হচ্ছে সাম্প্রতিক-- এটা দার্জিলিং যাওয়ার কিছুদিন পূর্বে শিকারের দিনে গৃহীত। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে শিকারের পর 'ধুতিতে' বাঘ-ছবি গৃহীত। গোঁফের আকারে প্রতি লক্ষ্য করে দেখা যায় ইনসেট ছবি, বাঘের ছবি, ফ্রক-কোটের ছবির মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশি নয়। ১৯০২ সাল নাগাদ বিবাহের পূর্ববর্তী ছবি গৃহীত। এবং বিবাহের ছবি হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এটাকে। মেজকুমারের ১৪ বছর বয়সে মুখুটির সাথে ছবিটিকে রানী চিনতে পারেনি। কিন্তু মিঃ র‍্যামকিন এবং মিঃ শরদিন্দু মুখার্জি পেরেছিল যেহেতু তারা তাকে বাল্যকালে দেখেছিল।

বাদীর ফটো

এর ক্রম বা সময় স্থির করার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। কিন্তু এটা যুক্তিপূর্ণ

নিশ্চয়তার দ্বারা করা সম্ভব, পোশাকের দিকে দৃষ্টিপাত করে যেটা লুঙ্গি থেকে সাধারণ বাঙালির ধুতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। পুরাতন কাপড় পরিহিত মেজকুমারের ফোটোতে সাক্ষ্য হচ্ছে যে এগুলি ১৯২৪ সালে বাদীর ঢাকা ত্যাগের পরে গৃহীত।

I. বাদী কটি বস্ত্রে — Ex. A(19) - X (283)

কপিসমূহ

এ (52) - X(212) B of কমিশনার গাঙ্গুলি

এ (42) - X(473)

II. বোরিলা ছবি — Ex. A(12) - X (37)

কপিসমূহ

এ (25) - Ex. C of কমিশনার

D/2 of Lahore

III. লুঙ্গি পরিহিত দণ্ডায়মান — এ (36) -

S. B. D. 14

কপিসমূহ

এ (41)

IV. লুঙ্গি পরে বসা — এ (24) - D/2 of Lahore কমিশনার

কপিসমূহ

এ (39) - S.B.D. 18

এ (51) - L. H. L. (1)

V. বাঘের চামড়ার উপর বসা — Ex. A(37) - S.B.D.15

VI. রোগা — Ex. LVII

VII. শাল গায়ে — Ex. এ (35)

VIII. ডাবল ব্রেস্ট কোট — Ex. LXXXV

P/2 of Lahore

IX. শিকার কোট পরিহিত — Ex. XXIV

X. খালি গায়ে — Ex. XLIII

কপি — LXXXIV - P(1) of Lahore

XI. পার্শ্বচিত্র — XLIX - X(288)

XII. 'জটা' ছাড়া ধুতি পরে দণ্ডায়মান — LXXXVIII

P/5 of Lahore

XIII. 'জটা' ছাড়া বাদী উপবিষ্ট ধুতি পরে — Ex. III

কপিসমূহ

Ex. XLVI - C of Ganguli

Ex. XLV - B of Ganguli (আবক্ষ শুধু)

Ex. LXV - X (48) - সম্ভবত লন্ডনে গৃহীত (বিবর্ধিত আবক্ষ)

Ex. CXII - X (44) - সম্ভবত লন্ডনে গৃহীত (বিবর্ধিত আবক্ষ)

Ex. I XXXXVI - X(46)

XIV. স্কার্ফ ও সেফটিপিন সহ — Ex. LX

28-4-34 তারিখে মিঃ উইন্টারটনের দ্বারা গৃহীত।

XLVII. D of Ganguli

XLVIII. E of Ganguli

LXIV. (বিবর্ধিত - গোঁফ)

LXII. (বিবর্ধিত - চুল যুক্ত)

XV. পুরাতন দরবার পোশাকে - XVIII

সম্ভবত কপি : XIX

XVI. দলবদ্ধ ছবি থেকে কেটে নেওয়া— LXXXII

সময়ের ক্রমানুসারে শেষের টি XIV র পূর্বে অসা উচিত যেটা হচ্ছে সাম্প্রতিক।

বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য গ্রহণ করে এবং ছবিগুলির তুলনা করে নির্দিষ্ট সাধারণ বিবৃতি যেগুলি স্বতঃসিদ্ধ- সত্য তা অবশ্যই মনে জাগবে।

1. এটি মিঃ চৌধুরী দ্বারা মিঃ গাঙ্গুলির কাছে পেশ করা হয়েছিল। একটি ছবিতে হুবহু সাদৃশ্য অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে। যেমন, যন্ত্রের প্রস্তুতি, আবহাওয়ার অবস্থা ফটোগ্রাফারের দক্ষতা, লেন্সের দিশা, রসায়ণের যথার্থতা, ফিল্মের উপস্থাপনার কোণ।

মিঃ চৌধুরির নিজের কথা ধরা যাক - প্রায় তার। এটা বলা যেতে পারে সবচেয়ে উত্তম অবস্থার মধ্যে এক্সপোজার একটি অনিশ্চিত বিষয় হয়ে যায়।

2. "কৌশলটি হচ্ছে একজন দক্ষ আলোকচিত্রী এবং চিত্রকর নেগেটিভ নিয়ে খেলা করতে পারে, যেটা তুলনামূলকভাবে সাক্ষে মূল্যহীন" - মি চৌধুরী এটাও বলেছেন।

3. "যখন অমি দুটি ছবি তুলনা করি, আমি চোখের দ্বারা বিচার করি, আমি দেখি না এটা, কিন্তু দেখার পর পড়ি। যখন আমি একটি ছবি দেখি, আমি তৎক্ষণাৎ মানুষটির সঠিক অনুপাতটি দেখি। এটা হয় শিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীর চোখ। সাধারণ মানুষও এটা করে কিন্তু এইরূপ জ্ঞানের সঙ্গে নয়। সেজন্য প্রকৃতপক্ষে তুলনার জন্য ফোটোর পরিমাপ অব্যবহার্য, যদি ফোটোগুলি বিভিন্ন কোণ থেকে নেওয়া হয়।" — বিচারক বলেছে।

মিঃ পারসি ব্রাউনের প্রঃ সাঃ ৪, আদালতে প্রতি উত্তর ছিল সংক্ষেপে একটি ছবি সেটাই পুনর্উৎপাদন করে চোখ প্রকৃতপক্ষে যা দেখে, দুটি মাত্রা এবং স্বল্প দৃশ্যমান চিহ্ন যার থেকে তুমি তৎক্ষণাৎ দৃশ্যকে উপলব্ধি করবে। ছবিতে তুমি মটরদানা থেকে বড় নয় বা মুখের অর্ধেক একটি মুখকে চিনতে পার যেটা ছায়ার মধ্যে থাকে এবং যখন একজন সাক্ষী বলে সে মুখ দেখেছে, তখন তাকে এটা জিজ্ঞাসা করার অর্থ থাকে না সে

নির্ভুলভাবে কী দেখেছে।

4. বিচারক পূর্বে বলেছিল, যে বৈশিষ্ট্য, একটি অপরটি থেকে খুব বেশি পৃথক হতে পারে না, কিন্তু তাদের সামগ্রিক প্রভাব এক-একটি মুখকে অপূর্ব করে তোলে। স্কুল বা এমন কোন বড় দলীয় ছবিতে পৃথক মুখ একটি ছোট মটরের দানা থেকে বড় নয়, মাঝে মাঝে চেনা যায়, যদিও একটি মুখ এত ছোট ছিল সেখানে যে আলো-আঁধারে ছোট্ট শরীর দৃষ্টিগোচর হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

এর অর্থ এই নয় যে তাদের আপেক্ষিক অবস্থান অপরিবর্তনীয়। যদি তুমি তোমার মুখকে নীচু কর, তোমার চিবুক গলা স্পর্শ করতে পারে, কান আপেক্ষিকভাবে উঁচু হয়ে যায়, নাকের সেতু বিপরীত দিকে এর ক্ষেত্র দৃষ্ট হবে। ভ্রু এবং চোখের মধ্যে স্থানটি সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, নাকের অগ্রভাগ মুখের কাছাকাছি হয়, বেশির ভাগ চুল দৃষ্ট হয়। যদি মুখ উপরের দিকে তোলা হয়, এ সবের বিপরীত ঘটে। যখন মাথা ডান দিকে কাত করা হয়, বা কান অন্য কানের চেয়ে উঁচুতে উঠে। সংক্ষেপে এসব ছবিতে মুখের কাত হওয়ার প্রভাব বলা যেতে পারে।

এই সূত্রকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেটা এই মামলায় উত্থাপিত হয়েছে। কুমারের ইনসেট্ ফোটোতে (XLIV) বাঁ চোখের বাহ্যিক কোণ সামান্য উপরে উঠেছে, যেখানে বাদীর একই কোণ আনুভূমিক বা স্বল্প নিম্নাভিমুখী (XLVI)। এটা সাগ্রহে গ্রহণ করা হয়েছিল একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক সূত্র হিসাবে এবং মিঃ চৌধুরী মিঃ গাঙ্গুলীর কাছে পেশ করেছে যে কুমারের চোখ বক্র। এই মামলা পেশ করা হয়েছিল যেহেতু মিঃ চৌধুরী সাক্ষীর হাতে পূর্ণাঙ্গ আকারের ইনসেট্ ছবির একটি বিবর্ধিত আবক্ষ ছবি তুলে দিয়েছিল। মিঃ গাঙ্গুলি অনুমোদন করেছিল যে বাঁচোখের বাইরের কোন উর্ধ্বাভিমুখী দেখাচ্ছিল, মিঃ পারসি ব্রাউন এটাকে স্বতন্ত্রসূচক সূত্র হিসাবে বলেছিল যে কুমারের চোখ বক্র। এই ইনসেট্ ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করে পূর্ণাঙ্গ আকৃতির-- দেখা যায় কুমার ডান দিকে ঝুঁকে বসেছিল, ফলে বাঁচোখের বাইরের কোণ উপরের দিকে চলে গিয়েছে। বাঁচোখই শুধু উপরের দিকে দেখা গেছে — মিঃ চৌধুরি ডান চোখের কথা উল্লেখ করেনি। এবং মিঃ পারসি ব্রাউনকে অনুমোদন করতে হয়েছিল যে এটা ছবিতে অনুপস্থিত ছিল এ(১৫)। এবং মিঃ মাসল্ হোয়াইট (বাঃ সাঃ ৫৬), যে ব্রাউনের পরে সাক্ষ্য দিয়েছিল, পার্থক্যের এই সূত্রকে বাদ দিয়েছিল।

মিঃ চ্যাটার্জি বাদীর পক্ষে কর্নেল পুলির থেকে তথ্য বের করেছিল, একজন সখের শিল্পী। যে কুমারের ইনসেট ছবি ও বাদীর ধুতি পরিহিত উপবিষ্ট ছবির একটি বিষয় উভয়ের ক্ষেত্রে একই চোখের নীচের স্তর থেকে কানকে খুব অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে এবং সেইজন্য এটি একটি সনাক্তকরণ চিহ্ন। পুলি বলেছিল এটা অস্বাভাবিক নয়। বিষয়টি মুখের কাত হওয়ার ফল এবং এজন্যে এটি ব্যতিক্রমী হচ্ছে না, বা সনাক্তকরণ চিহ্নও নয়।

6. একটি বস্তুর বুনন, সেটা মাংস বা রেশম বা চুলের ঢেউ হতে পারে, আলো-আঁধারের দ্বারা পুনরুৎপাদন করা যায়। মিঃ পারসি ব্রাউন ছবি X (49) দেখেছিল এবং ছবিটি একটি পার্থক্য উপস্থিত করেছিল — যে বাদীর চুল সোজা ধরনের এবং কুমারের চুল ঢেউ খেলানো। ঘটনা সূত্রে, বিচারক দেখেছিল বাদীর চুল ঢেউ খেলানো, এবং যে ঢেউ অন্যান্য ছবিতেও দেখা গেছে।

7. একই মানুষের গৃহীত ছবি, জীবনের বিভিন্ন পর্বে গৃহীত, তাদের দ্বারা সনাক্ত হবে যারা তাকে চিনত, কিন্তু প্রথম দর্শনে বা এমনকি একাধিকবার দর্শনের পরেও তাকে অজানা দেখাবে, যেন একই মানুষের ছবি নয়। এটা আগে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মেজরানী মেজকুমারের ছবি চিনতে পারেনি, যখন কুমারের ১৪ বছর বয়স ছিল (Ex. XL), কিন্তু মিঃ র‍্যাসকিন ও শরদিন্দুবাবু চিনতে পেরেছিল। তারা তখন তাকে দেখেছিল। যদি কুমার, যেভাবে তাকে ইনসেট্ ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আদালতে এসে থাকে এবং কেউ তাকে অস্বীকার করার কথা মনে করে থাকে, সে পরাজিত হতে পারে। যারা কুমারকে ঐ পর্ব ব্যাপী দেখেছে, কোন ছবিতে তাকে চিনতে অসুবিধা হবে না, যেহেতু তাদের মধ্যে একটি সাধারণ সাদৃশ্যের সূত্র উদ্ভূত হবে। বাদীর পূর্বেকার ছবির সাথে পরবর্তীকালের ছবির মিল খুব সামান্যই।

এবার বিশেষজ্ঞদের মতামতের দিকে নজর দেওয়া যাক। বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল মিঃ গাঙ্গুলী ও মিঃ উইন্টারটন এবং প্রতিবাদীদের পক্ষে মিঃ পারসি ব্রাউন ও মিঃ মাসল্ হোয়াইট্।

মিঃ গাঙ্গুলী (প্রঃ সাঃ ৫৪৪) যে বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল, বয়স ৫৯, কলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুলের উপ-অধ্যক্ষ এবং পেশায় ল্যান্ডস্কেপ্ ও পোর্ট্রেট শিল্পী। তার মর্যাদা দেখা যাবে একটি বিষয় থেকে যে সে লেডি হার্ডিঞ্জ, মহারাজা এবং স্যার হারবার্ট বাটলারের মূর্তি এঁকেছিল। স্যার উইলিয়াম মরিস ও অন্যান্য বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতিও অঙ্কন করেছিল। প্রতিকৃতি অঙ্কনের জন্য তার পারিশ্রমিক ছিল ২,৫০০০ টাকা এবং পোশাক পরিহিত পূর্ণাঙ্গ আকারের প্রতিকৃতির জন্য ৭,০০০ টাকা। জমিদার হিসাবে তার বাৎসরিক আয় ছিল ৪০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা। মিঃ পারসি ব্রাউন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিল যেখানে সে ছিল উপাধ্যক্ষ এবং দুবছর অধ্যক্ষ হিসাবে কার্যরত ছিল। সাক্ষী কোন আলোকচিত্রী ছিল না, কিন্তু তার নিজের কথায় ফোটোগ্রাফিতে শখ ছিল।

সে বলেছে ১৯৩৪ সালের মে মাসে তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল (৩০-৫-৩৪)। জনৈক মনমোহন রায়, বাদীর একজন দালাল, তাকে দুটি ছবি দেয় A ও B এবং সনাক্তকরণের বিষয়ে তার মতামত চায় এবং সে জেনেছিল ঘটনা কী। বাদী তাকে দ্বিতীয় পরিদর্শনে দেখেছিল এবং তাকে বলা হয়েছিল যে বাদীর পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে আদালতে। সাক্ষী ফোটোগুলি তুলনা করার পর একটি নির্দিষ্ট মতামত গঠন করেছিল

এবং সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়েছিল। তাকে কোন পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়নি, শুধুমাত্র যাতায়াত ব্যয় ছাড়া, যেহেতু তাকে বলা হয়েছিল বাদী অভাবগ্রস্ত।

এখন মিঃ গাঙ্গুলির মতামতের মূল্য যা হোক কিছু হতে পারে, তার সততার প্রতি প্রশ্ন জাগতে পারে না। যখন সে সাক্ষীর কাঠগড়ায় ছিল বিচারক তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং বিচারকের কোন সন্দেহ ছিল না যে সে যা মতামত দিয়েছিল তা প্রকৃত, সে বিনা বিচারে মেনে নেয়নি যেহেতু মিঃ চৌধুরি চেষ্টা করেছিল গুপ্তকথা প্রকাশ করতে — যা সে করেছিল। সে তুলনা করেছে —

(১) মেজকুমারের ইনসেট ছবি যেটা তার —A (XLIV)

(২) মিঃ উইন্টারটনের দ্বারা ১৯৩৪ সালে তার জীবন থেকে গৃহীত ছবির দুটি নমুনা (তার D ও E যেগুলি XLVII ও XLVIII)

(৩) বাদীর ধুতি পরিহিত উপবিষ্ট বিবর্ধিত আবক্ষ ছবি, (তার 'B' হচ্ছে Ex. XLV) যে ছবি থেকে এই আবক্ষ ছবি তৈরি হয়েছে সেই ছবি হচ্ছে Ex. III (উপরের তালিকা দ্রষ্টব্য)

(৪) Ex. III এর একটি কপি যেখানে গোঁফ আছে।

এককথায়, সে বাদীর বর্তমান ছবির তুলনা করেছে, ১৯২৫ সাল নাগাদ কলকাতায় গৃহীত তার ছবির এবং কুমারের ইনসেট্ ছবির সাথে যখন তার বয়স প্রায় ২৪ বা কম, ১৯২৫ সালে বাদী তার হিসাবে প্রায় ৪১ বছর।

মিঃ গাঙ্গুলি তাব পরিষ্কার মতামত দিয়েছিল যে এই তিনটি ছবি একই ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্বের ছবি।

সে বলেছে যে সে প্রথম দৃষ্টিতেই এই মতামত গঠন করেনি, বরঞ্চ ৪৫ মিনিটের নিরীক্ষার পর যে কারণগুলি সে দিয়েছে —

• (১) পৃথকভাবে একটা একটা করে গৃহীত অর্থাৎ কপাল, চোখের ভ্রূ, চোখ, নাকের আকৃতি, উপরের ও নীচের ঠোঁটের গঠনাকৃতি এবং বিশেষত কানের অদ্ভুত আকৃতি।

(২) বাদীর ডান চোখের পাতার নীচে একটা আঁচিল যেটা 'A' ছবি (কুমার) এবং 'B' ছবিতে (বাদী) দেখা গেছে।

(৩) চিবুকের প্রকৃতি একই রকম, যদিও এটা 'D' ও 'E' ছবিতে ভারী , শরীরের বাকী অংশের ওজনের তুলনায়।

গোঁফের বিষয়ে অর্থাৎ এর শেষ প্রান্তের বক্রতা তার 'C' ছবিতে যেটা বিচারক মনে করে বাদীর ১৯২৫ সালের ছবি। তিনি ঠোঁটের সাধারণ গঠনের সাদৃশ্য দেখেছেন চিবুকের স্বল্প অংশ সহ, মুখের কোণ, নাক পর্যন্ত উপরের ঠোঁট ইত্যাদি।

মিঃ উইন্টারটন পেশায় একজন আলোকচিত্রী, ৬০ বছর বয়স কলকাতায় তার সংস্থা এডনা লরেঞ্জ। সে প্রাক্তন ম্যানেজার ছিল কলকাতার বোর্স্ট অ্যান্ড সেফার্ডের যার বর্তমান ম্যানেজার মিঃ মাসল্ হোয়াইট যে অন্যপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল, শিল্পী হিসাবে সে

বার্লিন, ড্রেসডেন, মিউনিখ, প্যারিস ও লন্ডনে শিক্ষা নিয়েছিল।

LX ও LXI ছবিগুলি তিনি তুলনা করেছিলেন অর্থাৎ মেজকুমারের ইনসেট ছবি ও বাদীর সাম্প্রতিক ছবি হিসাবে তার মতামত ছিল যে এগুলি একই ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্বের ছবি। সে বলেছে —

কপাল, চোখের ভ্রূ, চোখের পাতা, নাক, নাসারন্ধ্র, মুখ এবং চিবুক এবং কানের লতির আকার এখনো একইরকম। বয়সের জন্য চুল অনেক হালকা, কিন্তু তাতে এখনো একই চাকচিক্য ও ঢেউ আছে।

এই উভয় বিশেষজ্ঞ তিনিটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছে, যা দুটি মুখের ক্ষেত্রে সাধারণ, তাদের মতানুসারে যা একই রকম। এগুলি হল —

(ক) কানের অদ্ভুত আকৃতি।

(খ) উপরের ঠোঁটের মধ্যবর্তী অংশের সাথে নীচের ঠোঁটের মধ্যবর্তী অংশ উল্লম্ব নয়। নীচের ঠোঁটের মধ্যবর্তী রেখা ডানদিকে।

(গ) উভয়চোখের পাতার নীচে আঁচিল যেটা ছবিতে একই স্থানে আশার আলোকে উপস্থাপিত করে।

(ঘ) মিঃ উইন্টারটন ৪টি বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেছিল। বাম হাতের মধ্যমা ও তর্জনী বাস্তবিকভাবে একই মাপের, অন্যপক্ষের বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে উল্লেখ করেছিল, অস্বীকার করেছিল উভয়ের ক্ষেত্রে কানকে স্বতন্ত্রসূচক বলে প্রযোজ্য, আঁচিলের কথা অস্বীকার করেছিল এবং দুটি আঙ্গুলের মসতা সম্বন্ধে কিছুই বলেনি, পার্থক্য হিসাবে যা সাক্ষ্য দিয়েছিল তা নীচে বর্ণিত হবে তাদের যোগ্যতার পরিমাপ করার পর।

মিঃ পারসি ব্রাউন একজন I. F. S. (অবসরপ্রাপ্ত), শিল্পী হিসাবে লন্ডনের সাউথ কেনিংসটনের রয়ের কলেজ অব্ আর্টস্ ও রয়েল কলেজের সহযোগী সংস্থার হয়ে। ইংলন্ডে শিল্প শিক্ষা করেছিল। স্থাপত্যে বিশেষজ্ঞ ছিল, কলকাতায় ১৮ বছর যাবৎ সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিল। সাউথ কেনিংসটন, বোম্বে, ও সিমলায় প্রদর্শনী করেছিল, Books on Indian Art-এর লেখক, ফাইন আর্টস্ প্রদর্শনীর বিচারক ছিল। তার দ্বারা নির্মিত কোন স্ট্যাচু কোন সার্বজনীন স্থানে স্থাপিত হয়নি শুধু কলকাতার হাইকোর্টে ছাড়া।

মিঃ মাসল্ হোয়াইট, পরিচালনায় অংশীদার, বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড, কলকাতা, লন্ডনে আলোকচিত্রী হিসাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত। তার নিজস্ব আলোকচিত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল সে ছিল পেশাদার আলোকচিত্রী।

মিঃ পারসি ব্রাউন মেজকুমারের ইনসেট্ ছবির (মিঃ গাঙ্গুলির 'A'), বিবর্ধিত আবক্ষ ছবি X(49), বাদীর ১৯২৫ সালের ছবি ও তার সাম্প্রতিক ছবি তুলনা করেছিলো। সে X(49, X(48)-এর উল্লেখ করে তার মতামত দিয়েছিল। মিঃ গাঙ্গুলির জেরা ছিল দুটি ছবির ভিত্তিতে ('A' ও 'B' থেকে বিবর্ধিত)। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে এই দুই

বিশেষজ্ঞের একই উপাদান ছিল।

মিঃ পারসি ব্রাউন পার্থক্যের এই তালিকা প্রদান করেছিল —

মেজকুমার X(4৬)	বাদী X(4৪)
মাথা, কপাল, খুলি — চওড়া বা বিস্তৃত	খুলি উঁচু
চুলের গঠন — ঢেউ খেলানো	সোজা
চোখের ভ্রূ — স্পষ্টত আনুভূমিক	শেষ প্রান্ত ভেতরের চাইতে নীচু
চোখ — বক্র, ভেতরের কোণ থেকে বাইরের কোণ উঁচু, পৃথক	আনুভূমিক
ঠোঁট — পুরু ও পূর্ণ নীচের ঠোঁট, উভয় দিক সঠিকভাবে প্রতিদসম নয়	প্রতিসম বা সুসমঞ্জস
চিবুক — পূর্ণ ও গোলাকার	
কান — পৃথক; লতি ঝোলানো	লতি বাইরের দিকে বাড়ান
চোয়াল — সংকীর্ণ সম্মুখভাগের সাধারণ আকৃতি নীচ অংশের চাইতে খুলি বিস্তৃত।	সংকীর্ণ
নখ — ক্ষুদ্রতর ও সংকীর্ণ	

চোখের সম্বন্ধে মতামত XLIV (গাঙ্গুলির 'A') ও XLVII (গাঙ্গুলির 'D') থেকে প্রদত্ত হয়েছিল।

মিঃ মাসল হোয়াইট তিনটি ছবির তুলনা করেছে — কুমারের ইনসেট্ ছবি, বাদীর ১৯২৫ সালের ছবি ও ১৯৩৪ সালের ছবি এবং মতামত দিয়েছে মুখগুলি সম্পূর্ণভাবে পৃথক।

মেজকুমার	বাদী
কান —(১) চোখের সাথে সম্পর্কিত কানের উপরিভাগ বাদীর থেকে উঁচু	বৃহত্তর
(২) চোখের সাথে সম্পর্কিত কানের অবস্থান নীচু	কানের বহির্ভাগে একটি নিম্নচাপ আছে
(৩) আকারের পার্থক্য	প্রসারণ
কপাল — সমতল	সমতল ও চওড়া
নাক — তীক্ষ্ণ	সমতল ও স্ফীত
নাসারন্ধ্র — গোলাকার	সমতল, স্ফীত ও বড় সেতু বিস্তৃত।
চোখ — উজ্জ্বল, বড়, আরো খোলা, ভয়হীন	সংকীর্ণ

চোখের ভ্রূ — নিকটতর, চিবুক — পূর্ণ ও গোলাকার, আঙ্গুল — LXI-তে কনিষ্ঠ আঙ্গুল ক্ষুদ্রতর।

এই পার্থক্যগুলি সম্বন্ধে সে মন্তব্য করেছে এবং আরো বলে যে ইনসেট্ ছবির

ভেতরে মানুষটি কুমার — আরো পরিষ্কার।

সে বাদীর নীচুর ঠোঁটের ডান দিকে একটা কম্পন দেখেছে। কিন্তু কুমারের মধ্যে নয়। সে বলেছে বাদীর ছবিগুলির উপরের ও নীচের ঠোঁটের মধ্যবর্তী রেখা একই স্থানে নয়। কিন্তু কুমারের ছবিতে একই রেখায়।

এটা উল্লেখ করা হবে যে মতামত গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে বাদীর তিনটি ও কুমারের একটি ছবি ছিল— ইনসেট ছবি। একটি ছবিতে তাকে অত্যন্ত ভাল দেখোচ্ছে এবং এত উন্নত যে প্রথম দর্শনে মনে হবে না এই ব্যক্তিই পরের ছবির মানুষটি — (দুটি ফ্রক কোট পরিহিত ছবি।) এক্ষেত্রে সব ছবির পুনর্বিন্যাস হয়েচে মিঃ মাসল্ হোয়াইটের মতে শুধুমাত্র বাদীর তিনটি ছবি ছাড়া যাতে সামান্য বিন্যাস করা হয়েছে (XLIX, XLIII, LXXXII)। এগুলি বিশেষজ্ঞের সম্মুখে পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু কুমারের ইনসেট ছবি পরীক্ষার কোন অর্থ হয় না, শুধু অন্যান্য ছবির সাথে ধারাবাহিক তুলনা ছাড়া, সবগুলি সমানভাবে পুনর্বিন্যাসিত। কিন্তু সম্ভবত একই স্থানে নয়।

উপসংহারে এসে ছবিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত বিবেচনা করা হয়েছে, বিচারক মিঃ পারসি ব্রাউনের সাথে একমত যে এই বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে কোন কাজ হয় না। ছবি কোন মানুষ নয়। একইভাবে ছবিগুলি নেওয়া হয়নি এবং ক্যামেরার দিকে দেহগুলি একই সমরেখায় স্থিত ছিল না; দুটি বিবর্ধিত ছবি X(49), X(48)-র সম্বন্ধে মতামতগুলি ব্যাখা করা হয়েছিল। মিঃ পারসি ব্রাউনের প্রধান সাক্ষ্য ও মিঃ গাঙ্গুলির জেরা প্রকৃতপক্ষে একই লয়ে নয়, তাদের উপস্থাপনার দৃষ্টিকোণও এক নয়। X(48)-তে বাদী সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে, ইনসেট্ ছবিতে মুখটি কোণাকুনি। মিঃ উইন্টারটনের সাক্ষ্য প্রশ্নাতীত। মিঃ পারসি ব্রাউন বলেছে যে Ex. X(48) তে মানুষটি লেন্সের মধ্যে তাকিয়ে আছে এবং X(49) তে কুমার তাকিয়ে আছে আলোকচিত্রীর দিকে। এটা কোন পরিমাপের বিষয়বস্তু নয়, যেটা মিঃ পারসি ব্রাউন বলেছে এবং যদিও সে এটাও বলেছে যে এটা একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীর চোখ হওয়া উচিত। একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত চোখ যা দেখে, এক অপটু চোখও দেখতে পারে, যদি দেখিয়ে দেওয়া হয়।

উপসংহারে এসে যা নথিবদ্ধ করা হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ —

(১) কুমার ও বাদীর নীচের ঠোঁটের ডান দিকে স্বল্প পরিমাণে কাঁপে। মিঃ পারসি ব্রাউন এটা X(49)-তে কুমারের মধ্যে দেখেছে কিন্তু X(48)-তে বাদীর মধ্যে দ্যাখেনি। মিঃ মাসল্ হোয়াইট এটা বাদীর মধ্যে দেখেছে একই ফোটোতে, কিন্তু কুমারের নয়। তারপর এটা সূচিত করা হয়েছে মিঃ গাঙ্গুলির দ্বারা একজন সাধারণ মানুষ এটা দেখতে পারে। রায়সাহেব (প্রঃ সাঃ ৩১০) এটা এ(১৫) ছবিতে কুমারের নীচের ঠোঁটে দেখেছে। সে এটাকে ছবির খুঁত বলেছে। বাদীর ক্ষেত্রে এটা অনুমোদিত। কুমারের ক্ষেত্রে বিচারক এর অস্তিত্ব দেখেছে। এটা ছবির কোন গোলমাল নয়। ১৯২৫ সালের বাদীর X(49)

ছবিতে মুখের বামদিক ছায়াচ্ছন্ন। যদি এই অংশ ছায়াচ্ছন্ন থাকে তাহলে দেখা যাবে না। ইনসেট্ ছবিতে বামদিক আলোকিত এবং সম্পূর্ণ দৃশ্যমান, কিন্তু ডানদিক ছায়ার মধ্যে, মতামত হচ্ছে যে ডানদিকে কোন কম্পন হত না। ঠোঁট দেখা গেছে, শুধুমাত্র আলোকিত অংশটুকু নয়, দেখা যাচ্ছে, ইনসেট ছবিতেও এমনকি কম্পন দেখা গেছে, যেটা মিঃ পারসি ব্রাউন দেখেছিল এবং বিষয়টি এ(১৫)তে সরল। নীচের ঠোঁটের মধ্যবর্তী রেখা ঠিক একেবারে উপরের ঠোঁটের মধ্যবর্তী অংশের নীচে নয়, বরঞ্চ ডান দিকে ঘেঁষা। মুখের ঢাল তাদের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তন করবে না। উভয়ের ঠোঁটের এটা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিচারক জ্যোতির্ময়ীদেবীর মধ্যেও এই কম্পনের একটা লক্ষণ দেখে বিস্মিত হয়েছে।

(২) বাদীর বামহাতের মধ্যমা ও তর্জনী ছবিতে একইরকম দেখাচ্ছে (XLVIII—১৯৩৪ সালের ছবিতে)। বিচারক এই দুটি আঙ্গুলই দেখেছিল। এগুলি সমান নয়। কিন্তু কাছাকাছি এবং অন্য হাতের ঐ দুটি আঙ্গুলের চেয়ে কম অসমান। কুমারের ইনসেট ছবিতেও এই দুটি আঙ্গুল এক সমান দেখাচ্ছে, কিন্তু এগুলি সমানভাবে প্রসারিত দৃষ্ট হয় না, বিচারক রাজা কালীনারায়ণের ছবির মধ্যেও এই অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছে (ছবি—XXXVIII)। এই দুটি আঙ্গুল, সমানভাবে প্রসারিত, ছবিতে সমান দেখাচ্ছে এবং এটা সম্ভাব্য যে বাদীর এই দুটি আঙ্গুলের মধ্যে স্বল্প পার্থক্য তাদের সমতার দৃষ্টিকে প্ররোচিত করতে পেরেছিল। এরূপ দৃষ্টির সমতা ইনসেট ছবির দুটি আঙ্গুলের প্রসঙ্গে বর্তমান। বিষয়টি কিন্তু পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত নয় এবং এই বিষয়ে পরিচয় বা পার্থক্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, শুধুমাত্র খুব ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ছাড়া।

(গ) কান

বিচারক মিঃ গাঙ্গুলি ও উইন্টারটনের সঙ্গে একমত যে বাদীর কান সনাক্তকরণের একটি প্রতীক।

এগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত। মিঃ গাঙ্গুলির অভিজ্ঞতায় সে এমন কান দ্যাখেনি। এগুলি বৃহৎ কান। লতি গালের সাথে সাঁটা নয়, কিন্তু ঝোলানো অর্থাৎ গাল ও লতির মাঝে চেরা; কানের বাইরের পরিধি, যাকে helix বলা হয়, বক্র হওয়ার পরিবর্তে কানের লতিতে যুক্ত হওয়া পর্যন্ত এই অংশে একটা কোণ সৃষ্টি করেছে, একটি স্পষ্ট কোণ; এবং লতি গাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। লতিগুলিকে স্ফীত দেখায় বাদীর মধ্যে বিচারক যেমন দেখেছিল এবং এগুলিকে Ex. I ও I(2) এর ছবির লতির মত দেখাচ্ছে। বিচারক যেমনভাবে তার নিকটে উভয়পক্ষের আইনজীবী সহ বাদীকে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এগুলি দেখেছিল (২৭-৪-৩৫ তারিখের পর্যবেক্ষণের নথি দ্রষ্টব্য)। প্রত্যেকটি লতির উপরিভাগও স্ফীত এবং helix অন্তবর্তীই ভাগের নিকটতর অংশ সহ একটি কোণ সৃষ্টি করেছে। কানের ভেতরে এই কোণ প্রত্যেকের মধ্যে কমবেশী বর্তমান। এবং যদিও বিচারক এটা প্রতিবাদী পক্ষের উকিলের অনুরোধে নথিভুক্ত করেছিল, এটা যে কারো ক্ষেত্রে করা হয় না এবং ছবিতে

পরীক্ষা করা যেতে পারে না। কানের বাইরের গঠন ছবিতে তুলনা করা যেতে পারে এবং কিন্তু helix-এর দুটি ভেতরের পরিধি বা বেড় সম্পূর্ণ রূপে উপস্থিত হয় না। বেশির ভাগ ছবিতে বাইরের বেড় উপস্থিত হয়।

(১) এটা স্বীকৃত যে উভয়ের কানের লতি সংলগ্ন ছিল না, বরঞ্চ মুক্ত বা ঝোলানো, কিন্তু এটা বলা হয়েছে বাদীর ক্ষেত্রে লতিগুলি প্রলম্বিত, গাল থেকে ঠেলে বের করা এবং ঐ কোণ কুমারের কানের বাইরের পরিধিতে বর্তমান নয়।

বাদীর ১৯৩৪ সালের ছবিতে এবং কুমারের ইনসেট ছবিতে। বামকান আলোকিত। এগুলি একই কান — কোণের দিকে নীচু। বিচারক উভয়ের কানের বাইরের পরিধিতেও এই কোণ লক্ষ্য করেছে। যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান তার কারণ হচ্ছে যেভাবে দুটি দেহ আসন গ্রহণ করেছে ক্যামেরার সামনে তার জন্য এটা অবশ্যম্ভাবী যদি আমরা অন্যান্য ছবির প্রতি লক্ষ্য করি। Ex. XLVIII-একটি অকৃত্রিম ছবি এটা লক্ষ্য করা যাক। এখানে ডান কান আলোকিত এবং বাদীর কানের বাইরে পরিধিতে কোন স্পষ্ট। কিন্তু ১৯২৫ সালের ছবির মতো স্পষ্ট নয়। আরেকটি বামকানকে আলো নেওয়া যাক — LXXII এর একটি আরেকটি অকৃত্রিম ছবি। ইনসেট ছবিতে বামকানে উভয়ের ক্ষেত্রে বাইরের কোণ পাতলা এবং অস্পষ্ট। এমনকি কুমারের ইনসেট্ ছবিতে ডানকান, যদিও ছায়াতে, দেখা যেতে পারে, এবং বাইরের পরিধির কোণ দেখতে পারা যায়। এটাও লক্ষ্য করা যায় যে ডানকান ছায়াতে অবস্থিত, কিন্তু লতি আলোর মধ্যে। বিচারক লক্ষ্য করেছে বামকানের মত স্বল্প পরিমাণে গাল থেকে ঠেলে বের হয়েছে লতিটি। বয়স ও চর্বি বা শুধু চর্বিই হয়ত এটাকে বৈশিষ্টপূর্ণ করেছে, মিঃ উইন্টারটন ও মিঃ ব্রাউন যা বলেছে। কর্ণেল পুলি এটা কুমারের ইনসেট ছবিতে LX (৪৫) দেখেছিল। সমস্ত কিছু দেখার পর বিচারক সন্তুষ্ট যে উভয়ের কান একই এবং এগুলি অদ্ভুত কান। এবং বিচারক এই পৃথক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের কান এগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক (দ্রষ্টব্য LIV, XXXIX)

(৪) আলোর দুটি সূত্র

মিঃ গাঙ্গুলি ও মিঃ উইন্টারটন আলোর দুটি বিষয় নির্দেশ করেছে, একটি বাদীর ছবির x(48) ডান চোখের নীচের পাতাতে এবং আরেকটি কুমারের ছবিতে X(49) একই স্থানে। মিঃ গাঙ্গুলি বলেছে যে এটা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অনুভব করেছিল এবং বাদীকে দেখতে চেয়েছিল এবং তাকে দেখেছিল যেদিন তাকে মিঃ গাঙ্গুলি, পরীক্ষা করেছিল এবং সে সেখানে একটি অতিক্ষুদ্র আঁচিল দেখেছিল। বিচারকও সেখানে একটি বিন্দু দেখেছিল, ডান চোখের নীচের পাতার একটি অংশে, যেখানে একটি সুক্ষ্ম খাঁজ ছিল এবং সেজন্য একটি নির্দিষ্ট পার্থক্য অর্জন করেছিল। এটুকুই বলা যেতে পারে যে এই দুটি হালকা সূত্র কুমার ও বাদীর দুটি সাধারণ সূত্রকে উপস্থাপিত করে এবং এগুলি, সমস্ত সম্ভাব্যতা সহ, একইরকম সাধারণ আঁচিলের কারণে। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রতিবাদীদের

বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা কোন আঁচিল দেখতে পেয়েছিল কি না এবং মিঃ মাসল হোয়াইট নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল এর সম্বন্ধে এবং আলোর দুটি সূত্র তার কাছে রাখা হয়নি, কারণ যাইহোক না কেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি সে ছবির উপর আলোর বিন্দু দেখেছিল কিনা। পার্থক্যের আরেকটি সূত্রকে মিঃ পারসি ব্রাউন উল্লেখ করেছিল। নাকের বিষয়টি গভীরতম সন্দেহের বিষয় হয়ে গিয়েছিল।

চোখ

কুমারের চোখ বক্র বা ট্যারা, বাইরের কোণটি ঊর্ধ্বমুখী। এ(১৫)র মত নায় যেটা মিঃ ব্রাউন অনুমোদন করেছে। ইনসেট ছবিতে বক্রতার ব্যাখ্যা যেটা এই মতামতের ভিত্তিস্বরূপ ছিল, তা প্রদত্ত হয়েছে। মিঃ হোয়াইট চোখ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল, কিন্তু এই বিষয়ে নয়।

ঠোঁট — মিঃ পারসি ব্রাউন কুমারের ঠোঁটে কম্পন দেখেছে। বাদীর মুখে নয়। মিঃ হোয়াইট বিপরীতভাবে দেখেছে। উভয়ের মধ্যে কম্পনের অস্তিত্ব ছিল। পরে মিঃ ব্রাউন বলেছে দুটি নীচের ঠোঁটের মধ্যে এইটুকু পার্থক্যই সে দেখেছে যে কুমারের নীচের ঠোঁটের মধ্যস্থান সামান্য পূর্ণ। এটা পর্যবেক্ষণ করা উৎসাহজনক যে কুমারকে মিঃ ব্রাউনের পূর্বে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং বলেছিল কুমারের ঠোঁট পাতলা এবং বহু সাক্ষী এসেছিল এবং বলেছিল বাদীর ঠোঁট পুরু। ঠোঁট একই রকম ছিল।

চোখের ভ্রূ — ধনুকাকৃতি, মেজরানীর মতানুসারে। মিঃ ব্রাউনের মতানুসারে আনুভূমিক। তাকে সরাসরি এ(১৫) দেখানো হয়েছিল। সে অনুমোদন করেছিল সেখানে — কুমারের একটি ছবি যার সম্বন্ধে ফণিবাবু সাক্ষ্য দিয়েছে সুসাদৃস্য বলে — চোখের ভ্রূ শেষ প্রান্তে নিম্নাভিমুখী। চোখের ভ্রূর মধ্যে কোন পার্থক্য প্রমাণিত হয়নি।

চোখ — চোখের সম্বন্ধে মিঃ মাসল হোয়াইট বলেছিল যে ওগুলি কুমারের ইনসেট্ ছবিতে বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর এবং আরো খোলা। কুমারের অন্য কোন ছবিতে চোখ দেখা যায়নি। এগুলি বাঘের ছবিতে খুব নিকৃষ্টভাবে উঠেছে, Ex. L, A10। সেখানে চোখগুলি ছোট ও গর্তে ঢোকা দেখাচ্ছে এবং কারণটি সম্ভবত যে ছবিগুলি উন্মুক্ত স্থানে তোলা হয়েছিল এবং চোখগুলি কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। ইনসেট ছবি ও অন্যান্য গুলিতেও এগুলি অন্যরকম দেখা গেছে। প্রকৃতপক্ষে যতটা ভাল ছিল, ততটা কোন ছবিতে দেখা যায়নি। চোখের উপরের পাতায় Puttiness সম্বন্ধে মিঃ ব্রাউন অনুমোদন করেছে এটা বয়সোচিত। পঞ্চাশ বছর বয়সে উজ্জ্বল চোখ পাওয়া যায় না। পার্থক্যের এই কারণ হিসাবে Puttiness কে অনুমোদন করা কষ্টসাধ্য। বয়েস স্থূলতা ও স্বাভাবিক পরিবর্তনকে, যা চোখের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, স্বীকৃতি দিয়ে চোখের কোন পার্থক্য প্রমাণিত হয় নি।

মস্তক, কপাল, খুলি —

মিঃ ব্রাউনের মতামত ছিল যে কুমারের মাথা গম্বুজাকৃতি, কপাল চওড়া এবং খুলি

বিস্তৃত মুখের নীচের অংশের চাইতে। এ(১৫) ছবির ক্ষেত্রে এ মতামত প্রযোজ্য নয়। মিঃ ব্রাউনকে কুমোরের এই ছবির উপরে চুলের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এমন করার কারণ ছিল। সে বলেছিল, কপালের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সামনের হাড়, চুল এবং অন্য সব, কিন্তু X(4৪)-এর ক্ষেত্রে কপালের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। বিচারক এই মাথা, বা চিবুক বা চোয়ালের কোন পার্থক্য বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়নি। সমস্ত ছবিগুলির প্রতি লক্ষ্য করে এবং একটা নয়, বিচারক একমত হয়নি যে আঙ্গুলগুলি পৃথক। এটা বলা হয়নি যে আঙ্গুলগুলি পৃথক কিন্তু ইনসেট্ ও ১৯২৫ সালের ছবিতে এগুলি পৃথক। পার্থক্য ছবির ক্ষেত্রে একটা দুর্ঘটনা। বাস্তবিকপক্ষে, একটি বস্তু যার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বিমত নয়, হচ্ছে হাত। বিচারক কাছ থেকে এগুলি দেখেছে। হাতগুলি ছোট ও একই রকম। এবং গলাও একরকম, প্রত্যেকটিতে স্পষ্ট অ্যাডামস অ্যাপল্‌সহ এবং গোঁফের বিষয়ে বলা হয়, কুমার এটাকে পরিষ্কার ও সরু করত। এটা ইনসেট্ ছবি ছাড়া কুমারের অন্যকোন ছবিতে উদ্ভূত হয়নি। বাকী ছবিগুলিতে হাতের শেষপ্রান্ত নিম্নাভিমুখী। বাদী, যদি সে চাইত, এগুলি উপরে তুলতে পারত।

ছাতি — মেজরানী বলেছে যে মেজকুমারের বুকের ছাতি লোমশ নয়। বাদী পক্ষের সাক্ষীরা বলেছে যে কুমারের বুকের ছাতি বাদীর মতো লোমশ। কিন্তু সে লোম কামাত। এই শেষ উক্তি করার মতো বিশেষ কোন কারণ নেই। যেহেতু কুমারের খালি গায়ের কোন ছবি নেই। যে সমস্ত সাক্ষীরা বলেছে যে কুমারের বুকের ছাতি লোমশ, তাদের মধ্যে আছে তার বোন, অন্যান্যদের মধ্যে আছে পুরানো খানসামা - প্রভাত (বাঃ সাঃ ৫২), পুরনো দেওয়ান (রসিক রায়, বাঃ সাঃ ৯০৭), বাড়ির ডিসপেনসারির পুরানো কম্পাউন্ডার (বাঃ সাঃ ৭৪) এবং আরো অনেকে, বাঃ সাঃ ৬৯-পাখাওয়ালা, ৪৯ তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এবং অন্যান্যরা অর্থাৎ ৪৬৪, ৭৬, ৮৯২, ৯৭৭। এটা মনে হয় বুকের ছাতি কামানো কোনভাবেই অপ্রচলিত অভ্যাস নয় ভাওয়ালে। যোগেশ (সাঃ ৮৯২) যে আঞ্চলিক বিদ্যালয়ে পড়ত এবং ফণিবাবুর বাড়িতে বাস করত, বলেছে যে রসিক রায়, ফণিবাবু এবং মেজকুমার তাদের বুকের ছাতি কামাতো এবং মতামত দেওয়া হয়েছিল যে ফণিবাবুও এমন করত। বিলু ও বাঃ সা ১৯৬১ লোকের একটা তালিকা দেয় যারা তাদের বুকের ছাতি কামাতো। সে বলেছে যে ফণিবাবু তার বাহুও কামাতো। ফণিবাবু স্বীকার করেছে যে সে ব্যায়ামের কারণে বুকের ছাতি কামাতো। সাক্ষ্যর ফলে বিচারক মেনে নিয়েছে যে এটা কোনভাবেই অপ্রচলিত অভ্যাস ছিল না। দেখা যাচ্ছে, লোমশ ছাতি সম্বন্ধে অনুমোদনের ও বিস্তৃত বিবরণের কোন প্রয়োজন নেই, যদিও মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বিচারক দেখেছে যে কুমারের বুকের ছাতিও লোমশ।

মুখ — বলা হয়ে থাকে কুমারের মুখ লম্বাটে, কিন্তু বাদীর গোলাকৃতি। ১৯২১ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত বাদীর ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করে, এটা দেখা যাবে যে স্থূল থেকে স্থূলতর হচ্ছিল। গাল ভরাট হওয়ার ফলে মুখ কম লম্বাটে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যদি

এটা অনুমোদন করা হয়, যদি পূর্বেকার ছবি (Ex. LVII) ও এমনকি অকৃত্রিম উন্মুক্ত শরীরের ছবির প্রতি দেখা যায়, অনেক পরে গৃহীত, (Ex. LVII) দেখা যাবে মুখ লম্বাটে, এবং সাম্প্রতিক ছবিতেও এটা এরকম। সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই, কারণ এরা মেজরাণী ও মিঃ ব্রাউন কর্তৃক শেখানো বুলি টিয়াপাখির মত বারবার আওড়ে যাচ্ছিল। ফণিবাবু তার সাক্ষ্য হিসাবে পুনর্বিন্যস্ত তালিকা দিয়েছিল এবং যেখানে মেজরানী ও মিঃ ব্রাউনের মধ্যে দ্বিমত ছিল, যেমন চোখের ভ্রূ বিষয়ে, ঠোঁটের বিষয়ে, সেখানে মেজরানী সফল হয়েছিল, যেহেতু সাক্ষীরা বলে চলেছিল যে কুমারের ঠোঁট পাতলা এবং তার চোখের ভ্রূ বাঁকা ও ধনুকাকৃতি। একটি ছবিতে ভ্রূ আরো ঘন।

পায়ের পাতা — এগুলিকে ফটো থেকে তুলনা করা যেতে পারে না, যেহেতু খালি পায়ে কুমারের কোন ছবি ছিল না, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বাদীর জুতোর মাপ ছয়। তার জুতো যেগুলি সে আদালতে পরে ছিল — দাখিল করা হয়েছিল এবং একজন চীনা জুতো প্রস্তুতকারক জুতোর মাপ প্রমাণ করেছিল যেটা সে বাদীর জন্য প্রস্তুত করেছিল। এই সাক্ষ্যের বিষয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না। কুমারের জুতোর মাপ ছয়, যেটা কলকাতায় মিঃ ঘোষালের কাছে রাখা হয়েছিল। আশু ডাক্তার সাধুর পা সম্বন্ধে একটি সূত্র উল্লেখ করেছিল। সে বলেছে যে বাদীর পায়ের আঙ্গুল ভেতরের দিকে ঢোকানো। বাদীর ছবিতে এমন কিছু একটা দেখা যায়, কিন্তু কেউ বলেনি যে এটা কুমারের পায়ে ছিল না এবং সূত্রটি উল্লেখ করা হয়নি বা কারো দ্বারা মতামত প্রদত্ত হয়নি, কম বিতর্কিত। পায়ের কোন পার্থক্য প্রমাণিত হয়নি।

নাক — নাক সম্বন্ধে বিতর্ক প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল। এটা লক্ষ্যণীয় যে বাদী তার স্মৃতিবিষয়ক একটা শিকারের ছবি এগিয়ে দিয়েছিল যাতে তার নাক পরিষ্কারভাবে পাতলা দৃষ্ট হয় এবং তার একটি বাজে ছবির মধ্যে নাক চওড়া ও বীভৎস। এ বিষয়ে Ex. A10, ও E.12-র উল্লেখ করা হচ্ছে। বিকৃত ছবিটি হচ্ছে তিনটি ছবির একটি যেটাতে জ্যোতির্ময়ীদেবী তাকে গরিলার মত দেখাচ্ছে বলে বর্ণনা করেছে। এগুলি হচ্ছে এ(১২), এ(২৫), এ(৩৫) যেগুলি বিকৃত ছবির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ছোট ফোকাস লেন্সের কারণে, বাদীকে এ ছবির মতো দেখতে নয়, যদিও মিঃ চৌধুরী বিচারের এক পর্বে এগুলির একটিকে (এ(১২)) বা এক্স(৩৭)কে ব্যবহার করছিল, সাক্ষীদের দ্বারা পার্থক্যের বাহ্যিক সূত্রকে বের কবতে এবং এটা বোঝাতে যে এটিই বাদীর সঠিক উপস্থিতি। এটা এই ধরনের কিছুই নয় যেহেতু যে কেউ এটা দেখাতে পারে এবং প্রতিবাদীদের বিশেষজ্ঞগণ মিঃ উইন্টারটন কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির ব্যাখ্যাকে অমান্য করেনি। এবার, নাকের বিষয়ে, জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে তার কাছে মনে হয় এগুলি একই রকম কিন্তু কেউ কেউ বলেছিল এটি মোটা, এবং বর্তমানে এটি মোটা কারণ সে মোটা হয়েছে। বিচারক জানে না চোখের মত নাকও চর্বি থেকে প্রভাবমুক্ত কিনা। কিন্তু ১৯২১ সালে গৃহীত বাদীর ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, যখন তার মোটা ছিল, ১৯৩৪ সালে গৃহীত তার

সাম্প্রতিক ছবি পর্যন্ত, বিচারক দেখেছে ১৯২১ সালেও নাক চওড়া ছিল। শুধু মাত্র দুটি বাঘ শিকারের ছবি ছাড়া, যেখানে কুমারের নাককে পতলা দেখাচ্ছে, অন্য ছবিতে তাব নাক যথেষ্ট চওড়া। ঐ অন্য সব ছবিতে নাক খুব বেশি চওড়া নয়, কিন্তু বাদীর নাকের মত যথেষ্ট চওড়া।

LVII, XLIII বা কুমারের যে কোন ছবি, দুটি শিকার ছবি ছাড়া, যেগুলি কুমারের বাকী ছবির মতো কৃত্রিম এবং যার মধ্যে নাকটাকে অবশ্যই কৃত্রিম সৃষ্টি করা হয়েছে। চওড়ার সূত্রে ছবির মধ্যে পার্থক্য সমাপ্তিমূলক নয় এবং পুনর্বিন্যাসের দৃষ্টিতে স্থিরীকৃত হবে না আকৃতির ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য ছিল যেটা শুধু ছবির দ্বারা নির্ণীত এবং চওড়ার বিষয়ে তুচ্ছ বাড়তি অংশ শুধুমাত্র ছবির দ্বারা নির্ণীত এবং চওড়ার বিষয়ে তুচ্ছ বাড়তি অংশে শুধুমাত্র ছবির দ্বারা নির্ণীত এবং পর্যবেক্ষণ নাসারন্ধ্রের সম্বন্ধেও পার্থক্য দেখিয়েছে। যদি মুখকে সোজা ক্যামেরার দিকে রাখা হয়, তাহলে নাসারন্ধ্র ও তার গর্ত আরো ভেতরে দেখা যাবে যদি কোণাকুনি ছবি তোলা হয়। মিঃ উইন্টারটনের এই পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও এবং এটা মনে করে যে একটি নাককে পাশ থেকে দেখা উচিত। কুমারের কোন পার্শ্বছবি নেই। কিন্তু বাদীর কমপক্ষে দুটি ছিল। ছবির দ্বারা বিচারকৃত নাকের একটি পার্থক্য বিচারক দেখেছে এবং বাদীপক্ষের কিছু সাক্ষীও বলেছে যে নাকটা তাদের কাছে সাধারণের চেয়ে কিঞ্চিৎ মোটা লেগেছে। যদিও আদালত বলতে পারত যে এই নাক একটি পৃথক নাক, এটা পরিচয়ের সমস্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে স্থানচ্যুত করতো, সৎ বা অসৎভাবে। কিন্তু বাদীর মামলা এটা হয়েছিল, যেটা জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছিল, যে কিছু লোক মনে করতো যে নাকটা সামান্য 'মোটা' যদি আদালত এর মধ্যে পার্থক্য দেখতো তবে পার্থক্যের কারণ হল নাকের হাড়ের উপর অস্থিসন্ধিব স্ফীতি, সিফিলিসের ফল— যা তার দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বে ছিল। মামলাটি অত্যন্ত সন্দেহজনক ছিল। কিন্তু বাদী তিনজন বিখ্যাত ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিল। যাদের মধ্যে দুজন প্রতিবাদীদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তৃতীয়জন বাদীর দ্বারা এবং তারা স্বীকার করেছিল যে নাকের হাড়ের ডানদিকে একটি হাড়ের বৃদ্ধি ছিল। বাদীর পক্ষে কর্নেল চ্যাটার্জি বলেছে, বেশি বৃদ্ধি এবং কারণ সিফিলিস। কর্নেল ডেনহাম ও মেজর থমাস প্রতিবাদীদের পক্ষে, এর কারণ হিসাবে এটা স্বীকার করেনি। কিন্তু তাদের কোন মতামত ছিল না। তিনজন ডাক্তারের সাক্ষ্য বিবেচনা করার পর এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে বাদীর সিফিলিস ছিল, যেমন কুমারের ছিল, এই জন্য হাড়ের বৃদ্ধি হয়েছিল যেটাকে বলা হয়েছে স্ফীতি এবং নাকের অন্যান্য পরিবর্তন হয়েছে। ১৯০৯ সালের পরবর্তী কালে উদ্ভূত বিষয় হিসাবে নাকের পার্থক্যকে যতদূর ব্যাখ্যা করা যায়, এটা বাদবাকী সাক্ষ্যকে ছাপিয়ে যেতে পারে না, যার অন্তর্ভুক্ত বীমাডাক্তারের রিপোর্টে উল্লিখিত চিহ্ন যে বিষয়ে প্রতিবাদীগণ এত ভীত ছিল, এবং যেটাকে বাদী স্কটল্যান্ড থেকে আনিয়েছিল যেহেতু প্রতিবাদীরা সেটা করেনি। সিফিলিসের প্রসঙ্গে আসবার সময় নাকের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

বাদীর দৈহিক চিহ্ন সমূহ — প্রকৃতপক্ষে বাদীর দেহে যে সব চিহ্ন দেখা গেছে

সেগুলি এরূপ —

(১) পায়ের পাতার উপরের চামড়া ও গোড়ালি (উভয় পা) রুক্ষ, পুরু ও ছিদ্রযুক্ত।

(২) মাথায় সেরে যাওয়া ফোঁড়ার চিহ্ন, খুলির উপর ত্রিভুজাকৃতি, যার সঠিক অবস্থান পরে উল্লেখ করা হবে।

(৩) বাঁদিকের উপরের মাড়ির দাঁত ভাঙা, শুধু চারদিকের খোলের সামান্য অংশ ছাড়া, মাড়ির থেকে ৫ মিলিমিটার উপরে যেটা দেখা যাচ্ছে।

(৪) একটি অস্ত্রোপচারের চিহ্ন, বামদিকে, বাদীর মতানুসারে, যাকে 'বাগ' বলা হয় তার ফল হচ্ছে এই অস্ত্রোপচার, সিফিলিসের প্রাথমিক ক্ষত থেকে যার উৎপত্তি। এর সঠিক স্থান পরে উল্লেখ করা হবে।

(৫) ডানবাহুতে একটি চিহ্নকে বাঘের থাবার চিহ্ন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) একটি পোড়াক্ষতের চিহ্ন- ডাক্তাররা এ বিষয়ে একমত — ৫ মিলিমিটার লম্বা, শিরদাঁড়ার এক ইঞ্চি ডাইনে।

(৭) বাঁ পায়ের গোড়ালির বাইরের উঁচু অংশে একটা ক্ষতচিহ্ন।

(৮) লিঙ্গের বাইরের চামড়ায় একটি ক্ষুদ্র তিল,

(৯) জিভের নিচে পূঁযকোষ।

বাদী তার সাক্ষ্যকালে এই সব চিহ্ন সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তার উপদংশ সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছে এবং আরো বলেছে যে তার বাহুতে ও পায়ে দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বে উপদংশজনিত ক্ষত ছিল, যেখানে শেষোক্তি কুমারের বিষয়ে অনুমোদিত। উপরোক্ত ৯টি চিহ্নের মধ্যে একমাত্র 'বাগী'র অস্ত্রোপচারের চিহ্ন এবং লিঙ্গের উপর তিলচিহ্ন ছাড়া আর সব বাদী দেখিয়েছে।

এগুলি সব তিনজন ডাক্তার দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে এবং পিঠের ক্ষতচিহ্নও যেটার সঠিক স্থান বাদী প্রদর্শন করতে পারেনি, অবশ্যই পেছনে থাকার দরুন।

এই সমস্ত চিহ্ন বাদী নিজে ডাক্তারের কাছে দেখিয়েছে যদিও ডাক্তারদের লিখিত উক্তি এটা উল্লেখ করেনি। কিন্তু কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইট আদালতে এটাকে 'উপদংশজনিত চিহ্ন (১০) বলে উল্লেখ করেছিল।

উপরোক্ত (১) ও (৯) চিহ্ন ছাড়া ডাক্তারের নথিতে নির্দিষ্ট কয়েকটি চিহ্ন ছিল, বাদীও দেখিয়েছে এগুলি, যেমন সেরে ওঠা উপদংশজনিত ক্ষতের চিহ্ন, নাকের উপর, পায়ের নলির উপর অভিযুক্ত স্ফীতিসহ। এগুলিকে 'উপদংশজনিত ক্ষত' হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিতর্কিত মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কুমারের শরীরে এগুলি ছিল না যদিও সে ক্ষত বহন করেছিল, কিন্তু বাদীর বক্তব্য ছিল এগুলি আলসারের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল যা সেরে গেছে, শুধু মাত্র একই কারণে উৎপন্ন নাকের উপর স্ফীতি ছাড়া। এই চিহ্নগুলি সম্বন্ধে 'উপদংশজনিত চিহ্ন' (১০) হিসাবে আলোচনা করা হবে।

(১১) ডাক্তারের দ্বারা দৃষ্ট তিনটি টিকার চিহ্ন।

(১২) প্রতিটি কানের লতিতে কান বেঁধানোর চিহ্ন।

(১৩) 'ধর্মদক্ষ চেলা লাগা' শব্দগুলি উঁচুতে বাম বাহুর উপরে উল্কি করা হয়েছিল। বাদী বলেছে যে সে যখন সন্ন্যাসী ছিল, তখন তার বাহুর উপরে এটি উল্কি করা হয়েছিল। মিঃ লিন্ডসে বলেছে যে বাদী এটা তাকে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল এটা তার 'গুরু'র নাম। শব্দগুলির অর্থ 'নাগা হচ্ছে ধর্মদাসের চেলা' বা 'ধর্মদাসের চেলা নাগা'। এর অর্থ পরে আলোচনা করা হবে।

বাদী চিহ্নগুলির উল্লেখ করবার পর যেগুলি সম্বন্ধে সে বলেছিল কুমারের দেহে ছিল। তাকে জেরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল — ১৯২১ সালের ৪ঠা মে যেদিন সে তার পরিচয় ঘোষণা করেছিল-- সেদিন বলার সময় কী ঘটেছিল।

উপদংশজনিত ক্ষতের বিষয়ে আদালতে সে সাঃ দেখিয়েছিল :

প্রঃ— আমি বলছি যে চিহ্নগুলিকে তুমি উপদংশজনিত চিহ্ন হিসাবে বলেছ সেগুলি আদৌ উপদংশের চিহ্ন নয়।

তাকে জেরা করা হয়েছিল এটা দেখাতে যে সে সিফিলিস সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

তারপর যখন জ্যোতির্ময়ীদেবী যখন তার প্রধান জেরায় এই সব চিহ্ন সম্বন্ধে বলল — উপদংশজনিত বা টিকার বা পুঁযকোষের চিহ্ন নয়, বরঞ্চ বাকীগুলি সম্বন্ধে যেটা বলতে হয়, সব, শুধুমাত্র পরে অর্জিত ও টিকার চিহ্ন ছাড়া, তাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল।

এটা ১৯৩৪ সালের জুন মাসে। প্রতিবাদীদের বক্তব্য ছিল বাদীর এই সমস্ত চিহ্ন মেজকুমারের মধ্যে আদৌ ছিল না যেগুলি ৪ঠা মে পরিলক্ষিত হয়েছে। এক কথায়, বোন বাদীর মধ্যে এই চিহ্নগুলি দেখেছিল এবং কুমারের মধ্যে সেগুলি আরোপ করেছিল। এটা কারো বক্তব্য নয় এবং কখনো প্রতিবাদীদের বক্তব্য হয়ে উঠেনি যে যে কোন চিহ্ন তৈরি করা হয়েছিল।

এবার চিহ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে অগ্রসর হওয়া যাক —

বাঁদিকের পায়ের গোড়ালির উপর ক্ষতচিহ্ন

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বাদী আদালতে এটি দেখিয়েছিল এবং বলেছিল যে এটা তার পায়ের উপর গাড়ির চাকা চলে যাওয়ার চিহ্ন।

বাদীকে বলা হয়েছিল যে এই চিহ্ন মেজকুমারের প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করা হচ্ছিল এবং কিছু সাক্ষী এর সম্বন্ধে বা এই দুর্ঘটনার সম্বন্ধে বা এই ঘটনার সম্বন্ধে বলেছিল যে মেজকুমার ছোটকুমারের বিয়ের সময় ক্র্যাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। সেটা ছিল ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাস। সেই সব সাক্ষীদের জেরা করা হচ্ছিল এটা দেখাতে যে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাদীর সাক্ষ্য ছিল যে ছোটকুমারের বিবাহের ৬/৭ দিন পূর্বে আস্তাবলে তার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল — ফিটনের চাকা তার বাঁপায়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল এবং বিবাহের দিন সে ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটছিল এবং এই দুর্ঘটনা চিহ্নটি রেখে

গিয়েছিল। জ্যোতির্ময়ীদেবী এই দুর্ঘটনা দেখেনি, কিন্তু বলেছে ক্ষতস্থান দেখেছে। এখানে ত্রৈলোক্য ডাক্তার ও নিশিডাক্তার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল। বাদী বলতে পারে না কত সময় নিয়েছিল আরোগ্য হতে, কিন্তু দিনগুলি নির্দেশ করেছিল। তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করা হয়েছিল এবং উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রদর্শন করা যে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই সমস্তই ঘটছিল যতক্ষণ না বীমার ডাক্তারের রিপোর্ট এসে পৌঁছেছিল। এর পূর্বে বাদী বিচারককে এই জিজ্ঞাসা করে একটি দরখাস্ত করেছিল যে প্রতিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী যখন দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল, সে বিবৃত করেনি আদৌ মেজকুমারের কোন চিহ্ন ঐখানে আছে কি না, কারণ যাই হোক না কেন এবং প্রতিবাদীরা তার পরে এই বিবৃত করে একটি দরখাস্ত দাখিল করে —

"উপরোক্ত প্রতিবাদীপক্ষের মামলা সর্বদাই হচ্ছে যে মৃত মেজকুমারের কোন গাড়ির দুর্ঘটনা হয়নি যাতে গাড়ির চাকা তার গোড়ালির উপর দিয়ে চলে গেছে।" (২৭-৮-৩৪ তারিখের দরখাস্তের উত্তরে ৩-৯-৩৪ তারিখে প্রদত্ত)

এটা সরাসরি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং অবিরাম চলেছিল যতদিন না বীমাডাক্তারের রিপোর্ট এসে পৌঁছেছিল। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত তারিখগুলি গুরুত্বপূর্ণ —

৪-৫-২১ — বাদী তার পরিচয় ঘোষণা করেছিল।

১০-৫-২১ — সত্যবাবুর পরামর্শে বোর্ড অব্ রেভিনিউ বীমার কাগজপত্র আনিয়েছিল যে মিঃ লেথব্রিজকে দেখেছিল ৯ইমে পূর্বে যেদিন The Englishman-এ তার চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। (৮ই মে রবিবার ছিল)

১৪-৭-২১ মূল মেডিক্যাল রিপোর্ট সহ বীমার কাগজপত্র বোর্ড এবং রেভিনিউয়ের কাছে প্রেরিত হয়েছিল (EX. 950)

১৫-৭-২১ — এগুলি বীমাকোম্পানীতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

১-১২-৩০ — প্রতিবাদীপক্ষ বীমাপত্রের প্রসঙ্গে ছটি এফিডেবিট্ চেয়ে পাঠিয়েছিল, দুটি মৃত্যুর, দুটি কাজের, এবং দুটি মৃতব্যক্তির পরিচয় পত্রের (D-file-এর paper No. 4)

৮-১২-৩০ — বীমাকোম্পানী কলকাতা অফিসে শুধুমাত্র দুটি মৃত্যুর এফিডেবিট পাঠিয়েছিল এবং বলেছিল যে বাদবাকীগুলি স্কটল্যান্ডে তাদের প্রধান দপ্তরে আছে।

১০-১২-৩০— প্রতিবাদীপক্ষ বাদবাকীগুলি চেয়েপাঠিয়েছিল।

১৯-১-৩১ — অন্যান্য চারটি এফিডেবিট্ এসে পৌঁছাল।

৬-১০-৩৪ — বাদী পূর্বোক্ত দুটি শনাক্তকরণের এফিডেবিট দাখিল করেছিল, সে মেডিক্যাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল। (paper No. 2400 of file D)

১৯-১১-৩৪ — বাদী প্রার্থনা করেছে যে রিপোর্ট স্কটল্যান্ড বা আঞ্চলিক শাখা অফিস থেকে চেয়ে পাঠানো যেতে পারে।

২৯-১১-৩৪ -- কলকাতা শাখার ম্যানেজার লিখেছে যে কাগজপত্র এডিনবার্গের প্রধান দপ্তরে আছে।

১৫ ১২-৩৪ — মূল Proposal form-এর সাথে মেডিকাল রিপোর্ট আসে। এই সমস্ত নথিপত্রের মধ্যে বীমাকৃত অর্থাৎ কুমারের ব্যক্তিগত বিস্তৃত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ছাপানো form-এ এই বিবরণের মধ্যে ডাঃ আর্নল্ড ক্যাডির সাক্ষর ছিল, এবং ৫ নং কলমে শনাক্তকরণ চিহ্নের পাশে এই শব্দগুলি লেখা ছিল "বাঁপায়ের গোড়ালির বাইরে অসমতল ক্ষতচিহ্ন"।

ডাঃ ডেনহ্যাম হোয়াইট প্রতিবাদীদের পক্ষে বলেছে যে অনুসন্ধানের অধীনস্থ ক্ষতচিহ্নকে সে বাঁপায়ের গোড়ালির উপরে ক্ষতচিহ্ন হিসাবে বর্ণনা করবে।

তার নথিতে সে এটাকে এইভাবে বর্ণনা করেছে —

বাঁ পায়ের গোড়ালির বাইরের উপরে অসমতল ক্ষতচিহ্ন

উঁচুস্থান ১১/২ সেমিঃ বিস্তৃত। তলাটি ৯ মিমিঃ বিস্তৃত। উচ্চতা ২ সেমিঃ। এটা প্রতিবাদীদের পক্ষে মেজর থমাসের দ্বারা অঙ্কিত একটি স্কেচের মত দেখতে।

কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইট তার সাক্ষ্যে বলেছে —

'যদি আমি চিহ্নের বর্ণনা করে থাকি, তবে আমি সেখানে যেমন বর্ণনা করেছি, একদম সেইভাবে বর্ণনা করব।' এর অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে একটি উপযুক্ত ছবির মধ্যে যার উপরে সব চিহ্নগুলি তাদের অবস্থান -- নির্দেশিত হয়েছে (Ex. A(80), A(80A))

বীমার ডাক্তারের রিপোর্টের বর্ণনা বাদীর লোকেদের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ— "বাঁপায়ের বাইরের দিকে অসমতল ক্ষতচিহ্ন।"

এটা সবাই স্বীকার করেছে যে এটি একটি ক্ষতচিহ্ন, চিহ্ন নয়। ডাঃ ডেনহ্যাম তার বিবরণে চিহ্ন ও ক্ষতচিহ্নের মধ্যে একটা পার্থক্য এঁকেছে যে ক্ষতচিহ্নের টিসুগুলি ফাইবার মূলক টিসু, চুলের কোষবিহীন, সংবহন নালিকা হীন, সামান্যতম রক্তসরবরাহ হয়ে থাকে যাতে। ডেনহ্যাম বলেছে যে এই ক্ষতচিহ্ন অত্যন্ত হালকা এবং যদি সে বীমার ডাক্তার হত সে আরো স্পষ্ট কিছুর জন্য দৃষ্টিপাত করবে। এটা স্বীকৃত যে একটা ক্ষতচিহ্ন হালকা হয়ে যায় এবং এটাও স্বীকৃত যে ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে মেজকুমারের আর কোন চিহ্ন ছিল না। এটা কারো বক্তব্য নয় যে ১৯০৫ সালে তার উপদংশ ছিল বা কোন আলসার বা তাদের কোন চিহ্ন বা উপদংশ জনিত চিহ্ন ছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। যাইহোক না কেন, একটা চিহ্ন — ১৯০৫ সালের ২রা এপ্রিল বীমার ডাক্তার বাদীর মধ্যে এই চিহ্ন দেখেছিল যখন কুমার তার সামনে এসেছিল। প্রতিবাদীপক্ষের মেডিক্যাল রিপোর্টে ভীত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল, এই ভীতি তার পরিচয়ের কিছু প্রমাণ। লক্ষ্য করা যাক এটা আসার পর কী ঘটেছিল। এটা আসার পূর্বে অনেক সাক্ষী এই ঘটনা সম্বন্ধে বলেছিল যে ছোটকুমারের বিবাহের সময় মেজকুমার ক্র্যাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত (বাঃ

সাঃ ৩৫, ৩৪, ৭১, ২, ১৫, ২১১, ৯৫৯, ৪৫৪, ৮০৬, ৯০৭)। এরা দুর্ঘটনা দেখেনি। এস্টেটের পুরনো উজির গঙ্গাচরণ বলেছে সে দুর্ঘটনার কথা শুনেছিল যখন সে বড়দালানে ছিল এবং দৌড়ে যায় ও দ্যাখে মেজকুমার হাত দিয়ে রক্ত বন্ধ করছে। সাক্ষী তার কাপড় ছিঁড়ে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দ্যায়। পুরানো কম্পাউন্ডার বাঃ সাঃ ৭৪ বলেছে যে মেজকুমার ডিসপেনসারি থেকে ওষুধ নিয়েছিল এবং চাকরেরা ক্ষত পরিষ্কার করে দিত এবং কেউ এর চিকিৎসা করেনি। পুরনো খানসামা বাঃ সাঃ ৪৮ ও এটা বলেছে। সাক্ষ্যের ভেতর যাওয়ার কোন দরকার নেই। এটা সঠিকভাবে পরিষ্কার যে মেজকুমারের একটা অসমতল ক্ষত চিহ্ন সেখানে ছিল। এবং এমন কিছু ছিল না যা তার বোনকে সত্য কারণ বলতে বাধা দেয়। এইজন্য প্রতিবাদীদের কোন বক্তব্য বা কোন সাক্ষী কিছু বলেনি, এমনকি ফণিবাবুও নয় যে কী করে কুমারের এই চিহ্ন হল যেটা বেশিদিন ঢাকতে পারা যাবে না, সামনে এসে পড়বে। ঐ পক্ষের সাক্ষ্য এই রূপ ছিলঃ সে ছোটকুমারের বিবাহের সময় খুঁড়িয়ে হাঁটেনি এবং এটা সত্য নয় যে তার গাড়ীর সাথে দুর্ঘটনা হয়েছিল। মিঃ চৌধুরী সঠিকভাবে বলেছিল যে যদি সে কারণটি খণ্ডাতে পারে, সে চিহ্নটিকে খণ্ডাবে, কিন্তু কারণ সম্বন্ধে তার কোন বক্তব্য ছিল না। ডাক্তাররা আর কোন কারণ দর্শায়নি যেমন, উপদংশ। প্রতিবাদীদের পক্ষে শুধু মেজরানীই এই চিহ্নের সম্বন্ধে কোন কিছু বলেনি।

মেটিক্যাল রিপোর্ট আসার পর তাকে একটি চিহ্ন অনুমোদন করতে হয়েছিল এবং সে যা বলেছে —

প্রঃ — আপনি কি তার শরীরে কোন চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলেন?

উঃ — কিছুই না, শুধু মাত্র তার পায়ে — বাঁপায়ে কাটাচিহ্নের মতো দাগ ছাড়া, বাঁ গোড়ালির সামান্য উপরে, পায়ের বাইরের দিকে।

প্রঃ — কী ধরনের দাগ ছিল এটা?

উঃ — তার গায়ের রঙের চেয়ে সামান্য সাদা এবং চামড়ার থেকে সামান্য উপরে।

তার সাক্ষ্য ছিল যে সে চিহ্নটি লক্ষ্য করেছিল তার বিবাহের সময়। জেরার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ছোটকুমারের বিবাহের সময় মেজকুমার খুঁড়িয়ে হাঁটত কিনা। তার উত্তর ছিল —

"আমি মনে করতে পারি না ছোটকুমারের বিয়ের সময় মেজকুমার খুঁড়িয়ে হাঁটত কিনা। যতদূর আমার মনে পড়ে সে খোঁড়াত না।"

"আপনি কি হলফ করে বলতে পারেন সে খোঁড়াত না?"

উঃ— নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, যেহেতু আমার মনে নেই।

মহিলা অনুভব করেছিল যে তার পায়ের থেকে জমি কেটে নেওয়া হয়েছে যেটা তার বড় বোন মলিনা কর্তৃক তার কাছে লেখা একটা চিঠিতে দৃষ্ট হয়েছে, ১৩১০ সালের ৭ই ফাল্গুন (১৯-২-১৯০৪)), অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যাতে বলা হয়েছে --

"আমরা সবাই এটা শুনে আনন্দিত যে রমেন্দ্রর পা সেরে গেছে।" ১৯০৪ সালের ২৪ শে জানুয়ারি ছোটকুমারের বিবাহ হয় (ছোটরানীর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য)। কোন ডাক্তার একটি কাটাচিহ্নকে "একটি অসমতল ক্ষতচিহ্ন" হিসাবে বর্ণনা করবে না।

বিচারক এই রকম চিহ্ন দেখেছে বাদীর পায়ে যে ক্ষতচিহ্ন বীমার ডাক্তার দেখেছিল। অন্যকোন ঘটনা এটাকে স্থানচ্যুত করে না।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে একটি নির্দিষ্ট ডাক্তার বাদীকে পরীক্ষা করেছিল। মনে করা হয়েছিল বাইরের গোড়ালির এই চিহ্ন ও ভেতরের গোড়ালির উপর একটি নির্দিষ্ট চিহ্নের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। ডাক্তারের বিবরণে ৫(v) নং চিহ্ন হচ্ছে একটি বিতর্কিত উপদংশজনিত চিহ্ন। বাদী চিঠিতে এই কথা বলেনি যে এই গাড়ির চাকার চিহ্ন নিয়ে কিছু করা হয়েছিল এবং পূর্বের চিহ্নকে উপদংশজনিত আব বা ফীতি হিসাবে নির্দেশ করেছিল। প্রতিবাদীপক্ষ এটা নির্দেশ করে একটা দরখাস্ত দাখিল করেছিল যে এটা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট যে সে এই দুটি চিহ্নকে সংযুক্ত করেনি। এটা তার বক্তব্য ছিল না যে এই দুটি চিহ্ন দুর্ঘটনার ফল, তবে বাইরের গোড়ালির উপরে চিহ্নকে একক ভাবে করেছিল এবং তার প্রধান সাক্ষ্যদান কালে এই শেষ দাগকে এককভাবে নির্দেশ করেছিল এবং তিনজন ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষাকালে, যারা আবার এগুলি পরীক্ষা করেছিল এবং তাকে পর্যবেক্ষণে একমত হয়েছিল এই দুটি দাগের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই।

আঁশটে পা

বাদীর পায়ের ভেতর দিককার ও তার গোড়ালির উপরে (instep) চামড়ার ধরনের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছে বিচারক। উভয় পয়েই এটা দেখা গেছে।

প্রঃ সাঃ ১, কর্নেল পুলি, যে ডাক্তার নয়, আদালতে পা দেখে বলেছে, "বাদীর পায়ের ভেতরদিককার চামড়া রুক্ষ, ফাটা ও শক্ত।"

কর্নেল ম্যাক গিলখ্রিস্ট, I.M.S. ছিল একজন প্রথিতযশা ও অভিজ্ঞ ডাক্তার। তার পূর্ণ যোগ্যতা নীচে উল্লেখ করতে হবে-- সে দেখেছিল এই চামড়ার অবস্থা এবং তার সাক্ষ্য ছিল বাদীর পায়ে যে চামড়া সে দেখেছে তা রুক্ষ, পুরু ও ভাঁজ করা — যাকে বলা হয় মাছের চামড়া এবং তার মতামত ছিল যে এটা বংশগত।

কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইট, প্রতিবাদী পক্ষের, এই চামড়া দেখে বলেছে : "গোড়ালির উপর ও পায়ের পাতার উপরে, দুপায়েই, তার চামড়ার অবস্থা উৎসুক্য জনক — এটাকে instep বলা সম্পূর্ণ সঠিক হবে।" জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এটা কী, সে বলেছে; "আমি মনে করে এটা hyperkeratasis-এর একটা অবস্থা। এটা চামড়া উপরি-পৃষ্ঠের পুরু অবস্থা। এর সম্ভবত কারণ endocerine নিঃসরণে ঘাটতি, সম্ভবত থাইরয়েড। আমি ও মেজর থমাস এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছি।"

এর নিদানতত্ত্ব যাইহোক না কেন, — মনে হয় ডেনহ্যাম ভবিষ্যৎ অনুমানের পেছনে যায় নি। বাদী বলেছে যে সে ও ছোটকুমার ও জ্যোতির্ময়ীদেবী ও কৃপাময়ীদেবী ও বুদ্ধু ও

জ্যোতির্ময়ীদেবীর কন্যা মণির এরূপ অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল — উত্তরাধিকারীরাও এই ধরনের আঁশটে পা পেয়েছে। এ বিষয়ে তাকে জেরা করা হয়নি অবশ্যম্ভাবী কারণের জন্য যে একজন সাক্ষী এটা স্বীকার করেছিল বিচার শুরু হবার পূর্বে, যদিও পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল; দুরুদুরু বক্ষে, মনে হয় যতক্ষণ না বিষয়টি পরিত্যক্ত হয় যেহেতু প্রতিবাদীপক্ষের কোন সাক্ষী এটা অস্বীকার করেনি এবং একজন অন্য সাক্ষী এটা অনুমোদন করেছিল। এই দুজন ও এই একক সাক্ষীকে বিচারের পূর্বে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং এই একক সাক্ষীটি এটা অস্বীকার করেছিল — সে হচ্ছে ফণিবাবুর বোন। বাস্তবিক, কেউ বিচারের সময় এটা অস্বীকার করতে আসেনি।

মেজকুমারের এই আঁশটে পায়ের বিষয়ে অনেক সাক্ষ্য দিয়েছে। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে তার ভাই ও কৃপাময়ীদেবী, ছোটকুমার, মেজকুমার ও সে নিজে ও তার পুত্র, বুদ্ধু ও তার কন্যা-মণির এই ধরনের পা ছিল। বিচারক তার পায়ের পাতা ও গোড়ালি দেখেছিল ও সেখানকার চামড়া অত্যন্ত রেখা যুক্ত লক্ষ্য করেছিল, মোলায়েম স্পর্শযুক্ত নয়। তাদের সাক্ষের সময় বিচারক এটা লিপিবদ্ধ করেছিল। প্রতিবাদীপক্ষের একজন উকীল, জগদীশ কমিশনের সামনে পরীক্ষিত হয়েছিল। সে স্বীকার করেছিল জেরার উত্তরে যে এই ধরনের চামড়া ছিল বুদ্ধু, মেজকুমার, জ্যোতির্ময়ীদেবী, ছোটকুমার ও বাদীর; এটা ছিল 'হাতীর চামড়ার মত' । প্রঃ সাঃ ৩৬৫ আশুডাক্তার এটা অনুমোদন করেছিল। দুজন অন্য সাক্ষী এর কাছাকাছি সাক্ষ্য দিয়েছিল। (প্রঃ সাঃ ৪১ ও ৩২৪)। মিঃ চৌধুরী তার সওয়াল জবাবে এই বিষয়ের উল্লেখ করেনি। এই বিষয়ে অসংখ্য সাক্ষী চাকর, আত্মীয়স্বজন, লোকজন যারা এই পরিবারকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত (বাঃ সাঃ ১৫, ২১, ৩৪, ৪০, ৪৮, ৫১, ৫২, ৬১, ৬৪, ৫, ৮৯, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৭৪, ১৬৭, ৩৮৭, ৬৫৭, ৮০৬, ৮৮৮, ৯০৭)। বিচারক লক্ষ্য করেছে মিঃ নরেন্দ্র মুখার্জিও অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন, এটা লক্ষ্য করেছিল জ্যোতি, মেজকুমার ও ছোটকুমারের মধ্যে। বিচারক মেজকুমারের পায়ের পাতার উপরে গোড়ালিতে এই মাছের চামড়া লক্ষ্য করেছিল। ঠিক যেমন বাদীর, রাজার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের যাদের নাম জ্যোতির্ময়ীদেবী নিজের নাম সহ করেছে যাদের এরকম ছিল বা এখনো আছে। এটা পরিবারে ধারাবাহিকভাবে চলেছিল। আশুডাক্তার বলেছে "ভাওয়াল রাজপরিবারের সদস্যদের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোড়ালি জোড়ের চামড়ার রুক্ষতা, ব্যতিক্রম বড়কুমার ও ইন্দুময়ী দেবী"।

কানবেঁধানো

বাদী এটাকে শনাক্তকরণের চিহ্ন হিসাবে উল্লেখ করেনি, কিন্তু মিঃ চৌধুরী কুমুদ গোস্বামীর (বাঃ সাঃ ৩৫) কাছ থেকে জেরায় বের করেছিল কুমুদ সত্যভামাদেবীর ভায়ের ছেলে ও রাজবাড়ীতে বেড়ে উঠেছিল, যে কুমারের কানে ছিদ্র ছিল। সে একই প্রশ্ন জীবনবীমার দালাল মিঃ সেনের কাছে রেখেছিল। কিন্তু মিঃ সেন এটা মনে করতে পারেনি। উদ্দেশ্য ছিল অবশ্যই নেতিবাচক, কিন্তু উত্তর ছিল ইতিবাচক এবং কেউ এটা

অস্বীকার করেনি। বাদীর কানেও ছিদ্রের চিহ্ন ছিল। এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, মনে হয়, কিন্তু এটা মনে হয় না যে এগুলি বাস্তবিক সার্বজনীন। যেমন টিকার চিহ্ন।

উপদংশজনিত চিহ্ন — এটা স্বীকৃত নয় যে এই শিরোনামের অধীনে যে চিহ্ন আছে সেগুলি উপদংশজনিত। কিন্তু এই চিহ্নগুলিকে এরকম বলা হয়েছে এবং এগুলি ডেনহ্যামের লিপিতে বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলি হচ্ছে তার তালিকায় ২, ৬ ও ৯ নং বিষয়।

দুপক্ষের সম্মতিতে আদালতের দ্বারা একটি আদেশ পাশ করা হয়েছিল এবং চুক্তিটি ছিল প্রতিবাদীপক্ষের একজন ডাক্তার দ্বারা বাদীকে পরীক্ষা করা হবে এবং বাদীর পক্ষের একজন ডাক্তার দ্বারাও, যদি তারা তাদের পর্যবেক্ষণে বা তাদের সূত্রে দ্বিমত হয়। বাদী তাদের ডাকার জন্য যোগ্য হবে।

প্রতিবাদীপক্ষের কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইট ও মেজর থমাস ও বাদীপক্ষের কর্নেল কে কে চ্যাটার্জি বাদীকে পরীক্ষা করেন। একই সময়ে তিনজন ডাক্তার বাদীকে পরীক্ষা করে এবং এইসব অভিযুক্ত উপদংশজনিত চিহ্নের প্রসঙ্গে তারা ভিন্নমত পোষণ করে কয়েকটি বিষয়ে, পর্যবেক্ষণেও।

কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইট L.R.C.P., M.R.C.S., M.B.B.S,(Lond) হচ্ছে I.M.S.-এর একজন অবসরপ্রাপ্ত সদস্য। সে কলকাতার পি. জি. হাসপাতালের একজন রেসিডেন্ট সার্জন ছিল তিনবছর। এবং ১৯২২ সালে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে সার্জারীর অধ্যাপক ছিল। তাছাড়া সে, জেলায় সিভিল সার্জন হিসাবেও কাজ করেছে।

মেজর থমাস, I.M.S., তখনো কর্মরত সিভিল সার্জন ছিল। উভয় শিক্ষিত ডাক্তারই ছিল অভিজ্ঞ, কিন্তু তাদের কেউ উপদংশে বিশেযজ্ঞ ছিল না, যদিও দুজন তাদের প্র্যাকটিস্ কালে বহু উপদংশ রোগের চিকিৎসা করেছে অবশ্যই এবং মেজর থমাস ভারতে আসার পূর্বে ছয়মাস যাবৎ ম্যাঞ্চেস্টারের যৌনব্যাধি সংক্রান্ত হাসপাতালে কাজ করেছে।

লেফট. কর্নেল কে. কে. চ্যাটার্জি, F.R.C.I., বাদীপক্ষ হচ্ছে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির একজন সদস্য; বাংলার সেই মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির একজন সদস্য; রয়্যাল সোসাইটি অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের একজন সদস্য, লন্ডনের বায়োকেমিক্যাল সোসাইটির একজন সদস্য। ১৯০৭ সালে সে তার ডিগ্রি অর্জন করে; তার বিশেষ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত লন্ডনের উলউইচ্ হাসপাতালে কর্নেল ল্যাম্বকিনের অধীনে যৌনব্যাধি সংক্রান্ত কাজ করে। তার বিশেষ বিষয় ছিল সার্জারী, ট্রপিক্যাল সার্জারী, এবং যৌনব্যাধি। কলকাতার সরকারি মেডিক্যাল স্কুলের প্রাক্তন সার্জন এবং পরবর্তীকালে এর সুপারিনটেনডেন্ট। এইরূপে সে সরকারি কাজ থেকে অবসর নেয়। তারপর কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের সার্জারির সিনিয়র অধ্যাপক হয়। ট্রপিক্যাল সার্জারী, প্যাথলজি, ট্রপিকের সাথে বিশেষ সম্পর্কিত সিফিলিসের উপর পুস্তক সমূহের লেখক। ভারতীয় গবেষণামূলক তহবিলের অধীনে ভারতে উপদংশের উপর গবেষণা করেছিল, ভারত

সরকার থেকে বিশেষ অনুদান নিয়েছিল।

তিনজন ডাক্তার দ্বারা বাদীকে পর্যবেক্ষণের যে পদ্ধতি ছিল তা এই: প্রত্যেক ডাক্তার নিজে চিহ্নগুলি দেখেছিল এবং তারপর কর্নেল ডেনহ্যাম চিহ্নগুলির বর্ণনা পাঠ করেছিল। যেমন সে এগুলি দেখেছিল এবং অন্যদুজন ডাক্তার এগুলি নথিবদ্ধ করছিল। মেজর থমাস ও কে. কে. চ্যাটার্জি উভয়ের বিবরণ এর মধ্যে রাখা হয়েছিল। পর্যবেক্ষণের নথি হিসাবে, ডাক্তাররা কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া দ্বিমত পোষণ করেনি যার প্রতি কে. কে চ্যাটার্জি ভিন্নমত দেয়। কেউ বলেনি এবং নথি এটা প্রদর্শন করে না যে উক্ত বর্ণনার মধ্যে চিকিৎসা বা নিদানতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্নেল ডেনহ্যাম মেজর থমাস্ কর্তৃক গৃহীত নোটকে সাক্ষ্য হিসাবে প্রমাণ করে। এগুলিতে তার সাক্ষ্যের শেষে কিছু পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল।

এখন কে. কে চ্যাটার্জির প্রতি এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে কর্নেল ডেনহ্যাম যে নোটগুলি পাঠ করেছিল এবং অন্য দুজন ডাক্তার কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সেগুলি ছিল তাদের মিলিত পর্যবেক্ষণের স্বীকৃত ফলাফল। উভয়পক্ষের উকীলদের উপস্থিতিতে পরীক্ষা করা হয়েছিল। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরীক্ষাকার্য ছাড়া। কর্নেল চ্যাটার্জি বলেছে এবং তার নোটস্ সেটা সায় দিয়েছে যে কর্নেল ডেনহ্যাম যা বলেছিল সে তা লিখে নিয়েছিল — প্রত্যেকটি শব্দ নয়, কিন্তু বিবৃতি উপলব্ধি করার পর এবং তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ যোগ করার পর। এটা আশা করা হয় যে তারা নোটস্গুলি তুলনা করবে এবং পরবর্তীকালে আলাপ-আলোচনা করবে। পরীক্ষার শেষে সে একটা আলোচনার প্রস্তাব করেছিল যা ডাক্তাররা করে, কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষের একজন উকীল এতে বাধা দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল —

আমি এটা আপনার কাছে পেশ করছি যে যেটা বলা হয়েছিল সেটা কী তিনজনের পর্যবেক্ষণের স্বীকৃত ফলাফল?

উঃ— না। সামান্য পার্থক্য ছিল যার জন্য আমরা মিলিত হতে চেয়েছিলাম।

প্রঃ— আমি আপনাকে বলছি, যেটা পাঠকরা হয়েছিল আপনি তার প্রতি কখনো আপত্তি তোলেননি?

উঃ— এটা সত্য নয়।

প্রঃ— আমি আপনাকে বলছি, নোটস্ পাঠকরার পূর্বে সমস্ত আলোচনা করা হয়েছিল?

উঃ— হ্যাঁ, এবং আমার গররাজি 'উল্লেখ করা হয়েছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, আমি আমার পার্থক্যসমূহ লিখছি এবং এগুলি দেখিয়েছিলাম।

প্রঃ— আমি আপনাকে বলছি, আপনি কখনো এটা করেননি?

উঃ— এটা মিথ্যা।

বলা হয় যে মেজর থমাস অনুমোদন করেছিল যে কর্নেল কে. কে. চ্যাটার্জি একটি

আলোচনা করতে চেয়েছিল, কিন্তু এটা অনুমোদন করা হয়নি; এবং যদিও পরবর্তীকালে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেছিল এ বিষয়ে —

প্রঃ— আমি আপনাকে বলছি যে বৈঠক সংঘটিত হয়নি যেহেতু আপনি ও মিঃ শরদিন্দু মুখার্জি মতামত দিয়েছিলেন যে উকীলদের উপস্থিত থাকা উচিত নয়?

উঃ— এটা পরিষ্কার যে কর্নেল চ্যাটার্জি তার নিজস্ব অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ তার নোটস্ে যোগ করেছিল তখন ও সেখানে নোট্সের তুলনা করতে চেয়েছিল এবং এতে বাধ সাধা হয়েছিল। এটা ভীতিজনক হতে পারে না যে কর্নেল চ্যাটার্জি তার কর্তৃত্বের দ্বারা অন্যদুজনকে স্বমতে আনবে এবং যদি সে এমন করত, কেউ অভিযোগ করতে পারত না।

(১) এবার বিতর্কিত চিহ্নগুলি হল এরূপ —

নোট্সের ২নং বিষয় — "নাকের উপরে গাঁট।"

নাকের হাড়ের অংশের নিম্নপ্রান্তের কাছাকাছি সেতুর ডানদিকে আঘাতজনিত স্ফীতি, এটি ঠিক তরুণাস্থি সংক্রান্ত সংযোগের উপরে। বাহ্যিকরেখা অনির্দিষ্ট। ব্যাসার্ধ ১ ইঞ্চির ৬/৭ ভাগ, মোটামুটি স্থায়ী এবং উৎস অস্থিমূলক।

এটি কর্নেল ডেনহ্যামের বিবৃতি। পর্যবেক্ষণ হিসাবে, এটি বিতর্কিত নয়।

কর্নেল চ্যাটার্জি পর্যবেক্ষণ হিসাবে যোগ করে —

একইরকম, কিন্তু সেতুর বামদিকে ছোট আঘাতজনিত স্ফীতি, নাকের শ্লেষ্মা ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ; লিউক্লোপাকিয়া; সামান্য অবদমিত নাক, থিকেনিং অব্ দ্য সেপ্টাম্ নোজ; উঁচু টাকরার সঙ্গে সংযুক্ত। এইসকল বিষয়ের অর্থ সরল এবং এখুনি ব্যাখ্যা করা হবে।

নোট্সের ৬ নং বিষয় — "উপদংশজনিত চিহ্ন।"

চামড়ার উপর ৭টি এরকম চিহ্ন বা ক্ষতচিহ্ন আছে যা নিচে আলোচনা করা হবে।

১০ নং বিষয় "পায়ের নলির হাড়ের উপর গাঁট এবং বুকের হাড়। এই সকল পর্যবেক্ষণগুলি বিতর্কিত, শুধুমাত্র বুকের হাড়ের মধ্যে পর্যবেক্ষিত বিষয়টির অনুমোদন ছাড়া, কিন্তু এর কারণ বা প্রকৃতি নয়।

বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্যকে স্বাগত জানাতে নির্দিষ্ট ঘটনাগুলি বিবৃত করা প্রয়োজন যেগুলি বিতর্কিত নয় এবং এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছে এমন সাতজন ডাক্তারের কাছ থেকে উপদংশের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। যারা এই বিষয়ে কিছু বলেছিল এবং কতগুলি নির্ভরযোগ্য পুস্তক বিচারকের সামনে রাখা হয়েছিল, যেমন ডেভিড লীর "প্র্যাকটিক্যাল মেথডস্ ইন ডায়াগোনেসিস্ অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অব্ ভেনারাল ডিজিজ্"। রোগের যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে, সেটা বিতর্কিত নয় এবং এটা সাধিত এবং দেখা হবে মামলার জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয়।

এটা সাধারণ বিষয় যে মেজকুমারের ১৯০৯ সালে যখন সে দার্জিলিং গিয়েছিল উপদংশজনিত ক্ষত ছিল। ১৯০৮ সালে যখন সে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়েছিল তখন তার এরূপ ক্ষত ছিল। প্রতিবাদীপক্ষের ফণিবাবু বলেছে যে ১৯০৯ সালের

এপ্রিলের তিনবছর পূর্বে উপদংশ ছিল এবং এর পূর্বে তার এই ক্ষত ছিল ১ ১/২ বছর। এখন এটা গ্রহণ করা যেতে পারে যখন ১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে মেজকুমার যখন বীমার ডাক্তারের কাছে পরীক্ষায় পাশ করেছিল তখন তার কোন উপদংশ ছিল না। যাইহোক তার সংক্রমণ হয়েছিল ঐ সময় ও ১৯০৭ সালের নভেম্বরের মধ্যে আলসার দেখা দিল। সঠিক দিন নির্ধারণের কোন প্রয়োজন নেই যখন তার সংক্রমণ হয়েছিল কিন্তু দেখা যায় ১৯০৫ সালের প্রথমে তার এটা হয়েছিল; উপদংশের ক্ষত আবির্ভাবের স্বাভাবিক সময় ৬মাস — থেকে ২ বছর। দেখা যাচ্ছে পুরাতন খানসামা প্রতাপ বলেছে যে রানী জীবিত থাকাকালীন রোগের আক্রমণ শুরু হয়। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে মেজরানীকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনা হয় এবং একটি চিঠিতে, যেটি আগে উল্লেখিত হয়েছে, রানী বিলাসমণিকে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে তার রক্ত দূষিত হয়নি এবং আমরা জানি ১৯০৭ সালের জানুয়ারিতে রানীর মৃত্যু হয়। তিনবছর পূর্বে দার্জিলিঙে মনে হয় রোগের সঠিক সূত্রপাত হয়েছিল।

উপদংশের জন্য বর্তমানে নির্দিষ্ট চিকিৎসা আছে। যাকে বলা হয় স্যালভারসন যেটা ১৯০৯ সালে এলবিচের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং ১৯১০ সালে বাজারে আসে। মেজকুমার তার চিকিৎসায় এই সুবিধা পায়নি যাতে রোগটি দ্রুত বিলুপ্ত হয়। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে উপদংশজনিত ক্ষত খুব কম দেখা দেয়, কিন্তু এমনকি তার সময়েও চিকিৎসা ছিল, যেমন পারদ চিকিৎসা। সুতরাং এটা ঘটনা যে মেজকুমারের আদৌ সঠিক চিকিৎসা হয়নি। যাইহোক এটা স্বীকৃত যে তার কনুই ও তার পায়ে উপদংশজনিত ক্ষত দেখা দিয়েছিল এবং প্রশ্ন হচ্ছে বাদীর এই চিহ্নগুলি তার রোগ রেখে গেছে কিনা এবং এই রোগের আরেকটি লক্ষণ গাঁট কিনা এবং আরেকটি প্রশ্ন যে বাদীর উপদংশ ছিল কি ছিল না। মেজর থমাস বলেছে, "উপদংশের প্রশ্নকে নিশ্চিত করতে দরখাস্তের অন্তর্ভুক্ত চিহ্ন ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ বিষয়ে আমাদের হাতপা বাঁধা ছিল।"

উপদংশ অর্জিত বা সহজাত। অর্জিত উপদংশ একজনের থেকে অন্যজনে সংক্রমণের দ্বারা বাহিত হয়। প্রাথমিক সংক্রমণ হয় সাধারণত জননেন্দ্রিয়ের পথে। এটা শুরু হয় একটি মুদ্রাধাতুক্ষয় হিসাবে। যতক্ষণ না জীবাণু রক্তের সাথে মেশে, ততক্ষণ এটাকে প্রাথমিক বলা হয়। যখনই এটা রক্তের সাথে মেশে, সমস্ত দেহে ছড়িয়ে যায় এবং তখন এটাকে বলা হয় মাধ্যমিক স্তর। তৃতীয় স্তর থেকে একে সুচিহ্নিত করা যায় না। তবে তৃতীয় স্তর থেকেই অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উপদংশজনিত ক্ষতের উদ্ভব ঘটে এবং এই স্তরের কোন সীমা নেই। ক্ষত যে কোন সময়ে উদ্ভুত হতে পারে, চামড়ার নীচে, হাড়ের উপরে, লিভারে, বা যে কোন অংশে। কোন টিসু রেহাই পায় না। ক্ষত ভেতরে সেরে যেতে পারে এবং কোন ক্ষতচিহ্ন রাখে না, কিন্তু চামড়ার উপরে গোলাকার দাগ হতে পারে বা এটা মিলিয়ে যেতে পারে। যখন উপদংশজনিত ক্ষত সেরে যায়, পেছনে একটা ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়। প্রশ্নটি হচ্ছে যে চিহ্নগুলি বাদী দেখিয়েছিল সেগুলি উপদংশজনিত

ক্ষতের এরূপ চিহ্ন কিনা।

চামড়ায় উপদংশজনিত চিহ্ন ছাড়া, অন্যান্য স্থানের মধ্যে এগুলি জিভ ও হাড়ের উপর হতে পারে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে একটি স্ফীতি হাড়ের উপর হতে পারে এবং এটি শক্ত হতে পারে। হাড়ের এই বৃদ্ধিকে সংক্ষেপে স্ফীতি বলা হয়।

এই সংক্ষিপ্ত তথ্য বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং রায়দানের সময় সহযোগিতার জন্য এগুলি উল্লেখ করা হবে।

এখন বিতর্কিত গাঁট ও উপদংশজনিত ক্ষত সম্পর্কিত সাক্ষ্য বিবেচনা করা হবে।

ডাঃ ডেনহ্যামের নথিতে বিতর্কিত গাঁট হচ্ছে ২ নং ও ১০ নং বিষয়। তিনজন ডাক্তার যা পর্যবেক্ষণ করেছে; নাকের সেতুর ডানদিকে উপরে একটি হাড়বৃদ্ধি, একেবারে ঠিক তরুণাস্থি সংযোগের উপরে, এবং বুকের হাড় পুরু হওয়া, যেটিও পরবর্তী, কর্নেল চ্যাটার্জির মতে একটি গাঁট। অন্য দুজন ডাক্তার মনে করেছে যে এই পুরু হওয়া সম্ভবত হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, সেইজন্য এটি গাঁট নয়। কর্নেল চ্যাটার্জির মত তারা নাকের সেতুর বাঁদিকের উপরে কোন হাড়বৃদ্ধি দেখেনি।

তাহলে নাকের ডানদিকের এই হাড়বৃদ্ধি কী? কর্নেল ডেনহ্যাম ও মেজর থমাসের সত্যই কোন মতামত ছিল না এ বিষয়ে যে এটা কী। ডেনহ্যাম তার প্রধান সাক্ষ্যে বলেছে এটা আঘাতমূলক অর্থাৎ ঘুষি বা আঘাতের কারণে। জেরায় সে বলেছে যে এর বয়স বলতে পারে না, তবে নিশ্চিতভাবে সাম্প্রতিক নয়। সে বলেছে, ঘুঁষি অবশ্যই অত্যন্ত জোরালো ছিল। কোন ক্ষতচিহ্ন ছিল না। সে বলেছে এটা সহজাত হতে পারে। আবার বলেছে, এরকম নাও হতে পারে। মেজর থমাস্ বলেছে যে এ বলা শক্ত এটা কী; কিন্তু এটা হয় নাসিকার হাড়ে কোন অস্বাভাবিকতা বা নাকের হাড়ের কোন সামান্য টুকরো। কারণ যাইহোক না কেন, হাড়ের চিড় ধরার বিষয় বাদ দেওয়া যায় না। সে আরো বলেছে যে উপদংশকেও বাদ দেওয়া যায় না। সেজন্য সে বলেছে, যদি বাদীর উপদংশ থাকত তাহলে দুটি বিষয়কে সংযুক্ত করা যেতে পারা যায় না মনের মধ্যে, যদিও পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক।

কর্নেল চ্যাটার্জির নির্দিষ্ট মতামত ছিল যে এটি একটি উপদংশজনিত গাঁট। এটা বিশেষজ্ঞের মতামত। অন্য পক্ষেও মতামত ছিল, শুধুমাত্র নগ্ন নেতিবাচক মতামত ছাড়া এবং কোন কারণ ছাড়াই উপদংশকে বহিষ্কৃত করা। সেজন্য কর্নেল ডেনহ্যামের উপদংশকে বহিষ্কৃত করার কারণ যে যদি এটা উপদংশ হত, সে এটা বৃদ্ধির আশা করবে। কেউ জানে না এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না। স্থানটির সম্বন্ধে কর্নেল চ্যাটার্জি বলেছে এটা স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিকও নয়। এ বিষয়ে থমাস ও মাইকেলের 'ম্যানুয়েল অব সারজারি'তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত হয়েছে, "যে সমস্ত হাড় উপদংশজনিত রোগে আক্রান্ত হয় সেগুলি হল খুলি, নাকের septum, নাকের হাড়, টাকরা, বক্ষাস্থি, উর্বাস্থি, জঙঘাস্থি, এবং পুরো বাহুর হাড়'। ডেভিডলাস্ বলেছে যে কোন টিসু রেহাই পায় না (পৃঃ

৫১), যদিও সে বলেছে, ১০১ নং পাতায়, গাঁট সৃষ্টি হবার প্রচলিত স্থান হচ্ছে কণ্ঠাস্থি, বক্ষাস্থি, পাঁজরা ও জঙ্ঘাস্থি। এখানে উপদংশকে অস্বীকার করার কোন কিছুই ছিল না এবং এটা যে উপদংশ সেটা কর্নেল ব্যানার্জির মতামতের উপর ভালভাবে নির্ভর করতে পারে, কিন্তু নির্ভর করার ততো প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন বিষয় আছে এটা দেখানোর জন্য যে বাদী একজন পুরাতন উপদংশজনিত রোগী, কর্নেল চ্যাটার্জি যেমন বলেছে। তার মতামতকে নিশ্চিত করেছে গাঁট, বিশেষত বক্ষাস্থির উপর আরেকটি গাঁট — পুরু হওয়া দেখা গিয়েছে যাকে কর্নেল চ্যাটার্জি নিশ্চিতভাবে বলেছে গাঁট। অন্যপক্ষে, বিবৃতি ছিল এটা সম্ভবত উপরিভাগের স্তর — যেটা বলতে হয়, চর্বির উপরে। এককথায়, বিষয়টি নির্ধারণ করবে, যে বাদীর উপদংশ ছিল।

ডাঃ থমাস বা ডাঃ ডেনহ্যামকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি বাদীর তখনো উপদংশ ছিল কি না। এটা বলা মুশকিল যেহেতু কারো মধ্যে এর অস্তিত থাকে না। তবে উপদংশকে যতটা সম্ভব নেতিবাচক করে যদি শনাক্তকরণকে যতদূর সম্ভব নেতিবাচক করা যায়। সেটা প্রশ্নাতীত। মেজকুমারের উপদংশ ছিল এবং এটা একটা জাগতিক বৈশিষ্ট্য নয়।

ডাক্তাররা সেখানে ছিল 'উপদংশ নিশ্চিত করতে'। মেজর থমাসের নিজস্ব উক্তি ঢুকে নিতে এবং তারা নিয়েছিল এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় দেখেছিল, যেগুলি কর্নেল ডেনহ্যামের নথিতে ছিল না। মেজর থমাস অনুমোদন করেছে যে নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলি করা হয়েছিল, যেমন কর্নেল চ্যাটার্জি বলেছে : কর্নেল ডেনহ্যাম বাদীর পরীক্ষা বিষয়ে চাল দিয়েছিল। কর্নেল চ্যাটার্জি ডেনহ্যাম ও থমাসের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বাদীর নিঃশ্বাস ও যৌনব্যাধিজনিত ক্ষতের জন্য সে বাদীর যৌনাঙ্গের গভীর পরীক্ষা করেছিল। বিচারকের মত্যে কর্নেল চ্যাটার্জিকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে বাদীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছিল ভারী ও শব্দযুক্ত। মেজর থমাস নাকের ভেতর নাসিকা প্রদাহের বিষয়ে লক্ষ্য করেছিল। সে একটি টর্চের দ্বারা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিল সেখানে। থমাস অদ্ভুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কথা অনুমোদন করেছে। কিন্তু পায়ে ও হৃদযন্ত্রে acdima-র প্রতি নির্দেশ করেছে — হৃদযন্ত্রের পরীক্ষা হয়নি, কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস বড় একটা ভারী ছল না, তবে শব্দযুক্ত যেটা নাসিকারন্ধ্রে কোন বাধাকে সূচিত করে। কর্নেল চ্যাটার্জিও নাকের ভেতর সাদা বিন্দু লক্ষ্য করেছিল এবং এও দেখেছিল septum সামান্য পুরু। বিচারক মনে করে সে বলেছে যে এই অবস্থার উৎপত্তি হয় উপদংশ রোগে।

তিনবার চাপ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কর্নেল চ্যাটার্জি মনে করেছে যে এই চাপের কারণে বাদী হটে এসেছিল, এতে স্বাভাবিক মানুষ ভয়ে আর্তনাদ করে উঠবে।

বাদীর জিভের উপর পরিষ্কার চিড় ছিল এবং তার পায়ের দুটি আঙ্গুলের মধ্যে ছিল হাজা। কর্নেল চ্যাটার্জি এগুলি দেখেছিল। বিচারকও আদালতে বাদীর মধ্যে এগুলি দেখেছিল। কর্নেল চ্যাটার্জির সাক্ষ্য ছিল এই সব বস্তু সে নাকের উপর দেখেছিল। জিভের উপর চিড় এবং হাড় বৃদ্ধি উপদংশকে নিশ্চিত করে। একজন বিশেষজ্ঞের চোখ সব কিছু

দেখতে পারেনি। অণ্ডকোষীয় অনুভূতিও বাদী হারিয়ে ফেলেছিল।

৮৫নং পাতায় ডেভিড নীল বলেছে, "জিভ হচ্ছে উপদংশজনিত ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার সবচেয়ে প্রচলিত স্থান। কারণ খাদ্য থেকে অবিরাম উত্তেজনার জন্য সেটা সেখানে প্রকট হয়।"

বিচারক বাদীর মধ্যে একটা পুরাতন উপদংশজনিত রোগ দেখেছে এবং তাতে নাকের সেতুর ডান দিকে একটা হাড়বৃদ্ধি দেখা গেছে, ব্যাসার্ধ এক ইঞ্চির ৭/১৬ ভাগ, কর্নেল চ্যাটার্জির মতে সেতুর বামদিকে হাড় সামান্য মোটা হয়েছে, septum পুরু হয়েছে, শ্লেষ্মা ঝিল্লীর প্রদাহ, এবং হাড় বৃদ্ধি ও তার সাথে যুক্ত হয়েছে চর্বি, যার থেকে নাক সার্বিকভাবে রেহাই পেতে পারত না। সব মিলিয়ে নাকের উপস্থিতির পরিবর্তন হতে বাধ্য হয়েছিল।

চামড়ার উপদংশের চিহ্ন

মেজর ডেনহাম হোয়াইটের নথিতে এগুলি ৫নং বিষয়ে অধীনস্থ, ছটি বিষয় আছে, এবং এগুলি হল :

(১) ছোট অবদমিত, অসমতল, ক্ষতচিহ্ন বামপুরোবাহুর উপর অন্তপ্রকোষ্ঠাস্থিগত সীমার মধ্যবর্তীস্থানে, ব্যাসার্ধ ৩ মিমিঃ।

(২) অসমতল ডিম্বাকৃতি চিহ্ন ৭ মি. মি., সর্বাপেক্ষা ব্যাসার্ধ ৪.৫ মি. মি. মূল পার্শ্বের পশ্চাদ্বর্তী দৃশ্য প্রায় একই ব্যাসার্ধের।

(৩) ছোট অবদমিত, ডানপুরোবাহু, অন্তপ্রকোষ্ঠাস্থির ১ ইঞ্চি উপরে, চামড়ার মধ্যে কোন ছেদ নেই।

(৪) খুব অস্পষ্ট রৈখিক ক্ষতচিহ্ন, দৈর্ঘ্যে ৪ মি. মি. আভ্যন্তরীণ malleolus-এর .৫´ উপরে (ডানদিক)

(৫) ক্ষতচিহ্ন : তামাকের পাইপের আকারে, সামান্য অবদমিত, পায়ের নিম্নাংশে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে শায়িত- আভ্যন্তরীণ malleolus- (বামদিক) এর ২১/২´´ উপরে।

বাম পা

(৬) ২´´ দীর্ঘ বর্ণহীন চিহ্ন, চর্মের স্বাভাবিক রঙের ঘাটতি, কয়েকটি স্থানে — ৬/১৬ ইঞ্চি সর্বাপেক্ষা প্রস্থ, আভ্যন্তরীণ malleolus এর কেন্দ্র থেকে পেছনে আড়াআড়িভাবে বিস্তৃতি।

এই শেষোক্ত বিষয়কে বাদী উপদংশজনিত ক্ষতচিহ্ন হিসাবে নির্দেশ করেনি। ডাক্তাররা নিজেরাই এগুলি তাদের দৃষ্টির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেছিল। কর্নেল চ্যাটার্জি মনে করে এটি চামড়ার একটি অবস্থা যাকে বলা হয় Leoko melano darma, যার বিষয়ে ডেনহ্যাম শুনেছিল, কিন্তু পরিচিত ছিল না। এর কোন গুরুত্ব নেই। শুধু উপদংশের সাক্ষ্য ছাড়া যা অন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। ডেনহ্যাম মতামত দাখিল করেছে যে এটা মদ্যপানজনিত চিহ্ন হতে পারে, কিন্তু এর পরীক্ষা সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

ডেনহ্যাম ও থমাসের মতামত ছিল যে বাদবাকী চিহ্নগুলি আদৌ উপদংশজনিত চিহ্ন নয় যেখানে কর্নেল চ্যাটার্জি মনে করে ওগুলি তাই। সে অত্যন্ত ইতিবাচক ছিল এ বিষয়ে।

চিহ্নগুলির মধ্যে (১) হয় বামপুরোবাহুর উপরে ও (২) ও (৩) ডান পুরোবহুর উপরে। কর্নেল চ্যাটার্জি বলেছে (১) ও (২) ক্ষতচিহ্ন এবং যেহেতু ডেনহ্যাম কর্নেল চ্যাটার্জির নোটস অনুসারে পাঠ করেছিল, যদিও মেজর থমাস তার বক্তব্য লিখেছিল. তথাপি 'ক্ষতচিহ্ন' শব্দটি লেখেনি এবং 'চিহ্ন' শব্দটি লিখেছিল। এটা অবশ্যই ক্ষতচিহ্ন ছিল, দেখা যাচ্ছে ডেনহ্যাম (১) ও (২) কে একই শ্রেণীতে রেখেছে এবং এগুলিকে গুটি বসন্তের চিহ্ন বলেছে যেটা সর্বদাই ক্ষতচিহ্ন হয়। এখন এই তিনটি চিহ্ন — (১) থেকে (৩) সবগুলি গোলাকার বা প্রায় গোলাকার এবং ১ম ও তৃতীয়টি অবদমিত। (১) ও (২) -এর মধ্যে কর্নেল চ্যাটার্জি ক্ষুদ্র বিন্দু দেখেছিল এবং (২) সামান্য অবদমিত। (৩) নং পরিষ্কারভাবে অবদমিত। কিন্তু ক্ষতচিহ্ন নয়। মেজর থমাস অনুমোদন করেছে যে তার এই সকল চিহ্নের সংজ্ঞা একমাত্র সংযোগ। ডেনহ্যাম (১) ও (২)-এর প্রতি মতামত সীমিত করেছিল এবং বাদবাকীর প্রতি কোন মতামত দেয়নি। থমাসের নেতিবাচক উপদংশের মতামত নির্ভরশীল ছিল ইংরেজি বই থেকে গৃহীত রোগমুক্ত উপদংশজনিত ক্ষতচিহ্নের ধারনার উপর বা সাদা চামড়ার উপর, এটা স্বীকৃত যে এই সকল ক্ষতচিহ্নগুলি গোলাকার, এবং সাধারণত অবদমিত হয় ও কিছু স্বাভাবিক রঙ থাকে। এই স্বাভাবিক রঙ সীমার মধ্যে থাকবে এবং কেন্দ্রেও উদ্ভূত হতে পারে। মানুষের চামড়ার এই স্বাভাবিক রঙের বিষয় কর্নেল চ্যাটার্জির বিশেষ পাঠ্য বিষয় ছিল যাতে "সে বিশেষ পড়শুনা করেছে। যাইহোক বিচারক তার সাথে একমত, বিশেষত বাদীর উপদংশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গ ীতে, যেটা প্রমাণিত যে (১), (২) ও (৫) নং চিহ্ন উপদংশজনিত ক্ষতের চিহ্ন, যদিও (৩) হচ্ছে একটি Subcutaneous উপদংশের চিহ্ন। যাইহোক বিচারক মনে করে যে এগুলি উপদংশজনিত ক্ষতের চিহ্ন। (৪) ও (৬) চিহ্নদ্বয় সন্দেহজনক এবং বিচারককে অবশ্যই সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে হয়েছে যে এগুলি উপদংশজনিত ক্ষতচিহ্ন হিসাবে প্রমাণিত হয়নি।

এই মামলার সাক্ষ্য খুব একটা সঠিক ছিল না। এটা হতে পারে না যে মেজকুমারের আলসারে স্পষ্ট স্থান নিরূপণ করা যেতে পারে না। সাক্ষ্যে ছিল যে কনুইয়ে ও পায়ে তার আলসার ছিল। প্রতিবাদীগণ এই ক্ষতস্থান স্থির করার কোন উদ্যোগ নেয়নি এবং বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে আশু ডাক্তার তার কনুই ও হাঁটুর জোড় সম্বন্ধে অস্পষ্ট তথ্য দিয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে বলেছিল এগুলি অন্যস্থানে হতে পারে, তার মনে নেই। যাইহোক, এটা বলা সম্ভব নয় যে এগুলি সনাক্তকরণ চিহ্ন যেমন বাঁপায়ের গোড়ালির বাইরে উপরে অসমতল ক্ষতচিহ্ন, কিন্তু এগুলির মধ্যে কিছুই সনাক্তকরণকে ভুল প্রমাণ করেনি। অন্যদিকে বাদীর উপদংশের ঘটনা ও কনুইয়ের বিষয়ও সনাক্তকরণ পরিস্থিতির সঙ্গে অবশ্যই সংযুক্ত করা হয়েছিল। যেহেতু একজন সাক্ষী অস্পষ্টভাবে কুমার ও তার একটি পা সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছিল যে উপদংশজনিত ক্ষতের উদ্ভব হয়েছিল।

বিচারকের লিপিবদ্ধ দুটি জিনিসের আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। বাদীর যৌনাঙ্গে কোন যৌনব্যাধিজনিত ক্ষতের চিহ্ন ছিল না। যেখানে ডেনহ্যাম বলেছে যে একটা অদ্ভুত যৌনব্যাধিজনিত ক্ষত ছিল যেটা যৌনাঙ্গের গ্রন্থির উপর চিরদিনের জন্য চিহ্ন রেখে গেছে। মেজর থমাস এ ব্যাপারে একমত, কিন্তু বলেছে যৌনব্যাধিজনিত ক্ষত সেরে যেতে পারে। কিন্তু এটা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়েছিল। এটা পুরোপুরি সারেনি। যৌনাঙ্গের অন্য কোথাও এটা হয়নি। সাক্ষীরা এই তথ্য দিয়েছিল-- এটা প্রদত্ত হয়েছিল এই বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপিত হবার পূর্বে। বাস্তবিক বিশষজ্ঞদের মতানুসারে যৌনব্যধিজনিত ক্ষত যেখানে সেখানে চিহ্ন রেখে যেতে পারে না। এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি একজন মানুষের সন্দেহজনক উপদংশের ইতিহাস-সহ তার পরীক্ষার ব্যাপারে সামান্য সাহায্য করে।

অন্য বিষয়টি হচ্ছে বাদীর বিষয়ে কর্নেল ম্যাক গিলাখ্রিস্টের সাক্ষ্য। সে দৃঢ়ভাবে বলেছে যে সে বাদীর দেহে কিছু চামড়ার স্বাভাবিক রঙ সহ ক্ষতচিহ্ন লক্ষ্য করেছিল এবং এই ক্ষতচিহ্ন উপদংশজনিত ক্ষতের ফল। কিন্তু জেরায় সে বলেছে এগুলি উপদংশজনিত ক্ষতচিহ্ন ছিল না। সে অন্য বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল এবং এটা উদ্ভূত হয় যে কি চিহ্নের বিষয়ে সে উল্লেখ করেছিল। প্রশ্নটার প্রতি গুরুত্বও দেয়নি সে। এখনো পর্যন্ত চিহ্নের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে যেটা শুধুমাত্র সাক্ষীদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। আঁশটে পা কার্যকরী ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণ বিষয়। বীমাব ডাক্তারের চিহ্ন --- বাঁ পায়ের গোড়ালির উপর ক্ষতচিহ্ন পরিবর্তনশীল। কানবেঁধানো প্রতিবাদীদের নিজস্ব মতামত। উপদংশজনিত ক্ষতচিহ্ন আলসারের ও উপদংশের উপর নির্ভরশীল। এখন যে সব চিহ্নগুলি সাক্ষীদের নিজস্ব সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভরশীল তার দিকে নজর দেওয়া যাক।

বাগীরোগের চিহ্ন

এ বিষয়ে ডেনহ্যামের উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। এর সঠিক স্থান এ(৪০) নং ছবিতে নির্দেশিত হয়েছে। চিহ্নটি একটি অস্ত্রোপচারের চিহ্ন, কিন্তু এটা আদৌ বাগীর নয়, দেখা যাচ্ছে এটা তলপেটের উপর, কুঁচকির উপর নয় যদিও এর কাছাকাছি,

বাদী সর্বদা বর্ণনা করছে এটাকে বাগী হিসাবে যেটা উপদংশ বা অন্য কিছুকেও নির্দেশ করে; কিন্তু সে এটাকে উপদংশের ফল হিসাবে বলছে। এই বিষয়ে সে যা তথ্য দিয়েছে তা এরূপ; তার উপদংশ শুরু হয়েছিল যৌনাঙ্গের উপর একটি প্রাথমিক ক্ষত দিয়ে এবং তার একমাস পরে তার এই বাগী হয়েছিল এবং একজন ইলাহী ডাক্তার এটার উপর অস্ত্রোপচার করেছিল। সে সময় নির্ধারণ করেছে তার পিতার মৃত্যুর ৪/৫ বছর পর অর্থাৎ ১৯০৬ সালে। এই তথ্য প্রদত্ত হয়েছে দুজন পুরানো চাকর ও পারিবারিক কম্পাউন্ডারের দ্বারা এবং এদের মধ্যে একজন এটি পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল (বাঃ সাঃ ৪৮, ৫২, ৭৪)। ইলাহী ডাক্তারকে একজন সুপরিচিত ডাক্তার হিসাবে পরিচিত

করানো হয়েছিল। কিন্তু অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এটা দেখাতে যে সে অপরিচিত ও হাতুড়ে। তার ডিপ্লোমা নথিতে আছে এবং এটা বিস্ময়মূলক ঘটনা যে রায়সাহেব তার সম্বন্ধে খোঁজ করেছিল। ১৯২১ সালে বাদীর উপস্থিতির পর। তার সাক্ষ্য চিহ্নের দ্বারা সমর্থিত — যদি সে বা বাদী এটাকে বাগী হিসাবে নিয়ে থাকে। তখন থেকে এটাকে প্রাথমিক ক্ষত হিসাবে নেওয়া হয়েছিল এবং যদি বাদী সর্বদা এরূপ মনে করে থাকে, 'কারো আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়, দেখা যাচ্ছে থমাস অনুমোদন করেছে যে মানুষের কুঁচকির এত নিকটে স্থানটির সম্বন্ধে দ্বন্দ্বমূলক ধারণা ছিল। বিচারক মেজকুমারের এই অস্ত্রোপচারের চিহ্ন দেখেছে। ইলাহী ডাক্তার ছিল একজন সার্জন এবং কুমার এটাকে গোপন রেখেছিল এবং সেজন্য আবশ্যিকভাবেই পারিবারিক ডাক্তারকে এর জন্য ডাকেনি।

ভাঙা দাঁত

বাদীর একটা দাঁত ভাঙা ছিল — বাঁদিকের মাড়ীর উপরের প্রথম দাঁত, শুধু বাইরের খোলসটা ছাড়া।

জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে মেজকুমার টমটম থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে এই দাঁত হারিয়েছে। সে দিনক্ষণ স্থির করতে পারেনি। শুধু সে প্রকৃতই বলতে পারে যে এটা হয়েছিল তার বাবার মৃত্যুর পর, যদিও সে ঘটনাটিকে ছোট কুমারের বিবাহের কাছাকাছি কোন এক দিনে স্থাপন করার চেষ্টা করেছিল। বিচারক মনে করে না কেউ অন্যলোকের দাঁতভাঙার বছর মনে রাখতে পারে। এই অক্ষমতা একটি মূল্যবান সনাক্তকরণ চিহ্নের বিষয়ে বাদীর বা তার সাক্ষীদের প্রতিকূল পরিস্থিতি নয়। কেউ কোন প্রতারককে ভাঙা দাঁত-সহ সামনে রাখবে না; কিন্তু এই মহিলার কোনমতেই সময়টা মনে ছিল না। বাদী তার প্রধান সাক্ষ্যে দুর্ঘটনাটি সংক্ষেপে বলেছে — কেমন করে সে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল এবং তার ঘোড়া চঞ্চল হয়ে উঠেছিল বিপরীত দিক থেকে তার ভাইয়ের হাতি আসতে দেখে এবং সে পড়ে গিয়ে দাঁত ভেঙেছিল। সে সময় উল্লেখ করেনি — তাকে এই বিষয়ে জেরা করা হয়নি। বিচারক এই ত্রুটিকে বিবেচনা করেনি, কিন্তু একটা সাধারণ প্রশ্ন ছিল যে তার চিহ্নগুলি মেজকুমারের প্রতি আরোপিত হচ্ছিল। সুতরাং বিচারক এই বিষয়ে আলোচনা করছে না এই ভিত্তিতে যে এটা প্রশ্ন করা হয় নি, কিন্তু বিচারক পর্যাপ্ত কারণ দেখেনি বাদীর দ্বারা পরীক্ষিত পুরাতন চাকরদের সাক্ষ্যকে বাতিল করতে যারা দাঁতভাঙাকে সমর্থন করেছিল (বাঃ সাঃ প্রতাপনারায়ণ (৪৮), প্রভাত দে (৪৯), গঙ্গাবাবু (৮), পুরাতন নাজির (৫২), নগেন (৮০৬)। এদের কেউ দুর্ঘটনা দেখেনি, শুধু নাজির দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই সেখানে গিয়েছিল। এলোকেশী যে ঢাকায় তার রক্ষিতা ছিল, যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছিল— যাকে দেখা গিয়েছিল ছোটকুমারের বিয়ের সময়, কিন্তু দিন স্থিরীকৃত নয়। অন্যপক্ষে, রানী এটা অস্বীকার করে এবং কেউ এ বিষয়ে শোনেনি, কিন্তু ফণিবাবু, আশা করা যায়, এ বিষয়ে শুনে থাকবে।

মাথার উপর ফোঁড়ার চিহ্ন।

পেছনে পোড়ার চিহ্ন।

বামহাতে বাঘের থাবার চিহ্ন।

যৌনাঙ্গে তিলচিহ্ন।

এই তিনটি চিহ্ন বাস্তবিক পক্ষে শুধু জ্যোতির্ময়ীদেবীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, বাদী ছাড়া। সে বলেছে যে তার মাথায় ফোঁড়ার চিহ্ন তার বাল্যকালে হওয়া বিভিন্ন ফোঁড়ার সবচেয়ে বৃহৎ ফোঁড়ার ফল। এবং সে এটা লক্ষ্য করেছিল এমনকি কুমারের বড় হওয়ার পরে, যখন সে নয় বছর বয়সে চুল কামিয়েছিল, যখন তার পৈতা হয়েছিল এবং যখন বাবার মৃত্যুর পরও সে মাথা কামিয়েছিল এবং আবার মায়ের মৃত্যুর পরে মাথা ন্যাড়া করেছিল।

এই তথ্যের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক দেখা যায় না। কিন্তু চিহ্ন, যখন থেকে এটা জ্যোতির্ময়ীদেবীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছিল, এটা পরীক্ষা করা যায়নি।

(h) পেছনে ফোস্কার চিহ্ন এই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। ডেনহ্যামের নোট্‌সে এটা ৮ নং বিষয়।

জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে বাদীর ৫/৬ বছর বয়সে এই ফোস্কা পড়ে। সুরেশ (বাঃ সাঃ ৫) ছাড়া আর কেউ এটা দেখেনি। সে কৃপাময়ীর একজন সৎ-পুত্র, তিনবছর বয়স থেকে রাজবাড়িতে বাস করছিল।

এই চিহ্ন মেজকুমারের মধ্যেও দেখা যাবে।

(i) ডেনহ্যামের ৭নং চিহ্ন। বাদী বলেছে একটি বাঘের বাচ্চার কারণে এই চিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে। জেরায় সে বলেছে, এটি তাকে একটি খাবলা মেরেছিল। এটা দেখা যাচ্ছিল যদিও কিছু আঁচড় মিশে গেছিল। বাদীকে এই বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কিন্তু জ্যোতির্ময়ীদেবীকে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছিল চিহ্নের সঠিক্ প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে। বলা হয়েছিল বাঘের বাচ্চাটি রাজার মৃত্যুর কিছু সময় পর তাকে আঘাত করেছিল যখন মেজকুমারের চিড়িয়াখানা সেখানে ছিল এবং ডাক্তারের কাছে মতামত চাওয়া হয়েছিল যে আঁচড় এই চিহ্নের কারণ কিনা। মনে করা হচ্ছে এটি একটি বাঘের বাচ্চা ছিল এবং খেলছিল। বিচারকের পক্ষে এটা বোঝা মুশকিল হয়েছিল যে যদি চিহ্নটি মিথ্যা আরোপিত হয়ে থাকে, একটি শারীরিকভাবে। অসম্ভব কারণ দেওয়া উচিত ছিল। এই চিহ্নের সাথে সম্পর্কিত সাক্ষ্য সত্য, যতক্ষণ না এটা স্থানচ্যুত হয় সনাক্তকরণের বিষয়ে ব্যর্থতার দ্বারা।

(২) একই মন্তব্য প্রয়োগ করা হয়েছে যৌনাঙ্গের তিলচিহ্নের প্রতি — কুমারের মধ্যে যেটির উপস্থিতি সম্পর্কে দুটি পুরানো ভৃত্য ও একজন পুরানো পরিচারিকা সাক্ষ্য দিয়েছিল (বাঃ সাঃ ৪৮, ৫২, ৯৮৭)।

টিকার চিহ্ন

এইগুলি সনাক্তকরণের চিহ্ন নয়, কিন্তু বাদী মেডিক্যাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল ও

এই চিহ্ন যেখানে তার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়েছে, একটা দুর্বল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এটা প্রদর্শন করতে যে রিপোর্টে উল্লিখিত টিকার চিহ্ন বাদীর মধ্যে নেই। মেডিক্যাল রিপোর্টে দুই বাহুতে দুটি টিকার চিহ্ন ছিল এবং এ বিষয়ে লেখা হয়েছিল সনাক্তকরণ কিন্তু চিহ্ন হিসাবে নয়। কিন্তু আবেদনকারী টিকা নিয়েছে কিনা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কলমে। বাদীর শরীরে দুটি টিকা চিহ্ন দেখা গেছে একটি বাহুতে এবং আরেক বাহুতে আর একটি এবং এগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট। যে সব ডাক্তার বাদীর পক্ষে পরীক্ষা করেছিল বলেছে যে চিহ্নগুলি অপ্রচলিত স্থানে নয়, বাইসেপের আভ্যন্তরীণ রেখায় এবং মেজর থমাস বলেছে যে অপ্রচলিত স্থান তাকে সচকিত করে যখন কর্নেল ডেনহ্যাম এর প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু দুজনের কেউ বলতে পারেনি যে এগুলি টিকার চিহ্ন নয় যেগুলি অবশ্যই তা ছিল। এর একটি ৩১বছরের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে যেতেই পারে।

এই বিষয় আলোচনা বন্ধ করার পূর্বে কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং এমনকি চিহ্ন সম্বন্ধে একটি কথা বলা উচিত এই মতামত দেওয়া হয়েছিল যে পরিবারে এই চিহ্নগুলি ধারাবাহিক। এগুলি বংশগত বা তেমন কিছু নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে জানা কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, যেমন চুলের রঙ, চুলের আকৃতি, ঠোঁটের আকৃতি, নাকের আকৃতি, কানের আকৃতি প্রায়ই বংশগত হয় না এবং প্রায়ই এর মধ্যে প্রজন্মের অন্তর ঘটে। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে রাজার এই তিন সন্তান মেজকুমার, তৃতীয়কুমার ও জ্যোতির্ময়ীদেবী পুরোপুরি প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান-- থেকে পৃথক অর্থাৎ ইন্দুময়ী ও বড়কুমার থেকে যারা কালো ও চুলহীন। বিচারক তাদের গাত্রবর্ণ দেখেছে ও রাজা কালীনারায়ণের মধ্যে তাদের চুলের লঙ। কিন্তু একটি বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, তা হচ্ছে আঁশটে পা হচ্ছে পারিবারিক চিহ্ন এবং কান এর অদ্ভুত আকৃতি এবং ঝোলানো লতি সহ যা ছিল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে।

চলনভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি, গলার স্বর

সনাক্তকরণ চিহ্ন হিসাবে চলনভঙ্গি কমবেশি অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু অতুলবাবুর মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছিল চলনভঙ্গীর সম্বন্ধে পার্থক্যসূচক বিষয় হিসাবে। প্রতিবাদীপক্ষ যতদূর অবগত ছিল সূত্রটি অদৃশ্য হয়েছিল। কিন্তু অন্যপক্ষে সাক্ষ্য বহুদিন পূর্বে প্রদত্ত হয়েছিল। মোক্ষদাদেবী (১৯৩০ সালে কমিশনের সামনে পরীক্ষিত) ১৩২৭ সালে চৈত্রমাসে তার প্রথম সাধুদর্শনের কথা বলছিল — সন্ন্যাসী হিসাবে বাদীর তখন জয়দেবপুর আগমনে যখন কিছু সন্দেহ দেখা যাচ্ছিল যে সাধুকে দেখতে মেজকুমারের মত। এই বৃদ্ধা জন্ম থেকে কুমারদের সম্বন্ধে জানত। মাধববাড়ীর দিকে যাওয়ার সময় সে প্রথম সন্ন্যাসীকে দেখতে পায়. সে সাধুর পেছন দিক দেখতে পেরেছিল, "তার চলনভঙ্গী, যেমন আমি দেখেছিলাম. আমার মধ্যে শিহরন জাগল — এটা মেজকুমারের" সে বলেছে। জ্যোতির্ময়ীদেবী যখন প্রথম সাধুকে দেখল অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তার চলনভঙ্গী তাকে ভাবিয়েছিল। অন্যান্য সাক্ষীদের মধ্যে বাঃ সাঃ ৯২১, হিরন্ময়বাবুর কথা অবশ্যই উল্লেখ

করতে হবে যিনি ঢাকার একজন বর্ষীয়ান উকীল এবং অত্যন্ত সম্মানিত ভদ্রলোক। ১৩২৭ সালের ফাল্গুন বা চৈত্রে যখন সাধু বাকল্যান্ড বাঁধে ছিল, একদিন প্রয়াত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাকে একটি সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ও তাকে প্রথম সারিতে বসিয়েছিল, "আমি এই ধরনের একজন মানুষকে ঐরকম পোশাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, যেহেতু সেখানে মহিলারা ছিল। তার অদ্ভুত আচরণ আমাকে চিন্তিত করল যেন সে ছদ্মবেশে আছে। সে চলে যাওয়ার পর এবং তার বসার, চলার ভঙ্গী ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য এই চিন্তা আমার মধ্যে উৎপন্ন হল যে সে মেজকুমার হতে পারে।"

বিচারক বাদীর চলনভঙ্গীর মধ্যে এমন কিছু দেখেনি যা তাকে মেজকুমাবের থেকে আলাদা করে। অন্যদিকে তার চলনভঙ্গী মেজকুমারের মতো, দেখা যাচ্ছে লোককে তার কথা মনে করাচ্ছে, এমনকি যখন সে তার পরিচয় প্রকাশ করেনি এবং এই ঘটনা ও অতুলবাবুর সাক্ষ্য দেখে যেহেতু চলনভঙ্গীর মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল, এটা সনাক্তকরণ পরিস্থিতির সংমিশ্রণে সামান্য বাড়তি সংযোগ।

অভিব্যক্তি

উল্লেখ করা হচ্ছে বিচারের একটি পর্বে মিঃ চৌধুরী বিকৃত ছবির একটিকে ব্যবহার করছিল — এর মুখে বিকৃতি ছিল এবং বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেছিল এটা কেন — দরখাস্তে এটাকে সুসাদৃশ্য বলা হয়েছিল, যদিও মানুষটিকে দেখা যাচ্ছিল সেখানে এবং মতামত দেওয়া হয়েছিল যে বাদী এটাকে বোর্ড অব্ রেভিনিউয়ের কাছে পাঠিয়েছে তার বর্ণনাসহ, সেখানে তার চেহারার মধ্যে কয়েক ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছে। সে এই ছবি ও মুখের অভিব্যক্তিকে গোমড়ামুখো বলে উল্লেখ করেছিল যদিও বাদীর অন্যান্য ছবি ছিল। বিশেষভাবে যেগুলি স্টুডিয়োতে গৃহীত হয়েছিল এবং তার দাঁড়ি কামানোর পরে।

একটি নির্দিষ্ট তোতলামি সত্ত্বেও, যার প্রসঙ্গে পরে আসা হবে, অসংখ্য যোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য ছিল যে বাদীর স্বর মেজকুমারের মতো, অন্য পক্ষে ফণিবাবু ও জনৈক মানুষ, একজন সন্দেহজনক সাক্ষী যে কমিশনে পরীক্ষিত হয়েছিল, ছাড়া আর কেউ এটা অস্বীকার করেনি। প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষীরা বাদীর কথা শুনেছিল, কিন্তু তাদের কেউ বলতে আসেনি যে বাদীর স্বর পৃথক। বিচারকের মতে স্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা তার পরিচয়ের বিপক্ষে যাবে।

তৎসহ —

জুতার মাপ ঠিক ছয়।

কুমারের পুরানো পোশাকে মাপমতন কোন পরিবর্তন ছাড়াই। এ সমস্ত বিষয় পূর্বে সম্পূর্ণ আলোচিত হয়েছে।

সংক্ষেপে

বোন, প্রথমরানী, সরোজিনী, মেজরানীর নিজের পিসী এবং তার আপন খুড়তুতো ভাই বলেছে যে বাদীই হচ্ছে মেজকুমার। অন্যান্য আত্মীয়রাও এমন বলেছে শুধু ফণিবাবু

তার বোন, জামাই ও এস্টেটের একজন কর্মচারী ছাড়া।

বোনের বিশ্বাস ছিল সৎ। কিন্তু রায়সাহেব তাকে সৎ বলে মনে করতে পারেনি — সে সন্ন্যাসীকে দেখেছিল ও কুমারকে জানত।

সম্মানিত ও স্বাধীন মানুষ, বয়স্ক লোকেদের কোনরকমের উৎসাহ ছিল না এবং ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা যাদের কোনরকম রোমান্টিকতা আছে বলে কেউ সন্দেহ করে না, তারা শপথ করে বলেছিল বাদীই মেজকুমার। তাদের বিবৃতি এটা নিশ্চিত করেছিল এবং বোনের সততার দ্বারা এটা নিশ্চিত হয়েছিল।

প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের মধ্যে একজন স্বাধীন সাক্ষীও ছিল না যে কুমারকে জানত ও তাকে মনে রেখেছে। যারা জানত ও অবশ্যই মনে রেখেছিল, তারা স্থির সংকল্পসহ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যকে প্রমাণ করতে এসেছিল। কিন্তু কারোর প্রকৃত বিশ্বাসও ভেঙে গেছিল। "প্রথম দৃষ্টিতে তাকে একই মানুষ বলে মনে হয়।" এতদূর পর্যন্তই অপর পক্ষের সাক্ষী যেতে পারে (প্রঃ সাঃ ৩২৬)। নাক কেমন করে এতখানি চওড়া হতে পারে? নাকটা সামান্য মোটা মনে হয়েছিল — এটুকু পার্থক্যই আরেকজন সাক্ষী বলতে পেরেছিল। (প্রঃ সাঃ ৩২৪)। একজন সাক্ষীকে বলতে শেখানো হয়েছিল বাদী বেশি লম্বা, সে বলেছে, কিন্তু কেমন করে অনেক বেশি লম্বা হতে পারে? (বাঃ সাঃ ৩৮১)

ছবিতে কোন পার্থক্য দেখা যায়নি, শুধু মাত্র নাকের একটি পার্থক্য ছাড়া; একটি স্বীকৃত ও অন্যটি প্রমাণিত পরিবর্তনের দ্বারা পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ছবিতে প্রথম দৃষ্টিতে একজন আগন্তুক বাদী ও মেজকুমারকে একই মানুষ বলবে না। কুমারের অনুমোদিত ছবির মধ্যে একজন আগন্তুকের কাছে বাদীকে একই রকম দেখায় না এবং ফ্রককোট পরিহিত ছবিতে কুমারের সাথে বাদীর সাদৃশ্য ইনসেটে পরিবর্তিত ছবির চেয়ে অনেক বেশি।

এর সাথে নিম্নোক্ত চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে ব্যতিক্রম ও এগুলি সনাক্তকরণ চিহ্ন হবে।

	কুমার	বাদী
গাত্রবর্ণ —	গোলাপী ও সাদা	গোলাপী ও সাদা
চুল —	বাদামী	বাদামী
চুলের গঠন —	ঢেউ খেলানো	ঢেউ খেলানো
গোঁফ —	চুলের থেকে হালকা	চুলের থেকে হালকা
চোখ —	বাদামী	বাদামী
ঠোঁট —	নীচের ডান ঠোঁটের কম্পন	একই রকম
কান —	কানের প্রান্তে কোণ	একইরকম
হাত —	ছোট	ছোট
পা —	ছয় নম্বর	একইরকম

অ্যাডাম'স অ্যাপেল —	স্পষ্ট	স্পষ্ট
বাঁহাতের তর্জনী —	ডানদিকের ঐ	
ও মধ্যমা	আঙ্গুলের চেয়ে কম অসমান	একইরকম
ডানচোখের নীচের		
পাতায় আঁচিল বা		
এরকম কিছু —	উপস্থিত	উপস্থিত
আঁশটে পা—	উপস্থিত	উপস্থিত
বাঁদিকের গোড়ালির		
বাইরে উপরে অসমতল		
ক্ষতচিহ্ন —	উপস্থিত	উপস্থিত
কানবেঁধানো —	উপস্থিত	উপস্থিত
ভাঙা দাঁত—	উপস্থিত	উপস্থিত
উপদংশ	উপস্থিত	উপস্থিত
উপদংশজনিত ঘা—	উপস্থিত	উপস্থিত

জুতো, পোশাক ঠিক একই মাপের। সাধারণ চেহারা একইরকম, শুধু স্থূলতা ছাড়া, যেটা ছবিতে এ(১৫) দেখা যায়। একই বয়েস। তার একুশ বছর বয়েসের উচ্চতা লক্ষ্য করে দেখা যায় আজকে তার উচ্চতা এমন হতে পারে। দৃষ্ট চিহ্ন সমূহ যোগ কর : মাথায় ফোস্কার চিহ্ন; পিঠে ফোস্কার চিহ্ন; কুঁচকির কাছে অস্ত্রোপচারের চিহ্ন; বাঘের আঁচড়ের চিহ্ন; যৌনাঙ্গে তিল চিহ্ন; গলার স্বর ও চলনভঙ্গী। ঘটনাটি যোগ কর যে কুমার সার্বিকভাবে অত্যন্ত ব্যতিক্রম দেখতে এবং প্রতিবাদীদের সংজ্ঞায় ঢাকায় বাদীর আগমন একটি দুর্ঘটনা।

যাইহোক, বাদী অবশ্যই নিজে মেজকুমার যতক্ষণ না এটা দেখা যাবে যে সে দার্জিলিঙে মারা গিয়েছিল বা তার মন হচ্ছে পৃথক বা তার হাতের লেখা পৃথক বা সে বাঙালি নয়। এই বিষয়গুলি আলোচনা হতে বাকী আছে।

এটা আশ্চর্যের বিষয় না যে যখন ১৯২১ সালের ৬ই মে সত্যবাবু খবর পেল যে এই সন্ন্যাসী নিজেকে ভাওয়ালের মেজকুমার হিসাবে ঘোষণা করেছে, প্রথম বিষয় যা সে করেছিল, তা হচ্ছে সে মিঃ লেথব্রিজের কাছে বলেছিল ''মৃত্যুর সাক্ষ্য নিরাপদে রাখতে।''

বাদীর মন

ভিড়ে ঠাসা আদালতে বাদী কাঠগড়ায় পা দিয়েছিল। একজন অতি আকর্ষণীয় সাক্ষী বিচারকের অভিজ্ঞতায় কখনো এমন করেনি। বহুদিন থেকে প্রচলিত কুমার মৃত। তার রানী সবকিছুর অধিকারী এবং বাদীকে আপন বলেনি। সে একজন ঠগ বলে ঘোষিত হয়েছিল। তার গল্প দুরভিসন্ধিমূলক ও তার দাবি অযৌক্তিক। তার কথার মধ্যে হিন্দুস্থানী টান ছিল। প্রতিপক্ষের মতানুসারে লোকটিকে বহুবছর ধরে পরিকল্পিত একটি মতলব

হাসিল করতে এসেছে। বিচারক তার সমস্ত কথা শুনেছিল ও তার আচরণের প্রত্যেক বিষয় দেখেছিল কখনো অবসন্ন না হওয়ার মন নিয়ে।

তার প্রধান সাক্ষ্যে সে তার গল্প বলেছিল। সে তার জীবন, পরিবার, কলকাতায় তার উপদংশরোগের চিকিৎসার জন্য গমন, তার দার্জিলিং ভ্রমণ, কী ঘটেছিল সেখানে, কেমন করে সে তার চেতনা হারিয়েছিল, কি করে সে এটা ফিরে পেল এবং নিজেকে দেখল চারজন সন্ন্যাসীদের মধ্যে, স্থান থেকে স্থানান্তরে সে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াল যতদিন না নেপালের ব্রাহ্মছত্রে সে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হল এবং বিভিন্ন স্থান অতিক্রমের পর ঢাকাতে এসে তার জ্ঞাত পদক্ষেপ সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করেছিল, জয়দেবপুরে গমন, পরিচয় ঘোষণা এবং এই মামলার কিছু বিষয়।

তাকে জেরা করেছিল মিঃ এ. এন. চৌধুরী এবং সে কাঠগড়ায় ছিল ৯ দিন যাবত। যখন মিঃ চৌধুরী কুমারের বৈশিষ্ট্য বাদীর প্রতি আরোপ করল, তার জ্ঞান, তার বৈশিষ্ট্য, যে সব বিষয় সে জানত, যে সব কথা সে জানত, সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা, এটা মজার বলে মনে হয়েছিল। এই লোকটি বাদী, সম্পূর্ণভাবে অশিক্ষিত, শুধুমাত্র সে নিজের নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায় সাক্ষর করতে পারত ইংরেজীতে ও বাংলায়। কিন্তু মেজকুমার ছিল "সুশিক্ষিত, সুমার্জিত অভিজাত।" কুমার ইংরাজী জানত। এই বাদী ইংরেজির একটি অক্ষরও জানত না, শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দ ছাড়া যা এই দেশের যে কোন অশিক্ষিত মানুষও শিখতে পারে। কুমার সবধরনের খেলাধুলা, বিলিয়ার্ড, ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, পোলো জানত। এই লোকটি এসব কিছুই জানত না। কুমার ইংরেজী পোশাক পরত, তাদের নাম জানত, ইউরোপীয় খানা খেত, ইংরেজী বাসনপত্রের নাম জানত এবং একটি সুসজ্জিত টেবিল সম্বন্ধে জানত। এই মানুষটি এ সবের কিছুই জানত না। কুমার সঙ্গীত ভালবাসত। এই লোকটি একটি গানও গাইতে পারেনি। কুমার ছবি তুলতে জানত, লেন্স ও ফোকাস সম্বন্ধে জানত। এই লোকটি ক্যামেরা শব্দটি জানত, কিন্তু জানে না কেমন করে ছবি তুলতে হয়। কুমার সাহেবদের সঙ্গে মিশত, কিন্তু এই লোকটি কখনো সাহেবের সঙ্গে মেশেনি, শুধুমাত্র কালেকটর কমিশনার ও গভর্নর ছাড়া এবং তাও শুধু তার বড় ভাইয়ের সাথে যে ইংরেজী জানত। সে বলেছিল যে সে 'দরবারী' লোক নয়, শুধু 'শিকার' ও 'ঘোড়ায়' চড়া জানে, কিন্তু সে বন্দুকের ও গোলাবারুদ সম্পর্কে কোন শব্দ জানে না, বা ঘোড়ার রঙের ইংরাজী নামও জানে না। জেরা প্রধানত ইংরেজি জ্ঞান সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এটা দেখতে হবে কুমার যা জানত সে সম্বন্ধে বাদীর প্রকৃত অজ্ঞতা কতদূর প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিচারক যেভাবে কুমারকে এঁকেছিল যা মিঃ চৌধুরী উপস্থাপিত করেছিল, তাতে সে মনে করেছিল, যদি কোন প্রতারক থেকে থাকে, সে হচ্ছে বাদী, কিন্তু তার সম্বন্ধে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাকে দেখে কৌশলী, অ্যাডভেঞ্চারকারী, ঠাণ্ডামাথার গোছানো ব্যক্তিও এ রকম খেলা খেলতে সক্ষম ব্যক্তি বলে মনে হয় না। তার উপর এটাই মনে করায় যখন সে বলেছিল, cue (বিলিয়ার্ডের লাঠি) শব্দটি বা brace (কোমর বন্ধনী)

শব্দটি সম্বন্ধে জানে না। কিন্তু সে গোলমেলে বা ভীত ছিল না এবং তাকে এমন দেখাচ্ছিল বা এমন আচরণ করেনি যদিও সে ভাণ করছিল এবং চেষ্টা করছিল দোষ করে বেহায়ার মত আচরণ না করতে। বুদ্ধিতে তাকে মনে হয়েছিল গড়পড়তা মানুষের চেয়ে নিশ্চিতভাবে নীচে এবং এটা ব্যাহ্যত এই যুক্তিকে জোরালো করে যে সে ছিল একটি পুতুল।

জেরার স্মরণযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে যে এটা কাউকে স্পর্শ করেনি, ঘটনাগতভাবে ছাড়া এবং সাধারণত কুমারের স্মৃতির যথাযথ কিছুই নয়, শুধু কয়েকটি বিষয় ছাড়া, উপদংশ, যে শিক্ষকরা তাকে পড়িয়েছিল এবং তাদের সাফল্য, দার্জিলিঙে উৎপন্ন কয়েকটি প্রশ্ন এবং বড়দালানের ঘরের সম্বন্ধে সাক্ষ্যের একটি প্রশ্ন, ম্যানেজারের বাড়ি ইত্যাদি। একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল ম্যানেজারের বাড়ি ও বড়দালানের একটি ঘরের মধ্যে যাকে অতিথিশালা বলা হত। এখন মিঃ চৌধুরী সাক্ষীদের কাছ থেকে এটা খুঁজে বের করার কষ্ট গ্রহণ করেছিল যাদের মতে কুমার অশিক্ষিত ছিল, শুধু সে নাম সাক্ষর করতে পারত এবং সে অন্য সকলের মত দেখতে পেয়েছিল যে এই মামলায় এটা সৃষ্টি হচ্ছিল যে কুমার অশিক্ষিত ছিল। যদি কুমার সুশিক্ষিত হত তাহলে তার অর্থ বাদীর পরাজয়, এবং পরে বাদী প্রধান জেরায় যে সে অশিক্ষিত, শুধু নাম সাক্ষর করা ছাড়া। যাইহোক, এটা প্রকাশিত হয়েছিল যে কুমার বাদীর মত অশিক্ষিত ছিল যখন সে দার্জিলিং গিয়েছিল এবং বিরুদ্ধ জেরা তার মাথার উপর উদ্যত ছিল, এটা বলতে হয় যতদূর এটা সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধেও খেলাধুলা সম্বন্ধে গিয়েছিল ততদুর মেজকুমার জানত না। কৌঁসুলী বলেছিল যে লোকটির অপরাধ করার যথেষ্ট সময় ছিল এবং সে ফাঁদে পড়তে যাচ্ছিল না।

জেরা ছিল এই ধরনের :

আপনি কি অ্যাথলেটিকস্, স্পোর্টস, ক্রিকেটের পোশাক, বেল, স্ট্যাম্পস্, উইকেট, এল.বি.ডাবলু, আম্পায়ার সম্বন্ধে জানেন?

ডিউস্, ১৫-৩০-৪০ সম্বন্ধে?

বিলিয়ার্ডের লাঠি, গোলকীপার, হ্যাফ-ব্যাক, ফুল-ব্যাক, সেন্টার ফরোয়ার্ড?

পোলোর পোশাক, পোলোতে ফাউল করা, ক্রস, নিকট পার্শ্ব- ব্যাক হ্যান্ড, অফ্ সাইড- ব্যাক হ্যান্ড, চুকের সম্বন্ধে ?

পোশাক সম্বন্ধে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল — মিলিটারী কলার, কলার, স্যুট, কোমরবন্ধনী, রুমাল, ফিতে, ভেস্ট, মোজা, টাই, লাউঞ্জ, স্যুট, সান্ধ্যপোশাক, বেস্টার ফিলড কোট, চওড়া পোশাক, ডাবল্ ব্রেস্টেড কোট, সিঙ্গেল ব্রেস্টেট কোট সম্বন্ধে সে জানে কিনা। বাদী এসব বিষয়গুলি জানত না যদিও সে স্যুট পোশাক অর্থে স্যুট কথাটি ব্যবহার করছিল এবং এর মাঝখানে কৌঁসুলী 'চূর্ণখাদ্য' শব্দটি বলেছিল, বাদী বলেছিল এটা ঘোড়াকে খেতে দেওয়া হয়। তারপর নামের পরিবর্তে তাকে কিছু জিনিস দেখানো হয় যা সে জানত এবং এগুলির জন্য তার নিজস্ব শব্দ ব্যবহার করত। কলারের জন্য এটি

দেখানোর পর, সে 'কলা' শব্দটি ব্যবহার করেছে 'ক'-এর উপর জোর দিয়ে এবং টাইয়ের জন্য 'নেকটাই' শব্দটি ব্যবহার করেছে এবং ভেস্ট এর পরিবর্তে কোট।

একই রকমভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে ডাইনিং রুম, সাইড বোর্ড, ক্যাম্পবোর্ড, চামচ, কাঁটা চামচ, ছুরি, নুনদানী, গোলমরিচ দানী, খাদ্য তালিকা, বড় বাসনপাত্র, মদের গ্লাস, টেবিলচামচ, ন্যাপকিন, মাছকাটার ছুরি, সম্বন্ধে জানে কিনা, শব্দগুলি বলা হয়েছিল, জিনিসগুলি দেখানো হয়নি।

ক্যামেরা সম্বন্ধে জানেন? হ্যাঁ, ফোকাস? লেন্স? এক্সপোজার? না। স্টুডিয়ো কথাটি ব্যবহার করত স্টুডি হিসাবে।

রাজবাড়িতে কি গোলাপ ফুলের বাগান ছিল? হ্যাঁ।

অর্কিড সম্বন্ধে জানেন? না।

একটি গেলাপ একটি মরসুমী ফুল? না।

গাড়ির বিষয়ে, সে কী char-এ-bane সম্বন্ধে জানে? না।

আমেরিকান গরুরগাড়ি ?

"এটা একটি মোটরের নাম।" বাদী বলেছিল।

কাদের তৈরি?

"এর সম্বন্ধে শুনেছি। কখনো দেখিনি।"

আমেরিকান গরুর গাড়ি কি টমটমেরই একটি নমুনা?

"হতে পারে। হ্যাঁ, এটা চারচাকার টমটম। এর নাম আমার মনে পড়ে।"

মিঃ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ অন্য বিষয়ে ঘুরে গেল। এটা একটা ফাঁদের মত দেখাচ্ছিল। শিকার ও ঘোড়ার বিষয়ে শব্দের জ্ঞান বিপজ্জনক ছিল।

এই দুই বিষয়ে এটা দেখা প্রয়োজন হবে মিঃ চৌধুরী কতদূর ঐ শব্দগুলির বাইরে গেছিল। যেমন কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় আছে যা আপনি শব্দ জানা ছাড়া জানতে পারেন না। যেমন — টেনিস, বিলিয়ার্ড বা ক্রিকেট বা ফুটবল, যদিও শেষের দুটি সম্বন্ধে আঞ্চলিক শব্দ আছে। যেমন, দূরদৃষ্টির জন্য 'মাছি', ব্যাবেলের জন্য 'কুণতা' ও 'কর্টিজ' এর জন্য কার্তুজ ব্যবহার করা হয়। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি শিকার সম্বন্ধে শব্দগুলি না জেনেও ভাল শিকার হতে পারে বা ভাল ঘোড়সওয়ার হতে পারে। যেমন, বাদীকে শিকারের সাথে সম্পর্কিত কতগুলি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল — টার্গেট, ছাতার পক্ষী, বিড়াল চোখ, বুলস্ আই, অভ্যন্তর, বাহির। ফিতাকৃতি ধূমহীন বিস্ফোরক, চক বোর, ওয়াইল্ড বোর, দোনলা বন্দুক, মাজল লোডার, স্পুথ বোর, দূরদৃষ্টি, বল কার্তুজ, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ, বড় শিকার, দম দম বুলেট, লেথাল বুলেট, সফট নোজ বুলেট, ধূমহীন বুলেট, বারুদ, হ্যামারলেস বন্দুক, ইত্যাদি। বাদী এসব শব্দ জানত না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'যদি আপনি মেজকুমার হন, তাহলে শিকারী হিসাবে এই ইংরেজি শব্দগুলি জানেন।' এই বিষয়ে এটা জানতে পরে ফিরে আসা যাবে যে অনুসন্ধান কতখানি শব্দের

ওপরে গিয়েছিল।

ঘোড়ার বিষয়ে তাকে একইরকম ইংরেজি শব্দ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "Hands, snaffle, curb, reading rein, chestant, bay, grey, roan, dunn, Piebald, skew bald, dapple, grey.

তাকে কিছু বাঙলা শব্দও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং এটা প্রকাশিত হয়েছিল যে এদের মধ্যে একটি শব্দ 'নমদা' ভাওয়ালে ব্যবহৃত হয় না। অন্য তিনটি হল 'কাজাই', 'দাহানা', ও 'দোল দেবা'। শেষের আরো কিছু শব্দ সে বলেছিল। শেষে মিঃ চৌধুরী এমন কিছু শব্দ বলেছিল H.E., H.H., I.C.S., 'আপনি কেমন আছেন?' 'খুব ভালো,' 'ধন্যবাদ'।

বাদী এগুলির অর্থ জানত না, শুধুমাত্র I.C.S. ছাড়া, সে বলেছিল কালেক্টর, কমিশনার ও এই ধরনের ব্যক্তিকে এটি পাশ করতে হয়, এবং ধন্যবাদ প্রসঙ্গে সে বলেছিল এটা 'আশীর্বাদ'।

এই ইংরেজি শব্দগুলির ভেতরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং খুঁজতে চেষ্টা করা কোন শব্দ কুমার জানত এবং কোনটি জানত না। দেখা যাচ্ছে যদি কুমার শিক্ষিত হত এবং ইংরেজি জানত, এটা বাদীর অন্ত হবে। অন্যদিকে যদি সে ইংরেজি না জানত, যদি সে অশিক্ষিত হত, এর অর্থ হবে জেরার শেষ, যতক্ষণ না এটা প্রদর্শিত হয় যে সে সম্ভবত ঐ শব্দগুলি তার স্বভাবিক বৃত্তি থেকে চয়ন করেছিল।

এখন এটা প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য ও বিষয় থেকে উদ্ভূত হবে যেটা তারা অনুমোদন করেছে যে কুমার ছিল পুরোপুরি অশিক্ষিত, শুধু তার নাম স্বাক্ষর করা ছাড়া ইংরেজি ও বাঙলাতে; এখন তাদের কুমারকে আদালতের সামনে পেশ করে এটা দেখানো প্রয়োজন ছিল যে সে ইংরেজী জানত, যে ইংরেজি পোশাক পরত এবং তাদের ইংরেজী নাম জানত এবং ইংরেজি কেতায় খাবার খেত এবং টেনিস থেকে পোলো সব ধরনের খেলাধুলা জানত; সর্বোপরি এটা দেখানো প্রয়োজন ছিল — যে বাহ্যত যেন মনে হয় সে শব্দগুলি জানত। এখন এটা অনুমোদিত হতে যাচ্ছিল যে কুমার ফুটবল বা ক্রিকেটের কিছুই জানত না— কখনো ও গুলি খেলেনি, শুধু বালক হিসাবে সে একটি বলে লাথি মেরেছিল এবং বালক হিসাবে সে ব্যাট দিয়ে বলে আঘাত করেছিল যেটা ছেলেমেয়েরা সবখানে করে, L.B.W. জানা ছাড়াও। যাইহোক টেনিস, পোলো, বিলিয়ার্ড সম্বন্ধে সাক্ষ্য সীমিত ছিল এবং বন্দুক ও গোলাবারুদ ও ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে তার জ্ঞান সীমিত ছিল।

ফণিবাবু তার নিজের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছে, যখন সে হাইস্কুলে থার্ড ক্লাসে ছিল তখন তার পড়াশুনা শেষ হয়, সে দেখেছিল মেজকুমার ইংরেজিতে তার মতো ভাল ছিল, ইংরেজী কথাবার্তা চালাতে পারত এবং ছোটকুমারও এমন পারত, যদিও সামান্য অল্প। সে আরো বলেছিল কুমারের শিক্ষা ১৯০০ সালে সমাপ্ত হয়েছিল। বড়কুমারের বিবাহের বছরে, এবং তারপর রাজার মৃত্যু হল এবং তারপর আদৌ কোন শিক্ষা হয়নি। কিন্তু কেউ

কেউ অবশ্যই এসে প্রতিজ্ঞা করত যে কুমার এই ধরনের বিষয় জানত। যাইহোক, ফণিবাবু এটা বলেছে যে মেজকুমার খেলাধুলা করত এবং সব রকমের এবং সে এই সব খেলাধুলায় কুমারের সঙ্গী ছিল। এবার, এটা জ্ঞানগোচর হয়েছিল যে এক ধরনের work book তার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে সে এটা মুখস্থ করতে পারে। এই বইটি Ex. 468। এটা ১৯৩২ সালের একটা ছাপা ডায়েরী, এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। সে স্বীকার করেছে যে এর ভেতরে তথ্য তারই হাতের লেখা, শুধুমাত্র ৭ই ও ১৩ই মার্চের লেখা ছাড়া এবং ২১, ২৩, ২৪, ২৫শে ডিসেম্বর ছাড়া। এটা স্বীকার করা হয়েছিল যে এগুলি প্রতিবাদীপক্ষের একজন উকীলের হাতের লেখা। এই মজার বইয়ে বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়বস্তুর জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই সব শিরোনামে।

বিলিয়ার্ড — টেবিলের একটা স্কেচ, শব্দ ও খেলোয়াড়ের নামসহ।

পোলো — মাঠের একটা স্কেচ, শব্দ ও খেলোয়াড়ের নাম সহ।

টেনিস — কোর্টের একটা স্কেচ, শব্দ ও খেলোয়াড়ের নাম সহ।

ফুটবল — মাঠের পরিমাপ ও শব্দগুলি।

এবং যেহেতু কুমার এক সুশিক্ষিত মানুষ, মার্জিত অভিজাত হতে যাচ্ছিল, সেহেতু তার ইংরেজি পোশাকের একটি ভাল ওয়াড্রোব ছিল, সেখানে সেন্টের একটি তালিকা পাওয়া গেছে; ottode rose, white rose, এবং এরকম আরো; সাবান-পিয়ার্স থেকে কার্বলিক; ইংরেজি পোশাক— চেস্টারফিল্ড, সোয়েটার, সান্ধ্য পোশাক, ফ্রক কোট, লন স্যুট, দরবার পোশাক, নিকার ব্যাকার, সওয়ারী পোশাক, যোধপুর ব্রীজ, ব্রীচেস, হাফ-প্যান্ট, গেঞ্জি-পায়জামা, গাঢ়-হালকা, পৃথক রঙের; ফেল্ট হ্যাট্, সোলার টুপি, খড়ের টুপি। জুতোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জুতো ছিল; ইংরেজি খানার একটি তালিকা পাওয়া যায়— যেমন, স্যুপ, রোস্ট হ্যাম, স্টু কাটলেট, জগ, ব্রন, আইরিশ, পিজিয়ন, গ্রিল, চপ, ফাউল ও অন্যান্য কারি, এবং এরকম অনেক। যেহেতু সেখানে একটি খাবার ঘর ছিল, 'মেনু' শব্দটিও ছিল, যদিও উচ্চারণ হতো 'মিনু' এবং দরিদ্র খানসামারা যাদের নামগুলি, মামলার শুনানির পর বিচারকের কাছে পরিচিত হয়েছিল, টেবিল বয় হিসাবে যাদের নাম রাখা হয়েছে এবং ইংরেজিখানা ছাড়াও, ডিনার ওয়াগন, কাপবোর্ড ও সাইডবোর্ড শব্দগুলি উদ্ধৃত হয়েছে। তাদের খেলার তালিকা পাওয়া গেছে। যেহেতু মেজকুমার সঙ্গীতানুরাগী ছিল, সেখানে মেজকুমারের গানের তালিকা পাওয়া গেছে। যেহেতু সে ফটোগ্রাফী জানত, বিভিন্ন ক্যামেরা ও কেমিক্যাল সম্বন্ধে তালিকা দেখা গেছে। সবচেয়ে উৎসাহজনক তালিকা হচ্ছে 'ঘোড়ার' বিষয়। কেউ ঘোড়ার সম্বন্ধে যা জানা প্রয়োজন সবই সেখানে দেখতে পারে, তাদের রঙের জন্য ইংরেজী নাম এবং যেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, ইংরেজি নাম বা বাংলা নামের জন্য একগুচ্ছ আঞ্চলিক শব্দ পেশ করা হয়েছে। যেমন, নামদার আঞ্চলিক শব্দ 'মাসাকেতা'। এর বিপরীতে ফণিবাবু একটি ইংরেজী সমরূপ শব্দ হিসাবে 'নামদা' দাখিল করেছে এবং হলফ করে বলতে এসেছিল যে এই শব্দটি যেটা বাদী জানত না ৯৯ভাগ

পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের সহিসদের কাছে। বাদী তিতির পাখীর জন্য তিতার ব্যবহার করেছে এবং এটা হিন্দী শব্দ ছিল, পশ্চিমবঙ্গে বলা হয় তিতির। জ্যোতির্ময়ীদেবী 'তিতার' শব্দটি ব্যবহার করত। ফণিবাবু হলফ করে বলেছিল যে আঞ্চলিক শব্দটি হল 'তিতির' এবং এটি হিন্দী শব্দ। ভাওয়ালের কিছু চাষী সাক্ষী 'তিতার' রূপটি ব্যবহার করত, ঠিক যেমন বাদী করত এবং বিষয়টি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

এটা দৃষ্টিগোচর করার খুব একটা বেশি প্রয়োজন নেই যে বইটিতে প্রতিবাদী পক্ষের একজন উকীলের দ্বারা একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়েছিল বাদীকে পরীক্ষা করার পর। উকীল সেখানে তার নিজের বিষয় রেখেছিল। কিন্তু এই বই থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফণিবাবু ১৯০৯ সালের পর ২৬ বছর বেঁচে ছিল, সিটিঙে যাচ্ছিল, ফ্রিমাসন্ লজের সদস্য ছিল এবং নৈশাহার দেখেছিল। সে 'মেনু' শব্দটি জানতে পারে এবং যেহেতু সে পান করত সে 'মদের গ্লাস' কথাটি জানত। সে নিজে জমিদার ছিল, অবশ্যই 'শিকার' করেছিল এবং গ্রামে যাকে বলে বিলাসের জীবনযাপন করত এবং যদিও অর্ধশিক্ষিত, সে অশিক্ষিত ছিল না, এবং তার নিজের তথ্য যেটা বিচারক বিশ্বাস করত মিথ্যা — যে সে এম.এ. পর্যন্ত পড়েছিল বাড়িতে এবং এন্ট্রান্স পর্যন্ত স্কুলে পড়েছিল যেটা সত্য হতে পারে। এমনকি তাকে মিঃ চৌধুরীর কুমারের স্তরে আসতে অনেক কিছু শিখতে হয়েছিল। ঐ কুমার বাস্তব নয়, কাল্পনিক। অশিক্ষিত ফণিবাবু ফ্রক কোটকে বলেছে 'ফ্রগ্ কোর্ট'। বাদীর শব্দ হচ্ছে 'ফোলাট কোট'। এই সব শব্দের ক্ষেত্রে অশিক্ষিত ফণিবাবু একেবারে বাদীর মত।

কৌসুঁলী বিচারককে অনবরত মনে করতে বলেছিল যে মেজকুমার ছিল একজন রাজার পুত্র এবং শিক্ষা বা অশিক্ষার নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা ছিল। ইংরেজি জ্ঞান ভাগ্যের দান নয়, যতক্ষণ ক্রিকেট খেলা যায় এর সম্বন্ধে উৎসাহ থাকে ততক্ষণ L.B.W. সম্বন্ধে জানা যায় না। 'রাজার পুত্র' কথাটি কিছু উদ্দেশ্য সাধন করেছিল। সে কী রাজার পুত্রের মত দেখতে নয়? সে কী রাজার পুত্রের মানসিকতা বহন করত না? তার গোঁফ কী রাজার পুত্রের মত নয়? একজন চাষী এই নাকের সম্বন্ধে বলেছিল যে রাজার ছেলের মত নাক। আদালত একটি প্রবচনের দ্বারা ভুল পথে চালিত হবে না।

বিচারক বিবেচনা করে যে জেরা ছিল একেবারে ঠিক তাই যাতে মনে হবে সত্য কুমারকে পরাজিত করতে। এটা স্মৃতিকে উপেক্ষা করেছে। বাদী জয়দেবপুরে ৩৭ দিনের জন্য ছিল, তার সাক্ষ্য শুরু হবার ১২ বছর পূর্বে। তার পরিবার ছিল ছোট, সম্পত্তি ছিল বিশাল এবং অসংখ্য অফিসার ছিল। বাদী জয়দেবপুরে রাজবাড়ীতে কখনো ছিল না, ঢাকার বাড়িতেও নয়। তার সপক্ষে ১৯২১ সালের ৪ঠা মের পর কিছুদিনের মধ্যে অনুসন্ধানের জন্য দাবী ওঠে। সে নিজে মিঃ লিন্ডসের কাছে প্রার্থনা করে, কালেক্টর, এক অনুসন্ধানের জন্য যা মিঃ লিন্ডসে নথিবদ্ধ করেছে। ১৯২২ সালে সত্যভামা দেবী এক অনুসন্ধানের জন্য বলে। ১৯২৩ সালে জ্যোতির্ময়ীদেবী মিঃ কে. সি দের কাছে অনুসন্ধানের জন্য বলে। ১৯২৭ সালে এটা প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। ঐ বছরে আদালত

চালু হয়। অন্যদিকে মিঃ লিন্ডসে ও মিঃ কে. সি. দের দ্বারা মিথ্যা আশা জাগ্রত হয় তাদের বিবৃতি অনুসারে। তখন নীতি ছিল যে সে অবশ্যই মুখোমুখি হবে না বা অভিযুক্ত হবে না। পুরনো নীতি ছিল তাকে 'কোন প্রশ্ন না করা তাকে একা ছেড়ে দেওয়া। এবং এটা এমন ঘটেছে যে বাদী অ আ ক খ শেখেনি, যদিও সে এসেছে শিক্ষিত লোকের ভান করতে। মেজকুমারের সম্পূর্ণ স্মৃতি সে কী মনে রাখতে পেরেছে? জয়দেবপুরের মানচিত্র, ঘরের বিন্যাস ব্যবস্থা, যে জঙ্গলে সে শিকার করেছিল, মফস্বলের ৪৪টি 'ডিহী কাবারি', সদরের অফিস, প্রতিবেশীদের বাড়ির অভ্যন্তর, লালগোলার বাড়ির অভ্যন্তর, ঢাকার যে বাড়ি সে জানত, কাশিমপুর বাবুদের বাড়ি, উত্তরপাড়ায় রানীর নিজস্ব লোকেদের বাড়ি, ভাইরা, দার্জিলিঙের 'স্টেপ্ অ্যাসাইড' য়ের সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ এবং অতীতের অনেক বিষয়, সব কি যথাযথ হতে পেরেছিল? আদালতে যে সব লোককে আনা হয়েছিল বা ছবি দেখানো হয়েছিল, তাদের যথাযথভাবে চিনতে কি সক্ষম হয়েছিল? উকীলের দক্ষতায় হাজারো লোকের স্মৃতি, স্ত্রীর স্মৃতি কি সঠিক স্থানে পৌছতে পেরেছিল এবং মেজকুমারের পূর্ণ স্মৃতি কি সম্পূর্ণভাবে এই অভিযুক্ত পাঞ্জাবী চাষীর মধ্যে রাখা গিয়েছিল? মিঃ চৌধুরী কি বাদীকে একটি বন্দুক দিয়েছিল এবং আদালতে চালাতে বলেছিল? মিঃ চৌধুরী স্মৃতিকে স্পর্শ করবে না, শুধুমাত্র সম্পূর্ণ ঘটনাগত ও কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া, যেমন --- উপদংশ, বড়দালান, এবং দার্জিলিং। সে সত্যের মধ্যে পতনের জন্য ভীত ছিল।

যা পূর্বে পর্যবেক্ষিত হয়েছে। যদি কুমার শিক্ষিত হত, তাহলে বাদী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু কুমার, বিচারক দেখাতে যাচ্ছে, অশিক্ষিত ছিল, শুধু নাম স্বাক্ষর করা ছাড়া। কিছু কিছু স্মৃতিভিত্তিক প্রশ্ন কোন প্রকৃত অজ্ঞতা প্রদর্শন করে না, শুধু সে তার স্ত্রীর বোনের, প্রভাবতীর, স্বামীর নাম সঠিক বলতে পারেনি, ১৯০৬ সালে কলকাতার এক ব্যক্তির সাথে যার বিবাহ হয়েছিল এটা ছাড়া। মেজকুমার কখনো তার সাথে সাক্ষাৎ করেনি এবং যদি সে তার নাম বলতে পারত, তাহলে আশ্চর্য হওয়া উচিত ছিল। স্মৃতি ছাড়া, যে বিষয়ে বাদী অন্য কোন ভুল করেনি, সাধারণ বিষয়ে সে কী কোন প্রকৃত অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিল, যেমন মেজকুমার প্রদর্শন করতো না? এটি একটি ছোট বিবেচনার বিষয় হবে।

এটা মেনে নেওয়া হচ্ছে যে মেজকুমার অশিক্ষিত ছিল শুধু ১৯০৯ সালে তার স্বাক্ষর করার সক্ষমতা এবং সে ইংরেজি জানত না ছাড়া। এই বিষয়টি তার শিক্ষার বিস্তৃতি, পরে আলোচনা করা হবে। যদি কোন অর্থে মেজকুমার শিক্ষিত হত, তাহলে বাদী এই মানুষটি নয় এবং কোন বিষয়ের অজ্ঞতার সূক্ষ্ম পরীক্ষার আদৌ দরকার হবে না। ইংরেজি পোশাক, ইংরেজি প্রথায় নৈশাহার, হোটেলে লাঞ্চের অর্ডার দেওয়া এবং সেগুলি খাওয়া, ইংরেজদের সাথে বসে খাবার খাওয়া, সান্ধ্য পোশাকে নৈশাহার, ক্রিকেট থেকে পোলো পর্যন্ত সবরকমের খেলাধুলা জানা, ইংরেজি আসবাবপত্রের সাথে পরিচিতি এবং তাদের কাজ জানা, সঙ্গীতানুরাগ, একজন ঘোড় সওয়ার হওয়া ছাড়াও একজন ঘোড়দৌড়কারী এবং দ্রুত চালক এবং একজন শিকারী যে বাঘ শিকার করেছিল ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে

মেজকুমার কি একরকমের সাহেব ছিল?

সে ছিল একজন ঘোড়সওয়ার এবং একজন ভাল শিকারী, সে ঢাকা ঘোড়দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছিল এটা স্বীকৃত; সে কিছুদিন মণিপুরী জকিদের সাথে পোলোও অনুশীলন করেছিল যেটা বাদী নিজে প্রধান সাক্ষ্যে বলেছিল।

বিচারের সময় এটা বিচারকের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে জেরায় বাদী তথা কুমারের উপস্থিতি প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষীদের উপর একটা বিরাট যন্ত্রণার ছাপ ফেলেছিল। বাদীপক্ষের সাক্ষ্যের চাপে সুর নীচু হতে আরম্ভ করেছিল যখন সম্মানিত ব্যক্তিরা বর্ণনা করতে শুরু করেছিল যে মেজকুমার কী ধরনের যুবক ছিল, তার শিক্ষা এবং তার জীবনধারা। প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য শুরু হবার পূর্বে টুপি ও ইংরেজি পোশাক সম্বন্ধে অসংখ্য মতামত দেওয়া হয়েছিল। এমনকি সাগরবাবু যখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় ছিল, প্রতিবাদীদের কাছে উত্থাপিত হয়েছিল যে যদি মেজকুমার ইংরেজি প্রথায় আহার করত, তবে তার কোথাও বসার স্থান থাকবে নিশ্চয়। তখনো পর্যন্ত একমাত্র স্থান সম্বন্ধে মতামত দেওয়া হয়েছিল, তা হচ্ছে বড়দালান, ম্যানেজারের বাড়ি, এবং বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে সান্ধ্যপোশাকে আহার গ্রহণ করত কি না এবং মতামত দেওয়া হয়েছিল যে সে লর্ড কিচেনারের জয়দেবপুর ভ্রমণকালে তার সাথে আহার করেছিল। তারপর ইংরেজ পরিদর্শকদের নাম করা হয়েছে কালেকটার ও কমিশনার এবং মিঃ মেয়ের ১৯০২ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত যে সেখানে ছিল, কিন্তু বলেনি যে মেজকুমার তার সাথে কখনো আহার করেছে বা কোথাও ইংরেজি প্রথায় আহার করেছে। তাকে বিচারের পূর্বে কমিশনের সামনে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এবং এই বিশেষ কুমার জেরায় উঠে আসছিল। মিঃ র‍্যামকিন এই কুমারের ছায়ার আবির্ভাবের পরে সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করতে উদ্যোগ নেয়নি যে সে কুমারের সাথে আহার করেছে কিনা কখনো; লর্ড কিচেনার অবশ্যই ছিল। সাক্ষী ও সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছে এটা প্রদর্শন করতে যে কুমারেরা তার ও তার মিলিটারী কর্মীদের সাথে জয়দেবপুর পরিভ্রমণ কালে বড়দালানে আহার করেছে এবং শিকারে বের হয়ে অন্য খাবারও খেয়েছে। বাদীপক্ষের তথ্য হচ্ছে লর্ড কিচেনার ব্যক্তিগত পরিভ্রমণে এসেছিল, রাজকুমার তাকে স্টেশনে স্বাগত জানিয়েছিল এবং রৌপ্যখচিত গাড়িতে করে রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল এবং বড়দালানের বারান্দায় মেজকুমার ও ছোটকুমার দাঁড়িয়েছিল এবং সেলাম জানিয়েছিল তাকে। কিচেনার ও তার মিলিটারী অফিসাররা সেই রাতে বড়দালানে আহার করেছিল এবং পরদিন ভোরে তারা জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করেছিল, কোদ্দা নদী পার হবার পর। কিন্তু জঙ্গলে কিচেনারের আর্দালী মারফত কী আলোচনা হয়েছিল হিন্দীতে মেজকুমারের ব্যাপারে যে দলের সাথে গিয়েছিল এবং যে শব্দগুলি হিন্দীতে বলা হয়েছিল সেগুলি ছিল সংক্ষিপ্ততম বর্ণনা।

এই তথ্য অনেক সাক্ষীর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এটা সত্য বলে বিশ্বাস করে বিচারক (বাঃ সাঃ ৩৯ দীলবর, ৬৩৬ আবদুল জমাদার, ৯৫২ মনমোহন, ৯০৭ রসিক

রায়; ৪৯২, ৯৭৩, ৯৩৮, ৮.৯ এবং ৫৭ আশুবাবু, স্টেশনমাস্টার)। এদের মধ্যে অফিসাররা ছিল যারা শিকারের আয়োজন করেছিল, মাহুত যারা গিয়েছিল, রেলকর্মীরা যারা তার স্পেশাল ট্রেনের কর্মী ছিল।

আহার বিষয়ে প্রমাণ করতে, প্রতিবাদীপক্ষ প্রতি সাঃ ৪৩ অ্যালেক ডি কোস্টাকে ডেকেছিল, একজন বাবুর্চি, এবং আমানুল্লা, প্রঃ সাঃ ৬১, একজন মাহুত ও রায়সাহেব অবশ্যই। ডি কোস্টা বলেছে যে তিনজন কুমার জঙ্গলে গিয়েছিল, বড়কুমার কিচেনারের সাথে একই হাতিতে ছিল, সকলে কাশিমপুর বাবুদের বাড়ির তাঁবুতে আহারে একত্র হয়েছিল। আমানুল্লা বলেছে যে তাঁবুগুলি ছিল কোদ্দার অপরতীরে, কাশিমপুর বাবুদের বাড়ি থেকে ২ মাইল, এবং বড় ও ছোট কুমার বাইরে যায়নি আদৌ এবং রায়সাহেব তিনজন কুমারের কথা বলেছে যে তারা কিচেনার, বার্ডউড্ ও ফিটজারেল্ড এর সঙ্গে নৈশাহারে বসেছিল। বিচারক বিশ্বাস করেনি এই সাক্ষের একটি কথাও যে কুমারেরা কিচেনার ও ম্যানেজার, একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বসে আহার করেছিল।

এটা নিশ্চয় প্রতিবাদীপক্ষ বুঝতে পেরেছিল, যদিও দেরীতে, যে বড়দালানে নৈশাহারের কথা কেউ সমর্থন করতে যাচ্ছে না, সুতরাং তারা একটি খাবার ঘরের কথা চিন্তা করতে শুরু করল এবং যেমন প্রত্যেক কুমারের একজন বাবুর্চি ছিল, এটাও অসত্যের একটা সুকাঠামোর ভিত্তি হতে যাচ্ছিল। ৯৭৭ নং সাক্ষী সাগরবাবুর বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল যে মেজকুমারের বৈঠকখানার পশ্চিমে একটি ঘরের পরে মেজকুমারের খাবারঘর ছিল। ম্যাপে এটি ছিল ১২১ নং ঘর। বৈঠকখানা হচ্ছে ১১৫ নং ঘর। এই ১২১ নং ঘর সম্বন্ধে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল :

প্রঃ— এটা কি মেজকুমারের খাবার ঘর? সেখানে কি টেবিল, চেয়ার সাইড বোর্ড ছিল?

সাক্ষী দুটিরই 'না' বাচক উত্তর দিয়েছিল।

এখন বাদীর সাক্ষী ও ভাগ্নে ও খানসামা যাদের কাজ ছিল খাবার পরিবেশন করা, কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য হচ্ছে যে-কুমার বারান্দায় আহার করত। বৈঠকখানা ও শোবার ঘরের উত্তরে ছিল ঘরটি। সে মেঝেয় বসে ভারতীয়দের মত খাবার খেত এবং তার খাদ্য ছিল ভাত এবং সাধারণ তরকারী এবং এগুলি আসত মন্দির থেকে, ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাঁধা, কিন্তু খানসামা ও বাবুর্চিরাও রান্না করত, এবং এগুলি সে তার 'মোসাহেব'দের সাথে সাধারণভাবে গ্রহণ করত। বাবুর্চিদের দ্বারা রাঁধা জিনিসগুলি ছিল কাটলেট বা চপ যেগুলি আজকের মতো পূর্বেও বাঙালি শব্দ হিসাবে ধরা হত।

এই তথ্য বাকী আছে — এই বসা ও আঙ্গুলের সাহায্যে খাওয়া। কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষীরা যোগ করেছে খাবার ঘরটি ছিল আহার গ্রহণের অনুষ্ঠানমূলক স্থান। এটি মেজরানীর সঙ্গে শুরু হয়েছিল। যার কুমারের খাবারের ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না, যেটা বিচারক পূর্বে তার বর্ণনায় বলেছে। তারপর অনেক সাক্ষী আসে এবং খাবার ঘরের

সম্বন্ধে বলে, যাতে বাদীর জেরা দাঁড়াতে পারে। বলা হয়েছে, মেজকুমার মাঝে মাঝে টেবিলে কাঁটাচামচ ব্যবহার করত। ছোটকুমারের খানসামা রুক্মিণীর সাক্ষ্যের পর, এই শেষোক্ত ব্যাপারটি তার সাধারণ অভ্যাস হিসাবে তৈরি করা সম্ভব ছিল না। দেখা যাচ্ছে সে বলেছিল সে প্রায় সবসময়ই বারান্দার মেঝেও এই ঘরে বসত।

আমরা সাগরবাবুর বক্তব্য অনুসারে এই ঘরের আসবাবপত্র দেখেছিলাম — একটি টেবিল, কয়েকটি চেয়ার ও একটি 'সাইড বোর্ড' — এটি বাদীর শব্দ। বিচার যতই এগিয়েছে, ঘরটি ততই পূর্ণ হতে শুরু করেছে। ফণিবাবু বলেছে ঘরটি 'খাবারের মালগাড়ি'। পুরাতন পাখা-টানিয়ে বলতে ভুল করে ফেলেছিল যে সে শুধু বৈঠকখানায় ও শোবার ঘরে পাখা টানত, সেজন্য রায়সাহেব যখন এল, এই ঘরে একটি পাখার অবতারণা করল। যাইহোক নৈশাহার সম্বন্ধে গোলমাল ছিল। এই তালিকাটি ফণিবাবুর বইয়ে ছিল এবং এরা হয় তথাকথিত 'কেরানীকুল', যারা এস্টেটের ছোটখাট পদ পূরণ করতে এসেছিল এবং এদের মধ্যে কেউ এস্টেটের দ্বারা বেতন পেত না, একজন ছাড়া। বাদীপক্ষের সাক্ষীরা বলেছিল মেজকুমারের এই ঘরটি ছিল তার 'মালগুদাম' অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন রকমের জিনিস থাকত। এই ঘর ও বৈঠকখানার মাঝে একটি ঘরে তার চাকর, মোসাহেব ঘুমাত। এই চাকরবাকরদের ঘরটিকে মেজরানী বলেছে তার 'সাজঘর' যাতে অন্য ঘরটি 'খাবারঘর' হতে পারে এবং সত্যবাবু তার এই উক্তি সমর্থন করে বলে মাঝের ঘরটি 'মালগুদাম'। কিন্তু পুরনো খানসামা, রুক্মিণী, এবং পুরনো পাখাওয়ালা (প্রঃ সাঃ ৪১) বলেছে এই ঘরে চাকরবাকরেরা ঘুমাত যাতে এই পাখাহীন খাবার ঘরে টেবিল পেতে নানা জিনিসপত্র রেখে প্রকৃত মালগুদাম হয়ে ওঠে। পুরো সাক্ষ্যটি বিস্ময়কর ও মিথ্যা। কুমারেরা ছিল চিরাচরিত বাঙালি, কোন রকমের ইংরেজি ভাবধারাহীন। তারা অবশ্য কাঁটাচামচ দেখে থাকবে, কিন্তু এর জন্য তাদের নিজস্ব শব্দ ছিল। যেমন রুক্মিণী এগুলিকে বলেছে 'কাটাচামিজ-চাকু', এমনকি নিশ্চিতভাবে শেখানোর ফলেও।

কয়েকটি কথায় পোশাককে স্থাপিত করা যেতে পারত। এটা স্বীকৃত হয়ে এসেছে যে মেজকুমারের সাধারণ পোশাক ছিল 'ধুতি', দুভাজ করে পরত বা লুঙ্গি ও কুর্তা ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক হিসাবে (প্রঃ সাঃ ফণিবাবু -৯২, সত্যবাবু-৩৮০, ২৯০, ৪৩)।

মেজরানী লুঙ্গির কথা স্বীকার করেনি, এটা ছিল নাক্কারজনক। কিন্তু ফণিবাবু অনুমোদন করেছে। এবং একজন দর্জির বিল রায়সাহেবকে অনুমোদন করতে বাধ্য করে যে সে গোলাপী ও হলুদ সার্ট পরত, জ্যোতির্ময়ীদেবী মেজকুমারের উজ্জ্বল রঙের পছন্দের কথা বলেছে। কিন্তু রায়সাহেব বিরুদ্ধতা করে বলেছে এটা ছিল হালকা রঙ সে তার ধারণা থেকে বলেছে ঐ ধরনের লোক উজ্জ্বল রঙ পরে না। সে দার্জিলিঙে গিয়েছিল একটা লুঙ্গি পরে (প্রঃ সাঃ বীরেন্দ্র -২৯০)। সে সাধারণত লুঙ্গি পরে থাকত, এমনকি দার্জিলিঙেও এবং রাজেশ শেঠও তাকে লুঙ্গি পরে থাকতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। সে যখন উচ্চ-পদাধিকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত তখন ইংরেজি পোশাক পরত

(প্রঃ সাঃ ২৯০; ২১; রুক্মিণী ইত্যাদি)। শিকারে সে ধুতি বা খাকী পোশাক পরে যেত। এটাও পরিষ্কার। তার একটি বাঘশিকারের ছবিতে ধুতি দেখা যায়। মিঃ কে. সি. দে তাকে কখনো টুপি পরে দেখেনি। সে সোনার কারুকার্য করা একটি টুপি পরত এবং তার ইংরেজি পোশাকও ছিল অবশ্যই অনুমানভিত্তিক — একটি দরবার কোট এবং একটি ফ্রক কোট এবং একটি টেইল্ কোট যেটা সে বলেছে কখনো পরেনি। ৫-১-০৩ তারিখ থেকে ৬-৮-০৬ তারিখের মধ্যে একটি দর্জির বিলে বড় কুমারের নাম ছিল। বলা হয়েছে এর মধ্যে মেজকুমারের জিনিসপত্রও ছিল।

বিচারক কোন 'লঙস্যুট' দেখেনি, সম্ভবত একটা ছাড়া এবং বাদবাকী বেশিরভাগ অনুষ্ঠানভিত্তিক পোশাক। যদি সে শুধু এই ধরনের পোশাক পরত শুধু রায়সাহেব দেখে থাকে, সে কী জানত ইংরেজি পোশাক সম্বন্ধে, খুব কম করে তাদের নাম? বীরেন্দ্র ব্রীচেসকে বলত 'ব্রাসাজ্'। ছোটরানী বলত 'ব্রীজিচ্'। প্রত্যেকে বলত একজোড়া পাজামা, পান্টুলুন বা প্যান এবং আঞ্চলিক শব্দগুলি সম্ভবত 'প্যান্'(প্রঃ সাঃ ৩৯৪) একজন ইংরেজী সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিল বিচারকের সামনে। সে (প্রঃ সা১ ৬৯) ইংরেজী পোশাক পরে ছিল। সে 'যোধপুর ব্রীজ' শব্দটি ব্যবহার করেছিল বেং স্বীকার করেছিল ইংরেজি পোশাকের বিভিন্ন কোটের নাম সে জানে না।

খেলাধুলার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখা যায় বাদী অবশ্যই এগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ, এটা দেখানো হয়নি যে এ সম্বন্ধে মেজকুমারের অজ্ঞতা কম বা আজকের থেকে কম ছিল। ক্রিকেট ও ফুটবল নিয়ে শুরু করা যাক। ফণিবাবু ১৯০১ সালে রাজার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে উভয় খেলায় দেখেছে। কেউ এতদূর পর্যন্ত যায়নি। বাদীপক্ষের খেলাধুলা বিষয়ে এই মামলায় একই স্থান পেতে জেরা করা হয়েছিল, কিন্তু তারা সকলে বলেছিল মেজকুমার কখনো টেনিস, ফুটবল বা ক্রিকেট খেলেনি। সবগুলির নাম করা বৃথা। ১৮৯৯ সালে ময়দানে একবার একটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়েছিল এবং ১৯০৩ সালে একটি ফুটবল ম্যাচও হয়েছিল। কয়েকজন খেলোয়াড় সাক্ষ্য দিয়েছিল (বাঃ সাঃ ৭৬, ১৫১, ৮৩, ২৫৫, ৫৭০, ৫৪৯, ৬৯৬, ৭৫৮)। উভয়পক্ষের কেউ বলেনি যে কুমারেরা কেউ খেলেছিল। সেখানে একটি হাইস্কুল ছিল এবং ছাত্ররা ফুটবল খেলত এবং মনীন্দ্রবাবুর সাক্ষ্য ছিল সে সেই ফুটবল ক্লাবের সূত্রপাত করেছিল এবং মেজকুমার তাদের যা প্রয়োজন সে সব এনে দিত। যেমন — ব্যাট, বল, স্ট্যামস্, প্যাড, গ্লাভস, পোশাক ও বুট। জ্যোতির্ময়ীদেবীর মতামতে সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছিল যে খাতায় লেখা ছিল মেজকুমারের জন্য বুটের ফরমায়েশ করা হয়েছিল। এটা ছিল মিথ্যা মতামত। এমনকি ফণিবাবু পর্যন্ত বলেনি যে মেজকুমার ১৯০১ সালের পর ফুটবল খেলেছে এবং মহীন্দ্রবাবু ১৯০৮ সালের কথা বলেছিল। পুরাতন খাজাঞ্চী, প্রতিবাদীপক্ষের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল যাকে (৩৫৪), বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সমস্ত মামলাটি ধরিয়ে দিয়েছিল। সে এই বলে আরম্ভ করেছিল যে মেজকুমার ফুটবল ও ক্রিকেট খেলেছিল। জেরায় সে বলেছিল মেজকুমার ৮/৯/১০

বছর পর্যন্ত ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছিল, পরে নয়। সে খেলেছিল এই অর্থে সে বলেছে যে সে ফুটবল নিয়ে দৌড়াত। সাক্ষীটি ফুটবল ম্যাচ দেখেছে, কিন্তু শব্দটি জানে না। মেজকুমার ফুটবল সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং আজকেও সে বাদীর মত বেশি কিছু জানে না।

থেকে যায় টেনিস, বিলিয়ার্ড ও পোলো। পোলোর বিষয়ে সামান্য ছাড়ের প্রয়োজন হবে, কিন্তু টেনিস ও বিলিয়ার্ডেও একটি সাক্ষী দল, প্রতিবাদীপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে এল এবং বলল মেজকুমার টেনিস ও বিলিয়ার্ড খেলত। রাজবাড়ির বড়দালানে অবশ্যই একটি বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল এবং এর সামনে ছিল একটি টেনিস কোর্ট। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য ছিল যে বড়কুমার ও যোগেশবাবুও টেনিস খেলত, তৎসহ রায়সাহেব ও সত্যবাবু— যখন এসেছিল। কিন্তু মেজকুমার এটা খেলত না, ছোটকুমারও না, বড়কুমারের মৃত্যু পর্যন্ত নয় (বাঃ সাঃ ৬৬০, ৮৮১, ৮০৬, ৯৭৭)। বিলিয়ার্ডের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে একই ধরনের সাক্ষ্য ছিল, শুধু ছোটকুমার মাঝে মাঝে এটা খেলত (বাঃ সাঃ ৯০৭)। একদল মামলাজীবী মানুষ একজন কাল্পনিক কুমারকে গঠন করার চেষ্টা করছিল। একজন সাক্ষী বলেছে যে মেজকুমার 'মেয়েলী' খেলা বলে টেনিস ত্যাগ করেছে — সে ছিল এই ধরনের মানুষ যে শিকার, হাতি, ঘোড়া ও নারী পছন্দ করত। দেখা গেছে মেজকুমার টেনিস ও বিলিয়ার্ড জানত না এবং বাদী এই বিষয়ে ব্যাপক অজ্ঞতা দেখায়নি। লেফটাঃ হোসেনের এই বিষয়ে সম্পূর্ণটা উল্লেখের প্রয়োজন হয়নি। সে বিলিয়ার্ডের ব্যাপার প্রমাণ করতে এসেছিল এবং মেজকুমার ও ছোটকুমারের কথা বলে, যে যখন তারা পার্ক স্ট্রিটে অবস্থান করছিল তখন তার বাড়িতে আসত বিলিয়ার্ড খেলতে। ছোটকুমার কলকাতায় যায়নি যতক্ষণ না মিঃ র‍্যামকিন অধিকার অধিগ্রহণ করেছিল এবং তারপর যখন সে কলকাতায় গেল, সে ৩নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অবস্থান করেছিল।

পোলোর ব্যাপারে বাদী প্রধান সাক্ষ্যে বলেছে যে জয়দেবপুরে মিঃ মেয়েরের দ্বারা নির্মিত একটা পোলো মাঠ ছিল। "আমি সামান্য পোলো খেলা শিখেছিলাম, আমি ও ছোটকুমার, বড়কুমার নয়।"

বিচারক একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিবৃতিকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য করেছে। মিঃ চৌধুরী মতামত প্রদর্শন করেছিল যে টেনিস প্রসঙ্গে বা এই ধরনের বিষয়ে তার প্রশ্নের উত্তর "তাদের দ্বারা আশা করা হয়নি" 'যারা বাদীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করেছিল। এবার এই পোলো বিষয়টি নিশ্চিতভাবে শিক্ষকদের মনে ছিল। এখন পোলো বিষয়ে জেরা কী প্রদর্শন করেছে — বাদী কিছুই না। একেবারেই কিছু জানে না পোলো সম্বন্ধে। এই জ্ঞাত বিষয়ে তার অজ্ঞতা দেখে এটা পরিষ্কার যে বাদী ১৯২১ সালে যেমন ছিল সেই হিসাবে তাকে কাঠগড়ায় রাখা হয়েছে। এখন পোলোর বিষয়ে এটা স্বীকৃত যে মিঃ মেয়েরের আগমনের পূর্বে এক ধরনের পোলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মিঃ মেয়ের আসার পর রাজবাড়ির সামনে ময়দান সমতল করে এবং এটাকে পোলো মাঠ হিসাবে

তৈরি করা হয়। এটাও বিতর্কিত নয় যে সেখানে তিনজন মণিপুরী জকি ছিল — পোলোর উৎস মণিপুরে — তাদের মধ্যে একজন চন্দ্রানন সিং। সে বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল। যে তথ্য সে দিয়েছে তা এই, সে ১৯০১ সালে মেজকুমারের ঘোড়সওয়ার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। দেড়বছর সে সওয়ারী করেছিল এবং তারপর সে ছোটকুমারের কাজে গিয়েছিল এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত তার কাজে নিযুক্ত ছিল। সে বলেছে তার কাজে যোগ দেওয়ার ২/৩ মাস পর ছোটকুমার প্রায় ১৫ দিন যাবৎ পোলো খেলেছিল, জারী রেখেছিল এবং তারপর ঢাকা ক্লাবে খেলতে আসত, এবং সাক্ষীও আসত, খেলতে নয়, তার সাথে মিঃ মেয়েরও ক্লাবে খেলতে আসত এবং তারপরে জয়দেবপুরে আদৌ পোলো খেলা হয়নি। শুধুমাত্র ছোটকুমারের বিবাহের পরে একদিন ছাড়া যাতে ইউরোপীয়ানরা ও মিঃ মেয়ের যোগদান করেছিল। ১৯০৩ সালে এই বিবাহ হয়েছিল। সে বলেছে যে মিঃ মেয়ের কলকাতা থেকে ৬টি পোলোর ঘোড়া এনেছিল এবং এর মধ্যে ৪টি লালগোলায় ছিল, বাদবাকী জয়দেবপুরে। জেরায় সাক্ষী বলেছে সে 'পেলহাম্ বিট্' সম্বন্ধে জানে না, যদিও সে 'কাজাই' ও 'ডাহানা' সম্বন্ধে জানে, যেটা ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে নরম ও শক্ত মুখের জন্য। সে ঢাকাতে পোলোর জন্য কোন ঘোড়া কেনেনি, না সে কলকাতায় গিয়েছিল ঘোড়া কিনতে। বেশ কিছু ঘোড়া কলকাতা থেকে এসেছিল। সে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছে কিন্তু জানে না ১৪ কি ১৫ টি ঘোড়া।"

যদি মেজকুমার পোলোতে এই সমস্ত অনুশীলন করে থাকে লেখা হয়েছে কোন ম্যাচ খেলা হয়নি। কিন্তু অনুশীলন করেছে — তার কাছ থেকে এর কোন কিছু বা 'নিয়ার সাইড্ ব্যাক হ্যান্ড' -এর মত শব্দ মনে রাখা আশা করা উচিত নয়। বিশেষজ্ঞ মণিপুরীদের দ্বাবা ব্যবহৃত এর জন্য বাঙলা শব্দ ছিল যেখানে। তারা 'চুকের' শব্দটির জন্য 'বাজি' শব্দটি ব্যবহার করে এবং ফণিবাবু ইংরেজির জন্য অন্য শব্দ ব্যবহার অনুমোদন করেছিল। কিন্তু ৩৫ বছর পর বাদীর কাছ থেকে যা কিছু সে জানত তা মনে রাখার আশা করা যায় না।

অন্যদিকে প্রতিবাদীপক্ষে সাক্ষীরা, ফণিবাবু ও রায়সাহেব-সহ বলেছিল যে মেজকুমার ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে দার্জিলিং যাওয়ার আগে পর্যন্ত পোলো খেলেছিল এবং এটাও বলা হয়েছিল যে তার ঢাকা পোলো ক্লাব বা যাকে বলা হত ঢাকা অ্যামিউজ্‌মেন্ট ক্লাব তার কথা মনে ছিল। মেজকুমার যে এই ক্লাবের সদস্য ছিল সেটা দেখাতে সেক্রেটারী স্বাক্ষরিত দুটি চিরকুট দাখিল করা হয়েছে (Z98, Z99, Z100)। চিরকুট ও চিঠি মিঃ আর এন রায়ের নামে সেক্রেটারী ইস্যু করেছিল। চিরকুটে তারিখ ছিল ১৯০৮, জানুয়ারি। এর মধ্যে দুটি পোলোর জন্য চাঁদা, আরেকটি দৌড়ে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং চিঠিটি একটি ঘোড়দৌড়ের জন্য 'পাগলা' নামে একটি টাট্টু ঘোড়ার প্রবেশমূল্য হিসাবে বিল।

বাদীর জেরার প্রায় চারমাস পর প্রতিবাদীপক্ষ একগুচ্ছ ভাউচার ও অন্যান্য কাগজপত্র ফাইল করতে আরম্ভ করে এটা প্রদর্শন করতে যে কুমার এসব জানত যেটা জেরা প্রদর্শন

করছে যে বাদী জানে না। বিচারক এটা অর্ডার XIII. রুল২-এর ভিত্তিতে প্রত্যাখান করেছিল এবং এই আদেশের পুরো কারণ দর্শিয়েছিল। যাইহোক, একজন সাক্ষীকে অনুমোদন করা হয়েছিল এই ধরনের ভাউচার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে। এই ধরনের প্রশ্নযোগ্য নথির উপরে তার সাক্ষ্য ছিল যে ১৯০৩ সালে মেজকুমার ঢাকাতে পোলো খেলতে যাচ্ছিল।

পুরো তথ্যটি প্রকৃতপক্ষে কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার দ্বারা অপ্রমাণিত হয়েছিল। মিঃ মেয়েরকে পোলো সম্বন্ধে একটিও পৃথক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সত্যবাবু তার প্রধান সাক্ষ্যে বলেছিল যে মেজকুমার দার্জিলিং যাবার দুবছর পূর্বে পোলো খেলা ছেড়েছিল। এটা দেখাচ্ছে যে ক্লাবের রিসিপ্ট বা চিরকুট ছোটকুমারের সাথে সম্পর্কিত ছিল যার সই ছিল একই রকম, আর. এন. রয়। স্বীকৃতভাবে ছোটকুমার ক্লাবের একজন সদস্য ছিল এবং তার রিসিপ্ট মেজকুমারের নামে চালানো হয়েছে। এটা ব্যাখ্যা করে কেন সেখানে রিসিপ্টের দুটি সেট ছিল না। একটি রিসিপ্ট ছিল একটি টাট্টু ঘোড়া 'পাগলী'র দৌড়ের সাথে সম্পর্কিত। বিলু বণবুকে (বাঃ সাঃ ৯৩৮) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জেরায় যে এটা মেজকুমারের টাট্টু কিনা। সে বলেছিল এটা ছোটকমারের টাট্টু। যদি এটা এরকম হয় ক্লাবের কেরাণী অতুলবাবুকে (বাঃ সাঃ ৪৯৯) এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। ভাউচার হিসাবে মৌখিক সাক্ষ্য ছিল যে মেজকুমার ১৯০৩ সালের এইরকম এক দিনে এসেছিল ঢাকাতে পোলো খেলতে, আর বেশি যাওয়া যেতে পারেনি, কেননা বিষয় উত্থাপনের প্রায় চার বাদে ভাউচার ফাইল করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজতম কাজ মেজকুমারের নাম প্রবিষ্ট করানো বা তার নাম হিসাবে ছোট কুমারের নাম দেখানো, (X208, X63, X453, X208)। এই ধরনের ভাউচার এই মামলায় দাখিল করা হয়েছে। X3, ১৯-৯-০৩, চিহ্নিত একটি ভাউচারে পোলো স্টিক ও পোশাকের ক্রয় দেখানো হয়েছিল। এগুলি লালকালিতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। বাহ্যত ক্যাশবুক এটা সমর্থন করে না। ১৯১৭ সালে তিনরানীর হিসাবের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে অর্থ ভাগাভাগি করতে হয়েছিল। বণ্টনকারী অফিসার অন্যান্য নথির মধ্যে এই সমস্ত ভাউচারের উপর ভাগাভাগির আয়োজন করেছিল। দেখা গেছে মেজকুমার পোলোক্লাবের সদস্য ছিল না আদৌ। সে বাদী যা জানে তার থেকে বেশি কিছু জানত না। মিঃ র‍্যামকিন যে নিশ্চিতভাবে ছোটকুমারের সঙ্গে পোলো খেলেছিল ক্লাবে, একটি ভুল করছিল, যখন সে বলেছিল, মেজকমারও, একজন সদস্য হিসাবে নয়, খেলত সেখানে। এই বিষয়ে সত্য হচ্ছে যা বিচারক অন্যপক্ষের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দেখেছে যেটা বলেছে কেরানী বীরেন্দ্র (বাঃ সাঃ ২৯০) একটি প্রাক মামলায়। যখন মেজকুমার বাড়িতে থাকত, সে হাতিতে ও টমটমে চড়ে বাইরে যেত; এছাড়া সে আর কোন শারীরিক কসরৎ করত না (Ex.350)। বিচারক দেখেছে যে বাদী মেজকুমারের চেয়ে, যদি সে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হত, এই সকল খেলাধুলাতে এমন কোন বেশি অজ্ঞতা দেখায়নি।

শিকার, বন্দুক ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে সে ইংরেজি নাম বা বিষয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে, কিন্তু এই বিষয়ে নয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল —

"যদি আপনি মেজকুমার হতেন, আপনি একজন শিকারী হিসাবে নিশ্চয় ইংরেজি শব্দগুলি জানতেন কিন্তু অসুস্থতার দরুন এগুলি ভুলে গেছেন।"

মেজকুমারের কাছে শিকার কোন শিক্ষিত মানুষের দ্বারা গৃহীত ফ্যাশনের বস্তু নয়। কিন্তু একটা খেলা যা সে বাল্যকালে আরম্ভ করেছিল এবং প্রায় প্রাত্যহিক প্রচেষ্টা হিসাবে, গ্রামের বাইরে অশিক্ষিত শিকারীদের তাদের বন্দুক ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য নিজস্ব ভাষা ছিল। ভাওয়াল ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেখানে অসংখ্য অশিক্ষিত শিকারী ছিল (বাঃ সাঃ ২৬) এবং তারা জানত কি করে শিকার করতে হয়, যদিও তারা ইংরেজি শব্দ জানেনা বা ব্যাখা করতে পারে না কেন muzzle end breach end থেকে ছোট। কয়েকজন শিকারীকে বাদী পক্ষের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল যারা বিষয়টি জানে কিন্তু নাম নয় এবং ইংরেজি শব্দের জন্য তাদের বাঙলা প্রতিশব্দ আছে। যেমন —

টার্গেট — চাঁদমারী, D.B.B.L. — দোনলা কার্তুজ, কার্টিজ — কার্তুজ, Bullet— গুলি, Foresight — মাছি, ট্রিগার — মেয়ার, কক — ঘোড়া, Shot — ছররা, Range— পাল্লা, Stock — কুণ্ডা, ব্যারেল — নলি, Muzzle loaders — গুটেইনা, Single barrel gun — একনলা বন্দুক।

এ বিষয়ে বিস্তৃত শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছিল যেগুলি বিতর্কিত নয়। কিন্তু মিঃ চৌধুরী দৃঢ়ভাবে বলে চলছিল যে একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে মেজকুমারের অবশ্য এগুলি জানা থাকবে। এমনকি একজন শিক্ষিত শিকারী যে বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে কোন এক উপলক্ষে মেজকুমারের সাথে শিকারে ছিল এবং যে ঢাকায় প্র্যাকটিসরত একজন সম্মানিত ব্যক্তি, বলেছে যে মিঃ চৌধুরী দ্বারা পেশকৃত কিছু শব্দ সে জানে, কিন্তু এও বলেছে যে বুলেট যেমন 'লেথাল বুলেট' ইত্যাদি তখনো আসেনি এবং ২০ বছর আগে সে 'লেথাল বুলেট' দেখেনি কোন শিকারে (বাঃ সাঃ ৬০০২)।

যেভাবে মেজকুমার শিকারে যেত তাও বিতর্কিত নয়। সে ধুতি বা খাকী পরে হাতির উপরে তার আসন বিশিষ্ট হাওদায় চড়ে (প্রঃ সাঃ ৬১) শিকারে যেত। তার সাথে যেত ম্যাকবিন, অ্যান্টনি, মণি — এই তিনটি নাম রানী কর্তৃক প্রদত্ত এবং হরিমিস্ত্রী, এডুইন ফ্রেসার (প্রঃ সাঃ ৫১) ও একজন বা দুজন বাবুও (প্রঃ সাঃ ৬১) যেত।

সাক্ষীরা আরো কয়েকটি নির্দিষ্ট নাম দিয়েছে — উমেদ আলি, নিজে একজন শিকারী (বাঃ সাঃ ২৬); যতীন (বাঃ সাঃ ৯), ও কেশব (বাঃ সাঃ ১৫)। ম্যাকবিন ও মণি — দুজন পেছনের আসনে বসত — এরা নেটিভ ক্রিশ্চান ও ভাওয়ালের প্রজা-- মণি ও ম্যাকবিনের কাজ ছিল হাওদায় বসে বন্দুক ভরা। একজন খানসামাও সেই সঙ্গে থাকত এবং মেজকুমারের মাথার উপরে ছাতা ধরে থাকত এবং হাওদার মধ্যে বন্দুকগুলি রাখার জন্য খাপ থাকত।

এইভাবেই মেজকুমার শিকারে যাত্রা করত এবং বাদীপক্ষেব সাক্ষ্য ছিল যে সে কখনো কার্তুজের বেল্ট বহন করত না যেটা তার হাওদার উপরে অন্য মানুষ বহন করত — এটা তাদের কাজ ছিল তার হাতে ভরা বন্দুক তুলে দেওয়া।

মিঃ চৌধুরী সাগরবাবুর কাছে (বাঃ সাঃ ৯৭৭) মতামত দিয়েছে যে চারটি বন্দুকের মধ্যে দুটি ছিল রাইফেল এবং মেজকুমার বাদীর মতে ছররা বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করত না, রাইফেল দিয়ে করত। কেউ ছররা বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করতে পারে না বা করে না। প্রতিবাদীপক্ষের ফণিবাবু বলেছে মেজকুমার বাঘশিকারে সাধারণভাবে রাইফেল ব্যবহার করত। বাদী বলেছিল যে সে বড় শিকারে ১২ ও ১৫ নং বন্দুক ব্যবহার করত, যদিও সে স্বীকার করেছিল তার একটি রাইফেল ছিল। তার শিকারের থেকে ফেরার ঠিক পরেই যে বন্দুক হাতে ছবি দেখা যায় সেটি ছররা বন্দুক। ফণিবাবুকে ছবিটি দেখানো হয়েছিল, অস্বীকার করতে পারেনি এবং এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য সামনে এসে পড়েছিল। A-10 ছিল একটি ছররা বন্দুক (বিলু, বাঃ সাঃ ৯৩৮)। ফণিবাবু রাইফেল সম্বন্ধে এবং তাদের দীর্ঘ লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিল এবং একটি উইনচেস্টার রাইফেলের কথা বলেছিল যেটা সম্বন্ধে মতামত দেওয়া হয়েছিল যে এটি মেজকুমারের প্রিয় রাইফেল, কিন্তু আদালতে একটি উইনচেস্টার রাইফেল তুলে দেওয়া হয়েছিল। সে ব্যবহার করতে পারেনি এবং এটা মনে হয় না খেদানোর পর হাতির পিঠ থেকে বাঘ শিকার করা হত না, এবং বিচারক বাদীর এবং শিকারীর এই সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে যে হাতির পিঠ থেকে বাঘ শিকার হাতের আন্দাজে করা যায়, দৃষ্টির দ্বারা নয়। বাদী বলেছে যে তার মনে নেই সে পাখী শিকার করেছে কি না যেটা মনে হবে অবিশ্বাস্য যতক্ষণ না সে তার পরবর্তীকালের অভ্যাসের কথা উল্লেখ করছে এবং এটা মনে হয় সত্যি যে তার চাকর তার বন্দুক ভরে দিত ঠিক যেমন ভাবে স্নান করাত, পোশাক পরাত। প্রতিবাদীপক্ষের অ্যান্টনি মোবালের সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করে দেখা যায় যে বলেছে, "মেজকুমার প্রতিদিন হাতিতে চড়ে শিকারে যেত এবং আমি যেতাম এবং বন্দুক ভরে দিতাম। বাদী পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত 'বারুদ' কথাটি জানত না। এটাতে প্রমাণ হয় ভাওয়ালে শব্দটি 'বারুজ'। এমনকি ফণিবাবুকেও এটা স্বীকার করতে হয়েছিল, যদিও সে বলেছিল 'বারুদ' কথাটিও পরিচিত।

পুনরায় বাদীর মনের গভীরে লক্ষ্য করে দেখা যায়, সেখানে বাহন সম্বন্ধে তার কোন অজ্ঞতা নেই যেগুলি তার পরিবার ব্যবহারের জন্য রাখা হত। বাদী 'চার-এ-বানে' কথাটি জানে না এবং সন্দেহ হয় এরকম কোন জিনিস ছিল কি না সেখানে বা নামটি পরিচিত কি না যতক্ষণ না ফণিবাবুর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করা হয় বা এটাকের অন্যের চেয়ে প্রাধান্য না দেওয়া হয়। প্রতিবাদী পক্ষের অন্য সাক্ষী শব্দটি শোনেনি বা তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়নি। একজন সাক্ষীকে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেছিল — পুরনো খাজাঞ্চী (প্রঃ সাঃ ৩৬৪) — স্বীকার করেছিল যে সে কখনো এটা শোনেনি। এটা অনুমোদনের জন্য গৃহীত হতে পারে না যে কুমার চার-এ-বানে কথাটি জানত। 'আমেরিকার গরুর গাড়ি' কথাটি বাদী জানত

না এটা কী, "হতে পারে এটা চার-চাকার টমটম। এর নাম আমার মনে নেই।" ঘোড়ার বিষয়ে পূর্বোক্ত শব্দগুলির অজ্ঞতা থাকবে যদি মানুষটি অশিক্ষিত বা ইংরেজি না জানে। ফণিবাবুকে এসব কথা শেখাতে হয়েছিল।

রাজবাড়ির আসবাবপত্রের নামগুলি উভয়পক্ষ থেকে সংগ্রহ করেছিল বিচারক। বড়কুমারের বৈঠকখানা বাঙলারীতিতে সাজানো ছিল --- বসার জন্য মেঝের উপর গালিচা পাতা ছিল। বাদ্যযন্ত্রাদি রাখার জন্য একজোড়া আলমারি ছিল এবং ফণিবাবু ৬টি মার্বেল টিপয় ও দুটি 'কুশন্' চেয়ারের কথা বলেছে। মেজকুমারের বৈঠকখানায় দুটি চৌকি ছিল যার উপর বসার জন্য বিছানা পাতা ছিল এবং পেছনে একটি বেঞ্চ ছিল যাকে ফণিবাবু বলত 'টুল' — এটি আঞ্চলিক শব্দ। ফণিবাবু একটি টিপয় ও দুটি কুশন্ চেয়ারের কথা বলেছে। রাজবাড়ির আসবাবপত্র সম্বন্ধে প্রধান সাক্ষী হিসাবে সাগরবাবু, বিলু ও ফণিবাবুর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, জ্যোতির্ময়ীদেবী ছাড়া এবং অনেক পরে বীরেন্দ্র মেজকুমারের ঘরে অবশ্যম্ভাবী কারণের জন্য একটি লেখার টেবিলের কথা যোগ করেছে। এই সাক্ষ্যের মধ্যে কোন তেমন পার্থক্য ছিল না, যেটুকু পার্থক্য ছিল সেটা এই বিষয়ে হেরফের ঘটায়নি। ফণিবাবুর নোটবুকে সাইডবোর্ড ও কাপ্‌বোর্ডের উল্লেখ আছে এবং সাক্ষ্যে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে এগুলি ছিল এটা হতে পারে, কিন্তু বিচারক বিশ্বাস করেনি কেউ ঐ নামগুলি ব্যবহার করত। এটা বিশ্বাস হয় না যে কোন বিদেশী পরিবার ছাড়া বাংলায় ঐ শব্দগুলি কেউ ব্যবহার করত।

একমাত্র রেসের বিষয়েই তর্কযোগ্য অজ্ঞতা দেখা গেছে। এটা একটা স্বীকৃত ঘটনা যে মেজকুমার ঢাকায় রেস খেলতে যেত। এবং তার দৌড়ের জন্য টাট্টু ছিল এবং এর দুটি ১৯০৪ সালের ১২ জানুয়ারি দৌড়ে অংশ নিয়েছিল। এটা কলকাতা টার্ফ ক্লাবের প্রকাশিত রেসিং ক্যালেন্ডার অনুসারে এবং প্রতিবাদীপক্ষের মিঃ চৌধুরী এটা বিচারককে দেখিয়েছিল। এরকম কোন অংশগ্রহণের সাক্ষ্য পূর্বে বা পরে ছিল না কিন্তু এটা অবশ্যই মনে হবে মেজকুমার রেস সম্বন্ধে কিছু জানত। ঢাকা রেসের সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনা হচ্ছে মিঃ গার্থের মৃত্যুর পর এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঢাকার একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, যেটা ১৯০৪ সালে ঘটেছিল। অতুলবাবুর সাক্ষ্য অনুসারে যে ছিল ক্লাবের কেরানী। ১৯০৪ সালটি একদম সঠিক হতে পারে না, কিন্তু অবশ্যই কিছু পরে, তবে কেউ এই রেসের সাথে মিঃ গার্থের সম্পর্ক অস্বীকার করেনি। পরে এই রেস চালু হয়েছিল। এটা বলা যেতে পারে মেজকুমারের ঘোড়দৌড়ের অর্থ ১৯০৪ সালের সঙ্গে সম্পর্কিত বা কাছাকাছি সময়ের। কিন্তু পরে নয়। তার তখন ২০ বছর বয়স।

ঢাকা রেস সম্বন্ধে বাদীকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করা হয়নি শুধু সে ঢাকা রেসকোর্সে ছিল কি না এটা ছাড়া। সে বলেছিল, "আমি এটা দেখেছি। এটা উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গিয়েছে।" মিঃ চৌধুরী তৎক্ষণাৎ বিষয়টি ত্যাগ করে।

কলকাতার রেস সম্বন্ধে সে বলেছে

"আমি কলকাতা রেস সম্বন্ধে শুনেছি। আমি দু একবছর যেতেও পারি। প্রতিবছর ভাইসরয় কাপ রেস অনুষ্ঠিত হয়। আমি কোন ঘোড়ার নাম মনে করতে পারি না যে ১৩১৬-র পূর্বে ভাইসরয় কাপ জিতেছে।"

প্র:— কাপ জিতেছে এমন কোন ঘোড়ার নাম করতে পারেন?

উ:— আমার ঘোড়ার বা যে কারো ঘোড়ার?

প্র:— আপনার নিজের।

উ:— আমি নিজে ভাইসরয় কাপ জিতেছিলাম।

প্র:— কোন বছরে?

উ:— আমি বলতে পারি না। আমি নিজে ঘোড়া চালিয়ে রেস জিতেছিলাম, কিন্তু আমি বলতে পারি না এটা ভাইসরয় কাপ ছিল কি না।

প্র:— কোথায় রেস হয়েছিল?

উ:— টালিগঞ্জে।

সে steaple chase-এর কথা জানে না। সে জানে না কি করে handicapping করা হয়। কিন্তু জানে এটা করা হয় দুটি ঘোড়াকে সমান সুযোগ দিতে, জানে যে পাথর ও পাউন্ড এই কারণে ব্যবহৃত হয়, ৮ বা ৭-১২ সংখ্যার অর্থ জানে না। পুনরায় পরীক্ষায় সে ব্যাখ্যা করেছিল যে টালিগঞ্জ রেস জেতার পর সে কী পেয়েছিল, একটি চাবুক। একজন সাক্ষী এটা সমর্থন করেছে। কেউ অস্বীকার করেনি এমন কিছু দেখা যায়নি যাতে মনে হয় এটা কোন ঘটনা নয়। যাইহোক, বিচারক নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে এই অজ্ঞতা এটা প্রদর্শন করে কি না যে মেজকুমার একজন অশিক্ষিত লোক ছিল না, তার চেয়ে বেশি যে ২৯ বছরে একটি স্মৃতি নষ্ট হতে পারে। এই ধারণার ভিত্তিতে এটা মনে হয় না এই অজ্ঞতা এরূপ নয় যা মানসিক পরিচিতিকে স্থানচ্যুত করে, যদিও এটা নিশ্চিত যে এই বিষয়ে কোন শেখানো পড়ানো হয়নি। এটা একটা স্মরণযোগ্য ঘটনা যে বাদীকে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে মিঃ গার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে বলেছিল গার্থ ছিল নবাব এস্টেটের ম্যানেজার।

প্র:— তিনি কি ১৩১৬ সালে ম্যানেজার ছিলেন? (ফাঁদ)

উ:— বলতে পারি না।

"তার মৃত্যু হয়েছিল কোন বছরে বলতে পারি না। কিন্তু আমি দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছিল। আমি বলতে পারি না কত পূর্বে, দশবছর পূর্বে নয়, কিন্তু বলতে পারি না ১/২ বছর পূর্বে কিনা। বলতে পারি না ৩/৫ বছর পূর্বে কিনা।" এটা বিচারকের কাছে মনে হয়েছে স্মৃতি।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে একজন সাক্ষীকে শেষের দিকে এটা প্রদর্শন করতে ডাকা হয়েছিল যে মেজকুমার প্রকৃতপক্ষে ভাইসরয় কাপের দৌড়ে উপস্থিত ছিল ১৯০৫ সালে,

পরে সাক্ষরতার প্রসঙ্গ এলে দেখা যাবে সাক্ষ্যটি অনির্ভরযোগ্য, যদিও এই উপস্থিতির মধ্যে কোন সহজাত অসম্ভাব্যতা থাকে না।

বাদী H.E., H.H., C.S I., I.C.S.,-এর অর্থ বা 'তুমি কেমন আছ' বা 'খুব ভাল' জানে না। তার I.C.S. সম্বন্ধে ধারণা ছিল এবং যদিও সে A.D.C. জানত না, Aid-de-camp সম্বন্ধে ধারণা ছিল, যখন উচ্চারণ করা হয়েছিল। যদি মেজকুমার ইংরেজী না জেনে থাকে, সে অশিক্ষিত। বলতে বিস্ময়কর, সে 'ক্রাশড্ ফুড্' কথাটি জানত — সে বলেছে এটা ঘোড়াকে দেওয়া হত — যদিও শব্দটি ইংরেজি পোশাকের শব্দের মধ্যে প্রবিষ্ঠ করানো হয়েছিল।

জেরার একটি অংশে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিল বাদী আদৌ বাঙালী নয়। পরে এই প্রসঙ্গ এলে অলোচনা করা সুবিধা হবে। যাইহোক এর একটা অংশ এখনই আলোচনা করা যেতে পারে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল —"রাজা রাজেন্দ্র খুব ভাল তবলা বাজাতে পারত, কিন্তু ভাল গান গাইতে পারত না। সে অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিল।" এটা সত্য, অন্য পক্ষের সাক্ষ্য অনুসারে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল —

"১৩১৬ সালের পূর্বে আপনি কি কোন বাঙলা গানের একটি কলি বলতে পারেন?

উ: পারি না।

এটা অদ্ভুত মনে হয়, দেখা যাচ্ছে রাজা সঙ্গীতানুরাগী ছিল, সঙ্গীতের 'ওস্তাদ' রেখেছিল। বৈঠকখানায় গান বাজনা হত, এবং তার মৃত্যুর পর, বড়কুমারের বৈঠকখানায় সঙ্গীতচর্চা হত, যেখানে বাদ্যযন্ত্রাদি ছিল এবং 'জগদ্ধাত্রী' পূজা ও 'পুণ্যা'তেও 'গানযাত্রা', 'নৃত্য', 'কবিগান' অনুষ্ঠিত হত। 'নাচঘরে' একটি মঞ্চ ছিল এবং থিয়েটার ইত্যাদি সেখানে অনুষ্ঠিত হত। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের কাছ থেকে এসব জানা গেছে এবং এসব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এটা অসম্ভব যে কেউ একটি গানের একটি পঙক্তিও বলতে পারে না। মেজকুমারের সঙ্গীত বিষয়ে চেষ্টার প্রসঙ্গে, বাদীপক্ষের সাক্ষ্য হচ্ছে যে সে কিছুই বাজাতে পারত না, কিন্তু এক / দুই লাইন গাইতে পারত এবং জ্যোতির্ময়ীদেবী, বোন বলেছে সে স্নান করার সময় গান গাইত, শব্দগুলি বুদ্ধিদীপ্ত নয়। কিন্তু একথা এইভাবে শুরু করে —

"ঝিলমিলি মানিয়া হরে ননদিয়া'

জেরায় সে (জ্যোতির্ময়ী) বলেছে যে সে মেজকুমারের গাওয়া অন্য গানের বলতে পারে, যেমন — "আয় লো অকীল কুসুম তুলি ভরিয়া ডালা।" এটা লেখা যেতে পারে এই দুটি গান ফণিবাবুর নোটবুকে মেজকুমারের গানের তালিকায় ছিল।

এটা কেমন যে বাদী কোন গানের একটি পঙতিও বলতে পারেনি, এমনকি যদি একজন প্রতারকও ১৩ বছর একটি বাঙালী পরিবারে বাস করত। একটি পঙক্তি বলতে পারত, বিশেষত প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য ছিল যে ঢাকায় তার বাড়িতে 'কীর্তন' হত এবং সেখানে এমন বাঙালী হিন্দু পরিবার কমই থাকত যে কীর্তন গাইত না, যেটা পরিদর্শন

করত না বা এমনকি ভিখারীরাও যা গেয়ে ভিক্ষা চাইত। কারণটি পরিষ্কার। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই, যারা পেশাদারী বা ভাল গাইতে পারে, তারা ছাড়া সকলেই স্বীকার করে যে তারা গাইতে পারে এবং এমনকি তারাও যারা ভাল গায়, তাদের পক্ষে প্রচুর খোশামোদের প্রয়োজন হয় সমাবেশে গাইবার আগে। এবং তারা লজ্জার ভঙ্গীতে মাপ চেয়ে গান শুরু করে। এটা বিশ্বাস করা যায় না কোন অশিক্ষিত মানুষ স্বীকার করবে আদালতে যে সে একটি গান জানে। এটা ভিড়ের মধ্যে লজ্জাজনক। যদিও এটা গর্বের বিষয়ও হতে পারে। ফণিবাবুর তালিকায় মেজকুমারের গানগুলির অধিকাংশই নিম্নমানের স্থূল ও হালকা প্রেমের গান এবং প্রধানত কৃত্রিম এবং যদি না শিক্ষিত হত, সে স্বীকারোক্তি করত না। একজন শিক্ষিত মানুষ একটি গানকে গ্রহণ করবে, সে যাইহোক না কেন, শিক্ষাগত বিষয় হিসাবে।

ফণিবাবু বলেছিল যে মেজকুমার থিয়েটারে প্রম্পটার হত। ঐ সাক্ষ্য তার নিজের অনুমোদনের দ্বারা স্থানচ্যুত হয়েছিল যেটা নীচে দেখা যাবে।

এই সাক্ষ্য বিশ্বাস করা যায় না যে মেজ ও ছোটকুমার জানত কি ছবি তুলতে হয়, যদিও বাড়িতে একটা স্টুডিয়ো ছিল। সেখানে একজন বেতনপ্রাপ্ত ফটোগ্রাফার ছিল এবং বড়কুমার জানত কী করে ছবি তুলতে হয়, কিন্তু এর অর্থ নয় অন্য দুজনও জানত। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য যে তারা কখনো ছবি তোলে নি (বাঃ সাঃ ৩৪, ৬৬০, ৯০৭, ৯৩৮)। প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার কোন কারণ নেই, যারা জেরায় প্রদত্ত কুমারকে গঠন করতে এসেছিল এবং যাদের বিভিন্ন বিষয় ছিল যা আলোচনা করা হয়েছে এবং সর্বৈব মিথ্যা।

ক্রিকেট-টেনিসে জেরায় বিচারকের মতামত হচ্ছে যে এটা শুধু কুমারকে পরাজিত করার জন্য, বাদীর যে অজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে, সেটা কুমারের নিজের চেয়ে বেশি আশা করা যেতে পারে না, এটা স্মৃতিকে উপেক্ষা করছে এবং সাধারণ জ্ঞানের পত্রকে স্থাপন করেছে যার উত্তর কুমার দিতে পারেনি।

এবার সেই প্রশ্নগুলিতে আসা যাক যেটা অবশ্যই মেজকুমারের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। এর উত্তরগুলি সঠিক। শুধুমাত্র বাদীর মেজরানীর বোনের স্বামীর নাম করতে পারা ছাড়া, সে একজন কলকাতার যুবক যার সাথে মেজকুমার সাক্ষাৎ করেনি এবং কিছু অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। যে প্রশ্নগুলির উত্তর সে দিতে পারেনি, সেগুলি এরূপ —

১৩০৯ সাল থেকে ১৩১৬ সাল পর্যন্ত লেফটাঃ গভর্নর কে ছিল? রিসলে কে ? লর্ড মিন্টো? হ্যাঁ, তার সম্বন্ধে আমি শুনতে পারি। বলতে পারি না, সে কে ? বা কোন বছরে সে ভারতে ছিল? বলতে পারি না কে ১৩০৯ থেকে ১৩১৬ পর্যন্ত কমিশনার বা কালেক্টার ছিল? কিন্তু র‍্যামকিন সাহেব একবার কালেকটার ছিল, পরে কমিশনার হয়। হ্যাঁ, ১৯১৬ -এর পূর্বে, বলতে পারি না কতদিন আগে, মিঃ গার্থ? হ্যাঁ, সে ছিল নবাব এস্টেটের ম্যানেজার, বলতে পারি না ১৩১৬ সালে সে ম্যানেজার ছিল কি না। ১৩১৬ সালে কি

তার মৃত্যু হয়েছিল? বলতে পারি না কোন বছরে, কিন্তু আমার দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বে। বলতে পারি না কতদিন পূর্বে। ১০ বছরের আগে নয়, কিন্তু বলতে পারি না এটা ১/২ বছর আগে কি না। বলতে পারি না এটা ৩/৫ বছর পূর্বে কি না। আপনি কি ঢাকার গঙ্গানারায়ণ রায় সম্বন্ধে জানেন? একজন গঙ্গাচরণ ডাক্তারকে জানি। কুঞ্জবিহারী চ্যাটার্জি? মনে নেই। বঙ্কিম চ্যাটার্জি? সে কলকাতায় থাকে। সে কে ? সে বই লিখেছে। কোন নাম বলতে পারেন? কখনো তার বই বড়িনি। সে মৃত। বলতে পারি না কলকাতায় কি না।

এই ধরনের স্মৃতির পরীক্ষা কাউকে স্থানচ্যুত করে না। অন্যদিকে, মিঃ গার্থের প্রতি উত্তর মনে হয় প্রকৃত স্মৃতি — স্মৃতির প্রচেষ্টা। শেখানো বুলি অন্যরকম দেখতে লাগে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বড়দালান অতিথিশালা হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছিল। বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল —

আপনার বড়ভাইয়েব থাকার ঘর থেকে আপনার ঘর কতদূর?

উঃ— তার কোন ঘর, বৈঠকখানা বা কোনটি ?

মিঃ চৌধুরী বিষয়টি বাদ দেয়। পরে সে জিজ্ঞাসা করেছিল তার ভাইয়ের ঘর অতিথিশালা থেকে কতদূর? বাদী উত্তর দিয়েছিল প্রায় ৫০ হাত দূরে। এটা সঠিক ছিল।

প্রঃ— S. B. Bardhan-এর কথা শুনেছেন?

উঃ— শশী গোবর্ধন? আমরা তার কাছে কাপড়ের ফরমায়েশ করতাম। জেরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কখন সে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ছিল, সে বলেছে সে ১২ বা ১৪ বছর বয়সে এখানে ভর্তি হয়েছিল। আবার বলেছিল নিচু ক্লাসে। কোন ক্লাস বলতে পারেনি। ৮ম শ্রেণী হতে পারে। সে সেখানে ১০বা ১৫দিন ছিল, সে প্রধান সাক্ষ্যে বলেছিল। অবশ্যই সেখানে কোন শেখানোর ব্যাপার ছিল না। প্রতিবাদীপক্ষ মতামত দিয়েছিল পরে মেজকুমার ২ বছর এই স্কুলে ছিল। ১০ বা ১৫ দিন বাদী উল্লেখ করেছিল, এটা অপ্রমাণিত হয়নি। এটা পরে দেখা যাবে যে ২ বছরের কথার চেয়ে একবছরের কম থাকার কথা বেশি সত্য নয়।

সে সংক্ষেপে আমাদের বলেছে, লাট সাহেবের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে কী ঘটেছে, যে সে কখনো তাকে বা কোন ইংরেজকে একাকী দেখেনি, তবে বড়ভাইয়ের সাথে শুধু যে ইংরেজি জানত। এর সত্য সম্পর্কে পরে যাচাই করা হবে।

অ্যান্টনি কী ম্যাকবিনের ভাই? (ফাঁদ)। না, সে মুনির ভাই। সে উপদংশ সম্বন্ধে কী বলেছিল এই তথ্যই শুধু মামলায় বাকি আছে এবং সে দার্জিলিং সম্বন্ধে কী বলেছিল সেটা তদন্ত করতে হবে, কিন্তু এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যে প্রশ্ন তার কাছে রাখা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে উত্থাপিত কোন সূত্রকে স্পর্শ করেনি।

আরেকটি বিষয় যাতে তার মনকে সামান্য আড়োলিত করতে চাওয়া হয়েছিল, তা হচ্ছে বড় দালান — ম্যানেজারের বাড়ী, এর মধ্যে ঘরের বিন্যাস এবং এর মধ্যে

আসবাবপত্র। প্রত্যেকে এই বাড়ীকে বড়দালান বলত, সত্যবাবু তার ডায়েরিতে একে বড়দালান বলেছে, কিন্তু একটি সন্দেহ উৎপন্ন হয়েছিল এই বাড়ি ও নাচঘরের দুধারে দুটি বাড়ির মধ্যে যেখানে ভারতীয় অতিথিদের রাখা হত। বিচারক সন্তুষ্ট হয়নি যে আসবাবপত্রের ইংরেজি নামের অজ্ঞতা ও এই ধরনের বিষয় চূড়ান্ত ঘটনা।

বাদীর সাক্ষ্যের দুটি বিষয় অত্যন্ত অসত্য হিসাবে আঘাত দেয়। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে সাদা শেয়াল যাকে সে বলেছে চিড়িয়াখানার পশুপাখিদের একটি। যে সমস্ত সাক্ষী এর সম্বন্ধে বলেছিল তাদের জেরা করা হয়েছিল, যদিও তারা এসেছিল একটি ভুলকে সমর্থন করতে, কিন্তু প্রতিবাদীদের একজন সাক্ষী চিড়িয়াখানায় এটা দেখে স্বীকার করেছিল (গোলাম নবী, ২৫৭)। বাদী বলেছিল যে সে শুঁড়ের উপর পা রেখে হাতির কান ধরে উপরে উঠত। প্রতিবাদীরা রানী ও মাহুত আবদুল মুনসী (৩৭) সহ সাক্ষীদের ডেকে এই প্রমাণ করতো যে সে এমন কিছু করতে পারত না, কিন্তু হাতির উপরে ওঠার জন্য বিভিন্ন স্থানে বাদামী ছিল। কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষের একজন সাক্ষী মেজকুমারকে দেখেছে বাদী যেভাবে ফলেছে সেভাবে হাতির উপরে উঠতে (প্রঃ সাঃ ২২৬, আবদুল হামিদ)। শেষোক্ত বাদী বলেছিল যে সে ডান হাতে চালনার রাশ ধরত। এখন মেজকুমারের বিষয়ে একটা জিনিস যে বিষয়ে সকলে একমত যে সে জয়দেবপুর ও ঢাকার রাস্তায় টমটম হাঁকাত। অসংখ্য সাক্ষী তার চালনার ধরন সম্বন্ধে বলেছে — সে অত্যন্ত দ্রুত ঘোড়া ছোটাত, এবং সে ডান হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরত (বাঃ সাঃ ১৬৭, ৩২৬, ৩৮৭, ৫৩০, ৪৮৯, ৭৩৬, ৬৬৬, ৭৮৯, ৮০১, ৫৮০ ও অন্যান্যরা)। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ব্রজগোপাল বসাকের, ঢাকার একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও ধনী ব্যক্তি, সে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। সে বলেছে, সে অত্যন্ত দ্রুত চালনা করত, আড়াআড়িভাবে বসত, ডানহাতে লাগাম ধরত — এটা ছিল তার রীতি। সাক্ষী নিজে একটি টমটম চালাত। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নাম বলতে পারেনি, সে কী ধরনের টমটম চালাত।

প্র: এটা কী একটা কুকুরে টানা গাড়ি না আমেরিকার গরুর গাড়ি?

উ: যে স্থানে লোক পা রাখে সেটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

আসন অনেক উঁচুতে (দেখিয়েছে ৩´-৬´´ উঁচু মাটি থেকে)। দুজনে বসতে পারত। মাঝে মাঝে তিনজন। মাঝে মাঝে তার সাথে কেউ থাকত। যখন তার সাথে সঙ্গীসাথী থাকত সে পা ছড়াত না। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সাক্ষীর কী ধরনের টমটম ছিল, সে এর নাম বলতে পারে নি। সাক্ষী শিক্ষিত মানুষ ছিল না, কিন্তু তার আয়ের প্রতি লক্ষ্য করে এটা বলা শক্ত যে সে একটি টমটমের মালিক হতে পারে না।

এখন এটা বিতর্কিত নয় যে বাদী, এই সন্ন্যাসী, জয়দেবপুরে তার ৩৭ দিন অবস্থানকালে টমটম হাঁকাত এবং পরে ঢাকাতে। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কোন অফিসার যারা সেইসময় জয়দেপুরে ছিল এবং যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, এমনকি ফণিবাবু এটা অস্বীকার করতে পারেনি। যে সব সাক্ষীরা জয়দেবপুরে বাদীর টমটম চালনার কথা বলেছে তারা

হল বাঃ সাঃ ৯৭৭, ৯৭৫, ৯১৮, ৮০৬, ৯৩৮, ৯৩৯ এবং আরো বেশি সাক্ষী ঢাকাতে চালাতে দেখেছে (বাঃ সাঃ ৪৫০, ৪৭২, ৫০২, ৬৬৬, ৭৩৯, ৭৮৯, ৮১২, ৮৩৩, ৯১৫, ৯১৮, ৯০১, ৭৯২, ৯৬১, ৭৭, ১০০৯, ১০১৫, ১০০২, ৯৭০, ৯৭৬, ৯৯৮)। তাদের সাক্ষ্য বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়নি, বরঞ্চ কোন সাক্ষ্য ছিল না। মিঃ মেয়ের বাদীকে রাস্তাতে টমটমে দেখেছিল, প্রতিবাদীপক্ষের সর্বমোহন একদিন বাদীকে দেখতে গিয়েছিল এবং তাকে একটি টমটম চালাতে দেখেছিল বাদীপক্ষের শুধু একজন সাক্ষী বলেছিল যে বাদী বাম হাতে তার লাগাম ধরে এবং সে বলতে চেয়েছিল এটি একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। বিচারক বামহাতে চালানোর মধ্যে কোন অসম্ভাব্যতা দেখেনি কেউ মতামত প্রদর্শন করেনি যে সে বাঁহাতি। ঘটনাটি হচ্ছে বাদী একটি টমটম চালাত এবং তাকে ১৯২১ সালের ৪ মে ও ৭ জুনের মধ্যে চালাতে দেখা গেছিল। এটা বিতর্কিত নয়। বিচারক এই সাক্ষ্য বাতিলের কোন কারণ দেখেনি যে সে কুমারের মত পুরানোপদ্ধতিতে চালাত না।

শেষত, একটা শব্দ লেখা যেতে পারে যাতে প্রতিবাদী পক্ষ কিছু গুরুত্ব সংযোগ করেছিল। ভাওয়ালের বিখ্যাত মিষ্টান্নের নাম করতে বলা হয়েছিল, সে 'দধিসন্দেশে'র কথা বলেছিল। সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছিল এটা দেখাতে যে এটাকে বলা হয় 'দাউদি সন্দেশ'। বাদীপক্ষের সাক্ষীরা বলেছে এটাকে বলা হয় 'দাউদি' বা 'দধি'। প্রতিবাদীপক্ষের একজন সাক্ষী একে বলেছে 'দউধি' সন্দেশ এবং এটা সামান্য উন্নতি ঘটিয়ে হবে দধি। অশিক্ষিত মানুষের একটি অভ্যাস আছে আদলাতে সাধারণ শব্দকে উন্নত করা। বিচারক লক্ষ্য করেছে বাদী তার সাক্ষ্যে একটি ক্ষেত্রে 'জিগাই' শব্দটি ব্যবহার করেছিল, জিজ্ঞাসার একটি নিম্ন রূপ। 'জিগাই' শব্দটি ভাওয়ালে প্রচলিত ছিল এবং বিচারককে তার বিপক্ষে একটি বিষয় হিসাবে এটাকে লিখতে বলা হয়েছিল। বাদী তৎক্ষণাৎ এটা ঠিক বলেছিল 'জিজ্ঞাসা'।

কেউ অবশ্য বিবেচনা করতে চেষ্টা করবে কি করে একজন অশিক্ষিত মন অপরিবর্তিত বা অজানা শব্দের প্রতি সাড়া দেয়। এই ধরনের ব্যাপার ঘটেছে এবং এর দু'একটি উদাহরণ দিতে হবে যখন এই বিষয়ের অবতারণা করা হবে যে বাদী হিন্দুস্থানী কিনা। বাদীর মনের যতখানি প্রতিবাদীপক্ষ বিচারকের কাছে জেরায় প্রকাশ করতে সতর্ক ছিল, তা সেদিনকার মেজকুমারের মনের থেকে পৃথক নয়। তার মনের বাকী অংশ তারা পরীক্ষা করেনি তার একমাত্র কারণ বিচারক মনে করতে পারে যে কাল্পনিক জ্ঞানের ভয় নয়, স্মৃতির ভয়।

মেজকুমারের অক্ষরজ্ঞান

বাদীপক্ষের মামলা ছিল যে মেজকুমার অশিক্ষিত ছিল, ইংরেজী ও বাংলায় তার নাম স্বাক্ষর করা ছাড়া, বাদীও বেশি কিছু লিখতে পারত না। এবং সে জানত না যেটা প্রমাণিত হয়েছে জেরায়।

প্রতিবাদীপক্ষের মামলা ছিল, ১৯৩৩ সালে যে বাদীপক্ষের মিঃ ঘোষালকে পরীক্ষাকালে পেশ করা হয়েছিল, কুমার একজন শিক্ষিত মানুষ। মামলাটি এইভাবে পেশ করা হয়েছিল —

"আপনি তাকে একজন সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, বাঙালি অভিজাত যুবক হিসাবে দেখেছিলেন।"

তখন ছবিটি উপস্থিত করা হয়েছিল যে কুমার একজন সুশিক্ষিত, সবধরনের খেলাধুলা জানে, ইংরেজি পোশাকের সঙ্গে পরিচিত, সাহেবদের সঙ্গে খাওয়া ও সাক্ষাত করা এবং ইংরেজিতে কথা বলতে সক্ষম। মামলার একেবারে প্রারম্ভে বাদীপক্ষের একজন সাক্ষী এই মতামত দিয়েছিল যে রাজা তার পুত্রদের সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চেয়েছিল এবং একজন সাহেবকে নিযুক্ত করেছিল তাদের শিক্ষা দিতে (বাঃ সাঃ ৩৫), এর অর্থ অবশ্যই মিঃ হোয়ারটন, কুমারদের একমাত্র ইংরেজি শিক্ষক।

প্রতিপক্ষের মতে বাদী একজন অশিক্ষিত পাঞ্জাবী, চেয়েছিল কুমারের ভূমিকায় অভিনয় করতে এবং যারা তাকে স্থাপন করেছিল, তারা তাকে এমনকি অআকখও শেখাতে পারেনি। যদিও তারা ১২ বছর পেয়েছিল এমন করার জন্য।

বিচারের সময় মেজকুমারের লেখা একটি পঙক্তিও ছিল না, শুধু বিতর্কিত ৯টি বাঙলা চিঠি ছাড়া, যেগুলি একটি সিল্ করা খামে বন্ধ করা ছিল এবং যেটি খোলা হয়নি, যতদিন বাদীর জেরা চলছিল। ঐ চিঠিগুলি বাংলাতে, উদ্দেশ্য মনে হয় মেজকুমারের দ্বারা তার স্ত্রীকে লেখা। এর মধ্যে একটা মনে হয় সে তার স্ত্রীর বোনকে লিখেছে, প্রভাবতী দেবী, ৬ বছর আগে যার মৃত্যু হয়েছিল। এই চিঠিগুলির অষ্টম চিঠির মাথায় লেখা ইংরাজিতে 'God'।

এই 'God' ছাড়া মেজকুমারের চিঠিতে আর কোন ইংরেজি ছিল না এবং পূর্বোক্ত বিতর্কিত চিঠিগুলি ছাড়া কোন বাংলা লেখাও নয়। একটি পৃথক বাংলায় স্বাক্ষরিত চিঠিকে শুধু বাদী তার নিজস্ব Exhibit বলে স্বীকার করেছিল।

বাদী সরাসরি তার পরিচিতি ঘোষণা করেছিল, বলা উচিত প্রায় প্রত্যক্ষভাবে, সত্যবাবু পদক্ষেপ নিয়েছিল, যা সে বলেছে, মৃত্যুর সাক্ষ্যপ্রমাণ নিরাপদ রাখতে এবং নিজে সরকারি উকীল রায়বাহাদুরকে নিয়ে দার্জিলিঙে গমন করেছিল। এটা ছিল ১৯২১ সালের মের পূর্বে। রায়বাহাদুর তখন থেকে এই বিষয়ে ১ম প্রতিবাদী হিসাবে কাজ করছিল। যদি মেজকুমারের কোন লেখা থাকত, এটা সোনার মত সযত্নে রাখা হত এবং এটা অচিন্ত্যনীয় যে বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে। ১৯৩২ সালে, বাহ্যত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে একজন হস্তলিপি বিশারদের মতামত নেওয়া হবে এবং শুধু মেজকুমারের একগাদা স্বাক্ষর ও বাদীর একগাদা স্বাক্ষর তার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আর কোন লেখা পাঠানোর ছিল না।

বাদীর জেরার প্রায় চারমাস পর, প্রতিবাদীপক্ষ কিছু নথি দাখিল করেছিল এবং এটা প্রমাণ করতে যে মেজকুমার সই ছাড়াও আরো লিখতে পারে এবং আরো কিছু জানতো। কিন্তু জেরায় প্রদর্শিত হয়েছে এর বেশির ভাগ বাদী জানে না। নথিগুলি Order XIII, Rule 2 of C.P.C. দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল। এর বেশির ভাগ বাদীর জেরায় ব্যবহৃত

ভাউচার ধরনের। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে শুধু মেজকুমারের স্বাক্ষর, কারো দ্বারা লেখার নীচে, এদের মধ্যে দুটিতে 'গৃহীত'-এর মতো শব্দ ছিল, যেগুলি বলা হয়েছিল, কেরানীদের দ্বারা নয়, বরঞ্চ কুমারের নিজের দ্বারা লেখা।

তিনজন কুমারের শিক্ষার বিষয়ে প্রদত্ত তথ্যের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় পার্থক্য শুধু ফলাফলে এবং পদ্ধতিতে নয়। বাদী বলেছে যে সে দুজন শিক্ষকের অধীনে ছিল, একজন দ্বারিকা মুখার্জি ও একজন অনুকূল এবং যা কিছু সে শিখেছিল, বাংলা ও ইংরেজী অক্ষর এবং কী করে উভয় ভাষায় স্বাক্ষর করা যায় এবং তারপর সময়ের প্রবাহে সে অক্ষরগুলি ভুলে গেছে এবং তার শিক্ষার যা কিছু রয়ে গেছে, তার হচ্ছে বাংলায় ও ইংরাজিতে তার নাম স্বাক্ষর করা।

জ্যোতির্ময়ীদেবী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য হচ্ছে এই — সে ও তার বড় বোন ইন্দুময়ী ১২৯৬ সনের পূর্বে একজন শিক্ষকের কাছে পড়ত, যখন দ্বারিকা মাস্টার এল, এবং তারা ও বড়কুমার যারা আগেকার শিক্ষকের কাছে অআকখ শিখছিল, তারা দ্বারিকা মাস্টারের অধীনে এল। জ্যোতির্ময়ীদেবীর বয়স তখন ৮/৯ বছর। পরে ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত, মেজকুমার ও ছোটকুমার একই শিক্ষকের অধীনে ছিল এবং তারা সকলে তার সাথে পড়তে যেত ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত যখন মেজকুমার ও ছোটকুমারকে কলেজিয়েট স্কুলে পাঠানো হল। বড়কুমারকে আগেই ঐ স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। মেজকুমার ও ছোটকুমার ২০/২৫ দিন ঐ স্কুলে পড়েছিল। তারপর ফিরে এল ও আবার তারা দ্বারিকা মাস্টারের অধীনে এল। এবং আরেকজন শিক্ষক অনুকূল বাবু। সে জানে না এর বেশি কী উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু নীট ফলাফল হয়েছিল, বড়কুমার কিছু শিখেছিল এবং তাকে দেখা যেত ইংরেজি খবরের কাগজ পড়তে, কিন্তু অন্যদুজন ছিল ভীষণ অন্যমনস্ক এবং তাছাড়া মেজকুমার ছিল গণ্ডমূর্খ এবং কিছুই শিখতে পারেনি, বাংলায় ফলা বানান বা সরল বানানের পরে। ১৩০০ সনের পরে জ্যোতির্ময়ীদেবীর তথ্য অগ্রসর হয়নি, কিন্তু কুমারের ভাগ্নে বিলু ১৩০৬ সালে একই শিক্ষকের অধীনে এসেছিল। মেজকুমার ও ছোটকুমার তখনো একই শিক্ষকের অধীনে ছিল। তাদের সাথে পড়ত লালা ওরফে অমূল্য ও জনৈক বালা। সে মেজকুমারের দুরন্তপনা বর্ণনা করেছে, যে ঘরে পড়ত সেখানে প্রত্যেক ছাত্রের টেবিল হিসাবে একটা কাঠের বাক্স ছিল এবং তারা ফরাসের উপর বসত, বাক্স থাকত সামনে, পড়ার ভান করত তারা। সাক্ষীর মনে নেই কী বই মেজো ও ছোটকুমার পড়ত, কিন্তু তারা ইংরেজি বইয়ের সাথে বাঙলা বই পড়ত এবং তারা ah, ad, at এবং এইরকম শব্দগুলি লিখত। এই সময়ে বড়কুমার আদৌ পড়ছিল না। রাজার মৃত্যুর সাথে মেজ ও ছোটকুমারেব পড়া সাঙ্গ হল। যেটা একটি স্বীকৃত ঘটনা।

প্রতিবাদীপক্ষের প্রদত্ত তথ্য ছিল ফণিবাবুর দ্বারা প্রদত্ত যে ছিল ছোটকুমারের সমবয়সী। তার তথ্য হচ্ছে :—

১২৯৮ থেকে ১৩০০ সন পর্যন্ত সাক্ষী ও ছোটকুমার চা বাগানের মালিক মিঃ

ট্রানসবেরির অধীনে পড়ত। তাদের বয়স তখন ৫ বছর। দুপুরবেলা পড়ত রাজবাড়ি স্কুলে। দ্বারিকা মাস্টারের অধীনে। মেজকুমার এদের একজনের কাছে পূর্ব থেকেই পড়ছিল এবং সে তাকে আরো অগ্রসর বলেছে।

১৩০০ — কুমারেরা ঢাকায় যায়। জ্যোতির্ময়ীদেবীর শিক্ষা শেষ হয়, সে নিজেও বলেছে এটা।

১৩০০ থেকে ১৩০৩ --- মেজকুমার ও ছোটকুমার ফিরে আসে।

১৩০৩ --- সাক্ষী ঢাকায় পড়তে যায়।

১৩০৭ --- কুমারদের শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৩০৯ — সাক্ষী তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া ছেড়ে দেয়, ফিরে আসে, দেখে মেজকুমার ও ছোটকুমার ইংরেজিতে তার মতোই ভাল তবে মেজকুমার বাঙলাতে একটু দুর্বল।

মেজকুমার ইংরেজি পড়তে পারত এবং সামান্য অঙ্ক ও নাম তা শিখেছিল ১৩০০ সনে।

১৩০৩ সনের শেষে কী বই সে পড়ছিল, সে মনে করতে পারে না, কিন্তু পবে ফলেছে রয়্যাল রিডার নং ৩ যখন সে ও ছোটকুমার Royal Reader No 1 পড়ছিল। বাদী 'নামতা' জানত না এবং সরল বিয়োগ করতে পারত না এবং বলেছিল সে গুনতে পারে না, যদিও সে তার সাক্ষ্যের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যা প্রদান করছিল।

জ্যোতির্ময়ীদেবী ও বিলুর থেকে এই তথ্য পৃথক। তাদের মতানুসারে ফলাফল হচ্ছে অআকখ-র জ্ঞান, সরল বানান, ও লেখা, যেখানে ফণিবাবুর মতানুসারে হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে একজন বালকের জ্ঞান যেমন হয়। সে দেখেছিল মেজ ও ছোটকুমার তার মতোই ভাল, ছোটকুমার বাঙলাতে তার চেয়ে একটু কাঁচা।

এই তথ্য মিথ্যা। প্রথম ক্ষেত্রে ফণিবাবু একটি প্রাক সাক্ষ্যে বলেছিল যে সে এন্ট্রান্সের সময় স্কুল ছেড়েছিল অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্লাসে। দ্বিতীয়ত, এই মিঃ ট্রান্সবেরিকে একজন চা বাগানের মালিক, এই শিক্ষাকালেব মধ্যে রাখা হয়েছে একজন সাহেবের বিকল্প হিসাবে। বলা হয়েছিল রাজা চিন্তিত ছিল যে তার পুত্রদেব সাহেবদের সাথে মেশা উচিত। একজন নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের শিক্ষা দেবার জন্য। যে সাহেব তার মনে ছিল সে অবশ্যই হোয়ারটন। কিন্তু তার পদত্যাগপত্র প্রমাণ করেছিল এবং প্রদর্শন করেছিল যে সে রাজার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিযুক্ত হয়নি এবং সে রানী বিলাসমণি কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল। যে চা বাগান মিঃ ট্রান্সবেরী কাজের জন্য ব্যবহার করত, সেটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং ১২৯৬ সন নাগাদ সে স্থানত্যাগ করে, জ্যোতির্ময়ীদেবীর মতানুসারে। যদিও সে আসত, পরিদর্শন করত ও বড়দালানে থাকত। মতামত হচ্ছে যে সে থাকত এবং ১৩০০ সনের ফাল্গুন পর্যন্ত শিক্ষক হিসাবে বেতন নিত। কিন্তু এটা শুধু ফণিবাবুর একার সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। কেউ অস্বীকার করেনি যে চাবাগান ১২৯৬ সন নাগাদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল যখন মেজকুমারের শিক্ষা আরম্ভ হয়নি।

তারপর এই সাক্ষ্য গিয়েছে ১৩০০ সন নাগাদ কলেজিয়েট স্কুলের বিষয়ে। বাঃ সাঃ ৯ গঙ্গাচরণের এই বক্তব্য যে মেজকুমার এই স্কুলে ছিল প্রায় দুবছর। ফণিবাবু বলেছে প্রায় একবছর।

কিছু ছাত্র, যারা ঐ সময়ে স্কুলে ছিল, সমর্থন করেছে বাদীর বিবৃতি যে সে ১০/১৫ দিন ঐ স্কুলে ছিল, সে ও ছোটকুমার সবচেয়ে নীচু ক্লাসে — ৮ম বি — এবং তারা একটি ফিটনে চড়ে আসত এবং সেখানে তাদের জন্য একটি তাবু খাঁটানো ছিল চা পানের জন্য, তারা কিছু পড়ত না, কিন্তু রাজার ছেলেরা খেলাধুলা করত, বাঃ সাঃ ৭৯২ -- রাজেন্দ্রকুমাব রায়, ঢাকার একজন উচ্চপদের ভদ্রলোক; বাঃ সাঃ ৯৯৭,-- কামিনীবাবু যে একই ক্লাসে ছিল; বাঃ সাঃ ৯৭৬-- অমূল্য সেন, B.L., যে ওকালতি করে না যদিও সে চিন্তা করতে ভুল করেছিল যে মিঃ মোহাতাব ঘোষ ৮ম বি ক্লাশে ছিল — পরে তারা উঁচু ক্লাসে যায়।) এই বিষয়ে স্কুলে অবশ্য আরো অনেকে ছিল যারা সাক্ষ্য দিতে পারত যদি রেজিস্টার না বর্তমান থাকত, কোন সাক্ষ্য নেই যে প্রতিবাদিপক্ষের দ্বারা কাউকে ডাকা হয়েছিল সাক্ষ্য দিতে।

পুরো তথ্যটি মিথ্যা উপাদানের দ্বারা আন্দোলিত হয়েছে। যেমন-- ফণিবাবু থার্ডক্লাসে তার শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এবং মিঃ ট্রান্সবেরি এবং একটি ঘটনা যে ফণিবাবু কুমারদের সাথে তার শিক্ষা পুনরায় আরম্ভ করেছিল — তাদের ঢাকা থেকে আসবার পরে দেখা যাচ্ছে যে তার পরিবার ১৩০০ সনে নয়াবাড়ীতে উঠে যায় বা ১৩০৩ সালে নয় — ফণিবাবু অনুমোদন করেছে যে 'গৃহপ্রবেশ' ১৩০০ সনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাছাড়া অন্য ঘটনার দ্বারাও। রাজার চিন্তাকে পাশে সরিয়ে রেখে একজন অর্ধশিক্ষিত শিক্ষকের নিযুক্তির সামান্য সাক্ষ্য এবং পরে একজন ভাল শিক্ষকের নিযুক্তি, অনেক ছেলেমেয়েকে শিক্ষা যাকে ফণিবাবু বলেছে স্কুল এবং যার মধ্যে সে পরিচয় দিয়েছে বাইরের বালকদের, এটা অসম্ভব যে দুজন বালক যারা প্রায় ৯ বছর শিক্ষকের অধীনে পড়াশুনা করেছে, তাদের অন্তত সামান্য কিছু শেখা উচিত। কিন্তু ফলাফল দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়েছিল নির্দিষ্ট কিছু চিঠি থেকে যেগুলি প্রতিবাদী নিজেরা দাখিল করেছিল। এখন ছোটকুমার বাঙলা লিখতে পারে এবং জ্যোতির্ময়ীদেবী পুনরায় বলেছে, বড়কুমারের মৃত্যুর পর, যখন সে 'কর্তা' হয়েছিল, তখন সে পুনরায় বাঙলা লিখতে পড়তে শুরু করল এবং ৫টি চিঠি দাখিল করা এটা দেখাতে যে এটা ছিল ঘটনা (Ex. 38 to 43)। চিঠিগুলিতে তারিখ আছে কিন্তু বছর নেই এবং আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রদর্শন করে যে এগুলি বড়কুমারের মৃত্যুর পর লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি, যেমন, পানুর উল্লেখ করেছে যে ১৩১৮ জন্মেছিল। আরেকটিতে সে গর্ব প্রকাশ করছে, "আমি এর পর থেকে নিজের হাতে লেখবো — আমি সামান্য ইংরেজী বলতে পারি, কিন্তু এখনো লেখায় ঘাটতি আছে —তুমি যেভাবে উপদেশ দিয়েছ, আমি সেইভাবে ইংরেজি শিখতে চেষ্টা করব।"

সে লিখতে পারে এটা দেখানোর পূর্বে, প্রতিবাদী দুটি চিঠি দাখিল করেছে, একটি তারিখ ১৩১৪ সন এবং অন্যটিতে তারিখ নেই, শুধু মাসের উল্লেখ আছে (Z145 ও

146)। বক্তব্য হচ্ছে যে ছোটকুমার চিঠি লিখতে ও পড়তে শুরু করেছিল. এটা নতুন নয়। জানুয়ারি ১৯৩৪-এর একেবারে শুরুতে, একজন সাক্ষী বলেছিল, যখন সূত্রটি অন্য কারো মনে ছিল না, যে ছোটকুমার মেজকুমারের মতোই অশিক্ষিত ছিল, কিন্তু পরে, সে উন্নতি করেছিল। এখন এটা মুহূর্তের জন্য সরিয়ে প্রশ্ন করা যায় যে এই চিঠিগুলি প্রকৃত কিনা বা অন্য সেটটি। প্রতিবাদী দুটি চিঠি দাখিল করেছিল, যেগুলি ছোটকুমারের অন্তত ২১ বছর বয়সের লেখা দেখাতে দাখিল করা হয়েছিল যে শিক্ষকদের কাছ থেকে নীট তারা কী শিখেছে। লেখাটি ছিল শিশুর দ্বারা লেখা 'আমি' কে লেখা হয়েছে 'ইয়ামি' বলে এবং অ্যাম্ লেখা হয়েছে 'ইয়াম' হিসাবে। এটা সদ্য লিখতে শেখা কারো দ্বারা লেখা, এটা ছোটকুমারের মামলার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে জালিয়াতির বিরুদ্ধে নয়, চিঠিগুলি ছিল বা তত্ত্বাবধান ছাড়া লেখা হয়েছিল এবং এমনকি একটি জালিয়াতিও উচুতে স্থাপন করা যায় না।

এই চিঠিগুলি প্রতিবাদীদের নিজস্ব মামলার ক্ষেত্রে একটি ভাল নির্দেশ — ছোটকুমারের ক্ষেত্রে ৭ বছর শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার পর কতখানি সফল হওয়া যেতে পারে। এখন যারা মেজকুমারকে জানত তাদের সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করা যাক।

বাঃ সাঃ ৬২ রেবতীবাবুকে একজন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তার ডিগ্রী নেওয়ার পর, ১৮৯৯ সালে জয়দেবপুরে স্কুলে এবং সেখানে ১৯০২ সালের একটি দিন পর্যন্ত কাজ করেছিল। সে বলেছে যে সে মেজকুমারকে মৌখিক ইংরাজি শেখাতে নির্দেশ পেয়েছিল। সে বলেছিল যে বাদী ইংরেজির একটি অক্ষরও জানত না এবং সে grass, yes, no, bad, good ইত্যাদি ধরনের শব্দ শেখাতে চেষ্টা করেছিল এবং কোন ফল হয়নি। সে বুদ্ধিমান ছিল, কিন্তু মন ছিল না।

এই সাক্ষ্যকে একাকী দাঁড করানোর প্রয়োজন নেই, এটা অকাট্য ও উভয়পক্ষের সাক্ষীর দ্বারা নিশ্চিত। বড়কুমারের শুধু ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল। মিঃ র‍্যামকিন বলেছে যে সে স্বচ্ছন্দে ইংরাজিতে কথা বলতে পারত। মিঃ স্টিফেন (বাঃ সাঃ ১১২) বলেছে সে তার সাথে ইংরেজিতে কথা বলত। কিন্তু হিন্দীর দুর্বলতা ছিল এবং অন্য দুজন কুমার তার সাথে সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলত। এখন নীচে দৃষ্টিপাত করা যাক ---

(১) মিঃ হোয়ারটন রাজার মৃত্যুর পর তিনজন কুমারের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ইংরেজি শেখাত এবং সেখানে ১ বছর ছিল। ২৫-৭-০২ তারিখে তার পদত্যাগপত্র আগে উল্লেখিত হয়েছে এবং যা নিদারুণ বিরক্তিতে ভরা, সে বলেছে (Ex. 4) ---

"আপনার ছেলেরা শুধু সম্ভাব্য সবরকমভাবে তাদের পড়াশুনায় অবহেলা করে না, তাদের উত্তরোত্তর বর্ধিত বাজে অভ্যাস বদলানোর চেষ্টাও করে না কোনভাবে এবং আমার কাছে সাক্ষ্য আছে, আমার উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করার কোন ইচ্ছা নেই তাদের।"

বাদী বিবৃতি দিয়েছিল যে মিঃ হোয়ারটন তাকে কিছুই শেখায় নি। বরঞ্চ আস্তাবলের দেখাশুনা করত। এটা পদত্যাগপত্রে দেখা গিয়েছে।

(২) ১৯০৪ সালে মিঃ মেয়ের কালেকটারের কাছে এস্টেটের ঘটনায় রানী বিলাসমণির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রিপোর্ট করেছে। তার নিয়োগকর্তা বলেছে (EX 284) "দুজন তরুণ কুমারের বিষয়ে আপনি নিজে জানেন যে তাদের সঙ্গে কোন কিছু করা অসম্ভব। তারা প্রতিনিয়ত বাজে সঙ্গীসাথীদের দ্বারা পরিবৃত থাকে যারা নিছক তাদের ঠকায় ও সমস্ত রকমের কুকর্ম করায়।" আরো —

"যতদূর বুঝতে পারি দুজন কুমার নিঃসহায়। তারা কোন শিক্ষা পায়নি। বড়কুমার একজন ভাল মনের ছেলে। যতদিন আমি আছি, ততদিন সঠিক আলো দেখাতে সাহায্য করতে পারি। ওর ব্যবসার ক্ষমতা আছে।"

এটা লিখে নিতে হবে যে সে দুজন কুমারের সাথে বড় কুমারের পার্থক্য করছে, সামান্য শিক্ষিত এবং ইংরেজীর ভাসা ভাসা জ্ঞান আছে। যাইহোক স্বল্প বা শিক্ষাহীন বলতে প্রকৃতই তাই।

(৩) ২৬-৪-০৫ তারিখে রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, এস্টেটের পুরাতন ম্যানেজার যে কুমারদের জন্ম থেকেই জানত এবং তাদের শিক্ষাকালে জয়দেবপুরে ছিল, বড়কুমারের কাছে চিঠিতে অভিযোগ করছে ঢাকায় এলেও সে তার সাথে দেখা করেনি, তার সদ্য প্রকাশিত এক বইয়ের কথা উল্লেখ করেছে এবং প্রস্তাব করেছে তাকে এটি উৎসর্গ করবার এবং একজন কেরানীর কথা জিজ্ঞাসা করছে যে তাকে নতুন বই প্রকাশে সাহায্য করতে পারে। এই চিঠিতে সে যোগ করেছে, তুমি কী দেখার ব্যবস্থা করতে পার না যে স্বল্প ইংরেজি দুজন শ্রীমানের মুখ থেকে নির্গত হতে পারত ? তোমার সঙ্গী-সাথী পোষ্যদের মুখ থেকে মহারাজা ডাক কোন কাজের নয়। এটা আগতদের কাছে প্রাপ্ত সম্মান (Ex. 42)।

(৪) ৫২ বছর বয়স্ক বাঃ সাঃ ১৪৫, মিঃ লাহিড়ী। কলকাতা হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট এবং উচ্চস্থানাধিকারী ভদ্রলোক। সে রাঠোরের মহারাজার একজন জামাই ও কলকাতার নাগরিক। সে এই পরিবারকে জানত না, একবার ছাড়া, ১৯০২ সালে সে ঢাকার সুসাঙ হাউসে অবস্থান করছিল এবং ভাওয়াল রাজের ঢাকার বাড়ির এক সান্ধ্য মজলিসে যোগদান করেছিল এবং এই উপলক্ষে বড়কুমারের সাথে পরিচিত হয়েছিল। দুজন ছোট কুমার এই পার্টিতে ছিল না এবং সে কিছু শুনে ছিল যে মেজকুমাব কোথায়। সে সুসাঙ পরিবারের মিঃ সুরেশচন্দ্র সিংহের সাথে এই পার্টিতে গিয়েছিল এবং এটা মনে পড়বে যে জেরায় বাদী তার নাম বলেছিল এবং বাদীর এটা মনে ছিল। মিঃ লাহিড়ী বলেছে যে ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে বা ১৯০৯ সালের জানুয়ারিতে মেজকুমার দিগেনচন্দ্র ব্যানার্জির সাথে ল্যান্সডাউন রোডে তার বাড়িতে এসেছিল। স্বীকৃতভাবে উভয়ে তখন কলকাতায় ছিল। দিগেনচন্দ্র একজন কেরানী ছিল। মিঃ লাহিড়ী বলেছে উভয়ে একটি টমটমে চড়ে এসেছিল এবং দিগেনবাবু তার সহপাঠী ছিল, কুমারের পরিচয় দিয়েছিল। মেজকুমার একটি লুঙ্গি পরে ছিল এবং তাদের মধ্যে 'বাঙাল ভাষায়' কিছু

আলোচনা হয়েছিল এবং সে তাকে তার বাসায় আসতে বলেছিল। সাক্ষী জিজ্ঞাসা করেছিল, বাসাটি কোথায়, সে বলেছিল এটা 'ওয়ালিশ ইস্ট্রিটে।' দিগেনবাবু ব্যাখ্যা করেছিল এটার অর্থ ওয়েলেসলি স্ট্রিট এবং সাক্ষীর এটা মনে ছিল উচ্চারণের কারণে। অ্যালেক ডি'কোস্টা (প্রঃ সাঃ ৪৩) ওয়েলেসলি স্ট্রিটের বাড়ি সম্বন্ধে বলেছিল যেখানে কুমার ১৯০৮-০৯ সালে কলকাতা পরিদর্শনের কালে অবস্থান করেছিল এবং বলেছিল 'ওয়ালিশ ইস্ট্রিট'। সে ছিল একজন অশিক্ষিত রাঁধুনি।

মিঃ লাহিড়ীকে বারবার জেরা করা হয়েছিল এ ব্যাপারে। মেজরানী বলেছিল, যে বলেছে তার স্বামী ওয়েলেসলি স্ট্রিট উচ্চারণ করতে পারে না সে একজন মিথ্যাবাদী। তার নিজের সাক্ষী, মিঃ আর. সি. সেনের, বার-অ্যাট-ল (প্রঃ সাঃ ৪৩৩) প্রতি লক্ষ্য করা যাক। সাক্ষী প্রমাণ করতে এসেছিল ১৯০৫ সালে মেজকুমার ভাইসরয় কাপে যোগ দিয়েছিল এবং সে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। সাক্ষী মিথ্যাচরণের উর্ধ্বে নয়, দেখা যাচ্ছে সে স্বীকার করেছে একটি মামলার কারণে একটি ঘটনার সমর্থনে একটি এফিডেবিট বিষয়ে হলফ করেছিল এবং আরেকটি মামলার কারণে বিপরীত হলফ করেছিল, যদিও প্রতিবাদহীনভাবে নয় এবং তার সাক্ষ্যের একটি অংশ মুছে ফেলা হয়েছিল একটি নথির দ্বারা যেটা বর্তমানে উল্লেখ করা হবে। এখন এই ভদ্রলোক বলেছিল যে সে ১৯০৫ সালে কুমারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল, (ডিসেঃ বা জানুঃ তে) এবং আবার ভাইসরয় কাপের দিনে (২৬ ডিসেঃ যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল)। সে নিশ্চিতভাবে বছরটি নির্ধারণ করেছিল। কারণ সেই বছর প্রিন্স ওয়েলস্ এসেছিল। সে আগমন করেছিল ২ জানুঃ এবং এই উপলক্ষে ১৯০৬ সালের ২ বা ৩ জানুয়ারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল। এখন এই রেসের দিনে, সাক্ষী মেজকুমারের সাথে সাক্ষাৎ রেসের মাঠে। সে বলেছে কুমারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে Lesley & Co.-এর মিঃ লিসলে-র এবং জয়দেবপুরের পুরানো চাবাগান নিয়ে তাদের মধ্যে ইংরেজিতে কিছু আলোচনা হয়েছে। যে বাগানটিকে ১৫ বছর পূর্বে তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। সাক্ষী বলেছে যে কুমার মিঃ লিসলের সাথে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলেছে। ব্যাখ্যা হিসাবে সাক্ষী বলেছে : কুমার বলেছিল, "টি গাডেন গান, অর্থাৎ টি গার্ডেন গান। সাক্ষী বলেছে পি লিসলের অসুবিধা হয়েছিল 'গাডেন' কথাটি অনুসরণ করতে এবং আমাকে মাঝে মাঝে বোঝাতে হয়েছিল।

এখন একটা উদ্দেশ্য ছিল এই সাক্ষীর মাধ্যমে ইংরেজি সম্বন্ধে আরো কিছু জানা, ছুরি ও কাঁটাচামচ সম্বন্ধে কিছু এবং সাক্ষী পেনিটিতে আহারের বিষয়ে বলতে শুরু করেছিল যেখানে কুমার উপস্থিত ছিল এবং ছুরি ও কাঁটাচামচের দ্বারা তার আহার গ্রহণ করেছিল। মিঃ জে. এন. রায়, Bar-at-Law, আহারের নিমন্ত্রণ করেছিল। জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এই ধরনের লোক - কুমারের মত পেনিটিতে যেত কিনা, সে বলেছে —

"আমি রামকে জানি যে একটি ইংরেজি কথাও বলতে পারে না, কি করে লোকের সাথে ব্যবহার করতে হয়, জানে না, পেলিটিতে আসে .... সাধারণ মানুষের মত যে

উচ্চারণ করত 'Tea goden gan'। কিন্তু এই উপলক্ষে এটা এমন ছিল না, কারণ মিঃ রে তাকে একজোড়া টাট্টু সহ বাইসাইকেল চাকাযুক্ত একটি ব্রুহাম্ গাড়ি উপহারের জন্য ধন্যবাদ দিতে আহারের আয়োজন করেছিল। মেজকুমার গিরিধারীলালের (অতিথি) সাথে হিন্দীতে কথা বলেছিল।''

সাক্ষী তাকে ইংরেজি বলতে শোনেনি, একমাত্র রেসের দিনে 'Tea goden gan' ধরনের ইংরাজি ছাড়া। প্রতিবাদীপক্ষ লাঞ্চের ইংরেজিকে ইংরেজির সাক্ষ্য হিসাবে পরিচিত করাতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। সাক্ষী পুরোনিশ্চিত ছিল লাঞ্চ ছিল রেসের পূর্ব দিনে ১৯০৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। ২৫শে ডিসেম্বর মেজকুমার জয়দেবপুরে ছিল এবং ডিসপেনসারির সেক্রেটারি হিসাবে একটি চিঠিতে সাক্ষর করেছিল।

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
সম্পাদক, জয়দেবপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়,

প্রতি,
সিভিল সার্জন, তাং ২৫শে ডিসেঃ ১৯০৫
ঢাকা,
মহাশয়,

আমি এখনি ২ তারিখের আপনার চিঠির এবং পূর্বের আদানপ্রদানের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে প্রার্থনা করি এবং এই বিষয়ে দয়া করে শীঘ্র উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করি, কৃতজ্ঞতা সহ —

রমেন্দ্রনারায়ণ রায়
আপনার বিশ্বস্ত সম্পাদক

যাহাতে কেরানী সই করার স্থানটি নির্দেশ করেনি। এই চিঠির স্বাক্ষর রায়সাহেব নিজে প্রমাণ করে। এটা কল্পিতভাবে একটা দুর্ঘটনা হতে পারে, যদিও কুমার কখনো পান করত না। এটা উপসংহারকে প্রায় নিশ্চিত করে যাতে কঠিন ঘটনাগুলি মিথ্যার ভিড়ের মধ্য দিয়ে ভাঙছে।

এবার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে পরীক্ষা করার যাক, যদিও এরকম করা বৃথা। অসংখ্য সাক্ষী বাদীর তরফে বলেছে যে মেজকুমার লিখতে পড়তে পারে না, শুধু নাম সই করা ছাড়া। এদের কারো কারো উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে উল্লেখিত বাঃ সাঃ ৬২ রেবতী বাবু, ঢাকার একজন উকীল মিঃ স্টিফেন যে বলেছিল দুজন কুমার তার সাথে হিন্দীতে কথা বলেছিল — বাঃ সাঃ ১৫৫, মণীন্দ্র বোস, ইউনিভার্সিটির লেকচারার, কিন্তু পূর্বে ছিল জয়দেবপুরে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক, বলেছে যে মেজকুমার ইংরেজী জানত না এবং এটা সে সংগ্রহ করেছিল তার সাথে কথাবার্তা বলার সময়। সে ইংরেজি বুঝত না। যোগেশ রায়, বি. এ. জয়দেবপুরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বলেছে যে সে মেজ ও ছোটকুমারকে কখনো ইংরেজি বলতে শোনেনি। মিঃ এন. কে. নাগ, ব্যারিস্টার, কখনো

মেজকুমারকে ইংরেজির একটি শব্দকে উচ্চারণ করতে শোনেনি যদিও সে ঘনিষ্ঠভাবে যৌবনে তার সাথে মিশেছিল। মিঃ পি. সি. গুপ্ত ইঞ্জিনীয়ার কখনো শোনেনি 'হাউ ডু ইউ ডু'-এর মতো অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। পুরানো অফিসাররা দেখেছে তার সামনে রাখা কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যে নয়। মিঃ জি. সি. সেন, বীমার দালাল (বাঃ সাঃ ৮৯) মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছিল যে আদৌ দালাল ছিল না, যতক্ষণ না বীমার ডাক্তারের রিপোর্ট, যা মনে করা হয়েছিল স্কটল্যান্ডে আয়ত্তের বাইরে, এসে পৌঁছায় এবং সাক্ষী হলফ করে বলে ডাঃ ক্যাডির প্রতিটি প্রশ্ন তাকে অনুবাদ করতে হয়েছিল, তাকে যেখানে সই করতে বলা হয়েছিল সেখানে সই করেছে, সে এই ধরনের মানুষ নয় যে পলিসির মিয়মকানুন বুঝতে সতর্ক হবে এবং তার ধারণা মেজকুমার পুরোপুরি অশিক্ষিত ও কষ্টে সৃষ্টে সই করতে পারা ছাড়া।

তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উকীলবাবু সন্ন্যাসীচরণ রায়, সদর আঞ্চলিক সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য ও ধনীব্যক্তি এই তিনজন কুমারকে একদিন, ১৮৯৭ বা ৯৮ সালে, এস. পি. মিঃ তুকেরের বাড়িতে দেখেছিল। মেজকুমারের বয়স তখন প্রায় ১৪ বছর। ম্যানেজার, রায়বাহাদুর K. P. Ghosh কুমারদের মিঃ তুকেরের বাড়িতে এনেছিল। "মি তুকের তাদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল ইংরাজিতে। তারা উত্তর দিল না, কিন্তু হাসল। তারপর মিঃ তুকের বাঙলায় কথা বলল, এবং কুমাররা বাঙলায় উত্তর দিল। প্রত্যেকে কথা বলল কিনা বলতে পারি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে বড়কুমার বলেছিল।"

১৯০০ সালে কুমারের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে সে একটি বই পড়ে বা তার একটি বই ছিল বলা যেতে পারে।

১৯০৬ সালে পুজার পর, স্কুল ইন্সপেক্টর মিঃ স্টিফেন জয়দেবপুরে রানী বিলাসমণি স্কুল পরিদর্শন করে। স্কুলে কর্মরত (প্রঃ সাঃ ১৪) একজন শিক্ষক সময়টি উল্লেখ করেছে। মিঃ যোগেশ রায় একজন উকীল, ঈশ্বরগঞ্জের (বাঃ সাঃ ৯০৯), তখন ঐ স্কুলে পড়ত। সে বলেছে যে ঐ উপলক্ষে মেজকুমার একটি চাপকানএবং পায়জামা পরিধান করেছিল এবং সেক্রেটারী রায়সাহেব মিঃ স্টিফেনকে দেখতে স্টেশনে গিয়েছিল, বালকেরাও সাহেবকে দেখতে স্টেশনে গিয়েছিল যেহেতু ঐ উপলক্ষে স্কুল ছুটি হয়েই গিয়েছিল। সে বলেছে যে মিঃ স্টিফেন, মেজকুমার ও রায়সাহেব স্টেশনে ওয়েটিংরুমে ট্রেনের জন্য বসে অপেক্ষা করেছিল। সেক্রেটারী সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিল। যখন সেক্রেটারী ঘরের বাইরে গেল, সাহেব ইংরেজিতে মেজকুমারকে প্রশ্ন করে। সেক্রেটারী ভেতরে এসে সাহেবকে ব্যাখ্যা করে যে সে ইংরেজি জানে না এবং মিঃ স্মাইল্ড মৃদু হেসে বলল, "আমি ওর সাথে বাংলায় কথা বলব।"

রায়সাহেব প্রায় পুরো ঘটনার কথা স্বীকার করে শুধুমাত্র কুমার ইংরেজি জানে না, এটা ছাড়া।

এই বিষয়ে সমস্ত সাক্ষীদের সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কোন বিশেষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর কবার প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে প্রমাণের বাধা প্রতিবাদী, কিন্তু নেতিবাচক বিষয় প্রমাণিত হয়েছিল। মিঃ হোয়ারটনের চিঠি ছিল। মিঃ মেয়েরের রিপোর্ট ছিল। রায়বাহাদুর কে. পি. ঘোষের চিঠি, ডিসপেনসারির চিঠি ছিল। প্রতিবাদীদের নিজস্ব সাক্ষী ছিল 'Tea gaden gan', ওয়ালিশ ইস্ট্রিট, ছিল যেগুলি বিচারক সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে যে মেজকুমার উচ্চারণ করেছিল। এটা বিনাকারণে নয় যে রায়বাহাদুর এস. পি. ঘোষ, প্রতিবাদীপক্ষের, যে জয়দেবপুরে ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে কুমারদের সাথে এসেছিল, তাকে প্রতিবাদীপক্ষ শিক্ষার বিষয়ে একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করেনি। জেরায় সে বলেছে, "তার বাবার জীবদ্দশায় তিনকুমার সামান্য লিখতে পড়তে শিখেছিল। পরে, বাবার মৃত্যুর কিছু পরে, সে অত্যন্ত দুরন্ত হয়ে ওঠে। আমি কেমন করে বলব সে কী করেছিল, বাবার মৃত্যুর পর তার যৌনজীবন অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠেছিল।"

তা সত্ত্বেও মেজরানী, বেশ কিছু সাক্ষী — ছোটরানী, ফণিবাবু, বীরেন্দ্র, রায়সাহেব, সত্যবাবু বলতে এসেছিল কুমার ইংরেজি বলতে পারে এবং সত্যবাবু বলেছে যে সে তাকে শিক্ষিত মানুষ বলবে। সে কম বলতে পারেনি। কৌঁসুলীর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, "সে একজন সুশিক্ষিত ও সুমার্জিত মানুষ।" উপসংহার রেলস্টেশনে মিঃ কে সি. দের অনিশ্চিত স্মৃতিকে বিতাড়নে সমর্থ হতে পারে না এবং চায়ের মজলিশে যেখানে সে তিনজন কুমারের সাথে স্বল্পক্ষণের জন্য মিলিত হয়েছিল; লেফট্যানেন্ট হোসেনের বিবৃতির দ্বারা নয়, যে, বিলিয়ার্ডকে বাঁচাতে ১৯০৪ সালে ছোটকুমারকে পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে রেখেছিল এবং নৈশাহারের কথা বলেছে যেগুলি সব জেরাতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এবং মেজকুমারের সাথে ঢাকাতে যার সংযোগ তার কলেজ জীবনের বিচ্ছেদ দ্বারা রক্ষা করা যেতে পারে যার সম্বন্ধে সে অজ্ঞ ছিল। মিঃ র‍্যানকিন ১৯০৫ সালের ২ আগস্ট ঢাকার কালেকটারের পদ থেকে অবসর নেয় এবং ২৯ বছর পরে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কালেকটার হিসাবে তিনকুমার তাকে সম্মান জানাতে সৌজন্যমূলক নিমন্ত্রণ করে। সে বলেছে, "তারা সাধারণত একসাথে আসত, সর্বদা নয়," এবং যখন তিনকুমার আসত, তাদের সাথে কেউ আসত, সম্ভবত ইংরেজিতে সাহায্য করতে।" সে মনে করেছে যে বড়কুমার ইংরেজি বলত, অনর্গল তবে ব্যাকরণদুষ্ট এবং তার কোন নির্দিষ্ট উপলক্ষের কথা মনে পড়ে না যখন মেজকুমার তাকে একাকী দেখেছিল, সেখানে সাহায্য করতে অন্য মানুষ থাকত সে সাক্ষ্য দিয়েছে যে মেজকুমারের উচ্চারণ একজন শিক্ষিত বাঙালির চেয়ে খারাপ। বিবৃত ঘটনা থেকে বিচারক বিশ্বাস করেছে মেজকুমারের ইংরেজি 'টি গডেন গান' ব. 'ওয়ালিশ ইস্ট্রিট' -এর পরে যায়নি। লেফট্যানেন্ট গভর্নর ও মিঃ অ্যালেস বড়কুমারকে আসতে বলত 'তোমার ভাইদের সাথে।' বড়কুমারের মৃত্যুর পর এটা আশা করা যায়, ছোটকুমার সর্বদা কারো সাথে যেত। মেজকুমারের ব্যক্তিগত কেরানী বীরেন্দ্র (প্রঃ সাঃ ২৯০) বলেছে যে তার মনে পড়ে না মেজকুমার একাকী সাহেব পরিদর্শনে যেত। সে বলেছিল বড়কুমারের

মৃত্যুর পর ছোটকুমার একাকী বা কারো সাথে যেত। এই 'কেউ' ছিল যোগেন্দ্রবাবু, সে বলেছে, যোগেন্দ্রবাবু অবশ্যই এটা অস্বীকার করেছে।

এটা প্রকৃতভাবে স্পষ্ট যে মেজকুমার আদৌ ইংরেজি জানত না, শুধুমাত্র কতগুলি শব্দ যা ইংরাজিতে অজ্ঞ লোকেরা বলে। এইরূপ শব্দ বাদী তার সাক্ষ্যের সময় ব্যবহার করেছিল এবং মেজকুমারের উক্ত ইংরেজির প্রতি লক্ষ্য করে, যদি এটাকে ইংরেজি বলা যায়, তাহলে আজকে সে বাদীর মতো একই স্তরে। কুমার, গ্রামবাসী, একজন সাহেব হতে চেয়েছিল। রাজা তাদের ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষা দিতে চিন্তিত ছিল। মিঃ হোয়ারটন ছিল শিক্ষক। সে গেল, মিঃ ট্রান্সবেরি এল পড়াতে। এবং প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল যে শিক্ষকদের চেষ্টার কোন ফল ইংরেজিতে হচ্ছে না। বড়দালানে নৈশাহার ব্যর্থ হল। লর্ডকিচেনারের সাথে নৈশাহার স্থানচ্যুত হল। 'মালগুদামে' কুমারের খাবারঘর ছিল পরের চেষ্টা, কিন্তু এটাও টিকল না। ইংরেজি পোশাক, ইংবাজি খানা, হোটেলে আহার, সাহেবদের সাথে যোগাযোগ, একজন ইংরেজের শব্দতালিকা পরিকল্পনার মধ্যে রাখা হল, শেষ এল পার্টি, তার পূর্বে সত্যবাবু (প্রঃ সাঃ ৮৭) একটি ফৌজদারী মামলায় একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েকে আনে যার সঙ্গ কুমার এক গয়নার দোকানে পায় এবং ইংরেজিতে ম্যানেজারকে বলে এবং ৭,০০০ টাকায় তার গয়না কেনে যখন কুমার কলকাতায় তার ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ছিল। বিচারক দেখেছে মেজকুমার যতটুকু ইংরেজি জানত আজকে বাদীও ঠিক ততটুকুই জানে।

বিচারক লেফট্যানেন্ট পুলির উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করেনি। আগে নির্দেশ করা হয়েছে লর্ড কিচেনারের শিকারের পূর্বে কুমারের সাথে সাক্ষাৎ বিষয়ে তার তথ্য, শিকারের আয়োজনের সাথে সম্পর্কিত, গেজেটের দ্বারা যা মুছে ফেলা হয়েছিল এবং যে ঘটনার কথা সে স্বীকার করেছে যে ২২ জানু ১৯০৯ এর পূর্বে সে কুমারদের আদৌ দ্যাখেনি এবং তখন শুধু বড়কুমারকে; বিচারক নির্দেশ করেছিল যে পুলিকে বিষয়গুলি বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল যা তার জ্ঞানত ঘটেনি, যা তাকে অনুমোদন করতে হয়েছিল, মেজকুমারের ইংরেজী উচ্চারণ সহ যা সে স্বীকার করেছিল ঘটনা নয়। মিঃ ও মিসেস মেয়ের মিঃ হোয়ারটনকে জয়দেবপুরে দেখেছিল, যদিও সে আগেই চলে গিয়েছিল এবং মিঃ মেয়ের তার প্রাক্তন রিপোর্ট, প্রাক্তন বিবৃতি ও র‍্যানকিনের দ্বারা আদালতে স্থানচ্যুত হয়েছিল।

প্রতিবাদীপক্ষ হাইকোর্ট থেকে ১৯০৫ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের একটি প্রমিসারি নোট চেয়ে আনে, ১০০০০ টাকা ঋণের জন্য মেজকুমারের দ্বারা সম্পাদিত। তার স্বাক্ষরের নিচে শব্দটি দেখা যায় 'টেন্ থাউজান্ড' এবং এটা তার দ্বারা লিখিত। মিঃ জি. সি. সেন. মিথ্যাসাক্ষী এবং এস্টেটের একজন কেরানী, শ্রীশ চন্দ্র রায়ের উদ্দেশ্য ছিল এটা সত্য বলে প্রমাণ করা। ১৯০৯ সালে নোটটি সম্মতিসূচক ডিক্রী পায়। মিঃ সেনকে এ বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। শ্রীরায়কে ডাকা হয়নি, এবং তিনজন সাক্ষী — সত্যবাবু, ফণিবাবু ও রায়সাহেব বলেছে যে এই 'টেন থাউজান্ড' কথাটি মেজকুমারের

হাতের লেখা। মিঃ হার্ডলেস, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ এর সপক্ষে মতামত দেয়। বিচারক এই সব সাক্ষীদের সাক্ষ্যে কিছু গুরুত্ব দেয়নি এবং যদিও এটা অবশ্যম্ভাবী যে মিঃ সেন এর সম্পাদনের সময় উপস্থিত ছিল, যা সে সাক্ষ্য দিয়েছে। যাইহোক, বিষয়টি দেখে ধারণা করে নেওয়া হয় যে কুমার দুটি শব্দ লিখেছিল 'টেন থাউজ্যান্ড', দৃষ্টি দ্বারা বিচার কবলে দেখা যায় সে বাহ্যত এটা করেছিল, তবে জানা যাচ্ছে না যে কেউ তাকে বানান বলে দেয়নি এবং কোন ক্ষেত্রে এটা ইংরাজি বলার ক্ষমতাকে প্রমাণ করে না। এটা স্বীকৃত যে সে অক্ষর জানত এবং শিক্ষকের অধীনে অবশ্যই ইংরেজি লেখা শিখেছিল বা সে তার নাম সই করতে পারত না। এই বিষয়টি 'হাতের লেখা' বিষয়টিতে বিবেচনা করা হবে।

এখানে শুধু অন্য একটি বিষয় পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেটা বাদী জেরায় বলেছিল যে সে গুনতে পারে না, এমনকি ১ থেকে ১০, ১০ থেকে ২০, ৬০ থেকে ৭০ পর্যন্ত। সে দুটি ছোট সংখ্যার মধ্যে পার্থক্যও বিবৃত করতে পারেনি। বিচারক বিশ্বাস করেনি যে সে গুনতে পারে না, এমনকি যদিও সে একজন প্রতারক হয়, সে সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্ন জিনিসের কথা উল্লেখ করেছিল। যেমন-- এত হাতী, ঘোড় ইত্যাদি। সে দিনের সময় বুঝতে পারত না। জ্যোতির্ময়ীদেবী বলেছে যে সে জানত না একটি পয়েন্ট পর্যন্ত কী করে গুনতে হয়। ১০/২০/৩০ টাকা ইত্যাদি অঙ্কগুলি বুঝত এবং বিচারক মনে করে না যে বাদী এটা করতে পারে না। যাইহোক সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা করার কোন সূত্র ছিল না মেজকুমার ১০ টাকা ও ২০ টাকার মধ্যে পার্থক্য জানে কিনা, বা সে ১০ বা ২০ জন মানুষের মধ্যে পার্থক্য বুঝত কিনা, ধরা যাক সে ১০টাকা বা ২০ টাকা দিতে চাইত, সে পার্থক্য জানত। এই খোঁজের মধ্যে বিচারকও কিছু দ্যাখেনি। সংখ্যা না ব্যবহার করে কেউ বলতে পারে না সে ৫০ বছরে পৌঁছতে পারবে, সে রাজাই হোক বা কৃষক। মেজকুমার তার হিসাবপত্র রাখতে একজন কেরানী নিযুক্ত করেছিল। বিচারক মনে করে না তার কোন বিয়োগ করার ক্ষমতা ছিল। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে মিঃ হলধর রায়, একজন কোটিপতি, যে এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছিল, ১৩৪০ থেকে ১৩১৩ বিয়োগ করতে পারত না।

বাঙলা লেখার বিষয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাদী তার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বাঙলায় লিখতে পারত, কিন্তু বলতে পারত না কোন অংশের জন্য কোনটি হয় সঠিকভাবে, শুধু 'ম' অক্ষর ছাড়া। সে এটাও জানত 'ন্দ্র' একটি যৌগিক শব্দ। সংক্ষেপে সে অক্ষর জানত না। বাংলা বা ইংরেজিতে সমস্ত স্বাক্ষর ছিল তার কাছে একটি চিহ্ন। হাতের লেখা বিষয়ে এটা বিবেচনা করতে হবে যে এটা তার বাল্যকালে অর্জিত শিক্ষার অবশিষ্টাংশ কি না বা পরবর্তীকালে অর্জনের দ্বারা জালিয়াতি কি না, কারণ কোন সন্দেহ নেই যে স্বাক্ষরগুলি মেজকুমারের স্বাক্ষরের সাথে সাদৃশজনক।

মেজকুমারের বাঙলা হাতের লেখার মধ্যে কিছুই সৃষ্টি হয়নি শুধুমাত্র একটি পৃথক চিঠির মধ্যে (Ex. 2) একটি একক স্বাক্ষর ছাড়া তিনজন কুমার স্বাক্ষর করেছিল এবং

মাকে উদ্দেশ করে এবং বিতর্কিত একটি চিঠি, উদ্দেশ্য স্ত্রীকে চিঠি লেখাও একটি ছিল ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রমী চিঠিটির উদ্দেশ্য ছিল তার বোনকে চিঠি লেখা- প্রভাবতী দেবীকে। Ex. 2-র স্বাক্ষর প্রকৃত এবং এটাই ছিল অন্যান্য চিঠিগুলির সঙ্গে এর তুলনার মানদণ্ড। বাদী অস্বীকার করেছে যে সে চিঠিগুলি লিখেছিল এবং যে সব সাক্ষী তার শিক্ষার বিষয়ে কথা বলেছিল — জ্যোতির্ময়ীদেবী ও বিলু ও যারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত, বলেছে যে এরূপ চিঠিগুলি বা কোন বাঙলা লেখা তার পরবর্তীকালের। এটা অবশ্যই যে মেজকুমার সামান্য বাঙলা লিখত, এমনকি বাঙলা স্বাক্ষরও নয়। এস্টেটের কোন কাগজ তার বাঙলা স্বাক্ষর বহন করেনি। কোন সাক্ষী এমনকি বাদীপক্ষেরও কেউ তাকে বাঙলা স্বাক্ষর করতে দেখেনি। শুধু যতীন (বাঃ সাঃ ৯) নামে তার এক মোসাহেব ছাড়া যে বলেছে যে সে একবার তাকে তার পিসীর কাছে চিঠি লেখার জন্য ডেকেছিল এবং এতে বাঙলাতে স্বাক্ষর করেছিল। প্রতিবাদী পক্ষেরও কেউ দ্যাখোনি মেজকুমারকে বাঙলায় লিখতে। যে সব সাক্ষীরা এই সব বিতর্কিত চিঠিগুলি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে এগুলি মেজকুমারের লেখা। তারা হল ফণিবাবু, রায়সাহেব, ছোটরাণী ও বীরেন্দ্র। বিচারক বিশ্বাস করেনি তারা মেজকুমারকে বাংলা লিখতে দেখেছিল। তারা এমন বলেনি, যদিও তারা হাতের লেখা শনাক্ত করেছিল, ছোটরানী ছাড়া যে বলেছে সে মেজকুমারকে চিঠি লিখতে দেখেছে মেজরানীকে। বিচারক বিশ্বাস করেনি ছোটরাণী আদৌ মেজকুমারের কোন লেখা দেখেছে। যাইহোক, বিতর্কিত চিঠিগুলি অবশ্যই মেজরানীর একক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে এবং প্রশ্ন হচ্ছে এটা বাদীকে পরাজিত করতে ষড়যন্ত্র বা প্রকৃত কি না।

চিঠিগুলিও তাদের সূচী সংক্ষেপে নির্দেশ করা যেতে পারে। কুমাররা অনবরত যাতায়াত করত ঢাকায় সাময়িক পরিদর্শনের জন্য ও তাদের নিজের বাড়িতে অবস্থান করত। তাদের অবস্থানকালে তাদের পিওন জয়দেবপুর থেকে ঢাকায় আসত এবং এটা বলা হয় যে চিঠিগুলির বেশিরভাগ ঢাকা থেকে জয়দেবপুরে লিখিত এবং পত্রবাহকের দ্বারা প্রেরিত। তারিখসহ চিঠিগুলি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ — তার সূচীগুলি এভাবে দেওয়া যেতে পারে —

(১) ২৫ শে শ্রাবণ, ১৩০৯ X(9) Z(142)(1)

কাল ১২ টার সময় লাট সাহেব আসবে ও কমিশনারের বাড়িতে রাত কাটাবে। আজ দুপুরবেলায় আমি কমিশনারকে দেখেছিলাম। আমি তোমাকে বলব এবং কী আলোচনা হয়েছিল তার সাথে যখন আমি বাড়ি যাব।

(২) ৩০শে বৈশাখ, ১৩১১, X(7) Z(143)

প্রভা, শ্যালিকা, মেজরানীর ছোট বোন,

অন্যান্য বিষয়ে মধ্যে বলা হয়েছে

"এতদিন তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি না পেয়ে আমি মনে করেছি তুমি আমার প্রতি রাগ করেছে, আশা করি ধারাবাহিকভাবে তুমি আমাকে লিখবে।"

চিঠিটি নির্দেশ করে এই দুটি আদন-প্রদানের মধ্যে চিঠি দেওয়া নেওয়া হয়েছে।

(৩) ৯ই শ্রাবণ, ১৩১২, বুধবার, X(৪) Z(142)

ঢাকা থেকে জয়দেবপুর, মেজরানীর মতানুসারে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে অশ্বিনীবাবুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। সে ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখবে এবং সে যা বলেছে আমরা তাই করবো। ঠিক নেই লাটসাহেব আসবে না আসবে না?

(৪) ১২ই ভাদ্র , ১৩১২ (২৪-৪-০৫)

ঢাকা থেকে জয়দেবপুর, মেজরানীর মতানুসারে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে বৃষ্টির জন্য মিছিল বের হয়নি। সকালে নতুন ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখব।

(৫)১৯ সে পৌষ, ১৩১২, Ex. Z(142)(3)

ঢাকা থেকে জয়দেবপুর, মেজরানীর মতানুসারে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে ৪/৫ দিন পূর্বে আমি লাটসাহেবের জন্য ঢাকায় ফিরতে পাবি। সে পরশুদিন আসবে।

(৬) ১১ই শ্রাবণ, ১৩১৩

ঢাকা থেকে জয়দেবপুর, মেজরানী অনুসারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেছে আজকে ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখেছি। কালকে স্যাভজ সাহেব ও র‍্যানকিন সাহেবকে দেখব এবং তাদের দেখার পর ৫টার সময় লাটসাহেবকে দেখব।

(৭) ১২ই শ্বাবণ ১৩১৩ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেছে : লাটসাহেবকে দেখেছি। কালকে র‍্যানকিন সাহেবকে দেখব।

(৮) ৯ই পৌষ, ১৩১৩,

জয়দেবপুর থেকে কলকাতা, মেজরানী অনুসারে, মেজরানী তখন কলকাতায় ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িতে ছিল। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলেছে: যতদিন তুমি ওখানে আছ প্রতিদিন আমাকে চিঠি লিখবে। ২৪ তারিখ আমাদের যাওয়া স্থির। মা আমার সাথে যাচ্ছে।

(৯) ১৬ই বৈশাখ, ১৩১৫:

জয়দেবপুর থেকে উত্তরপাড়া, রানীর কথা অনুসারে যে সত্যবাবুর বিবাহ উপলক্ষে সেখানে গিয়েছিল। চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছে — আমি ৪/৫টি চিঠি লিখেছি, কিন্তু উত্তর নেই। ২০ শে যাত্রা করবো।

১৯-১-৩২ তারিখে আদালতে একটি বন্ধ খামের মধ্যে ভরে চিঠিগুলিকে ফাইলে রাখা হয়েছিল এবং জেরার সময় বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। বাদী অবশ্যই এগুলি অস্বীকার করেছিল।

বিচারক চিঠিগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টিপাত করেছিল এবং হস্তলিপির বিশারদের মতামত বিবেচনা করেছিল। এই মতামত সম্বন্ধে এখুনি আলোচনা করা হবে। চিঠিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয়, যদিও এগুলি ১৮ থেকে ২৪ বছরের কোন মানুষের দ্বারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে লিখিত। চিঠিগুলি কৃত্রিম।

মেজকুমার তার বিবাহের পূর্বে সেবিকা রাখতে শুরু করেছিল এবং তার নৈতিক

চরিত্র ছিল সবসময় খারাপ, কিন্তু বিচারক এই মন্তব্যের মধ্যে কিছুই দ্যাখেনি যে এরূপ একটি লোক মনে হয় ঢাকায় সাময়িক পরিভ্রমণকালে চিঠি লিখবে না।

যে বিষয়ে খটকা লাগে বিচারকের কাছে যে প্রায় সব চিঠিতে পরিভ্রমণের উল্লেখ করা হয়েছে বা অফিসিয়ালদের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে মনে হয় যেই চিঠিগুলি লিখুক না কেন, তার কাছে সাক্ষাৎগুলিএকটি অযাচিত সম্মান। স্ত্রীর প্রতি প্রথম চিঠিটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ১৩ বছর বয়স্ক স্ত্রী, তিন মাস আগে বিবাহ হয়েছে যে দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে এবং একজন কমিশনার সম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং স্বামী একজন বালক তাকে বলতে যাচ্ছে কমিশনার কী বলেছিল। কেউ কেউ ভেবেছিল যে কুমার একজন শিক্ষিত অভিজাত, সাহেবের সাথে মেশে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্ভবত চিঠিগুলি রচিত হয়েছে এই মামলায়, কিন্তু এটি বড়জোর উপসংহারের জন্য নিশ্চিত ভূমি। বিচারকের খটকা লেগেছে যে কুমার অনবরত ঢাকার বাড়িতে আসছিল, বাড়ি থেকে একঘণ্টা'র পথ এবং যদি এধরনের চিঠিপত্র স্বাভাবিক হত, তাহলে শুধু এই উল্লিখিত চিঠিগুলি অফিসিয়ালরা সংরক্ষিত রাখত। রানী অবশ্যই বলেছিল যে অন্যান্য চিঠিগুলি আদালতে পেশযোগ্য নয় যেহেতু সেগুলি স্থূল কিন্তু এটা এখনো অদ্ভুত যে যেগুলি স্থূল নয়, বেশিরভাগ এই বিষয়ে। কিন্তু চিঠিগুলির বক্তব্য থেকে কেউ কিছুই লেখক সম্বন্ধে বিচার করতে পারেনি। কিন্তু যদি কেউ মনে রাখে তার শিক্ষা সাধারণ বাংলা বানান পর্যন্ত এবং ১৩০৭ সালে এটি সম্পূর্ণ সমাপ্ত, তাহলে সে বিবেচনা করবে চিঠিগুলি। এই দুটি ভাইয়ের একই পর্যায়ের শিক্ষা ছিল, প্রকৃতপক্ষে বললে এবং সেজন্য ফণিবাবু বলার পরিকল্পনা করেছিল যে সে এই ছোট ভাইয়ের শিক্ষার শেষে দেখেছিল ইংরেজিতে একইরকম দক্ষ, কিন্তু ছোটকুমার বাঙলাতে একটু কাঁচা। যদি ছোটকুমারের চিঠি মেজকুমারের লেখার দক্ষতার পরিমাপ হয়ে ওঠে তাহলে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য ছিল যে ছোটকুমার বড়কুমারের মৃত্যুর পর পুনরায় লেখা শিখেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক সন্তুষ্ট যে চিঠিগুলি আসল নয়।

(১) ২৫শে শ্রাবণ ১৩০৯, চিঠিতে বলা হয়েছে, কালকে বেলা ১২ টায় লাটসাহেব আসবে। এটা প্রকাশিত যে স্যার জন উডবার্ন ঐ তারিখে আইনসভায় সভাপতিত্ব করছিল এবং তারপর বিহার পরিভ্রমণে অগ্রসর হয় (ক্যাল গেজেট ২০-৪-০২)। এবার ১৯শে পৌষ ১৩১২, (৩-১-০৬) চিঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। এখানে বলা হয়েছে লাটসাহেব পরশু আসবে এবং কুমার বাড়ি যাওয়ার পূর্বে ৪/৫দিন অপেক্ষা করে।

এবার এই তারিখগুলি লক্ষ্য করা যাক —

২৬শে ডিসেঃ ১৯০৫ — প্রতিবাদী পক্ষের মিঃ আর. সি. সেন-এর মতে মেজকুমার ভাইসরয় কাপের দিনে কলকাতায় ছিল।

২ রা জানু, ১৯০৬ — প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতায় আগমন।

সবাই একমত যে তিনজন কুমার কলকাতায় গিয়েছিল এবং ১৯নং ল্যান্সডাউন

রোডের বাড়িতে অবস্থান করছিল এবং প্রতিবাদীপক্ষ একজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিল যে ঐ উপলক্ষে বাড়িকে সাজিয়েছিল। ১৯০৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পর্যন্ত মেজকুমার অবশ্যই কলকাতায় ছিল। যেহেতু ঐ দিন মেজকুমার ম্যানেজারকে ৩০ টাকা পাঠাতে বলেছিল। চিঠিটি ৪-১-০৬ তারিখে ল্যান্সডাউন রোড থেকে এবং ম্যানেজার একটি নোট (Ex. 470/470(A))-এর সাথে টাকাটি পাঠিয়েছিল। সুতরাং কুমার ৩রা জানুয়ারি ঢাকাতে ছিল না। বিষয়টিকে এত গুরুত্বপূর্ণ দেখাচ্ছিল যে বিচারক প্রতিবাদীপক্ষের অ্যাডভোকেটের বক্তব্য শুনেছিল। সে বলেছে যে লেফট্যানেন্ট গভর্নর ১৬ই জানুয়ারি ঢাকা পরিদর্শন করেছিল । সেজন্য যদি ১৯শে পৌষকে ২৯শে পৌষের ভুল হিসাবে ধরা হয় চিঠিটি খাপ খায় অর্থাৎ যদি ৩রা কে ১৩ তারিখ হিসাবে পড়া হয়। কেউ এই সম্ভাব্যতাকে বর্জন করতে পারে না। কিন্তু এমনটি এটাও খাপ খায় না। ১৩ তারিখকে কেউ ১৫ তারিখ বলবে না 'পরশুদিন''। এটা ছিল স্যার ব্যাম ফিল্ডের প্রথম ঢাকা পরিদর্শন, নতুন রাজ্যের রাজধানী এবং দিনটিকে অবশ্যই ঘোষণা করা হয়ে থাকবে।

(২) এবার রীতির দিকে লক্ষ্য করা যাক। স্ত্রীর প্রতি লেখা চিঠিগুলি কবিত্বহীন। কিন্তু শ্যালিকার প্রতি লেখা একটি চিঠি কেতাবী। কোন সন্দেহ থাকতে পারে না মেজকুমার বই সম্বন্ধে অজ্ঞ। সেজন্য এই চিঠির রীতি ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন ছিল এবং ফণিবাবু সেখানে ব্যাখ্যা দিয়ে ছিল। সে বলেছে যে মেজকুমার নাট্যচর্চা করত, এবং সাক্ষী চিন্তা করে সে একটি নাটকে প্রেমপত্র পাঠ করেছিল এবং সে ডিসমিস্ নাটক থেকে উদাহরণও দিয়েছে। বলা হয়েছিল এই নাটকটি 'নেকলেস' নামে বড়কুমারের মৃত্যুর পর জয়দেবপুরে মঞ্চস্থ হয়েছিল। সে বলেছে ওটা একটা আলাদা নাটক। 'নেকলেস' নাটকের ছাপা প্রোগ্রাম তাকে দেখানো হয়েছিল এবং সে স্বীকার করেছিল এই বিষয়ে (Ex.334/34(3)) বিচারক এগুলি দেখেছিল। এটা 'ডিস্‌মিসের' মত একই নাটক।

এখন শ্যালিকার এই চিঠি নির্দেশ করেছে এবং রানীও সাক্ষ্য দিয়েছে যে সে ও মেজকুমার চিঠিপত্র লিখত এবং এই চিঠিপত্র তার বিবাহের একবছর পর পর্যন্ত চলছিল যে বিবাহ ১৩১১ সনের মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মেজরানী বলেছে যে সে এই চিঠি ১৯০৩ অক্টোঃ/নভেঃ মাসে তার স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিল। এটা ভুল। তার বোনের ৬ বছর যাবৎ মৃত্যু হয়েছিল। এটা অদ্ভুত আর কোন চিঠি ছিল না বা তার স্বামী বা বাড়ির অন্য কেউই বলতে আসেনি যে এই চিঠিটি সেখানে ছিল বা এরূপ চিঠিপত্র আঁদান প্রদান হত বা কি করে এই একটি বিবাহের পূর্বে লিখিত চিঠি রক্ষিত হয়েছিল।

(৩) এই চিঠিগুলির বিষয়ে দুজন হস্তলিপি বিশারদ মতামত দিয়েছিল এবং Ex. 2, মেজকুমারের স্বীকৃত স্বাক্ষরটি এবং বাদীর কয়েকটি বাংলা স্বাক্ষরের উপর। মিঃ এস. সি. চৌধুরী-এর মতামত ছিল যে Ex. 2-এর লেখক, যদি এটা তার স্বাভাবিক স্বাক্ষর হয়, এই চিঠিগুলির লেখক হওয়া সম্ভব হতে পারে না; এবং Ex.-2 ও বাদীর স্বাক্ষর একই হাতের। প্রতিবাদীপক্ষের মিঃ হার্ডলেসের একেবারে বিপরীত মতামত। এইসব মতামতের

কারণ বিবেচনা করে বিচারক নীচে ঐ বিষয়ের আলোচনা করেছে। মিঃ চৌধুরীর মতামত ছিল সঠিক। এটা দেখা যাবে দুজন বিশেষজ্ঞ প্রকৃতই তাদের ক্ষেত্রে একমত। কিন্তু মিঃ হার্ডলেস এটা আঁকবে না। সে দৃশ্যমান তথ্য অস্বীকার করতে পারেনি।

বিচারক পরিসমাপ্ত করেছে যে এই আলোচনার অধীনস্থ বিতর্কিত চিঠিগুলি আসল নয়। এগুলি মেজকুমারের দ্বারা লিখিত নয়। প্রকৃতপক্ষে বলতে, মেজকুমার কখনো বাংলায় কোন কিছু লেখেনি, স্বাক্ষর ছাড়া এবং এটাও এত দুর্লভ যে কতিপয় তাকে এটা করতে দেখেছে। একটি বিষয় বাকী থাকে যে কি শিক্ষা সে শিক্ষকের অধীনে অর্জন করেছিল, শুধু নিজের নাম লেখা ছাড়া, এমনকি যে অক্ষরগুলি দিয়ে লিখেছে তার জ্ঞান ছাড়া। এটা পরের বিষয় উত্থাপন করে :

বাদীর ও ঐ মেজকুমারের হাতের লেখা

বাদীর পূর্বতম স্বাক্ষর আদালতে নেওয়া হয়েছিল, ১৯২৯ সালে একটি জমি রেজিস্ট্রিতে দুটি ওকালতনামা ও কতিপয় দরখাস্তে এটা নেওয়া হয়েছিল। পরের স্বাক্ষরগুলি সে আদালতে ফাইল করেছিল ১৯৩৩ সালে ডিসেম্বরে। এগুলিকে আদালতে ফাইলকৃত নমুনা স্বাক্ষর হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমস্ত স্বাক্ষরগুলি ইংরেজিতে। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই এবং বিশেষজ্ঞরা একমত যে এই সমস্ত স্বাক্ষরগুলি একই হাতের তা হচ্ছে বাদীর।

বাংলা স্বাক্ষরগুলির মধ্যে দুটি আদালতে লিখিত (Ex. 10(5)(i) ও Z(162)(1), ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে, জেরা চলাকালীন, একই কাগজে শুধু রমেন্দ্র শব্দ ছাড়াও Z(162)(1); এবং তিনটি স্বাক্ষর আদলতে ফাইল করা হয়েছিল। [Ex. 3(1) to 3(5)]- এগুলির মধ্যে। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই যে সমস্ত স্বাক্ষরগুলি তার দ্বারা কৃত।

৮-২-৩২ বিচার আরম্ভ হবার প্রায় ২ বছর পূর্বে এবং ৫ বছরের বেশি পরে বাদীর ১৯টি স্বাক্ষর বোর্ড অব রেভিনিউয়ের কাছে গিয়েছিল। সরকারি উকিল, রায়বাহাদুর শশাঙ্ককুমার ঘোষ, প্রতিযোগী প্রতিবাদীদের পক্ষে কর্মরত, একজন হস্তলিপি বিশারদের মতামত নিতে মনস্থ করল। সে অনুরোধসহ তার লিখিত ফরমাশ পাঠাল কলকাতা পুলিশের কমিশনারের কাছে। লিখিত ফরমাশ ছিল এইরকম —

বিভাগ (এ)

প্রয়াত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তার ভ্রাতাগণ কর্তৃক হুন্ডিগুলি সম্পাদিত হয়েছিল।
৭টি হুন্ডি ও একটি হ্যান্ডনোট।

বিভাগ (বি)

রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ভঙ্গিতে এটা প্রতারকের স্বাক্ষর।

(১) ১৯২৯ সালে ঢাকায় একটি জমি রেজিস্ট্রি মামলায় রমেন্দ্রনারায়ণের ভঙ্গিতে প্রতারকের স্বাক্ষরসহ চারটি ওকালতনামা ফাইল করা হয়েছিল।

(২) ১৯২৯-৩০ সালে (৫০ ও ৫১নং) ৮ পাতা জমি রেজিস্ট্রির আবেদনসহ তিনটি টাইপ করা দরখাস্ত ঢাকার কালেকটারের সামনে ফাইল করা হয়েছিল এবং এটা রমেন্দ্রনারায়ণ রায় হিসাবে এক প্রতারকের স্বাক্ষর বহন করছিল।

(৩) ১৯২৯-৩০ সালে জমি রেজিস্ট্রি মামলায় বাংলায় ২৭১৪ ও ২৭১৯ নং দুটি দরখাস্ত করা হয়েছিল জমি রেজিস্ট্রির ডেপুটি কালেকটারের কাছে এবং ৬ পাতায় মেজকুমার হিসাবে প্রতারকের সাক্ষর ছিল।

বি. দ্র. — মেজকুমারের স্বাক্ষরগুলির নীচে (বিভাগ (ক)) লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া হয়েছিল, এগুলি বি-(খ) তে একই ভাবে দাগ দেওয়া প্রতারকের স্বাক্ষরগুলির সাথে তুলনা করা হয়। উভয় বিভাগ থেকে সবচেয়ে বিসদৃশ ৫টি স্বাক্ষর তুলনার জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে এবং কারণসহ মতামত দয়াকরে নথিবদ্ধ করা যেতে পারে।

তারপর একটি নোটে বিশষজ্ঞকে বলা হয় ১৯নং ল্যান্সডাউন রোডের মিঃ এস. সি ঘোষ ও মিঃ এস. এন. ব্যানার্জি কে মতামত পাঠানো উচিত। এই নোটে উভয় বিভাগের ৫টি স্বাক্ষরের পুনরাবৃত্তিও করা হয়। যাকে বিসদৃশের জন নির্বাচিত করা যেতে পারে।

রায়বাহাদুর, যখন সে এই চিঠি প্রেরণ করছিল, অবশ্যই কাঁপছিল। সে কী চেয়েছিল তা গোপন করেনি এবং সে পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে লিখিত ফরমাশ পাঠিয়েছিল। মিঃ এস. সি. চৌধুরী একজন প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিল এবং তার কাজ ছিল পুলিশের মামলায় হস্তলিপি তুলনা করা।

তারপর মিঃ এস. সি. চৌধুরী এই দুই বিভাগের স্বাক্ষরগুলিকে তুলনা করেছিল এবং যতদূর পেরেছিল পার্থক্য করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এটা বলে শেষ করেছিল যে মন হয় খুব সম্ভব 'এ' বিভাগের লেখকই 'বি' বিভাগের লেখক। যতটুকু পার্থক্য, তার কারণ দুর্বলতা, রোগ ও বয়স। সে উভয়ের মধ্যে প্রচুর নির্দিষ্ট সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখেছিল — গঠনে নয় এবং চিন্তা করেছিল নকলনবীশ এগুলি পুনরায় লেখাতে পারেনি।

মিঃ এস. সি. চৌধুরীকে বাদী আহ্বান করেছিল এবং তার সাক্ষ্য এখুনি বিবেচিত হবে। তাকে ডাকার পূর্বে সে আরো দুটি লিখিত ফরমাস গ্রহণ করেছিল। ৪ঠা জানুয়ারি মিঃ পঙ্কজ ঘোষ, প্রতিবাদীপক্ষের, তার সামনে ৬টি বিতর্কিত চিঠি দাখিল করেছিল, Ex.2 উল্লিখিত, বাদীর বাঙলা স্বাক্ষর এবং তার মতামত চাওয়া হয়েছিল। তার মতামত ছিল Ex.-2-এর লেখক, যদি এটা স্বাভাবিক স্বাক্ষর হয়, চিঠিগুলি লেখেনি এবং বাদীর স্বাক্ষর একই হাতের হতে পারে।

৯ই জানুয়ারি প্রতিবাদীপক্ষের মিঃ মুখার্জি তার কাছে দুটি বিভাগের ইংরেজি স্বাক্ষরের উপর মতামতের জন্য অনুরোধ করেছিল,-- বাদীর, কুমারের ও বাঙলা স্বাক্ষরের। মিঃ চৌধুরী বাঙলা স্বাক্ষরগুলির উপর মতামত দিতে অস্বীকার করেছিল, যেহেতু সে ইতিমধ্যে একটি মতামত দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজি সাক্ষরগুলির উপর যার মধ্যে নতুন উপাদান অন্তর্ভুক্ত সে মতামত দিয়েছিল যে এগুলি একই হাতের।

তার সাক্ষ্যকে সমাদর করতে কতগুলি নির্দিষ্ট সরল প্রস্তাব উল্লেখ করা প্রয়োজন যেগুলি আত্ম-সাক্ষ্য। একজন নকলনবীশ এই গঠন সৃষ্টি করেছে বা এরকম কিছু, কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র লেখার ধরন থাকে, সে কৃত্রিমতা ত্যাগ করে, তার অভ্যাসের চিহ্ন প্রকৃত জিনিসের মধ্যে থাকে। এগুলিকে বলা হয় মূল বৈশিষ্ট্য।

মিঃ চৌধুরী সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সে বলেছিল যে Ex.2 (মেজকুমারের স্বাক্ষর) কব্জির দ্বারা লেখা যেখানে বিতর্কিত চিঠিগুলি পুরোবাহুর দ্বারা লেখা।

আলিপুর বারের মিঃ মুখার্জি যে পদ্ধতিটি জানত, মিঃ চৌধুরীকে জেরা করেছিল। এবং যে মিঃ চৌধুরীর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিল এরকম করার পূর্বে, এটা না বলে যে সে তাকে জেরা করতে এসেছে। সে বলেছিল যে Ex.2 অবশ্যই কব্জির দ্বারা লেখা, তবে বিতর্কিত চিঠিগুলিও তাই, যেখানে বাদীর স্বাক্ষরগুলি আঙ্গুলের দ্বারা লেখা। সে প্রকাশ করেছিল Ex.2 দেখতে ভাল এবং আরো উজ্জ্বল রেখা এবং আঙ্গুলের চেয়ে ভালো লেখা প্রদর্শন করেছিল এবং সে বাদীর স্বাক্ষরে চিহ্ন θ নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছিল এটা দেখাতে যে এগুলি একজন অশিক্ষিত মানুষের আঙ্গুল θ লেখন। সেখানে বিতর্কিত চিঠিগুলির কব্জি লেখনকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। সেখানে মিঃ হার্ডলেস বলতে এসেছিল যে বিতর্কিত চিঠিগুলি অবশ্যই পুরোবাহু লেখন। তবে Ex.2-ও তাই। মিঃ হার্ডলেস বলেছিল বা বলতে সক্ষম হয়েছিল: কতিপয় দক্ষ মানুষ এই লেখকের মত তাদের পার্শ্বিক রেখাগুলি সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে মোটা করে সৃষ্টি করতে পারে একটা বিবেচনামূলক উচ্চতায়। এটা একেবারে মিঃ চৌধুরীর মতামতের মতোই এবং তার মতামত হচ্ছে যে Ex.2-এর লেখক এই ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল না।

এবার মিঃ হার্ডলেস অনুসারে Ex.2-ও একইরকম সুন্দর লেখা। সে এটা স্বীকার করেছে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে মেজকুমারের ইংর্যাজি স্বাক্ষরও এক রকম ঝুঁকে পড়া ও ধনুকাকৃতি প্রদর্শন করছে। যদি লেখক একজন পুরোবাহু-লেখক হয় তবে কী করে এগুলি ধনুকাকৃতি হল? সে সাধারণ নিয়মগুলি স্বীকার করেছিল এ বিষয়ে। কিন্তু সে তার মতামত পরিবর্তন করতে পারেনি।

এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে কুমার ইংরে ও বাংলায় কব্জি-লেখক ছিল যেটা আলিপুর বারের মিঃ মুখার্জি সঠিকভাবে দেখেছিল। মিঃ হার্ডলেস বাংলা জানত না, সে এটা বলে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার দ্বারা বিতর্কিত চিঠিগুজি বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল যে কেউ যদি কব্জির দ্বারা ইংরেজী লেখে, সে পুরোবাহুর দ্বারা বাঙলা লিখতে পারে। সে এটা প্রথম বলার পর বলেছিল যে সে বলতে পারে না এটা সম্ভব কি না। মিঃ এস. সি. চৌধুরী বলেছিল যে একজন কব্জি লেখক উভয় দ্বারাই লিখবে। কিন্তু এটা খুশির ব্যাপার যে মিঃ চৌধুরী যাকে মিঃ মুখার্জি জেরা করেছিলেন এবং মিঃ হার্ডলেসও কব্জি ও পুরোবাহুর যে চিহ্ন সম্বন্ধে একমত ছিল এবং যদিও মিঃ হার্ডলেস আন্দোলিত হতে শুরু করলো।

তারপর বাদীর একটি ইংরেজি স্বাক্ষর সম্বন্ধে মিঃ হার্ডলেস বলেছে 'আঙ্গুলের' দ্বারা লেখা এবং একটি বাঙলা সই সম্বন্ধেও তাই। তার প্রধান সাক্ষ্যে সে বলেছে যে বাদীর ইংরাজি স্বাক্ষর সাজানো বাঁকানো, কিন্তু বাংলা স্বাক্ষর সম্বন্ধে সে এই কথা উল্লেখ করেনি। এটা স্বীকার করতে হয়েছিল যে বাদীর ইংরেজি ও বাংলা সাক্ষর বাঁকানো ও ধাপে ধাপে, এবং এর অর্থ সেও একজন কব্জি লেখক। একজন আঙ্গুল-লেখক বাঁকাভাবে লেখে না। বাদীর লেখা মিঃ হার্ডলেসকে দেখানো হয়েছিল, সে স্বীকার করেছিল যে সে বাদীকে পেনের অগ্রভাগ প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে দেখেনি। কিন্তু ক্ষণিক বিরতিতে সে বলেছে পেনের অগ্রভাগ পেন না তুলেই পরিবর্তন করা যেতে পারে, যেরূপ অন্ধ মানুষের যে পরিবর্তন করে কিন্তু পেন তোলে না, যাতে কম লাইন হারাতে হয়। এটা বলতে হয় যে বাদী পেনের অগ্রভাগ পরিবর্তন করছিল এরূপ করার কোন সাক্ষ্য না রেখে। পুরো ব্যাপারটি হাস্যকর। মিঃ হার্ডলেস লেখার ধরনের পার্থক্য ছাড়াও বাদী ও মেজকুমারের স্বাক্ষরের মধ্যে পার্থক্যের প্রচুর সূত্র রেখেছিল, কিন্তু এগুলির কোনটাই মৌলিক নয়। এগুলি একই মানুষের দুটো সাক্ষরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষত বেশ কিছুদিন না লিখলে এটা দেখা যেতে পারে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যাওয়ার প্রস্তাব করেনি বিচারক এবং মানুষের লেখায় বয়স, রোগ ও দুর্বলতার প্রভাব হিসাব করার চেষ্টা করা যেতে পারে কারণ এটা মিঃ হার্ডলেসের সাক্ষ্য যেটা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যে বাদী ও কুমারের স্বাক্ষর একই হাতের।

এটা মনে পড়বে যে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে বাদীর ১৯টি স্বাক্ষর ছিল এবং ১৯২৯ সালে ফাইলকৃত নথিতে কিছু এবং কিছু আদালতে বিচার চলাকালীন লিখিত, কিন্তু কেউ জানে না কখন। তখন মিঃ হার্ডলেস স্মারকলিপি থেকে ৭টি সই তার তালিকায় সেঁটে দেয় এবং তার নীচে ১৭টি সই— ১৯২৯, ৩০, ৩৩ সালে নেওয়া সই সহ। সম্পূর্ণ সিরিজকে 'সি' সিরিজ ও মেজকুমারের স্বাক্ষরকে 'কে' সিরিজ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এগুলি একই তালিকার বামভাঁজে ছিল; যাতে কেউ দুটি বিভাগকে পাশাপাশি দেখতে পারে। 'পি' সিরিজে স্মারক থেকে গৃহীত ৭টি সইকে 'জে' সিরিজ বলা যেতে পারে, যেমন করা হয়েছে।

মিঃ হার্ডলেস একমত যে 'জে' সহ 'পি' সিরিজের সমস্ত সাক্ষর একই হাতের সই। সে আরো বলেছে —

(১) 'জে' সিরিজ অবশ্যই 'কে' সিরিজের মত কোন মডেল থেকে নকল করা হয়েছে। এগুলি ধীরে ও সতর্কভাবে লেখা হয়েছে এবং উপরের ও নীচের আঁচড়গুলি সমপরিমাণ পুরু যদিও লেখক এগুলি আঁকছিল।

(২) 'পি' সিরিজের বাদবাকী অংশ কোন অদক্ষ লেখকের স্বাভাবিক লেখা।

(৩) বাকী 'জে' সিরিজের নিজস্ব কিছু নির্দিষ্ট সঙ্গতি আছে এবং এই সঙ্গতি হচ্ছে একই মানুষের লেখার অভ্যাসের গুণপরিবর্তন।

(৪) পুরো 'পি' সিরিজের লেখক লেখা অভ্যাস করেছে, পুরো সিরিজের মিলের দ্বারা যেটা দৃষ্ট হয়েছে।

(৫) এই বৈশিষ্টগুলি 'কে' সিরিজে নেই।

যদি কেউ কিছু স্থায়ী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে লেখায়, সেগুলি হারাতে পারে না, যদিও সেগুলি উন্নত করা যেতে পারে; এবং সামান্য অভ্যাসে আবার আগের লেখায় ফেরা যেতে পারে। কলমধারণের বৈশিষ্ট্যটি চলে গিয়েছিল। বাদবাকীর কোনটা স্থায়ী ছিল কী না এ বিষয়ে বিচারক সন্তুষ্ট হয়নি।

বিচারক স্মারকলিপিতে ১৯টি সই দেখেছিল। এর বাইরে এসেছিল 'জে' সিরিজ থেকে সাক্ষর। মিঃ হার্ডলেসকে বলতে হয়েছিল, এই সাদৃশ্যের মধ্যে কোন ভুল নেই। তার ফটোগ্রাফের বিবর্ধন নির্ভুল। মূল সাক্ষরে বিচারক দেখেছে যে ১৯টি সই অবশ্যই একই সময়ে সামান্যতম স্পর্শে লিখিত হয়েছে। এটা অসম্ভব যে কেউ এগুলি লিখতে পারে যতক্ষণ না সে জানে কী করে লিখতে হয়। কখন বাদী লিখতে শিখল? ১৯২১ সালের পর দেখা যাচ্ছে না সে অক্ষর জানে। সম্ভাব্যতা এই মামলায় তর্কের বিষয়, কিন্তু এটা কারো পক্ষে অসম্ভব যে কেউ এই ব্যক্তিকে চেয়েছিল মেজকুমারের সই নকল করাতে। কোন সাক্ষ্য বিচারককে প্রভাবিত করেনি যে ১৯টি সই আঁকা হয়েছিল। এটা অসম্ভব। ১৯২৯ ও ১৯৩৩ সালের সইয়ের পার্থক্যের দ্বারা এটা বর্জিত হয়; স্বাভাবিক বৈচিত্র্যও কোন মডেলের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। অক্ষর বিষয়ে মেজকুমারের অজ্ঞতা হচ্ছে উপসংহারমূলক প্রমাণ যে সে ১৯২১ সালের পরে লেখা শেখেনি। কিন্তু সে ইংরেজি ও বাংলায় স্বাক্ষর করা শিখেছিল। এই সাক্ষর তার দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বের স্বাক্ষরের অবশিষ্ট স্মৃতি। এটা বিচারককে মিঃ হলধর রায়ের সাক্ষ্যকে মনে করিয়ে দেয়। সে ছিল E. B. Flotila-এর একজন ডাইরেকটর। বাদীও একজন ডাইরেকটর হিসাবে অর্ডারে সই করেছিল যেভাবে মিঃ রায় করেছিল (Ex. 24)। মিঃ চৌধুরী, প্রতিবাদী পক্ষের জেরায় এটা প্রকাশ করেছিল। বাদী যদি কুমার হত সে অক্ষরগুলি ভুলত না, কেউ ভোলে না। কিন্তু অনেক বছর ধরে যদি না লেখা হয় তাহলে স্মৃতি থেকে সব মুছে যায়।

বিচারক দেখেছে এবং দুজন বিশেষজ্ঞও দেখেছে যে বাদী ও মেজকুমারের সই একই হাতের এবং এখানে মিঃ এস. সি. চৌধুরী সঠিক।

বিচারক বাদীর জেরার ঐ অংশের আলোচনা করেনি। যা দেখাতে মনস্থ করেছিল যে সে বাঙালি নয়। এর বেশিটাই শব্দের খেলা বা কৌশল, সুপরিকল্পিতভাবে যা একজন অশিক্ষিত মানুষকে হতভম্ভ করে। যখন বাদী বাঙালী কি না এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে তখন এটা আলোচনা করা ঠিক হবে।

দলগুলির প্রবেশ ও আচরণ এবং কতগুলি অন্য বিষয়

বাদী তার মামলা বন্ধ করার পর প্রতিবাদী, যারা জেরায় তার স্মৃতি স্পর্শ করতে পারেনি, তার মুখে কথা বসাতে শুরু করল; যে সে এটা বলতে পারে না, ওটা বলতে পারে না, এই ধরনের বা এই ধরনের কোন লোককে। স্বল্প কারণে এগুলি বাতিল না করে

বিচারক এগুলির কিছু আলোচনা করেছে। এর কোন অর্থ থাকতে পারে যদিও বিচারক এগুলি গ্রহণ করেনি।

এর মধ্যে ১লা বৈশাখের চায়ের মজলিশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অভিযোগে বর্ণিত সেখানকার প্রবেশ কোন ঘটনা নয় যতটা ছিল মজলিশ যেটা ঘটনার দ্বারা অপ্রমাণিত হয়েছে।

বিচারক অভিযোগে বর্ণিত একজন D. S. P. সহ মিঃ কিরণ গুপ্তের সাথে সাক্ষাৎকার আলোচনা করেছে যে ঐ একই দিনে মিঃ কয়্যারি ও রায়সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকারে ডিউটি করতে এসেছিল।

মিঃ কে. সি. দে-র সাথে অভিযোগে বর্ণিত সাক্ষাৎকার ঘটনার দ্বারা বাতিল হয়েছিল। ১৯২৬ সালে ঢাকায় বাদীর সাথে সাক্ষাৎকার এটা ছিল অসম্ভব এবং মিঃ দে ১৯২৩ সালে জ্যোতির্ময়ীদেবীর পালিত পুত্রের সাথে সাক্ষাৎকার অনুমোদন করেছিল তার নিজের চিঠির সাক্ষ্য দ্বারা। এখানেই কৌশল করা হয়েছিল। বাদী তাকে কলকাতায় প্রথম দ্যাখে, যেমন সে স্বীকার করেছে, এবং এটা অবশ্যই ১৯২৪ বা তার পরে।

বাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছে যে মিঃ সেরিডান, পুলিশের একজন অফিসার, ১১ই মে বাদীর ওখানে পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট তৈরি করে। রিপোর্টটি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দাখিল করা হয়নি এবং এখানেই বিষয়টির ইতি হয়েছে। দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটি সাক্ষাৎকার বাকী থাকে। এটা হচ্ছে ১৯২১ সালের ২৯শে মে মিঃ লিন্ডসের সাথে সাক্ষাৎকার। মিঃ লিন্ডসের মতে সে একই দিনে, কিন্তু একই স্থানে ও সময়ে নয়। এর একটি রেকর্ড করে, সেজন্য এটা তার মনে আছে যে বাদী হিন্দীতে আলোচনায় কী বলেছিল। এর বিস্তৃতি আজানা। এই রেকর্ডের উপরে মিঃ লিন্ডসের একটা চিঠি ছিল যেটা থেকে দেখা যায় সে বাদীর গুরু ধরমদাসকে দেখতে দেরি করেছিল যখন সে ঢাকায় এসেছিল, যেহেতু লিন্ডসে কোয়ারির জন্য অপেক্ষা করছিল যে ভাষাটি ভাল জানত। এখন এই সাক্ষাৎকারের রেকর্ডে বাদীর বিরুদ্ধে কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র সে, রেকর্ড অনুসারে বলেছিল যে সে দার্জিলিঙে নিউমোনিয়ায় ২/৪ দিন অসুস্থ ছিল এবং যখন সে জয়দেবপুর থেকে দার্জিলিঙে গেল, সে অসুস্থ ছিল না, শুধু একটা ফোস্কা ছাড়া—একেবারে ঠিক ডানহাঁটুর উপরে। এই উত্তর মিঃ লিন্ডসের প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে। সে ফোস্কার উল্লেখ করেছিল এবং উপদংশের কথা স্বীকার করেনি, মনে করা হচ্ছে রেকর্ডটি সঠিক, খুব একটা বোকার মত নয়। এটা মনে করা কষ্টকর মিঃ লিন্ডসে নিউমোনিয়া কথাটির হিন্দী জানত, যতক্ষণ না বাদী এই শব্দটিই ব্যবহার করেছে এবং এখানে আরেকটি অসুবিধা দেখা যায় যে বাদী যদি নিজে মেজকুমার না হয়, তাহলে না শিখে দার্জিলিঙের বিষপ্রয়োগের ঘটনা মিঃ লিন্ডসের সামনে রাখল কী করে যেটা ৪ঠা মের পর শীঘ্র কলকাতায় টেলিগ্রাফ করে সত্যবাবুকে জানানো হয়। এই তথ্যকে সঠিক রেকর্ড হিসাবে নেওয়া যেতে পারে না এবং মিঃ লিন্ডসের এই বিষয়ে আদৌ কোন স্বাধীন স্মৃতি ছিল না।

প্রবেশের আরেকটি অন্য সাক্ষ্য হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত জজ বাবু দেবব্রত মুখার্জির। যখন বাদী নদীর ধারে সন্ন্যাসী রূপে থাকত, তখন সে বাদীকে দেখত এবং সে বলেছে যে বাদী তাকে বলেছিল সে তার 'মুলুক' ত্যাগ করেছে — হয়ত সে পাঞ্জাবী বলেছিল — যখন তার বয়স ছিল ১১ বছর। বিচারকের মতে স্মৃতি তার সাথে ছলনা করেছিল এবং তার মুখে অন্য বিবৃতি সৃষ্টি করেছিল। এই বিবৃতিকে সে পরিহার করেছিল যেটা বাদীর পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিবাদী পক্ষের মামলার সাথে বেমানান নয়। প্রবেশ প্রমাণিত হয়নি, বাদীর ভূমিকার সাথে এটা বেমানানও নয় যেভাবে এটা পূর্বে আত্মপরিচয়ে ছিল।

বাদীর দ্বারা ১৯২৬ সালে রেভিনিউ বোর্ডের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি প্রতিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী দ্বারা বারে বারে উল্লিখিত হয়েছিল, কিন্তু এর কোনকিছুই বেমানান ছিল না। স্মারকলিপি কোন নালিশ ছিল, কিন্তু একটি অনুসন্ধানের জন্য এক আর্জি এবং বাদীপক্ষের একটি সাক্ষ্য যেটা একজন সাব-ডেপুটি কালেকটার দ্বারা দাখিল করা হয়েছিল যে পরিবারকে জানত। এই স্মারকলিপি চিত্রবৎ ও গালভরা শব্দের দ্বারা লিখিত হয়েছিল এবং এর সাথে মানহানির মামলায় গৃহীত সাক্ষ্যকে যুক্ত করা হয়েছিল এই বিবৃতিসহ যে এগুলি বাদীর পক্ষে রায়কে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাদীর কিছু স্বীকৃতি একটি তথ্যকে স্পর্শ করে যা সে তার সন্ন্যাসীর জীবন বিষয়ে প্রদান করেছে বা তার তোতলামির কারণ হিসাবে প্রদান করেছিল। এগুলি নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে বিবেচিত হবে।

মেজরানীর আচরণ বা স্বীকৃতি বিষয়ে যে সাক্ষ্য আছে তা প্রদানের প্রয়োজন আছে—

ফণিবাবুর পিসী, কমলকামিনীদেবী বাদীর আবির্ভাবের পর কলকাতায় মেজরানীর সঙ্গে আলোচনা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। রানী এটা অস্বীকার করে, কিন্তু এই আলোচনা কোন স্বীকৃতিকে প্রকাশ করেনি। সুতরাং এ বিষয়ে বলা কোন প্রয়োজন নেই।

মেজকুমারের মামীমা সুধাংশুবালাদেবী বলেছে যে সে যখন বাদীর কলকাতার বাড়িতে অবস্থান করছিল তখন মেজরানী তাকে বাড়িতে ডেকে পাঠায়। সে জেরায় বলেছে যে সে যখন রানীকে দেখতে গিয়েছিল, তখন বাদীর বাড়ির প্রত্যেকে মায় বাদী ও জ্যোতির্ময়ীদেবীও এটা জানত। সে রানীর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিল যে সে তাকে চিনতে পেরেছে এবং কোন সন্দেহ নেই সে মেজকুমার। সে বলেছিল, "তুমি শুধু একবার মেজখোকাকে দ্যাখ।"

রানী বলেছিল, "কি দরকার" ভাই বা অন্য কারো কাছে শুনেছিল সে একই মানুষ নয়, একজন পাঞ্জাবী যে সাধুর ছদ্মবেশে এসেছিল রাজ্যকে উপভোগ করতে। রানী এই মহিলার আগমন স্বীকার করেছে, কিন্তু তার নিজের মুখে বসানো কথা অস্বীকার করেছে। কোন স্বীকৃতিকে আলোচনার একটি অন্য বিবরণ দিয়েছে। এর উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু রানীর নিজস্ব বক্তব্য এর গন্ধ রেখে গেছে। সে স্বীকার করেছে যে সুধাংশুবালা তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলেছিল, "কেন তুমি তার

সাথে একবার দেখা করছ না?'' রানী তাকে বলেছিল যে যদি তাকে দেখার প্রয়োজন হয় সে তা করবে, তার বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না এবং তাছাড়া সে তাকে দেখেছিল ইত্যাদি। সে আরো বলেছে যে সুধাংশুবালা তার অনুসন্ধানে বলেছিল সে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ি থেকে এসেছে। এই স্বীকৃতির মধ্যে কিছু নেই, যদিও কোন কিছুই অসম্ভব নয়। এটা কষ্ট করে বলা যায় যে জ্যোতির্ময়ীদেবী, যদি জ্ঞাতসারে একজন প্রতারককে পেশ করে থাকে, এই মহিলাকে পাঠিয়েছিল রানীর উপর প্রভাব ফেলতে। এর মধ্যে একটা আশা দেখা যায় যে স্ত্রীর হৃদয়, তাকে দেখে, কোমল হয়ে ভ্রাতার বিরোধিতা করতে পারে।

রানী তার সাক্ষ্যে আদালতকে বলেছিল সে বাদীকে দেখেছিল ও কখন। সে দেখেছিল কলকাতায় তার অবস্থানকালে সেটা আমরা যেমন জানি, ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সালের কোন একটি তারিখের মধ্যে। সে প্রথম তাকে দেখেছিল, একদিন সে আর বুদ্ধ আস্তে আস্তে একটি ফিটন চালাচ্ছিল তার বাড়ির উল্টোদিকে। সে রাস্তার দিকে মুখ করে 'গাড়ি বারান্দায়' দাঁড়িয়ে ছিল এবং সামনে রাস্তার একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ দ্বারা হালকা আড়াল ছিল। ফিটনটি আস্তে আস্তে এসে তার বাড়ির সামনে থামল। বুদ্ধ তাকে দেখিয়েছিল এবং বাদী যার পেছন দিক তার দিকে ছিল, ঘোরে তাকে দেখার জন্য। ফিটনটি সেখানে ৫ মিনিট থেমেছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি একসপ্তাহের মধ্যে, একই সময়, একই স্থানে। ফিটনটি সেদিনও দাঁড়িয়েছিল। বাদী এইভাবে তার বাড়ির পাশ দিয়ে অনেকবার যাতায়াত করেছে, কিন্তু ফিটনটি থামেনি, তখন তারাও বোধহয় তাকে দেখেছিল।

বাদী ও রানী একে অপরকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দেখেছিল। রানী একটি গাড়ি বা ল্যান্ডোতে যাচ্ছিল এবং বাদী একটি ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল এবং অনেক পরে আরেকবার কলেজ স্কোয়ারের কাছে। এটা একজন প্রতারককে ঘিরে একটা স্ত্রীসুলভ ঔৎসুক্যও হতে পারে, এবং বাদীর মতে তাকে একঝলক দেখার চেষ্টা, ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি শেষে রানী জয়দেবপুরে গিয়েছিল প্রায় ২৩ বছর পর। 'পর্দার' আড়াল থেকে সে প্রচুর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল এবং তাদের কয়েকজন সাক্ষ্য দিয়েছিল। রানী বলেছে যে তারা তাকে সম্মান জানাতে এসেছিল, কিন্তু সাক্ষীরা বলেছে যে রানীকে দেখার জন্য আঞ্চলিক নায়েব তাদের এসেছিল এবং রানী তাদের অনুরোধ করেছিল বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য না দিতে (বাঃ সাঃ ১০৮, ১১০, ১২৪, ১৪৭, ১৫১, ১৭৭, ২০৮, ৭৪, ৯৩, ১০৪)। তাদের কেউ কেউ উল্লেখ করেছে যে সাক্ষাৎকারের সময় রায়সাহেব ও আশুডাক্তার উপস্থিত ছিল। তারা বলেছে তাদের সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তারা বলেছে যে তারা তাকে সনাক্ত করেছে, তাই রানী একবার তাকে দেখতে পারেনি? ফুলদির কয়েকজন বড় তালুকদার সাক্ষী মেজবাহাউদ্দিন, যে রানীকে দেখতে গিয়েছিল — সাক্ষী সেইদিনকার কথা বলছিল না, বলেছে যে সে ও ডাঃ স্যামসুদ্দিন তাদের আসনে বসেছিল এবং রানী পর্দার ওপারে ছিল এবং আশু ডাক্তার পর্দা তুলল এবং সাক্ষী প্রণাম

করে একটাকা নজর প্রদান করল। রানী তাকে সাক্ষ্য দিতে না করল, যেখানে সাক্ষী বলল: আমরা তাকে কুমার বলে চিনতে পেরেছি। আমাদের তাকে জয়দেবপুরে আনতে দাও, এবং আমরা নিশ্চিত আপনিও তাকে চিনবেন। কেন এস্টেটের টাকা নষ্ট করছেন? এটা শুনে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং বলল, "এখন এটা কী করে সম্ভব?" জনৈক মনোমোহন ভট্টাচার্য, রানীর একজন প্রাক্তন চাকর, তার লালগোলার রাজবাড়িতে গিয়েছিল এবং তার সাক্ষ্য হচ্ছে সে রানীর সাথে মামলা থেকে বিরত হওয়ার জন্য তর্ক করেছিল। মেজরানী একথা স্বীকার করে। কিন্তু বলে যে সে বাদীর পক্ষ থেকে তাকে ভয় দেখাতে গিয়েছিল। কী এই মানুষটিকে সাহস দিয়েছিল এমন উদ্দেশ্যে রাজবাড়ির ভিতরে যেতে, যদি উভয়ের নিকট সত্য না জ্ঞাত হত? এই ধরনের স্বীকৃতিতে এই মামলা নির্ধারিত হবে না, যদি সনাক্তকরণ অন্যথা প্রমাণিত না হয়, তবে কিছুই যায় আসবে না, যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে সত্য হিসাবে এই সাক্ষ্যকে বিশ্বাস করা উচিত।

আরেকটি অন্য বিষয় উল্লেখ করা উচিত। যে সব স্বাক্ষীরা বাদীর পরিচিতি হলফ করে বলেছিল, অনেকে তার সাথে আলোচনা করেছিল, অনেকে তাকে চিনেছিল। এদের মধ্যে একজন সাক্ষী শম্ভুনাথ চক্রবর্তীর (বাঃ সাঃ ১১৪) নাম উল্লেখ করা উচিত। সে একটি দর্জির দোকানের সহকারী ছিল, এবং ১৯০৭ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত জয়দেবপুরে অর্ডার সংগ্রহ করতে যেত। সে ১০ থেকে ১৫ দিন ঘুরত। সে কুমারদের জানত এবং কলকাতার বোস পার্কে বাদীকে ২/৩ মিঃ দেখার পর চিনতে পেরেছিল। সে তার কাছে গেল, প্রণাম জানাল এবং বাদী তাকে জিজ্ঞাসা করল সে কে।

আমি বললাম, "ভাল করে অমাকে দেখে বলুন আমি কে ?" সে আমাকে দেখে বলল, "আমি সত্যি আপনাকে চিনতে পারছি না। আমি বললাম, "আমি জয়দেবপুরে যেতাম জামার অর্ডার নিতে। তখন বাদী বলল, "আপনি জেযুত নাকিরে মশাই।" মেজকুমার আমাকে জেযুট (গ্রাজুয়েট) বলে ডাকতেন। এই ধরনের বিশেষ বিশেষ লোকের বিবৃতির দ্বারা এই মামলা নির্ধারিত হবে না।

বিচারক যতদূর বাদীর শরীর ও মন পরীক্ষা করছে, প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এবং কিছুই দ্যাখেনি যা এইধরনের বিবৃত প্রত্যক্ষ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত পরিচিতিকে স্থানচ্যুত করে। তর্কাতীত বৈশিষ্ট্যের সংগ্রহের দ্বারা যা কোন দ্বিতীয়ের মধ্যে সৃষ্ট হতে পারে না।

বিচারক দেখেছে হাতের লেখা একই এবং বাদীকে শেখানো হয়নি। বিচারক প্রতিবাদী পক্ষের তাৎপর্যময় আচরণ দেখিয়েছেন, মেডিকেল রিপোর্টের আতঙ্ক এবং আরো কিছু নির্দিষ্ট বিষয় যা বিচারক উল্লেখ করেছে এবং যা বিচারক উল্লেখ করবেন যখন তিনি সমাপ্তি টানবেন। বিচারকের কোন মতামত বাদীর পরিচিতিকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। যতক্ষণ না এটা দেখা যাবে মেজকুমার দার্জিলিঙে মৃত্যুবরণ করেছে বা বাদী উজলার মান সিংহ বা আদৌ বাঙালি নয়। দার্জিলিঙের বিষয়ে ফেরার পূর্বে বিচারক দুটি ঘটনা প্রকাশ করতে চেয়েছে। বাদী মেজরানীর তিনটি চিহ্ন উল্লেখ করেছিল যার দুটি পরিবারের কাছে জানা, সুতরাং এই দুটির বিষয়ে জ্ঞান কোন কিছুই প্রমাণ করে না। সে একটি তৃতীয়

চিহ্নের কথা উল্লেখ করেছে, যদি এর অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তার স্বামী একমাত্র এটা জানবে। রানী এই চিহ্নের কথা অস্বীকার করেছে এবং একপক্ষের এই হ্যাঁ সূচক বাক্য ও অন্য পক্ষের অস্বীকার, এই সূত্র কোন কাজের নয়।

আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, মিঃ চৌধুরী কোন কারণে, যেটা বিচারক বুঝতে পারেনি, কুমারের এক ভাগ্নের কাছে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন রেখেছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল এটা কোন ঘটনা কি না যে মেজরানী একবার গর্ভবতী হয়েছিল। বিলু এটা কখনো শোনেনি। জ্যোতির্ময়ীদেবীকেও জিজ্ঞাসা করা হয়। সে অস্বীকার করেছিল যে সে কোন সময় গর্ভবতী হয়েছিল। কিন্তু রানী তার প্রধান সাক্ষ্যে এক গর্ভপাতের কথা বলেছিল।

দার্জিলিং

বিচারক বিচারের প্রাথমিক পর্বে যেমন ভাবে বর্ণনা করেছিল, মেজকুমার ১৯০৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিল এবং ৮এপ্রিল দার্জিলিঙে যাত্রা করে। সত্যবাবু প্রায় একমাস পূর্বে কলকাতা থেকে এসেছিল এবং এরূপ করার মিথ্যা কারণ দেখাতে শুরু করেছিল — যে শিলঙে যেতে এসেছিল এবং সে সরকারি চাকরীর উদ্দেশ্যে শিলঙে গিয়েছিল। কিন্তু একটি তথ্য দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল যাতে সে স্বীকার করেছিল তখন শিলঙে যায়নি, অক্টোবরে গিয়েছিল। বিচারকের এই প্রশ্নে যাওয়ার দরকার নেই যে সে জয়দেবপুরে এসেছিল কি না, তারপর শীঘ্র সে ধারাবাহিকভাবে কুমারের সাথে দেখা করতে শুরু করল, তাকে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে দার্জিলিঙ নিয়ে গিয়ে তাকে মেরে ফেলতে। প্রশ্নটি হচ্ছে যে দার্জিলিঙে কুমারের মৃত্যু হয়েছিল কি না। এর জন্য প্রয়োজন অভিযোগ বর্ণিত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান এবং এটা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক মৃত্যু, ধরে নেওয়া হচ্ছে এটা ঘটেছিল, এর অর্থ হবে বাদীর মামলার ইতি, কেউ ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত হয়নি এবং রানীর প্রতি আরোপিত বাদীর মামলাতে সে কোনকিছু দ্বারাই অভিযুক্ত হচ্ছে না।

মেজকুমার দার্জিলিঙে যাত্রা করার পূর্বে সত্যবাবু ও মুকুন্দ, তার ব্যক্তিগত কেরানী, সেক্রেটারী বলে উল্লেখিত একটি বাসা ঠিক করতে দার্জিলিঙে গিয়েছিল। তারা 'স্টেপ-অ্যাসাইড়' নামে একটি বাড়ি ঠিক করে এবং খবর জানাতে বলা হয় যে বাড়িটি ছোট ও সেজন্য এই উপলক্ষে মেজরানীকে শুধু একজন বয়স্ক আত্মীয়াকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এটা স্বীকৃত নয় যে সত্যবাবু জ্যোতির্ময়ীদেবী বা সত্যভামাদেবীকে এই ঘটনার বাইরে রাখার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এটা ঘটনা যে মেজরানী বা কোন 'বৌ' কখনো তার স্বামীর সাথে কোন বোন বা তাদের কাউকে ছাড়া একাকী বাইরে যায়নি। যে দলটি জয়দেবপুর থেকে যাত্রা করেছিল, তাকে 'ভাঁড়ের দল' হিসাবে বর্ণনা সঠিক হয়েছে এবং পুরো তালিকা পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। ভৃত্যদের মধ্যে একজন দারোয়ান শেরিফ খানের নাম মনে করা প্রয়োজনীয় হবে। সেখানে তিনজন গৃহ-ভৃত্য, একজন পাচক-অম্বিকা ও একজন বাবুর্চি ছিল গোর্খা রক্ষী ছাড়াও। সেখানে চারজন খানসামা ছিল বিপিন সহ (প্রঃ সাঃ

১৪১)। চাকরবাকর ছাড়া দলের বাকী সদস্য ছিল — বিপিন সহ চারজন 'খানসামা' ছিল। চাকরবাকরদের বাদ দিয়ে দলের বাদবাকী সদস্য হল—

১. ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্ত
২. বীরেন্দ্র ব্যানার্জি
৩. ক্যাবরান
৪. রানী (মেজ)
৫. কুমার
৬. অ্যান্থনি মোরেল
৭. সত্যবাবু
৮. মুকুন্দ গুঁই (সেক্রেটারী)

ক্যাবরান পুরানো চাকর, তবে সে করত উঁচুদরের কাজ। সত্যবাবুর কথা, সে দার্জিলিঙে বাজাব হাট করত, দরকারি কাজও কিছুটা করত। ঢাকায় ভাওয়াল পরিবারের আধা প্রতিনিধি সে। সত্যবাবুর ডায়েরি অনুসারে, চাকরদের চেয়ে সে কিছুটা উঁচুতে ছিল। লেখাপড়া জানত না। তবে নামটা সই করতে পারত। (পি. ডবলিউ ২০৫, ক্রিসট) এন্টনি মোরেলও উঁচুপদের চাকর, বয়স প্রায় ৫০। প্রায় ৫ বছর ধরে সে কাজ করছে।

ক্যাবরান ও এন্টনি ছাড়া বাকীরা ছিল কম বয়েসী। এদের মধ্যে মুকুন্দ ছিল সবচেয়ে বড়। বয়স ৩০। কুমারের বয়স ২৫ এর নীচে। ডাঃ দাশগুপ্তের বয়স ২৩, সত্যবাবুর ২৪, বীরেন্দ্রর বয়স ২১। রানীর বয়স ২০। বীরেন্দ্র স্বীকার করেছে সে এস্টেট থেকে কোন বেতন পেত না। বীরেন্দ্র দ্বিতীয় কুমারের হিসাবপত্তর দেখত, দার্জিলিঙেও তারা এই হিসাব রাখছিল। বীরেন্দ্রকে প্রায় ৮ মাস আগে নিয়োগ করা হয়েছিল। মুকুন্দ ছিল জমিদারীর একজন কর্মচারী। বর্তমানে দ্বিতীয় কুমারের কেরানী হিসাবে কাজ করছিল। তার শিক্ষা বি. এ. পর্যন্ত। সত্যবাবু বি এ পাশ করে বি. এল্ পড়ছিল।

গোটা দলটি 'স্টেপ অ্যাসাইড' এ বাস করছিল। দার্জিলিঙ চৌরাস্তা থেকে রণজিৎ রোড ধরে গেলে প্রথম বাড়িটা তাদের। দার্জিলিঙের একটা সাম্প্রতিক ম্যাপ পাওয়া গেছে। তাতে দেখা গেছে, এই বাড়িটার নম্বর ২০১। এটি ছিল একতালায় দোতলায় ৫ খানা করে ঘর। ঘরগুলি ছিল রণজিৎ রোডের সমান্তরাল ধারায়। একতলা ও দোতলার প্রথম ঘর দুটির মুখ দক্ষিণ দিকে। বাড়ির সামনে ছোট একটি ফুলের বাগান। রাস্তা থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকা যায়। একতলা ও দোতলার ৫টি ঘরই বারান্দা দিয়ে ঘেরা। বাড়িটির পিছন দিকে ছিল একটি জায়গা যেখানে ছিল 'চাকরান' বা চাকরদের ঘর ও রান্নাঘর। রাস্তা থেকে সেখানে যাবার আলাদা একটি পথ ছিল। নিজের চিত্র থেকে দোতলার ঘরগুলির অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে —

(চিত্রটি পাওয়া যায়নি) এখানে বর্ণনাটি দেওয়া হল —

১নং থেকে ৫ নং ঘর — বারান্দায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

৬নং — রাস্তার দিকের বারান্দা।

৭নং — সামনের দিকে একটি সরু বারান্দা।

এল ৫ ও এন ৭ — চাকরদের ঘর

এ. বি — দোতলায় পাহাড়ে যাবার রাস্তা।

এটি ছিল সর্বোচ্চ তলা — নীচে সংলগ্ন ঘরগুলি। বাড়িটার উল্টোদিকের রাস্তা একজায়গায় বাঁক নিয়েছে। বারান্দাটা সেইজন্যে বেঁকে গেছে। পশ্চিমদিকে একটা পাহাড়ের পাশেই বাড়িটা, পাহাড়ের উপরের বাড়িটার নাম 'পেকোটিপ'। বাগানের মধ্যে ঢুকেই সামনের বারান্দা। সেখান থেকে ঢোকা যায় ১নং ঘরে। একতলায় একটি ঘরের লাগোয়া ছিল বাথরুম। সেখান থেকে একটি পথ চলে গেছে পিছনে রান্নাঘরের দিকে।

দার্জিলিঙের মানচিত্রের বহু বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হল —

১. স্টেপ অ্যাসাইড

২. পেকোটিপ

৩. ম্যাল ভিলা সমূহ - ১.২.৩

৪. দূতকোটি, একটি ভিলা

সি. এইচ. চৌরাস্তা

এ বি সি ডি — পুরানো সুধীরকুমারী রোড

ভি — সবজী বাগান

ই. এফ. জি. এইচ — নতুন সুধীর কুমারী রোড

কে — সবজী বাগানে যাবার ছোট পথ

৫. টি — চামড়ার কারখানা

৬. এমিনস কুটির

দেখা যাচ্ছে স্টেপ অ্যাসাইড রণজিৎ রোডের উপরই অবস্থিত। রণজিৎ রোড চৌরাস্তা থেকে বেরিয়ে ভুটিয়া বস্তি হয়ে আরও নীচে নেমে গেছে।

স্টেপ অ্যাসাইড থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত শুধু নীচু পাহাড়। দূরত্ব ২ থেকে আড়াই মাইল। স্টেপ অ্যাসাইড থেকে শ্মশান যেতে লাগে এক ঘণ্টা।

'রোজ ব্যাংক' হল বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ। রোজ ব্যাংক থেকে শ্মশানভূমি দেখা যায় না। ১৯০৯ সালের মে মাস থেকে শ্মশানভূমির সংস্কার কার্য শুরু হয়।

১৯০৯ সালের মে মাসে ১ নং ম্যান ভিলায় কলকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য বাস করতেন।

কার্ট রোড দার্জিলিঙের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। দার্জিলিঙ হিমালয়ান রেলওয়ে এর উপর দিয়ে চলে গেছে 'গুডস শেড' পর্যন্ত, কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনটি অন্য স্থানে। এর কাছে একটু নীচের দিকে লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়াম। অবস্থাপন্ন মানুষরা দার্জিলিঙ বেড়াতে এলে এখানে ওঠে।

স্টেপ অ্যাসাইড থেকে চৌরাস্তা এসে বাঁ ধারে পড়ে 'কমার্শিযাল রো'। এর নীচ দিয়ে গেলে পাওয়া যায় রবার্টসন রোড এবং অকল্যান্ড রোড। রবার্টসন রোড ধরে কিছুদূর গেলে লয়েড রোড পাওয়া যাবে, তারপরই কার্ট রোড। এর কাছে 'গুডসশেড'। এখান থেকে একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে যার নাম ফার্নডেন রোড, নীচের দিকে নেমে গেলে পাওয়া যাবে কনসারভেন্সি রোড। এখান থেকে যাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া রোডে। এখান থেকে বাঁ দিকে পায়ে চলার একটি রাস্তা ধরে যাওয়া যায় শ্মশানে।

কুমার এবং তার দল দার্জিলিঙে এসে পৌঁছান ২০ এপ্রিল, কুমারের মৃত্যু হয় ১৯০৯ সালের ৮ মে, শনিবার। কুমার দার্জিলিঙে ছিলেন ১৯ দিন তাঁর বিবৃতি থেকে পরবর্তী ঘটনাগুলি জানা যায়। তিনি ১৯০৯ সালে মার্চ মাসে জয়দেবপুর গেলে সত্যবাবু দার্জিলিঙ যাবার প্রস্তাব করলেন। একমাত্র সিফিলিস রোগের কষ্ট ছাড়া দার্জিলিঙ না যাবার অন্য কোন কারণ ছিল না। দার্জিলিঙে পৌঁছাবার পর কুমারের বিবৃতি —

"আমি সেখানে ভালোই ছিলাম। ১৪/১৫ দিন পর হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রাত্রিতে ব্যথা শুরু হল। সেই রাত্রিতে আমি আশু ডাক্তারকে ব্যথার কথা বললাম। পরদিন এক ইউরোপিয়ান ডাক্তার এলেন। তিনি একটা ওষুধ লিখে দিলেন। আমি সেটা খেলাম। তৃতীয় দিন আবার সেটা খেলাম। তাতে কোন কাজ হল না। রাত্রি ৮/৯ টা নাগাদ আশু ডাক্তার একটা ছোট গ্লাসে করে একটা ওষুধ দিল। যখন সেটা খেলাম, আমার বুক পুড়ে যেতে লাগল, আমি বমি করে ফেললাম। শরীরে ভীষণ জ্বালাপোড়া। ওষুধ খাবার ৩/৪ ঘণ্টা পর এই অবস্থা হয়েছিল। আমি ঝিমিয়ে পড়লাম। সেই রাতে কোন ডাক্তার আসেনি।

চতুর্থ দিনে সকাল বেলায় আমার রক্ত পায়খানা হতে লাগল — শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেল। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। এরপর কোন ডাক্তার এসেছিল কি না, তা জানি না।

জেরার সময় মিঃ চৌধুরী এই বিবরণ শুধু শুনেছিলেন, তারপর বলেছিলেন : ডাঃ কানভার্টের নাম প্রথম দিনেই শুনেছিলেন। দ্বিতীয় দিনে আশু ডাক্তার তাকে ওষুধ দেবার পর যখন তিনি অস্থির বোধ করছিলেন, শরীরে জ্বালা পোড়া করছিল, বমি পাচ্ছিল, তখন চীৎকার করে বলেছিলেন : আশু, তুমি আমাকে কি দিয়েছ?

এই বিবরণ অনুযায়ী ঘটনাগুলি হল :

৫ম রাত্রি : ভীষণ ব্যথা

৬ষ্ঠ রাত্রি : ডাঃ কনভার্ট এসে দেখে ওষুধ দিলেন

৭ম রাত্রি : একই ওষুধ চলল। কোন ডাক্তার আসেনি। রাত্রিতে আশু কিছু ওষুধ দিল যা খাবার পর থেকেই কুমারের বুক জ্বলতে লাগল ও বমি হল।

৮ম রাত্রি : রক্তপায়খানার পর অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন পর্যন্ত কোন ডাক্তার আসেনি।

ফরিয়াদীর বক্তব্য : সেই দিনই তাকে মৃত মনে করে কিছু লোক পুরানো শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল দাহকার্যের জন্যে, সেখানে পৌঁছাবার কিছু পরেই তুমুল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, যারা তাকে পোড়াতে নিয়ে গিয়েছিল, তারা তাকে রেখে আশ্রয়ের খোঁজে চলে গিয়েছিল। কাছেই একটা গুহার মধ্যে থাকত ৪ জন সাধু। তারা তাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে তাকে জীবন্ত বুঝতে পেরে গুহায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর ঝড়বৃষ্টি থামলে দল বল সমেত সত্যবাবু ফিরে এল। তার দেহ না দেখে তারা চলে গেল। সেই রাত্রিতে একটা মৃতদেহ যোগাড় করে পরদিন সকালে আবার তারা শ্মশানে এসে সেটা দাহ করল। শোনা যায়, ভাওয়ালের কুমারকে কুকুর বিড়ালের মতো ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এই কেলেংকারি ঢাকবার জন্যেই নাকি এটা করা হয়েছিল।

প্রতিবাদীপক্ষে বলা হয়েছে ৬ মে সকালের দিকে কুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন, ৭ তারিখ পর্যন্ত এই অবস্থা চলে, ৮ তারিখ মাঝরাতে তার মৃত্যু হয়। 'বিলিয়ারি কলিক' এ তার মৃত্যু হয়। রাত্রিতে তার মৃতদেহের দাহকার্য সম্ভব ছিল না বলে পরদিন সকালে শোভাযাত্রা করে তার দেহ নতুন শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়।

বাদী পক্ষে কোন সাক্ষী ছিল না / তার অসুস্থতা বিষয়ে তার বিবৃতি একমাত্র সাক্ষ্য। বাদী পক্ষ যা বলেছে, তা তাকে প্রমাণ করতে হবে।

অপরপক্ষে প্রতিবাদী পক্ষে প্রধান সাক্ষী ডাঃ কনভার্ট ও নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ অন্যান্য সাক্ষী —

(১) দ্বিতীয় রানী (২) সত্যবাবু (৩) ডাঃ আশুতোষ (৪) বিপিন খানসামা (৫) ব্যক্তিগত কেরানী বীরেন্দ্র (৬) এন্টনি মোরেল (৭) নার্স জগৎমোহিনী দেবী (৮) সত্যবাবুর ভাগনে শ্যামাদাস মুখার্জি।

এরা প্রত্যেকেই কুমারের অসুস্থতার কথা বলেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। ডাঃ কনভার্টও সমস্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন। এছাড়া সকলের শোকযাত্রায় যারা যোগ দিয়েছিল, তারাও এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। এই ধরনের প্রায় ৯৬ জন সাক্ষী আছে।

মনে রাখতে হবে, ৪মে বিবাদীর দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, সত্যবাবু ১৫ই মে তারিখের আগে একজন ব্যারিস্টার সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিঙ পৌঁছান। এই সময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এন. এন. রায় কতকগুলি সাক্ষীকে জেরা করেন। তাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সাক্ষীদের অন্যতম ছিল ক্ষেত্রনাথ মুখার্জি। তাকে ১৭.২. ২১ তারিখে দার্জিলিঙে বিবাদী শনাক্ত করেছিলেন।

যখন এইসব সাক্ষ্য গ্রহণ চলছিল, তখন সত্যবাবু, জি. পি রায় বাহাদুর ও ব্যারিস্টার দার্জিলিঙে একটা হোটেলে ছিলেন। এই ব্যারিস্টার আবার ম্যাজিস্ট্রেটের আত্মীয়। তার দ্বারা হয়তো মিঃ এন. এন. মিত্র প্রভাবিত হননি, কিন্তু সত্যবাবু যখন বলেন, তিনি ব্যারিস্টারকে দার্জিলিঙ নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়ানোর জন্যে, তার কথা বিচারক বিশ্বাস করেনি। সত্যবাবু একথাও বলেছিল যে সাক্ষীরা কি বলেছিল, তা'ও সে জানে না, সে কথাও বিচারক বিশ্বাস করেনি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এন. এন. রায় যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, সেগুলি কে ঠিক করে দিয়েছিল, সেগুলি জানা যায়নি। পরের দিকে যে প্রশ্নগুলি করা হয়েছিল, সেগুলি ঠিক করে দিয়েছিলেন রায় বাহাদুর, জি. পি. ৩ জুন তারিখে। এগুলি দার্জিলিঙে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ডেপুটি কমিশনার মিঃ গুডির কাছে ৭.৬.২১ তারিখে। ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, যে তিনি এই সব প্রশ্ন ঠিক করে দিয়েছিলন, এবং, রায়বাহাদুর জি. পি. কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এগুলিতে চলবে কিনা।

সাধুর কাহিনী

সাধু বলেছে, সে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। ১৯০৯ সালের ৮মে ডাক্তাররা ভেবেছিলেন, তার মৃত্যু হয়েছে, তারা সেই মর্মে ঘোষণাও করেছিলেন। তার দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, চিতার উপর তোলা হয়েছিল, আগুন দেবার আগে তুমুল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। এর ফলে শববাহকের দল চলে যায়। ঝড়বৃষ্টি থামলে তারা ফিরে আসে, শবদেহ না দেখতে পেয়ে কাঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে বলে, কুমারের দেহ দাহ করা হয়েছে। এর পরের কাহিনী হল, শববাহকের দল যখন চলে গিয়েছিল ঝড়বৃষ্টির জন্য, তখন একজন সন্ন্যাসী চিতার কাছে আসেন, তার মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখে তাকে তাদের আশ্রয়ে নিয়ে যান, এবং মন্ত্রোচ্চারণ করে তার চেতনা ফিরিয়ে আনা হয়।

দ্বিতীয় কুমারের চেহারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে : ফর্সা রং, সুগঠিত দেহ, বাদামী রঙের চুল, ২৭ বছর বয়স, এবং স্টেপ অ্যাসাইড-এ তার মৃত্যু হয়। আরও বলা হয়, সেখানে তিনি তার স্ত্রী, ভাই অন্যান্য কর্মচারীসহ বাস করতেন, এখানে আরও বলা হয়েছে, বৃষ্টিপাতের রিপোর্ট আনুযায়ী দার্জিলিঙে ৮ ও ৯ মে কোন্ বৃষ্টি হয়নি।

এর সঙ্গে ৭ টি প্রশ্ন যোগ করা হয়েছে। সব শেষে বলা হয়েছে শবযাত্রার সময় গরিবদের মধ্যে টাকা ও খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিবাদীপক্ষের বক্তব্য : মধ্যরাত্রিতে কুমারের মৃত্যু হয়নি, কোন মন্ত্র দিয়ে তাকে বাঁচানো হয়নি বা শব ছাড়া কোন কাঠ পোড়ানো হয়নি।

প্রশ্নাবলী

১। ১৯০৯ সালের মে মাসে আপনি কি দার্জিলিঙে উপস্থিত ছিলেন?

২। যদি উপস্থিত থাকেন তবে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়ের মৃত্যুর ঘটনা মনে করতে পারেন?

৩। দ্বিতীয় কুমারের মৃত্যু-শয্যাপাশে, অথবা শবযাত্রা অথবা দাহকার্যের সময় আপনি কি উপস্থিত ছিলেন?

৪। আপনি কি আগে থেকে কুমারকে চিনতেন? যদি না চিনে থাকেন, তবে মৃত্যুর পর তার দেহ কি আপনি দেখেছিলেন? দয়া করে দেহের একটা বিবরণ দিন।

৫। কুমারের শবদেহ নিয়ে শববাহকের দল কোনসময় বাড়ি থেকে যাত্রা করেছিল,

তা কি আপনি বলতে পারেন? দাহকার্য কখন শেষ হল? কোন শ্মশানে তার দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কোন পথ দিয়ে সকলে গিয়েছিল?

৬। শবযাত্রার সময় অথবা দাহকার্যের সময় কি ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল?

৭। যদি দাহকার্য সকালে হয়ে থাকে, তবে আগের রাত্রে কি কোন ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল?

৮। কুমারের মৃত্যুকালে, শবযাত্রায় অথবা দাহকার্যের সময় উপস্থিত ছিলেন, এমন কোন লোকের নাম ঠিকানা আপনি দিতে পারেন?

৯। সাক্ষীকে কুমারের অসুখ, মৃত্যু অথবা দাহকার্যের সময়কালীন ঘটনাবলী মনে করতে বলা হবে।

এই সমস্ত প্রশ্ন মিঃ আর. সি. দত্ত তৈরি করেছিলেন। মিঃ লিন্ডসে ভুল করে বলেছিলেন, যে তিনি এগুলি তৈরি করেছিলেন।

প্রতিবাদীপক্ষ দার্জিলিঙের কোন হিসাবপত্র দাখিল করেনি। এগুলি পাওয়া গেলে ডাক্তারদের ভিজিট ও দাহকার্যের খরচ সম্পর্কে জানা যেত। ঢাকার কালেকটর মিঃ লিন্ডসে বড়রানীকে কুমারের অসুখ ও মৃত্যুসংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠাতে লিখেছিলেন। ৯.১১.২১ তারিখে বড়রানী সেগুলি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এসবের মধ্যে কুমারের মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কিত কোন টেলিগ্রাম ছিল না। মনে হয় বড়রানী এটা পাঠাননি। বাদীপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ১৯২৮ সালের আগে পর্যন্ত বড়রানী কোন পক্ষেই যোগ দেননি।

শোকসূচক পত্র

১০মে ভাওয়ালের দল দার্জিলিঙ ছেড়ে চলে গেল। কর্নেল কনভার্ট বড়কুমারের কাছে একটি শোকপত্র লিখেছিলেন। প্রতিবাদীপক্ষ থেকে এটি পেশ করা হয়েছিল। ডাঃ কনভার্ট বড়কুমারকে চিনতেন না। বাদীপক্ষ জানত না, তিনি কেন বা কখন এটা লিখেছিলেন। সত্যবাবু আসল পত্র কখনো দেখেনি। ১নং প্রতিবাদী ৫.৬.৭১ তারিখে এক একটি প্রতিলিপি বোর্ড অব রেভেনিউতে পাঠিয়েছিলেন। লন্ডনে ডাঃ কনভার্টকে এই পত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, তিনি এটা লিখেছিলেন।

ডাক্তারের পত্র

১. মন্টেগেন ভিলা
দার্জিলিঙ
১০মে, ১৯০৯

প্রিয় কুমার

আপনার হৃদয়বান ও অমায়িক ভ্রাতার মৃত্যুতে যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য আমার আন্তরিক শোকার্ত সমবেদনা জানাই। আমার মনে হয়, নিজের রোগ সম্পর্কে তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তার অকালমৃত্যুর কারণ।

যেদিন প্রভাতে তাকে দেখতে গেলাম, তাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছিল, আমি যে

চিকিৎসার কথা বললাম, তা তিনি নিতে অস্বীকার করলেন। তার ব্যক্তিগত সচিব ও অন্যান্য বন্ধুরাও তাকে তার সংকল্প থেকে নড়াতে পারলেন না। সেই দিনই কিছু পরে তার ভীষণ ব্যথা শুরু হয়। তার সচিব দ্রুত আমার কাছে দৌড়ে গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে আসে। এই সময় সচিব ও অন্যান্য বন্ধুদের অনুরোধে কুমার আমার চিকিৎসা গ্রহণ করে। হাইপোডারকিন ইনজেকশনে ব্যথাটা তাড়াতাড়ি কমে যায়, কিন্তু দুভার্গবশত দ্রুত আবার ব্যথটা ফিরে আসে, এবং আমাদের সকলের চেষ্টা সত্ত্বেও তার মৃত্যু হয়। আপনার ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করা হয়েছিল, যাবা কাছে ছিলেন, তারা সকলেই তাকে যথাসাধ্য সেবাযত্ন করেছিলেন। যদি তার সকল বন্ধু কাছে থাকতেন তাহলে ভাল হত, কিন্তু তার অসুখের ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল, যে কিছু করবার ছিল না। এর আগেও তার এই ধরনের রোগাক্রমণ ঘটেছে, তাই তার মনে হয়েছিল, এবারও তিনি সেরে উঠবেন। কিন্তু এবার তা হয়নি।

বিশ্বস্ত

জে. টি কনভার্ট

কর্নেল কনভার্ট স্বীকার করেন যে এই পত্র তিনি ঘরের কারো নির্দেশে লিখেছিলেন। এই পত্র ১০ মে লেখা হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই।

কর্নেল কনভার্টের হলফনামা

১৯০৯ সালের ৭জুলাই কর্নেল কনভার্ট একটি হলফনামা পেশ করেছিলেন, কারণ সত্যবাবুর বীমার টাকা তোলার জন্য এটির দবকার ছিল। বিচারক ইতিপূর্বে বলেছিল সত্যবাবু নিজের দায়িত্বে এসব করছিল, জমিদারী থেকে এটা করা হয়নি। সত্যবাবুর ডায়েরি থেকেও এটা জানা যায়। এটা প্রমাণ হয়ে গেছে সে এটা নেবার জন্য দার্জিলিঙ গিয়েছিল। এই হলফনামা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ছাপানো ফর্মে লেখা ছিল —

পর্নিথিন, ৭৪৭৮৯

জীবন · কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

মৃত্যুর প্রমাণপত্র

আমি, জন টেনফু কনভার্ট, লেঃ কর্নেল, আই, এম. এস, সিভিল সার্জেন, দার্জিলিং এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি আমি বিগত ১৪ দিন যাবৎ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বায়কে দেখেছি, তার শেষ অসুখে আমি তার চিকিৎসা করেছি। তিনি ২৭ বছর বয়সে ১৯০৯ সালের ৮মে, রাত্রি ১১.৪৫ মিনিটে দার্জিলিঙে মারা যান তিন দিন ভোগার পর। তার মৃত্যুর কারণ হল অন্ত্রের তীব্র ব্যথা।

তার শারীরিক লক্ষণ ও চেহারা থেকে এটা বোঝা গিয়েছিল। ১৯০৯ সালের ৬মে তারিখে তার শরীরের অবস্থা থেকে তাব রোগ বুঝতে পেরেছিলাম। ৮ তারিখে সকালে রোগ তীব্র হয়, সন্ধের দিকে তার মৃত্যু হয়।

জে. টি কনভার্ট

এটা এইচ. এম. ক্রফোর্ডের সামনে পেশ করা হয়। ক্রফোর্ড এটা সই করেন, এবং তার পদবী পরিচয় দেন জাস্টিস অব পিস ও দার্জিলিঙের ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ৮.২.১০ তারিখে ক্রফোর্ড নিজেই একটি মৃত্যু-সার্টিফিকেটে সই করেন। লন্ডনে যখন তাঁকে জেরা করা হয়., তিনি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারেন নি।

এখন এটা বোঝা যায়, ১৯০৯ সালের ৬ মে খুব সকালে কুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই সময়টাকে রাত্রি বলে, বাদী সহ প্রতিটি সাক্ষীর মতে, কুমারের অসুস্থতা শুরু হয়েছিল ৫ তারিখ রাতে।

কেস্-এর বিবরণ

বিচার শুরু হবার পর যখন সাক্ষীদের জেরা করা শুরু হল, তখন মনে করা হয়েছিল, কুমারের অসুস্থতা ১৪ দিনের ব্যাপার, ৭.৭.৯ তারিখে লেঃ কনভার্টের হলফনামা থেকে তাই .বোঝা যায়। কর্নেল তাকে ১৪দিন ধরে চিকিৎসা করেছিল। সে স্বীকার করেছিল তাকে এর আগে চিকিৎসা সংক্রান্ত বারোটি কাগজপত্র দেখানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি ছিল ''কেসের বিবরণ'। মিঃ প্রিঙ্গন তাকে জেরার সময় প্রশ্ন করেছিলেন—

প্র: আপনি কি নিবারণ ডাক্তার ও পারিবারিক চিকিৎসকের সাহায্যে কুমারকে ১৪ দিন চিকিৎসা করেছিলেন?

উ: আমি ঘটনাটা জানতাম। আমি যখন দ্বিতীয় কুমারকে প্রথম দেখি, তখন তার পেটের বাঁদিকে খুব ব্যথা হচ্ছিল। আমি প্রতিদিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করতাম। যতদূর মনে হয়, তাব মাঝে মাঝেই এরকম ব্যথা হত।

পেটের উপর ডাক্তার ব্যথার দিকে লক্ষ্য রাখতেন, তারপর ৮ তারিখে শেষ ব্যথার দিনও তিনি ওষুধ দিয়েছিলেন।

কনভার্টের পর এন্টনি মোরেলকে জেরা করা হলে সে জানায়—এটা ছিল মাঝে মাঝে জ্বর ও ব্যথা — এটা ১০/১২ দিন ধরে চলছিল। ডাক্তার কনভার্ট ২/৩ দিন পর এসে তাকে দেখে যেতেন।

এখন এটা পরিষ্কার, এগুলি সবই মিথ্যা বিবৃতি। কুমার ৬ মে তারিখে অসুস্থ হন, ৮ তারিখে মারা যান। দ্বিতীয় রানী, আশু ডাক্তার, বীরেন্দ্রর সাক্ষ্য অনুযায়ী দার্জিলিঙ আসবার পর তিনি সুস্থ ছিলেন, তিনি স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতেন, লাঞ্চ খেতেন, বিলিয়ার্ড খেলতেন, এবং শিকারে যাবার পরিকল্পনা করতেন। আশু ডাক্তার বলেছেন, ৬মে পর্যন্ত কুমার ভাল ছিলেন, সত্যবাবু ও অন্য কয়েকজন সাক্ষী বলেছেন, মৃত্যুর ৬দিন আগে থেকে তার স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করে।

বিলিয়ারি কনিক — একটি কাহিনী

ডাঃ কনভার্টের হলফনামা বাঁচাবার জন্য কিছু একটা করা হয়েছিল। ডাঃ আশু বলেছেন, তারা দার্জিলিঙ পৌঁছাবার ৪ দিন পরেই ডাঃ কনভার্টকে ডাকা হয়েছিল। পরের ভিজিট ছিল ৬ তারিখে। আশু ডাক্তার জানিয়েছেন, ডাক্তারের প্রথম ভিজিটে তিনি

কুমারের রোগের ইতিহাস তাকে বলেছিলেন, কুমারের সিফিলিস ও বিলিয়ারি কনিকের কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। সেই সময় বিবিয়াবি কনিকের কোন লক্ষণ না থাকায় ডাক্তার কনভার্ট সিফিলিসের ওষুধ দিয়েছিলেন। এটা পরে বোঝা যাবে, বিলিয়ারি কনিকের কথাটা বানানো। ডাক্তার কনভার্ট কুমারের মধ্যে এই কনিকের ব্যথা কখনো দেখেছেন। ১৪ দিন ধরে তিনি কুমারকে দেখেছেন, এই বিবৃতি মেনে নেওয়া যায় না কেননা ৬মের আগে তিনি কোন প্রেশক্রিপশনই লেখেননি। তিনি কুমারকে ৬মের আগে অনেকবার দেখেছেন এটা অসত্য। তাছাড়া যদি তিনি কুমারের সিফিলিস রোগ দেখতেন, তাহলে হলফনামায় তার উল্লেখ করতেন। হলফনামায় তিনি কুমারের বয়স প্রায় ২৭ বছর বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কুমারের বয়স ছিল ২৫। আমি সত্যবাবুর ডায়েরিতে দেখেছি, তিনি কুমারের জন্মতারিখ খোঁজ করছিলেন।

হলফনামায় লেখা আছে, কুমারের মৃত্যু হয়েছে রাত ১১.৪৫ মিনিটে। সেই সময় তিনি কুমারের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাও ঠিক নয়। ৮ তারিখে সকালে কুমারের ব্যথা খুব বেড়ে যায়, সন্ধ্যার সময় তার মৃত্যু হয়।

এখন আমি সংক্ষেপে জানাচ্ছি বিলিয়ারি কনিক কি। বিবাদীপক্ষ লেঃ কর্নেল ডাঃ ম্যাক নিন ক্রাইস্ট, আই. এম. এস., এম. বি. বি এইচ. ব (এডিনবরা) এম. আর. সি. পি. (লন্ডন) ডি. এম. সি. (এডিনবরা) কে জেরা করেছিলেন। তিনি ফার্মাকোলোজিতে ডি. এম. সি. ডিগ্রী পেয়েছিলেন। ৮ বছর তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রফেসার ছিলেন সাইকোলজিতে। তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে সিভিল সার্জেন হিসাবেও কাজ করেছেন। তিনি কুইনাইন, মশা, ও পীতজ্বর সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন।

বাদীপক্ষ ডাঃ ব্রাডলে এম. ডি. (ক্যানাডা), সি. এইচ এম.(কানাডা), ট্রপিকাল মেডিসিনের রয়াল সোসাইটির ফেলোকে জেরা করেছিলেন।

বিবাদীপক্ষ মেজর থমাস, এম. ডি; লেফটানেন্ট কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইট, এম. বি. বি. এস, কোন এক সময় মেডিক্যাল কলেজের সার্জারীর অধ্যাপক ছিল। এইসব ডাক্তারের মতামতই একমাত্র সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্য হিসাবে এগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

পিত্তশূল কী এ বিষয়ে কোন দ্বিমত ছিল না এবং এর তাৎক্ষণিক ও দূরবর্তী কারণও। ডা কনভার্টের মতে কুমারের মৃত্যু হয়েছিল পিত্তশূলে। আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কুমারের মৃত্যু ও অসুস্থতার তথ্য প্রদান করে মেজবানী ও সত্যবাবু তাদের কোন পূর্ববর্তী বিবৃতির দ্বারা বিব্রত হয়নি। আশুডাক্তার ও বীরেন্দ্র এই বিষয়ে পূর্বে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ১৯২১ সালে মানহানির মামলায় আশুডাক্তার দুবার সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং যেখানে সে একজন মানুষকে অভিযুক্ত করেছিল তার প্রতি দার্জিলিঙে কুমারকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগের জন্য। সে শ্রীপুর মামলাতেও সাক্ষ্য দিয়েছিল ঢাকার আদালতে। মানহানির মামলায় অভিযোগ পরিচালিত হয়েছিল রায়বাহাদুর এস পি ঘোষের দ্বারা যে এই মামলায় প্রতিবাদী পক্ষের হয়ে উপস্থিত ছিল। শ্রীপুর মামলাতেও

আশুডাক্তার প্রতিবাদীদের হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল যারা তখন ছিল বাদীপক্ষ। বীরেন্দ্র এই শেষ মামলায় একা সাক্ষ্য দিয়েছিল। আশুডাক্তারের প্রাক ও বর্তমান সাক্ষ্যের মধ্যে শুধু এটা দেখাই প্রয়োজন যে এই ডাক্তার নিশ্চয় খোলামন নিয়ে আদালতে বিচারকের কাছে বলতে আসেনি কী ঘটেছিল, বরঞ্চ সবকিছুই গোপন করতে। সেজন্য তার প্রধান সাক্ষ্য ছিল দুর্বল। সে ব্যাখ্যা করেছিল তার বর্তমান স্মৃতি ভাল এবং এটা প্রেসক্রিপশন ও টেলিগ্রাম দ্বারা সাহায্য পেয়েছে যেগুলি সে পূর্বে দ্যাখেনি। তাকে অবশ্য পরে স্বীকার করতে হয়েছিল সে পূর্বে প্রেসক্রিপশনস ও টেলিগ্রাম দেখেছিল। সেজন্য সে চরম চেষ্টা করছিল পূর্বের বিবৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে এবং করে চলছিল। সে বলেছিল যে যখন সে সংবাদপত্রে মেজরানীর সাক্ষ্য পড়েছিল সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এখন সাক্ষ্যগুলি পরীক্ষা করতে অগ্রসর হওয়া যাক যে ঘটনাগুলির বিষয়ে সত্যবাবু ডায়েরির কিছু পাতায় লেখা হয়েছে। ঘটনাগুলি ৭,৮,৯ ও ১০মের। সে বলেছিল যে ডায়েরি খুলেছিল ১৯মে বা ২০মে নাগাদ, কিন্তু কুমারের অসুস্থতা ও মৃত্যুসম্পর্কিত আগেকার ঘটনাগুলি রেখেছিল। সে একেবারে শুরু থেকে এটা লিখতে চেয়েছিল, যদিও ঘটনা সূত্রে সে ৭মে থেকে শুরু করেছিল।

৬মে বেলা ৩টে থেকে ৬টা

অসুস্থতার সূত্রপাত এবং এটা ছিল জ্বর ও পেটে ব্যথা। (রানী, সত্য, আশুডাক্তার, বীরেন্দ্র)।

যখন কুমারের বিলিয়ারি কনিকের ব্যথা শুরু হল আমি উপস্থিত ছিলাম। এটা আমার স্বতন্ত্রভাবে মনে পড়ে। আশুডাক্তার বলেছে, সত্যবাবু ও আমি এবং প্রায় প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলাম। সত্যবাবু যোগ করে, তার বসে থাকতে হয়েছিল। যন্ত্রণা ছিল অতি তীব্র। ব্যথায় মেজকুমার গড়াগড়ি দিচ্ছিল। এই জন্য তাকে শোবার ঘর থেকে বের করে পাশের ঘরে মেঝের উপর শোয়ানো হয়েছিল যেখানে সে মারা গিয়েছিল।

সকাল

কর্নেল কনভার্ট এসে একটি ওষুধের প্রেসক্রিপসন করল। এই সময় কুমার ভাল ছিল, বানীর মতানুসারে, সে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ভাল ছিল।

সত্যবাবু যন্ত্রণা এবং স্বল্প জ্বরহীনতার কথা উল্লেখ করেনি যখন ডাঃ কালভার্ট এল।

আশুডাক্তার এই সময়ের কোন কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলেনি। শুধু তখন যে প্রেসক্রিপশন তৈরি করা হয়েছিল তা বিলিয়ারি কনিক ও জ্বরের জন্য উপযুক্ত, এটা ছাড়া।

বেলা ১০ টা থেকে ৪টের মধ্যে জ্বর ও যন্ত্রণা ছিল, তারপর কনভার্ট চলে গিয়েছিল।

দুপুরবেলা

সবার মতে এটা বিলিয়ারি কনিক ছিল, কিন্তু ডাঃ কালভার্ট তা বলেনি। সত্যবাবু জ্বরের কথাও বলেছে এবং রাতে জ্বর ও যন্ত্রণা ছিল। যখন ডাঃ কনভার্ট এল কেউ বলেনি যে কুমার বিলিয়ারি কনিকে ভুগছে। ঐ দিনের টেলিগ্রাম ও প্রেসক্রিপশনটি এরকম—

টেলিগ্রাম

Ex. 261(a) সকাল ১০টা, গতরাতে কুমারের ৯৯-এর কম জ্বর ছিল। এখন জ্বর নেই।

Ex. 223 ৬টা ৪৫ মিঃ --- গতকাল কুমার তীব্র পাকস্থলীর যন্ত্রণা সহ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। সিভিল সার্জন চিকিৎসা করছে।

মুকুন্দ

Ex. 224. রাত ৮টা ৫৫মিঃ — জ্বর, দুঘণ্টা তলপেটের ব্যথা ছিল। এখন কমেছে। চিন্তার কিছু নেই, পুনরায় হওয়ার ভয় নেই।

সকাল ১০টার টেলিগ্রামে যন্ত্রণার উল্লেখ নেই। এমনকি ৬টা ৪৫ মিনিটের টেলিগ্রামেও এটা পাঠানো পর্যন্ত কোন যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু 'পাকস্থলীর যন্ত্রণা' 'গতকাল'-এর কথা বলা হয়েছে। যদিও সকালের টেলিগ্রামটি শুধু জ্বরের কথা উল্লেখ করেছে ৯৯ এর কম, ৫ তারিখের রাতে। সত্যবাবু স্বীকার করেছে বাঙালিরা সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত সময়কে রাত বলে থাকে। ৬ তারিখ সকালে কনিকের ব্যথা ছিল না এবং ৬টা ৪৫ মিঃ পর্যন্ত। সাক্ষীরা সেজন্য সকালকে জ্বর ও কনিক বিহীন রাখে যখন কনভার্ট এল; উভয়পক্ষের সাক্ষ্যেই শুধু নয়, টেলিগ্রামেও ছিল না একথা। এবং যখন ডাঃ কালভার্ট এল, সে নীচের প্রেসক্রিপশান তৈরি করল।

ভাওয়ালের কুমারের জন্য

Spl. amon aromal ---3ii
Sodii bi carb ---3i
Tinct. card co. ---3vi
Spt. Choloform
Aqua Cinamon ---3vi

প্রতিদুঘণ্টায় এক দাগ

Lint opii---3ii

বাইরে ব্যবহারের জন্য

J. T. C.

সাক্ষ্য দিতে আসার পূর্বে ডঃ কনভার্টকে এই প্রেসক্রিপশন লন্ডনে কমিশনারের সামনে দেখানো হয়েছিল। তার জেরার সময়েও দেখানো হয়েছিল। তার প্রধান সাক্ষ্যে তাকে এই প্রেসক্রিপশন দেখানো হয়েছিল। সে বলেছিল যে মিঃ হান্টার তাকে এটা দেখিয়েছিল সাক্ষ্য দিতে আসার পূর্বে এবং সেটা সে 'সনাক্ত' করেছিল' প্রেসক্রিপশন হিসাবে যেটা তার পাকস্থলীর অসুখে দেওয়ার অভ্যাস ছিল (Ex. 51)

এটা যে কোন স্থানীয় যন্ত্রণায় (Local pain) কাজ দেয়। তার সাক্ষ্য ছিল যে কুমার ইনজেকশন নেয় না, সুতরাং এটাই বিকল্প হিসাবে সবচেয়ে ভাল। সে ৬ তারিখের পূর্বে কোন ব্যথা দ্যাখেনি।

এটা পরিষ্কার যে Ex. 51-এর দুটি প্রেসক্রিপশনের পিত্তশূলের ব্যাপারে আদৌ কিছু করার ছিল না। ডাঃ ডেনহাম ও ডাঃ ম্যাক গিলখ্রিস্টেরও এক মত ছিল এ বিষয়ে। ডাঃ কনভার্ট যখন কুমারকে চিকিৎসা করে তখন যন্ত্রণা ছিল এবং তার মতে এটা ছিল রোগের একটা 'বিরতি'। তারপরে ৬ তারিখে যে দুঘণ্টার জন্য ব্যথা ওঠে, তার জন্য কোন ডাক্তারকে ডাকা হয়নি। বিচারকের প্রবল সন্দেহ ছিল যে এই ব্যথা সত্য কি না, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে ৬ তারিখেও ডা কালভার্ট কোন পিত্তশূল দ্যাখেনি। এমনকি প্রতিবাদীপক্ষের দ্বারা আমন্ত্রিত ডাক্তাররাও প্রেসক্রিপসনের মুহূর্তে কোন পিত্তশূল দ্যাখেনি।

৬ তারিখ রাত

৭তারিখে সকাল ৭-১০ মিঃ প্রেরিত টেলিগ্রামে (Ex. 282(a)) বলা হয়েছে; "গত রাতে কুমারের ভাল ঘুম হয়েছে, জ্বর-যন্ত্রণা ছিল না।"

মুকুন্দ

৭ তারিখে ডায়েরীর পাতায় সত্যবাবু লিখেছিল — "রমেন্দ্রর অসুখ চলছে, সামান্য জ্বর সহ পাকস্থলীতে যন্ত্রণা। গতরাতে ঘুমায়নি, বাড়িতে তার করা হয়েছে।"

এটা মিথ্যা বর্ণনা সেটা টেলিগ্রাম দেখলে বোঝা যায়। সত্যবাবু বলেছে সে নিজের ঘুমের কথা লিখেছিল। কিন্তু ঘটনার প্রায় ১৫ দিন পরে সে ডায়েরী লিখেছিল।

৭ই মে

এই দিন কোন টেলিগ্রাম পাঠানো হয়নি। কোন প্রেসক্রিপশন করা হয়নি। শুধু আশুবাবু একটি করেছিল যা সে পূর্বের মামলায় লুকাতে চেষ্টা করেছিল। যাতে সে সাক্ষ্য দিয়েছিল—

ডাঃ ম্যাক গিলখ্রিস্টের মতে এই প্রেসক্রিপশনে ছিল কুইনাইন, আর্সেনিক, স্ট্রাইককাইন, দুটি জোলাপ। তার মতে এটি জটিল ম্যালেরিয়ায় সাধারণ টনিক হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। পিত্তশুলে বা কেউ এটা গ্যাসট্রিক ব্যথায় বা পেট ফাঁপায় দেবে না।

মেজর থমাস বলেছে— কুইনিন দেখে মনে হয় ম্যালেরিয়ার সন্দেহ করা যেতে পারে।

নির্দেশানুসারে বড়ি খেলে এটা আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের চিহ্নের কারণ হবে না, যদি না ৫/৬ তারিখে কুমারের পিত্তশূল বা পাকস্থলীর যন্ত্রণা না থাকে।

প্রতিবাদী পক্ষের কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইট বলেছে যে ডাক্তার সম্ভবত মনে করেছে ক্রনিক ম্যালেরিয়া। ডোজও স্বাভাবিক ছিল প্রেসক্রিশনে। আরো বলেছে কোন মানুষ এইসব বড়ির ১২টি গলাধঃকরণ করতে পারে না। কিন্তু সে বলেনি ফল হবে পৃথক।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যদি নাক্স ভমিকার প্রাণনাশক ডোজ দেওয়া হয়, তবে লক্ষণ কী হবে?

সে বলেছে রোগীর মধ্যে স্ট্রিকনিন বিষপ্রয়োগের লক্ষণ থাকবে। এটা দেখা দেবে আধ-ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার তিনভাগের একভাগের মধ্যে। গিলখ্রিস্ট বলে এটা নির্ভর

করবে মিশ্রণের উপরে, পাকস্থলী খালি বা পূর্ণ কিনা খাদ্যের দ্বারা (লায়নস মেডিঃ জুরিস প্রুডেডস, ৯ম সংস্করণ, পৃ:৪৮৮)।

ডাক্তারদের মধ্যে প্রেস বিষয়ে কোন দ্বিমত ছিল না যে এটা ম্যালেরিয়ার নিরাময়ে সহায়ক এবং পাকস্থলীর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। কেউ বলেনি, এমনকি আশুডাক্তারও, যে এটা পিত্তশূলের পক্ষে সহায়ক ওষুধ।

যদিও এটা সবারই বক্তব্য ছিল যে যদি কুমারের মধ্যে ৭ তারিখে আর্সেনিক ঢুকে থাকে এবং লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে, এটা অবশ্যই ঐ উৎস থেকে এসেছে। ডাঃ থমাস স্বীকার করে যে যদি কেউ কাউকে আর্সেনিক দ্বারা বিষপ্রয়োগের কথা মনে করে থাকে, সে একটি প্রেসঃ তৈরি করবে যা ছদ্মরূপে পরিবেশন করা যেতে পারে।

পূর্বোক্ত ১৯২১ সালে মাসকানি ও শ্রীপুর মামলায় আশু ডাক্তার ৫ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত দার্জিলিঙের সমস্ত তথ্য প্রদান করেছিল। কিন্তু কোথাও স্বীকার করেনি যে সে কোন প্রেসঃ তৈরি করেছিল। ৭ই মে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সে বলেছে—রাত ৮টা ৯টা নাগাদ এসে কর্নেল কনভার্ট দেখেছিল যে কুমার অত্যন্ত পিত্তশূলে ভুগছে, সে চেয়েছিল কুমারকে ইনজেকশন দিতে, কিন্তু কুমার রাজি হয়নি, সে একটি অভ্যন্তরীণ ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেয় (Ex. 395)। আশুডাক্তার বলেছে সে জানে না যে কুমারকে বড়ি খেতে দিয়েছিল। সম্ভবত নার্স বা অন্য লোক এটা করেছিল।

মিঃ মি. এম. ঘোষের সামনে সে বলেছে সে কোন প্রেসক্রিঃ করেনি। কুমার নিবারণ বাবু ও কনভার্টের ওষুধ গ্রহণ করেছে। ডাঃ কনভার্ট কী ওষুধ দিয়েছিল তা মনে নেই। ৬/৭ তারিখে অন্য কোন ডাক্তার আসেনি। সে একবার বলেছে ডাঃ নিবারণ ৭ তারিখে এসেছিল, আরেকবার বলেছে সে আসেনি।

লন্ডনে কনভার্টকে প্রতিবাদীপক্ষ এই প্রেসক্রিঃ দেয়নি। তারা দিতে পারেনি। এটা পিত্তশূল, শোকপত্র ও মৃত্যুর হলফনামাকে স্পষ্ট করবে।

অতঃপর উপায়ন্তর না দেখে মিঃ চৌধুরী তার বক্তব্য পেশ করল যে নিবারণ ডাক্তার এটা ৭ তারিখে মুখে মুখে বলে গিয়েছিল এবং আশু ডাক্তার লিখে নিয়েছিল। আশুডাক্তার নিজেও বলেছে যে হয় নিবারণ ডাক্তার বা ডাঃ কনভার্ট এটা তাকে লিখতে বলেছিল। কখন, কী অবস্থায় বা এটা দেওয়া হয়েছিল কি না বা এর ফল কী হয়েছিল এ সম্বন্ধে সে একটি কথাও বলেনি।

এই প্রেসক্রিপশনের জন্য ডাঃ কনভার্ট, নিবারণ ডাক্তারকে দায়ী করা যায় না। এর অর্থ বিষয়টির সমাপ্তি এবং প্রেসক্রিপশনের লেখক আশুডাক্তারের মুক্তি , তার যা উদ্দেশ্য ছিল। সে নিশ্চিতভাবে এটা লিখেছিল ও সই করেছিল। ৭ তারিখে নিবারণ ডাক্তার বা কনভার্ট কোন প্রেসক্রিপশন করেনি।

৭ তারিখে মেজকুমারের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্যে এইরূপ বলা হয়েছে ---

এই দিন কোন টেলিগ্রাম যায়নি। শুধু একটা ছাড়া যে কুমার ৬ তারিখ রাতে ভাল ঘুমিয়েছিল।

সকাল ৭টা থেকে ১০টা— যন্ত্রণা বা জ্বর ছিল না। ডাঃ কনভার্ট ও ডাঃ নিবারণ রায় উভয়কেই ডাকা হয়েছিল।

সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত— সত্যবাবুর মতে একই রকম। আশুডাক্তারের মতে জ্বর আরম্ভ হয়েছিল।

বিকাল ৪টে থেকে রাত ৯টা— যন্ত্রণা ও জ্বর ছিল সত্যবাবুর মতে যে বলেছে যে রাত ৯টায়, এটা বলা মুশকিল সে বেশি খারাপ হয়েছে কিনা, কিন্তু সকালের মত ভাল ছিল না।

সত্যবাবু বলেছে যে সন্ধ্যায় ডাঃ কনভার্ট বা ডাঃ নিবারণ এসেছিল। মনে নেই যে তারা প্রেসক্রিপশন করেছিল কিনা।

আশুডাক্তার এই দিন সম্বন্ধে বলেছে—

সকাল ৭টা থেকে ১০ — কুমার ভাল ছিল।

" ১০টা থেকে বেলা ২টা — জ্বর , কিন্তু সে মনে করতে পারে না।

বেলা ২টা থেকে ৪টা — জ্বর হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত নয়।

সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা — পিত্তশূলের ব্যথা সন্ধ্যার পূর্বে দেখা দেয়; আমার মনে পড়ে।

আমার মনে পড়ে না সে তীব্র স্বল্প বা জ্বর ছিল কি না।

তার মনকে প্রায় স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। সে এমন একটি পেরিসক্রিপশনের কথা প্রমাণ করতে চাইছিল যা জ্বরের সঙ্গে মানানসই, কিন্তু যন্ত্রণার সঙ্গে নয়। তাছাড়া প্রেসক্রিপশন দেখার পর তার সবকিছু মনে পড়ে যায়।

সে বিচারকের সামনে স্বীকার করেছে পিত্তশূলে আর্সেনিক দেওয়া যেতে পারে না। এমনকি ব্যথা থাকলে জ্বরের সময়েও নয়। মেজকুমারের ম্যালেরিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যও ছিল না, সে বলেছে ঐ দিন কুমারের সামান্য পেট খারাপ ছিল।

দুটি বিষয় পরিষ্কার যে কনভার্ট বা নিবারণ কেউই ৭ তারিখ আসেনি বা তাদের স্বাক্ষরসহ কোন প্রেসক্রিঃ থাকবে না। ধরে নেওয়া যাক ঐ দিন রাতে শোবার ঘরে কুমারের পিত্তশূলের ব্যথা হয়েছিল এবং পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়নি যেখানে সে ৮ই মে শুয়ে ছিল। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল তাকে ৭ই মে দিনে স্থানান্তরিত করা হয়। এটা ছিল প্রতিবাদীপক্ষের বিপিন, বীরেন্দ্র ও সত্যবাবুর সাক্ষ্য। সে ৭ তারিখ সন্ধ্যার পর এমনকি শোবার ঘরে ছিল। তারপর এসেছিল আর্সেনিক প্রেসক্রিঃ। এটা ব্যথার উপশম করতে পারেনি।

এটা পরিষ্কার কুমারকে রাতারাতিই পাশের ঘরে যন্ত্রণার মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সত্যবাবুর ভাইপো শ্যামাদাস, যে ছিল পরদিন সকালের দাহের হোতা, সে বলেছে সে কুমারকে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ দেখেছে, পরের দিন সে কুমারকে অন্য ঘরে দেখতে পায়।

কোন প্রেসক্রিপশনই জ্বরের বিষয়টি নির্দেশ করেনি শুধু আশুডাক্তারের একটি প্রেসক্রিপশন ছাড়া (Ex. 51(a))। বিচারকের কাছে মনে হয়েছে প্রেসক্রিপশনে জ্বরের

উল্লেখের প্রয়োজন ছিল। রায়সাহেব, ফণিবাবু ও অন্যান্য সাক্ষীরাও ম্যালেরিয়ার কথা বলেছে। বিচারক এই সাক্ষ্যের একবর্ণও বিশ্বাস করেনি।

এই দিনের ঘটনাগুলি পরিষ্কার যে কোন ডাক্তার আসেনি। কোন টেলিগ্রাম পাঠানো হয়নি, দেখানো হচ্ছে যে কুমারের অবস্থা ৬মের চেয়ে খুব একটা খারাপ হয়নি। সে সকালে ভাল ছিল, কিন্তু রানী ডাঃ কনভার্টের সাক্ষ্য বাঁচাতে বারবাব বলছিল যে ঐ দিন সকালে ডাঃ কনভার্ট এসেছিল। প্রতিবাদীদের নিজের সাক্ষ্য ছিল যে কনভার্ট ৬ই মে সকালে কোন যন্ত্রণা দেখেনি। সে ৭ই মে আদৌ আসেনি। এমনকি যদিও সে এসে থাকে সে কোন পিত্তশূল দ্যাখেনি। ৬ মে আগে কুমার আদৌ অসুস্থ ছিল না এবং ১৪দিনের অসুস্থতার কথা প্রতিবাদীপক্ষ পরিত্যাগ করেছিল। ৭মে পর্যন্ত কনভার্ট কোন পিত্তশূলের কথা না বললেও ডান-বাম দিকে ব্যথার কথা বলেছিল এবং সে প্রতিদিন এর প্রতি লক্ষ্য রাখছিল। প্রথম দিন সে ডানকাঁধে ব্যথা দেখেছিল এবং ওষুধ দিয়েছিল। সে আবার তাকে দ্যাখে ৮ই মে।

৮ই মে সম্বন্ধে প্রতিবাদীদের পরিষ্কার বক্তব্য ছিল। মেজরানী বলেছে একটু আগে পরে ডাঃ কনভার্ট ও ডাঃ নিবারণ এল।

সকাল ১০/১০-৩০ মিঃ — সামান্য ব্যথা ও বমি

দুপুর ১২— ২টা/২.৩০ মিঃ — ব্যথা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। মলে আমাশা ও রক্ত দেখা যায়, বাথরুমে ৪/৫বার পায়খানা করে এবং তারপরে বেড প্যানে। পায়খানা পাতলা, কিন্তু জলের মত ছিল না।

সে স্বীকার করেছে যে কুমারের পেট খারাপ হয়েছিল। ২টা থেকে ৪.৩০—কুমার ইনজেকশনের জন্য রাজি হয়নি।

৪টা থেকে ৬টা— কুমার ইনজেকশনের জন্য রাজি হয়।

ইনজেকশন দেওয়ার পর সে নিশ্চিত করে জেরায় বলেছিল নার্সরা এল। তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। নার্সরা তার শরীরে একটা পাউডার মালিশ করতে শুরু করল এবং সে বিছানার পাশে বসে রইল। রাত ৮টা নাগাদ ডাঃ কনভার্ট আহারের জন্য চলে যায়। সে মনে করতে পারে না ইনজেকশন দুবার দেওয়া হয়েছিল কি না।

সন্ধ্যায় — মেজরানীর মামা ডাঃ বি. বি. সরকার নামে একজন ডাক্তারকে নিয়ে আসে। সে কুমারকে পরীক্ষা করে বলে যায় যে কুমারের দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু বরফ ঠাণ্ডা নয়।

মেজরানী অস্বীকার করেছে যে চলে যাওয়ার পূর্বে ডাঃ সরকার মৃত্যুর কথা উচ্চারণ করেছিল।

মধ্যরাত — ডাঃ কনভার্ট, আশুডাক্তার ও নিবারণ ডাক্তারের উপস্থিতিতে মৃত্যু।

ইনজেকশন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শরীর দ্রুত খারাপের দিকে গিয়েছিল। মেজরানী পরদিন সকালে দেহ সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত ঘর ছাড়েনি, মৃত্যুর পর সারারাত বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিল।

বাদীর পক্ষ থেকে— মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই দিনকার কোন সাক্ষী ছিল না। স্টেপ অ্যাসাইডের মালিক রামসিং সুব্বা সন্ধ্যায় ৭-৩০ মিঃ নাগাদ যে ঘর সে কুমারকে ভাড়া দিয়েছিল সেই ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে দ্যাখে সামনের ঘরে (৫নং ঘর) কুমারেব দেহ, সেখানে ডাঃ বি. বি. সরকার, আশুডাক্তার, সত্যবাবু ও অন্যান্য দু-একজন অবস্থিত। রামসিং কোন কথা না বলে বেরিয়ে আসে এবং যাওয়ার সময় দ্যাখে ৩নং ঘরে মেজরানী একটি লোহার খাটে শুয়ে উচ্চস্বরে কাঁদছে। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। মতামত দেওয়া হয়েছিল রাম সিং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।

তিনটি টেলিগ্রামে (Ex. 225, 221, 222) কুমারের অসুস্থতার খবর জানানো হয়। চতুর্থ বা পরের টেলিগ্রামে মৃত্যুর খবর জানানো হয়। এটা দাখিল করা হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে কখন এটা পাঠানো হয়েছে বা মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?

প্রেশক্রিপশন

প্রেশক্রিপশনগুলি একটি বিরতিহীন ধারাবাহিকতা বহন করে। লক্ষ্য করতে হবে এসব কিছু দ্রুত অনুসরণের বিষয় নির্দেশ করে। কিন্তু কেউ সময়ের সূত্র নিশ্চিত করে না। আশুডাক্তার মনে হয় বাদীবাকী সব জানে। চারটি প্রেসক্রিপশন মনে হয় রোগের চারটি স্তরকে নির্দেশ করেছে। কিন্তু দুটি প্রেসক্রিপশন ধরে নেওয়া হচ্ছে দুটি ডাক্তারের দ্বারা একই ভিজিটের সময় লেখা হয়েছে।

যাইহোক প্রেসক্রিপশনগুলি নিম্নোক্ত ক্রম নির্দেশ করে, প্রতিবাদীপক্ষের মেজর থমাসের মতানুসারে —

১. সাধারণ ডিসপেপসিয়া

২. ক্রিয়াহীনতা

৩. ইনজেকশনের বিকল্প হিসাবে পিত্তশূলের ও মলদ্বারের অবস্থার জন্য opium বড়ি।

৪. তলপেটে খিল ও যন্ত্রণা হতে পারে

ডাঃ ম্যাক গিলখ্রিস্ট ও ডাঃ ব্রাডলের মতানুসারে —

১. সাধারণ ডিসপেপসিয়া

২. ক্রিয়াহীনতা

৩. পেটখারাপের জন্য opium বড়ি

৪. পাকস্থলীতে খিল ও যন্ত্রণা

মেজর থমাস খিল ধরার কথা উল্লেখ করেনি কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষ পিত্তশূলের ফল হিসাবে খিল ধরার কথা বলেছে ও মেজর থমাসও এটা সায় দিয়েছে।

উপরের কথার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মেজরানী বলেছে — সকালে ১০টা পর্যন্ত মেজকুমার ভাল ছিল, বমিরভাব ও সামান্য যন্ত্রণা ছিল। ১২টার সময় তীব্র যন্ত্রণা ও রক্তমল নির্গত হয়। ডাঃ নিবারণ এল, ডাঃ কনভার্ট এল ২টর সময়, এবং কুমারকে

ইনজেকশনের জন্য রাজি করাল — ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে যন্ত্রণার উপশম হল।

সন্ধ্যার পূর্বে নার্স পাউডার মালিশ করল।

সন্ধ্যা — ডাঃ বি. বি. সরকার।

মধ্যরাত — মৃত্যু।

মেজরানীর তথ্যে সন্ধ্যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিছু পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে প্রশ্ন নেই যে বিচারকের সামনে সব প্রেসক্রিপশন ও টেলিগ্রামগুলিই ছিল, শুধুমাত্র মৃত্যুর টেলিগ্রামটি ছাড়া।

নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি বিবেচনা করে দেখা যায় —

(১) সকালে কুমার যখন ভাল ছিল তখন কনভার্ট এল এবং একটি ইনজেকশন দেওয়ার প্রস্তাব দিল। এক্ষেত্রে ব্যগ্রভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ ও মিনতি ছিল — তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন এই প্রস্তাব করা হয়েছিল যদি মেজকুমারের অবস্থা ভাল থাকে বা যন্ত্রণা না থাকে। সত্যবাবুর মতে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করতে। কর্নেল কনভার্ট এর প্রস্তাব দিয়েছিল, যদিও শেষ করেছিল একটি সাধারণ ডিসপেপসিয়ার জন্য প্রেসক্রিপশন করে। দিনের প্রথম প্রেসক্রিপশন।

একজন মানুষ, যে সাধারণ ডিসপেপসিয়ায় ভুগছে, সে ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। কখন সে ঠাণ্ডা হল এবং তার পূর্বে কী ঘটেছিল?

মৃত্যুর দিন সকালে কুমারের প্রচণ্ড পেট খারাপ ছিল। রক্ত পায়খানা করছিল অত্যধিক। এর দুদিন পূর্ব থেকে সে এতে ভুগছিল। এটা প্রধান সাক্ষ্য জেরায় সে বলেছে; ৭মে রাত থেকে কুমারের পিত্তশূলের কথা বর্ণনার পর এবং ডাঃ কনভার্ট এর জন্য প্রেসক্রিপশন করল।

৮মে সম্বন্ধে সত্যবাবু বলেছে :

"রাত ২/৩ টে নাগাদ ব্যথা বাড়ল এবং একজন লোককে ডাঃ কনভার্টকে ডাকতে পাঠানো হল। সে ৭/৮ নাগাদ এল। সে ইনজেকশন দিতে চেয়েছিল। কুমার দিতে মানা করেছিল। তারপর এল ডাঃ নিবারণ সেন। ডাঃ কনভার্ট তাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য নিযুক্ত করল। ডাঃ কনভার্ট সকালে কিছু প্রেসক্রিপশন তৈরি করল। আমার মনে পড়ে না কী প্রেসক্রিপশন সে তৈরি করেছিল। সে আবার বেলা ২/৩টা নাগাদ এল, কিন্তু কোন উন্নতি হয়নি কুমারের, সে আবার রাত ৮টা নাগাদ এল, কুমার তখন রক্তপায়খানা করছিল। রক্তপায়খানার কোন ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়নি। আমি জানি না ডাঃ কনভার্ট এটা করার জন্য কোন মতামত দিয়েছিল কি না। এরা দুজন ২/৩ জন নার্সকে রেখেছিল কুমারকে ওষুধ খাওয়াতে। মৃত্যুর দিন সকাল থেকে রক্তপায়খানা শুরু হয়েছিল। ১০/১২ বার হয়েছিল। আমি আন্দাজ করতে বলতে পারি কত রক্ত তার বেরিয়ে গিয়েছিল। লাল রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল।"

এই সাক্ষ্য ২৭-১-২২ তারিখে মানহানির মামলায় মিঃ এস. পি. ঘোষের কাছে প্রদত্ত।

শ্রীপুর মামলাতেও সে একই কথা বলেছে এবং এই দিন সম্বন্ধে সে বলেছে—

"বেলা ২টোর পরে নাড়ী খারাপ হতে লাগল (Ex. 394(11)) সে ৪/৫ নাগাদ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল না। (Ex. 395)।

পরবর্তীকালে শ্রীপুর মামলায় সে বলেছিল রাতে ডাঃ কনভার্ট একটা ইনজেকশন দিয়েছিল। আশুডাক্তারের কাছে এই সাক্ষ্য পেশ করা হলে সে কোন উত্তর দেয়নি। এগুলি তখন স্মরণে ছিল, এখন নেই। কারণ যখন সে এগুলি বলেছিল, তখন সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু এগুলি সত্য নয়; তারপর প্রেসক্রিপশনস ও টেলিগ্রাম দেখার পর স্মৃতি জোরালো হয়। সে বড়রানীর সাক্ষ্য পড়ে আশ্চর্য হয়েছে।

এই আশু ডাক্তারের কাছে সত্যের চেয়ে অনেক স্বাভাবিকভাবে অসত্য এসেছে। এখন তার বর্তমান সাক্ষ্য থেকে যতটা বেশি সারাংশ বের করতে পারা যায়।

বেলা ৩-১০-এর টেলিগ্রামের বয়ানের অর্থ— যখন কোন মানুষ মরছে, পুরো অসুস্থতার অধ্যায়ে কোন টেলিগ্রামে একবারও পিত্তশূলের কথা উল্লেখ করা হয়নি। রক্ত পায়খানার কথা সবই বলা হল 'ভয়ঙ্কর রক্ত পায়খানা' কথাটি দ্বিমত পোষণ করে পরবর্তী সাক্ষ্যে। ১৯১৭ সালে রানী সত্যভামার চিঠি ও সংবাদপত্রে উল্লিখিত মৃত্যুর কারণ রক্তপায়খানা। বিচারক এই দুটি উৎসের উপর নির্ভর করেনি।

এই রক্তপায়খানা কী, যেটার পরে দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, সেটা এখন দেখা যাবে। বিচারকের কোন সন্দেহ নেই এই ক্রিয়াহীনতা মধ্যরাতে হয়েছিল।

যদি এরকম হয় তবে 'রক্তপায়খানা নিশ্চয় ভোরে শুরু হয়েছিল।

একটি মানুষের রক্তক্ষরণ হচ্ছে — নিশ্চিতভাবে তার দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ডাঃ কালভার্ট প্রেসক্রিপশন করল — একটি মিকশ্চার collapse-এর কারণে ও opium বড়ি পেট খারাপের জন্য। আশু ডাক্তার আগে বলেছিল নিবারণ ডাক্তার ও ডাঃ কনভার্ট একসাথে এসেছিল। এখন সে এটা স্বীকার করছে না। যেজন্য প্রতিবাদীপক্ষ opium বড়িকে দেওয়ার সময় হিসাবে উল্লেখ করল বেলা ২টা এবং বলল এটা পিত্তশূলে মরফিয়ার বিকল্প।

কর্নেল কনভার্ট পেট খারাপের কথা স্বীকার করেনি যেটা বর্তমানে একটা স্বীকৃত সত্য এবং তার সাক্ষ্য ছিল যে রক্তপিত্ত-সহ পায়খানা পিত্তশূলের ফল।

১৯০৯ সালের ৮মের মাত্র দুমাস পরে মৃত্যুর হলফনামায় সে বলেছে —

"৮মে সকালে রোগের আক্রমণ তীব্র হয়েছিল এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে ৭ মে কুমার ভাল ছিল। সামান্য জ্বর ও যন্ত্রণা ছিল, টেলিগ্রামের এই উক্তি অসত্য।

বিচারকের মতে ঐ দিনে রক্তপায়খানা-সহ পেট খারাপ প্রকৃত তথ্য। পিত্তশূলের ভিত্তিহীনতার অসংখ্য সূত্র আছে। কিছু কিছু উল্লেখ করা যায় —(১) কোন টেলিগ্রাম. এমনকি আশুবাবুও পিত্তশূলের কথা উল্লেখ করেনি। (২) পিত্তশূলে পেট খারাপ বা পায়খানায় রক্ত থাকে না। এর মূল কারণ কোষ্ঠকাঠিন্য। ডাঃ কনভার্ট এটা স্বীকার

করেছে। এবং কোন পেটখারাপ না দেখে সে বলেছে যে রক্ত পিত্তপূর্ণ মল সে দেখেছিল. তা পিত্তশূলের ফল।

কর্নেল কনভার্ট ও কর্নেল ডেনহাম হোয়াইটকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এই রক্তপিত্ত-মল আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের নির্দেশ করে কি না। উভয়ে না বলেছে। প্রত্যেকেই না বলেছে। তাহলে সমস্ত দিক বিচার করে এটা বলা যেতে পারে রক্তপায়খানা পিত্তশূলের কারণে হতে পারে না।

(৩) পিত্তশূলের আদৌ কোন চিকিৎসা হয়নি। যদিও ব্যথায় কুমার ইনজেকশন দিতে আপত্তি করেছিল— এই ভিত্তিতে পিত্তশূল বলা যেতে পারে। কর্নেল কনভার্টের শেষ প্রেসক্রিসশন ছিল পাকস্থলীতে প্রয়োগের জন্য বেলেডোনা লিনিমেন্ট। বিচারকের মতে এটিই সমস্ত বিষয়ের সূত্র। কর্নেল ডেনহ্যাম এই লক্ষণের ভিত্তিতে একটি মতামত দিয়েছে — 'কর্নেল কনভার্টের সাক্ষ্য পড়ে আমি মনে করি তার চিকিৎসা eterits কে সূচিত করেছিল।'

মেজর থমাস বলেছিল যে এই enterits হচ্ছে অন্ত্রের কোষঝিল্লীর প্রদাহ।

(৪) রাজপরিবার মৃত্যুর কারণ হিসাবে পিত্তশূলের উল্লেখ করে না। টেলিগ্রামেও এর উল্লেখ করা হয়নি। বীরেন্দ্র (বাঃ সাঃ ২৯০) বলেছে, "কর্নেল কনভার্ট বলেছিল পাকস্থলীতে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় যন্ত্রণা হচ্ছে।' কালভার্ট অবশ্যই এটা অস্বীকার করেছে। সত্যবাবু ও আশুবাবুর মতে 'পেটব্যথা' বা 'লিভার ব্যথা'। এটা মনে করা যেতে পারে পিত্তশূল কথাটি তাদের কাছে অপরিচিত ছিল বা এটা মনে হয়নি। এরা কলকাতায় কুমারের যে পিত্তশূলের কথা বলেছিল তার সব মিথ্যা। কর্নেল কনভার্ট মৃত্যুর পরবর্তী হলফনামায় বলেছে '১৪ দিনের চিকিৎসা'। কিন্তু সে ৬মের পূর্বে কুমারকে আদৌ দ্যাখেনি। প্রতিবাদীদের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী ৭ তারিখের আগে যন্ত্রণার মাঝামাঝি সময়ে তাকে আর্সেনিক প্রেসক্রিপশন করতে বলা হয় এবং যখন সে উপস্থিত ছিল না বিচারকের মতে, এটা একদম পরিষ্কার যে কেউ তার কাছ থেকে এই শোকপত্র চাইছে রক্তপায়খানার প্রকৃত কারণ, দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ও বাহ্য মৃত্যুর কারণ লুকাতে। এবং ডাঃ কনভার্ট, যে স্বীকার করেছে সে কোনদিন আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের রোগী দ্যাখেনি, সে এই আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে পিত্তশূলের মতামতটি গ্রহণ করেছিল এবং যেভাবে চাওয়া হয়েছিল সেইভাবে লিখেছিল, যেমন '১৪দিনের অসুস্থতা', এবং ১৯০৯ সালের হলফনামায় বয়স। কেউ বলেনি কেন, কিভাবে কে এই শোকপত্র লিখেছিল এবং কাকে প্রদান করা হয়েছিল। কনভার্ট বলেনি সে লিখেছিল। সত্যবাবু এর একটি কপি রেভিনিউ বোর্ডের কাছে ১৯২১ সালের জুন মাসে পাঠিয়েছিল বাদীর আবির্ভাবের পর এবং একটি উত্তর কনভার্ট পেয়েছিল। চিঠিটি আবিষ্কৃত হয় ১৯২১ সালের মে তে। বাদীর দাবির ভিত্তিতে বলা হয় যে মৃত্যুর সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং চিঠির একটি কপি মেজরানীর কাছে ও কালেকটারের কাছে পাঠানো হয়। বিচারক এই তথ্য বিশ্বাস করেনি। এটা কাল্পনিক।

রক্তপায়খানার অর্থ নিম্ন মলদ্বারে প্রচণ্ড মলসঞ্চয়, যেহেতু রক্ত ছিল লাল। এগুলি আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের লক্ষণ, ডাঃ গিলখ্রিস্টের মতানুসারে, যার অন্য প্রত্যেকটি মতামত বিতর্কিত এবং এই বিশেষ মতটি কর্নেল ডেনহ্যামও সমর্থন করেছে যে এগুলি তীব্র enteritis বা অন্ত্রের প্রদাহের মধ্যে দেখেছে যা একটি উত্তেজকের দ্বারা সৃষ্ট। এই উত্তেজক যে কোন কিছু হতে পারে, আর্সেনিক-সহ। এর ফলে এক ঘণ্টা বা সর্বাপেক্ষা ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হতে পারে। ডাঃ গিলখ্রিস্টের সঠিক মতামত ছিল যে আর্সেনিক বিষপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট মলের সাথে কলেরার পায়খানার মিল আছে। যদিও উভয়পক্ষের দুজন ডাক্তারই একমত হত যে এইদিনকাল লক্ষণের অর্থ এক উত্তেজক পদার্থ, তাহলে এটা বিচারকের খোঁজার পক্ষে যথেষ্ট হত যে এগুলি কোন রোগের কারণে নয়, বরঞ্চ এক উত্তেজনা পদার্থ যা তার মধ্যে ঢুকেছে। যাইহোক, বিচারককে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে এই উত্তেজক পদার্থ আর্সেনিক, যেহেতু আর কিছুই ছিল না। এখন দেখতে হবে মেজকুমার মধ্যরাতে না সন্ধ্যার কিছু পরে মারা গিয়েছিল। এক্ষেত্রে ডাঃ কনভার্টের হলফনামা ছিল যে মৃত্যু হয়েছে ১১-৪৫ মিঃ এবং তার সাক্ষ্য ছিল সে তার মৃত্যুতে উপস্থিত ছিল।

জেরায় সে বলেছিল যে সার্টিফিকেট না দেখেও সে মনে করতে পারে সে মধ্যরাতে মারা গিয়েছিল। এই কথা ২২ বছর পরেও মনে ছিল। কারণ কুমারের অনাবশ্যক মৃত্যু তার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সে স্বীকার করেছিল সাক্ষ্যের পূর্বে তাকে বিভিন্ন নথিপত্র দেখানো হয়েছিল। মৃত্যুর হলফ নামায় যে ১৪ দিনের অসুস্থতা ইত্যাদি মতামত প্রদর্শন করা হয়েছিল সেগুলি অসত্য। এখন এটা দেখতে হবে '১১-৪৫ মৃত্যু' একই রকম অসত্য কি না।

১৯১১ সালের ৩ অগস্ট ডাঃ কনভার্ট মিঃ লিন্ডসেকে একটি গোপনীয় চিঠি লিখেছিল যার বিষয়বস্তু ছিল যে সে নিশ্চিত হতে পারেনি মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল কি না। এটা অজানা যে কী তথ্য তার কাছে জানানোর পর সে উত্তরে এটা লিখেছিল। বিচারকের মতে কনভার্টের 'স্বাধীন স্মৃতি'র ব্যাপারটা অসত্য। কারণ অবিতর্কিত ঘটনাগুলি ৮ মে রাত ৭ থেকে ৮টার মধ্যে মেজকুমারের 'মৃত্যু' বা 'মৃত' বলে ধরে নেওয়া' কে নির্দেশ এবং প্রতিষ্ঠিত করে।

নিম্নোক্ত সমস্ত ঘটনাগুলি একত্রে এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করে —

(ক) প্রতিবাদীপক্ষের নিজস্ব তথ্য : দেহ নিষ্ক্রিয় হওয়া মৃত্যুকে নির্দেশ করা; নাড়ি নেই; জিঞ্জার পাউডার দ্বারা দেহ মালিশ সমস্ত সন্ধ্যার পূর্বে। রানীর তথ্যে ডাঃ বি. বি. সরকারের আগমন ও মৃত্যুর মধ্যে চিকিৎসায় একটা শূন্যতা ছিল।

(খ) মৃত্যুর পূর্বে ৩-১০ মিঃ নাগাদ শেষ টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। ৪-৪৫ নাগাদ বড়কুমার একটি টেলিগ্রাম পাঠায় দার্জিলিঙে যেটা সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ পৌঁছায় যার কোন উত্তর দেওয়া হয়নি।

(গ) সন্ধ্যায় ডাঃ বি. বি. সরকারের আগমন।

এই ডাঃ সরকারের আগমন ঘটেছিল মেজকুমারের পিতৃস্থানীয় কাকা সূর্যনারায়ণ বাবুর দ্বারা। ডাঃ সরকার ১০ মিঃ রোগীকে দেখে চলে যায়। তখন কনভার্ট ও নিবারণ ডাক্তার ঘরে ছিল না। সত্যবাবুর মতে ডাঃ সরকার কুমারকে দুবার দেখেছিল — একবার এককভাবে, অন্যবার উপস্থিত দুজন ডাক্তারের সাথে। বিচারক এটা প্রায় অসম্ভব বলে বিবেচনা করেছে যে ডাঃ সরকারের মতো স্বল্প প্র্যাকটিস বা প্র্যাকটিসহীন ডাক্তারকে কনভার্ট একমুহূর্ত সহ্য করবে না। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে কনভার্ট যখন সেখানে ছিল না তখন বি. বি. সরকার কুমারকে পরীক্ষা করেছিল এবং শেষ সময়ে।

সত্যবাবুর ডায়েরীতে, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতিদিন লেখা হয়েছিল, কিন্তু স্বীকার করেছিল ৩দিন পরে লেখা যাতে কিছু ভুলে যাওয়ার অজুহাতের সুযোগ থাকে, ৮মে তারিখে লেখা হয়েছিল—

"মধ্যরাতে কুমার রমেন্দ্র মারা যায়, দার্জিলিঙে 'স্টেপ অ্যাসাইডে', ৪ জন ডাক্তার চিকিৎসা করেছিল। (১) পারিবারিক ডাক্তার আশু দাশগুপ্ত, (২) রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ, (৩) ডাঃ বি. বি. সরকার, (৪) কর্নেল কনভার্ট। যখন সে মারা গেল প্রত্যেকেই ছিল।"

সে বলেছে এটা সত্য, শুধু ডাঃ সরকার ছাড়া। এটা কারো ক্ষেত্রে সত্য নয় শুধু ডাঃ সরকার ও আশু ডাক্তারের উপস্থিতি ছাড়া।

(ঘ) মৃত্যুর টেলিগ্রাম কোথায়?

দার্জিলিঙে উপস্থিত কেউ জানে না এর সম্বন্ধে — কে, কখন এটা পাঠিয়েছিল। পরিবারের কেউ জানে না। কালেকটারের কাছে যে সব টেলিগ্রাম সংগৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রামটি ছিল না। প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী রায়বাহাদুর এস. পি. ঘোষ সাক্ষ্য দিয়েছে যখন সে ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত ঢাকায় কোর্ট অব ওয়ার্ডের ডেপুটি কালেকটার ছিল। তখন সে সাধুর সাথে সম্পর্কিত গোপনীয় নথিপত্র দেখেছিল এবং তার মধ্যে মৃত্যুর সংবাদের টেলিগ্রামটি দেখেছিল। তাকে পুনরায় পরীক্ষা করা হয়নি। বিবৃতিটি পরিষ্কার। কেউ এটা অস্বীকার করতে আসেনি। যাইহোক, মিঃ চৌধুরী স্বীকার করেনি যে টেলিগ্রাম প্রতিবাদীদের অধিকারে রয়েছে. এখন দেখতে হবে কার অধিকারে নথিটি ছিল।

এটা সাধারণ বিষয় যে মৃত্যুর ঘোষণা করে টেলিগ্রামটি ৯মে সকালে ৯টা নাগাদ তৃতীয় কুমারের কাছে প্রেরিত হয়েছিল যখন সে স্টেশনের দিকে আসছিল দার্জিলিঙ যাবার ট্রেন ধরতে। বিলু ও সাগরবাবু তার সাথে ছিল। টেলিগ্রামটি পড়ে ছোটকুমার কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। টেলিগ্রামে তার মতে সম্ভবত 'সন্ধ্যা' মৃত্যুর সময় হিসাবে উল্লিখিত ছিল। সাগরবাবুও 'সন্ধ্যা'র কথা বলেছিল।

ফণিবাবু বলেছে সেও টেলিগ্রাম দেখেছে। মৃত্যুর সময় হিসাবে সেখানে মধ্যরাতের উল্লেখ ছিল। টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিল ক্যাবরাল। একজন মৃত মানুষকে প্রেরক হিসাবে বাছা হয়েছিল, যদিও সে অশিক্ষিত ছিল।

৮ তারিখের 'মৃত্যুর রাত' এর পাতায় সত্যবাবু সব কিছু লিখেছে, শুধু মৃত্যুর টেলিগ্রামটি ছাড়া। তারপর ফণিবাবু এল তার 'গত মধ্যরাত' সহ অস্পষ্ট মতামত সমর্থন করতে যে টেলিগ্রাম পরের দিন সকালে প্রেরিত হয়েছিল।

কেন টেলিগ্রাম পরের দিন সকালে প্রেরিত হয়েছিল তার কারণ পরিষ্কার। জয়দেবপুর স্টেশনের সিগন্যালার ছিল নিরঞ্জন রায় (বাঃ সাঃ ৯৮৫)। তার নিশ্চিত মনে নেই কোন টেলিগ্রাম রাতে এসেছিল কি না। কিন্তু রাত ৯/৯-৩০ মিঃ নাগাদ স্টেশনে গোলমাল শুনেছিল স্টেশনে যে কুমার মারা গিয়েছে। কিন্তু সে বলেছে যদি কোন টেলিগ্রাম মধ্যরাতে এসে থাকে তাহলে পরিবারকে চিন্তান্বিত না করতে রাতে সেটা রাজবাড়িতে পাঠানো উচিত হত না। মোদ্দা কথা রাতে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল এবং সেটাতে সন্ধ্যায় মৃত্যুর কথাই ছিল। 'গত মাঝরাত' কথাটি একটুকরো মিথ্যা সাক্ষ্য।

(ঙ) একজন প্রতিবাদী সাক্ষী বলেছে সেই সন্ধ্যায় স্টেপ-অ্যাসাইড়ে কোন রান্না হয়নি--যদিও কেউ ধারণা করেনি কুমার মরবে। এই দিন স্যানিটোরিয়ামে অবস্থিত কিছু ভদ্রলোক সাক্ষ্য দিয়েছে : ঐ দিনটির কথা তাদের মনে আছে, তারিখ বা কোন কিছু নয়, কিন্তু একটা ঘটনা সেদিন ঘটেছিল। যখন তারা নৈশহারের পূর্বে common রুমে বসেছিল, একটি লোক এসে বলল ভাওয়ালের মেজকুমার মারা গেছে, তার দাহের জন্য শ্মশানে নিতে তাদের সাহায্য করতে হবে। সময়টা ৮টাব পূর্বে। কারণ খাবারের ঘণ্টা ৮টা বা ৮-৩০মিঃ বাজে। বিচারক এটা সমর্থন করেছে। এই তর্ক করা হয়েছিল যে, তাদের বিবৃতি সাক্ষ্য নয়, জনশ্রুতি। এদের অবিশ্বাস করার কারণ কি ? কমিশনের সামনে পরীক্ষিত দার্জিলিঙের মধুসূদন মুখার্জী ও কালিদাস পাল বলেছে সন্ধ্যার পরেই কুমারকে দাহ করতে লোকজনের সাহায্যের জন্য তাদের ডাকতে আসা হয়েছিল।

কুমারের অসুস্থতা, ক্রিয়াহীনতা, খিল ও শরীরের সক্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে মালিশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় সব সন্ধ্যার পূর্বে। বিচারকের মতে বাহ্যত কুমারের মৃত্যু হয় ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে। বড়কুমারের ৪-৪৫মিঃ টেলিগ্রামের কোন উত্তর না দেওয়া, সন্ধ্যায় ডাঃ সরকারের আগমন। সন্ধ্যায় কোন রান্না না হওয়া, চারজন ভদ্রলোকের অনভিযোগ্য প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, প্রতিবাদীপক্ষের দ্বারা সূচী দিতে না চাওয়া ইত্যাদির জন্য অন্য কোন উপসংহার সম্ভব নয়।

যাইহোক, এটা আশ্চর্যজনক নয় যে যদিও কিছু দক্ষতার সঙ্গে মেজরানীর মুখে বক্তব্যসমূহ স্থাপিত করা হয়েছিল, যাতে এটা আশুডাক্তার ও বীরেন্দ্রর পূর্ব বিবৃতির সঙ্গে কিছু পরিমাণে মানানসই হতে পারে।

শোকপত্র, প্রেসক্রিপশন, টেলিগ্রামগুলি, ডাঃ কনভার্টের মৃত্যুর হলফনামা, সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ফাঁকা সময়ের সঙ্গে নার্স জগৎমোহিনী সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাতের একটা পরিষ্কার চিত্র প্রদান করেছিল। সে বসে পাউডার মালিশ করছিল। তারপর সে, আরেকজন মঙ্গলী ও ডাঃ কনভার্ট চলে গেল। ঘরটি প্রকৃতই নিস্তব্ধ ছিল। সে রোগীকে কিছু ডালিমের রস দিয়েছিল। হঠাৎ তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল. রানী কেঁদে উঠল।

ডাঃ কনভার্টকে তৎক্ষণাৎ পাঠানো হল। সে এসে কিছু একটা প্রেসক্রিপশন করল ১০/১১ নাগাদ (সন্ধ্যার পর কোন প্রেসক্রিপশন হয়নি) কিন্তু ওষুধ আসার পূর্বে রোগীর গলায় ঘরঘর শব্দ হল এবং সে মারা গেল। সে ডাঃ সরকারের উল্লেখ করেনি অবশ্যই এবং সারারাত রানীকে ঘরের মধ্যে দেখেছে। কিন্তু বিচারক এটা বিশ্বাস করেনি। তার মতে যখন ডাঃ সরকার এসেছিল তখন রানী সেই ঘরে ছিল না, সে কাঁদছিল তৃতীয় ঘরে যেটা রামসিং সুব্বা দেখেছিল। বাদীর সাক্ষীদের মতে, প্রায় ৯টার সময় দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং বীরেন্দ্রর পূর্ব বিবৃতি ছিল—"রাত ৯টার পর রানী ঘরে ছিল। এর পূর্বে সে এর সংলগ্ন ঘরে ছিল। এখন সে এটা অস্বীকার করেছে, কিন্তু আশুডাক্তার এখনো স্বীকার করে যা সে পূর্বে বলেছিল 'যে তার মৃত্যুর সময়ে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বাংলার কিছু লোক উপস্থিত ছিল। যদি এই সময় লোকজন থেকে থাকে তাহলে সে ঘরে থাকতে পারে না। এটা লক্ষ্য করতে হবে যে লোকজন মৃত্যুর সময়ে ছিল, কিন্তু একজনও বাইরের লোককে ডাকা হয়নি। প্রতিবাদীদের বর্তমান সাক্ষ্য অনুসারে ডাক্তার ও নার্সরা উপস্থিত ছিল।

মৃতদেহকে কখনো দাহ করা হয়নি, এ বিষয়ে স্যানটোরিয়ামে অবস্থানরত বাবু পদ্মিনীমোহন নিয়োগী বলেছে যে ৭/৮ জন লোকের সাথে সে স্টেপ-অ্যাসাইডে গিয়ে দেখে কুমারের দেহ নিজে একটি চারপায়ার উপর আবৃত হয়ে পড়ে আছে। তারা তাকে কাগঝোরায় নিয়ে যায়। তারপর আবহাওয়া খারাপ দেখে ১৫/২০ মিঃ কি আধঘণ্টা, ৯-৩০/১০টার মধ্যে স্যানিটোরিয়ামে ফিরে আসে এবং একটু পরে বৃষ্টি আসে। বিচারকের কাছে তার এই সাক্ষ্য সত্যি বলে মনে হয়েছে।

অন্যান্য সাক্ষীরা যারা এই শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল তারা হল কিরণ মুস্তাফী (বাঃ সাঃ ৯৪১), বিশ্বেশ্বর মুখার্জী (বাঃ সাঃ ৯৪৪) যতীন্দ্র চক্রবর্তী (বাঃ সাঃ ৯৪৭), মন্মথ নাথ চৌধুরী (বাঃ সাঃ ৯৮৬) চন্দ্র সিং (বাঃ সাঃ ৯৬৮), সীতানাথকুমার বাগচি (কমিশন)। এরা সকলেই বলেছিল শবযাত্রা ৯টা নাগাদ শুরু হয়ে রাত ১০টা নাগাদ শ্মশানে পৌঁছায়। খাট সাজানোর কয়েক মিনিট পরে মুষলধারে বৃষ্টি আসে। সকলে বৃষ্টির জন্য আশপাশে আশ্রয় নেয় এবং আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে দ্যাখে খাটের উপর দেহ নেই। চিৎকার ও কান্নার রোল ওঠে। লণ্ঠন নিয়ে খোঁজা হয়। তারপর তারা ফিরে আসে। এই সাক্ষ্যে পরিস্থিতিগত বিশদ বর্ণনা খুব স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হয়েছে। সকলেই বলেছে দেহটি কমার্শিয়াল রো রুট ধরে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যাই হোক, তথ্যটি একটি গল্পের মতো শোনাবে। উপরোক্ত সাক্ষী ছাড়াও যে সব দোকান থেকে শেষকৃত্যের দ্রব্যসামগ্রী কেনা হয়েছে, যারা শবযাত্রা দেখেছে, সেই সব সাক্ষীও আছে। (বাঃ সাঃ ১০১৬, ৮৩৮, ৯৪০, ৯৬৩, ৯৬৬ ৯৭৮, ৯৮০, ৯৮৩)।

অনুকূল চ্যাটার্জি যাকে কুমারের কাকা সন্ধ্যার কিছু পরে ভুটিয়া বস্তি থেকে ডেকে এনেছিল তার প্রতি প্রতিবাদীপক্ষের বক্তব্য ছিল সে সকালে শবযাত্রার সঙ্গে গিয়েছিল এবং তারা তাদের সাক্ষী হিসাবে ফকির রায়কে পরীক্ষা করেছিল। সে বলেছে, সে রাতে

কোন শবযাত্রা দ্যাখেনি, সকালে দেখেছিল, কিন্তু যোগ দেয়নি। কিন্তু তার সঙ্গে অনুকূল চ্যাটার্জির আলোচনা হয়েছিল এ বিষয়ে। আলোচনার বিষয়টি নিয়ে তাকে পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। এই পুনঃ পরীক্ষা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কারণ কেউ অতীতে কোনও এক দিন বৃষ্টি হয়েছিল কিনা তা মনে করতে পারে না যদি না সেটা কোন ঘটনার সাথে জড়িত থাকে যা তার মনে ছিল।

৮ মে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল কি না সেটা জড়িত তিনটি বিষয়ের সাথে। একটি হল যে কোন ঝড়বৃষ্টি হয়নি. দ্বিতীয়, শ্মশানে কোন ছাউনি ছিল কি না। তৃতীয়ত. কাছাকাছি কোন কুঁড়ে বা ছাউনি ছিল যাতে লোকজন আশ্রয় নিতে পারত।

বাদীপক্ষের বক্তব্য ছিল দেহ পুরানো শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে কোন ছাউনি ছিল না। প্রতিবাদী সাক্ষের মতে কুমারের দেহ নতুন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে ছাউনি ছিল। এটা স্বীকৃত যে ১৯০৭ সালে নতুন শ্মশান নির্মিত হয়েছিল এবং পুরানো শ্মশান তখন ব্যবহার করা হতো না।

কিন্তু বিভিন্ন সাক্ষ্যে পাওয়া গেছে যে পুরানো শ্মশানের দুর্বল অবস্থাকে উন্নত করা হয়েছিল ও একই ছাউনির সংস্কার করা হয়েছিল। বাঃ সাঃ মিঃ মন্মথ চৌধুরীর মতে পুরানো ও নতুন শ্মশানের মধ্যে পার্থক্য শুধু একটা ছাউনির ও রাতে বেশী নিচে নামার হাত থেকে রেহাই— যদি পুরানো শ্মশান বাছা হয়। ১৯১১ সালে নতুন সুকুমারী সড়ক নির্মিত হওয়ার পর অবশ্যই কেউ পুরানো শ্মশানে যেত না, যেহেতু নতুন শ্মশান রাস্তার কাছে পড়ত।

এখন যে কুঁড়েগুলিতে সাক্ষীরা আশ্রয় নিয়েছিল তার প্রসঙ্গে আসা যাক। মন্মথবাবু বলেছে সে বর্তমান কসাইখানার নিকটে একটি কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েছিল। এটা পরিষ্কার যে শাকসব্জীর বাগানের মালীদের জন্য সেখানে কুঁড়ে ছিল। চন্দ্র সিং নামে বাঃ সাক্ষীও এই কসাইখানায় অশ্রয় নিয়েছিল বৃষ্টির জন্য। ফকির নামে প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী বলেছে এই ঝড়বৃষ্টি অনেকটা কালবৈশাখীর মত। এর সময় ছিল এটাই। এটা বর্ষা নয়। বিচারক এই তথ্য বিশ্বাস করেছে যতক্ষণ না কোনকিছুর দ্বারা বৃষ্টিকে বাদ দেওয়া যায় এবং প্রতিবাদীদের চেষ্টা ছিল এটা বৃষ্টির রিপোর্টের দ্বারা বাদ দেওয়া।

প্রতিবাদীপক্ষের মতে ঐদিন দার্জিলিঙে বৃষ্টি হয়নি, দার্জিলিঙে সেন্টপলস গীর্জায় বৃষ্টিমাপক যন্ত্র আছে। সেই বৃষ্টিপাতের রিপোর্ট গভর্নমেন্ট গেজেটে ছাপা হয়। অন্যান্য স্থানেও বৃষ্টিমাপক যন্ত্র আছে। তবে দার্জিলিঙ শহরে এক স্থানে বৃষ্টি হলে অন্যস্থানে তা নাও হতে পারে।

দার্জিলিঙে বোটানিকাল গার্ডেনে বৃষ্টিমাপক যন্ত্র আছে। প্রতিবাদীপক্ষ এই বোটানিকাল গার্ডেনের রিপোর্ট বেশ করে দেখিয়েছে যে ঐদিন দার্জিলিঙে বৃষ্টিপাত হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার খাতার যে পাতায় বৃষ্টিপাত লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল সেই খাতায় অদৃশ্যহাতের কারচুপি দেখা গিয়েছিল এবং তা এত কাঁচাহাতে করা হয়েছে যে দেখামাত্র সবকিছু অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এমনকি অন্য কালিও ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহলে বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং সেটি লুকোনোর জন্যই খাতার পাতায় কারচুপি করা হয়েছিল।

প্রতিবাদীপক্ষের মতে রাত ১১-৪৫ মিঃ কুমারের মৃত্যু হয় ও পরদিন সকালে দেহ যথারীতি হিন্দুধর্ম অনুযায়ী নতুন শ্মশানে সৎকার করা হয়। দেহ স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে, ঘি মাখিয়ে, পিণ্ডদান করে দাহ করা হয়েছিল দেহ। এ বিষয়ে কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায়—ডেপুটি কমিশনারের অফিস কর্মী বসন্তকুমার মুখার্জি বলেছে যে সে নার্স জগৎমোহিনীর কথায় সকাল ৮টায় স্টেপ অ্যাসাইডের বাড়িতে যায়। কাপড় দিয়ে আগাগোড়া আবৃত ছিল মৃতদেহটি। সুতরাং সে মৃতের মুখ বা শরীর কোনটাই দেখতে পায়নি। আধঘণ্টা পরে যে শবযাত্রা বেরিয়েছিল তার সঙ্গে সে গিয়েছিল। কিন্তু কাঁধ দেয়নি। দেহটি তার লম্বা বলে মনে হয়েছিল। আমাদের দেশে মৃতদেহ বা খাট কেউ ছুঁয়ে থাকে কিন্তু লোকের অভাব না থাকলেও মৃতদেহ বা খাট কেউ ছুঁয়ে থাকেনি। একজন মহিলা ওপরে একা বসে কাঁদছিল।

দেহটি শ্মশানে একটি এলোমেলো চিতার উপর রাখা হল, কিন্তু মৃতদেহ দাহ করবার আগে যে সব রীতি পালন করা হয় তার কিছুই করা হয়নি, না স্নান করানো, না ঘৃত লেপন, না পিণ্ডদান, কিছুই না, ঠিক সেইরকম ঢাকা দেওয়াই রইল। সেইভাবেই দেহটি দাহ করা হল। সে কোনদিন এরকম শবদাহ দেখেনি।

স্বামী ওঙ্কারানন্দও তার সাক্ষ্যে ঐ একই কথা বলেছে। মৃতদেহটি তার লম্বা বলে মনে হয়েছিল এবং কোন হিন্দু প্রথা পালন করা হয়নি। দেহটি দাহ করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ আবৃত ছিল।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার যে শ্মশানে কার দেহ দাহ করা হয়েছিল সেটা সত্যবাবুরা কাউকে জানতে দিতে চায়নি। কুমারের দেহ হলে মুখ না খুলে রাখার কোন কারণ থাকতে পারে না। পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য লোকেরা অবশ্য মনে করেছিল কুমারের স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল, কিছু সন্দেহ করেনি। সুতরাং শবদাহ অন্যরকমভাবে হলেও কোন সন্দেহ জাগেনি। আর সত্যবাবুদের পক্ষে একটা শবদাহের প্রয়োজন ছিল। শ্মশান থেকে কুমারের দেহ হারিয়ে গেল একথা তারা জয়দেবপুরে গিয়ে বলবেন কি করে? তাছাড়া দেহ সৎকার করা হয়েছে প্রমাণিত না হলে বীমা কোম্পানি টাকা দেবে না।

সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ৮ই মে কুমারের রাত্রে মৃত্যু হয়েছিল এবং সেইদিন রাত নটার সময় শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শ্মশান থেকে মৃতদেহ যে অদৃশ্য হয়েছিল বা পরে তা আবার পাওয়া গিয়েছিল, এ কথা বাদী বা প্রতিবাদীপক্ষের কেউ সাক্ষ্যে বলেনি।

যে সমস্ত সাক্ষীরা শবযাত্রার কথা বলেছিল বা শবযাত্রার পূর্বে দেহটি দেখেছিল তা হল এই—

(১) কালীপদ মিত্র, (২) কানাইরাম মুখার্জি, (৩) নলিনী ঘোষ (৪) শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জি, (৫) মহেন্দ্র ব্যানার্জি, (৬) ক্ষেত্রমোহন ভট্টাঃ (৭) তিনকড়ি মুখার্জি, (৮) রাজেন্দ্র

শেঠ, (৯) বিজয় মুখার্জি, (১০) জগৎমোহিনী দেবী (১১) মিঃ আর. এন. ব্যানার্জি, (১২) গীতা দেবী।

এদের প্রথম ৬ জন সেক্রেটারীয়েটের কেরানী, শ্যামাদাস ছাড়া। এরা কমিশনের সামনে পরীক্ষিত হয়েছিল।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা আদালতে পরীক্ষিত হয়েছিল— এরা সকলেই প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী।

১. আর লিউস (১১), ২. ফ্রেডরিক লফটম (১৩), ৩. এ. প্রিভা, ৪. দুর্গাচন্দ্র পাল (৫৭), ৫. নরেন মুখার্জি (৬৬), ৬. সুরেন্দ্রচন্দ্র, ৭. নরুল হক, ৮ মতিয়ার রহমান (৭১), ৯. পলম্যান (৭৩), ১০. লখি মুদী, ১১. কালী ছত্রি (৭৩), ১২ ডাঃ এম. সি. রায় (১০৩), ১৩. সতীশচন্দ্র মুখার্জি (১০৫), ১৪. কালী ছত্রিনি (১১৯), ১৫. সত্যপ্রসাদ ঘোষাল, ১৬. নন্দগোপাল গড়গড়ি, ১৭. তেজবীর (৭১), ১৮. পূর্ণ ব্যানার্জি, ১৯. পঞ্চানন মিত্র(১১৩), ২০. মিঃ হল্যান্ড(৩০৯) ২১. তারাপদ ব্যানার্জি (৪২০)।

এরা ছাড়া সাক্ষ্য দিয়েছে মেজরানী, সত্যবাবু, বীরেন্দ্র, আশুডাক্তার, বিপিন, বাড়ির বাসিন্দা ও অ্যান্টনি মোরেল।

আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছে যারা তারা প্রত্যেকেই শবযাত্রার রাস্তা হিসাবে থর্ন রোডের কথা উল্লেখ করেছে। বাদী পক্ষের তিন সাক্ষী বলেছে তারা স্টেপ অ্যাসাইড থেকে শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ছিল। এরা হল— ১. বসন্তকুমার মুখার্জি, ২. স্বামী ওঙ্কারানন্দ ওরফে ক্ষেত্রনাথ মুখার্জি, ৩. রামসিং সুব্বা।

এদের মধ্যে বসন্ত মুখার্জি বলেছে শবযাত্রা থর্ন রোড ধরে নয়, কমার্শিয়াল রোড ধরে গিয়েছিল।

ডেপুটি কমিশনারের আরেক অফিসকর্মী নলিনীকান্ত চক্রবর্তী কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে পূর্বে দেহটি আপাদমস্তক আবৃত ছিল এবং এইভাবেই পুড়েছিল। পরবর্তীকালে ৩-৬-২১ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে সে বলেছিল দেহটি অনাবৃত ছিল এবং সেটি ছিল সুগঠিত, বলিষ্ঠ ও ফর্সা এক যুবকের। পূর্বেই সাক্ষীকে এসব শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল।

প্রতিবাদীপক্ষের মতে কুমার ১১-৪৫ মিঃ নাগাদ মারা গিয়েছিল। তারপর বিভাবতী সারারাত্রি কুমারের দেহ জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল এবং আরো একজন মহিলা বিভাবতীকে জড়িয়ে ধরেছিল। পরদিন সকালে মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাবার পরও বিভাবতীদেবী সেখানেই পড়ে রইলো। তারপর বিভাবতীর মাতুল সূর্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়; তিনি সেই সময় দার্জিলিঙে অন্য একটি বাড়িতে ছিলেন। তিনি এবং কাশীশ্বরীদেবী উভয়ে বিভাবতীকে সেখান থেকে জোর করে তুলে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

নিজের ঘরে ঢুকে বিভাবতী গা থেকে একে একে গয়নাগুলি খুলে ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগলো, নেহাত যেগুলি খুলতে পারলো না সেগুলি গায়ে রইল। বিপিন খানসামা সেগুলি তুলে রুমালে বেঁধে রেখে দিয়েছিল। তারপর একজন মহিলা বিভাবতীকে স্নান করাবার জন্য

কলঘরে নিয়ে যায়। স্নান করে বাড়ির চাকরবাকরদের মতো একখানি ধুতি পরে বেরিয়ে এলো। বিভাবতী কাঁদছিল ও বিলাপ করছিল, "আমি আমার স্বর্বস্ব পাহাড়ে রেখে এলুম।" একজন মহিলা বলল, "বাছা, গয়নাগুলি এখুনি খুলে ফেললে?" বিভাবতী কাঁদতে কাঁদতে বলল, "এখন তো আমাকে গয়না খুলতে কেউ বাধা দেয়নি, তিনি আমাকে কোনো গয়না খুলতে দিতেন না।"

বিচারক দেখেছে বসন্তবাবু ও ওঙ্করানন্দ স্বামী সত্য বলেছিল। দেহটিকে আবৃত করে মিছিলে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং যত শীঘ্র সম্ভব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। সমাপ্তি নির্ভর করে একটি একক ঘটনার উপর - - যে কুমার সন্ধ্যার সামান্য পরে মারা গিয়েছিল; এবং এই দিনেব অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত সাক্ষ্যের পরীক্ষা এই সমাপ্তিকে নিশ্চিত করে। এটা ব্যাখ্যা করে অস্বাভাবিক মিছিল, ডাঃ আচার্যকে দেহ পরীক্ষা করতে ডাকা, ৯ তারিখে দার্জিলিং থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত মৃত্যুসংবাদসংক্রান্ত নোটিশের আগমন উল্লেখ করছে যে মধ্যরাত্রি মৃত্যুর সময় এবং রোগটি তলপেটে ব্যথা ও রক্তক্ষরণ সহ জ্বর, পরের দিন শোকবার্তা গৃহীত হচ্ছে। শ্মশানের জন্য টাকার একটা অঙ্কের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। কেউ জানে না কে অর্থ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু স্যানিটোরিয়ামের মিঃ চন্দ জানতে চেয়েছিল এটা এবং বড়কুমারের কাছে চিঠি দিয়েছিল স্যানিটোরিয়ামের আরো অর্থ চাই এবং সে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছে, বাহ্যত এটা সংগ্রহ করতে।

জীবনবীমার অর্থ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দাহের কাগজপত্র গৃহীত হয় (২২০২/২২২০)। যদিও শ্মশান কর্মচারীর (catrah) স্বাক্ষর ছিল অত্যন্ত সন্দেহজনক। এই ব্যক্তি এবং দার্জিলিঙদলের প্রত্যেকেই জানত কী ঘটছে, কিন্তু বিশ্বাস করছিল যে মৃত্যুটা ঘটনা। তারা বড়জোর পরিবারের মুখোমুখি হতে পারত এবং বলতে পারত কুমারের দেহ দাহ হয়নি। বাহ্যত তারা এটাই বলেছিল। সত্যভামাদেবী ১৯১৭ সালে বর্ধমানের মহারাজের কাছে লিখেছিল অনুসন্ধান করতে এবং ১৯২২ সালে মেজরানীর কাছে একটি চিঠিতে উল্লেখ করেছিল এটা।

রায়সাহেব উমেশচন্দ্র ধর, কালীগঞ্জ স্কুল কমিটির সদস্য ও এস্টেটে কর্মরত, তার আত্মীয়েরা ছিল প্রতিবাদী পক্ষের অধীন। সে কমিশনের সামনে পরীক্ষাকালে বলেছিল যে টেলিগ্রাম থেকে মৃত্যুর সময় চেয়েছিল, স্থানীয় নায়েব তাকে দেখিয়েছিল এবং বিবৃতি পরিবর্তন করেছিল যখন সে একটি প্রশ্ন থেকে জানে কালীগঞ্জে কোন টেলিগ্রাফ অফিস ছিল না এবং এই সভা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে অন্য কোন সদস্য কথা বলেনি। একটি কাল্পনিক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কালেকটারের কাছে পাঠাতে ব্যবহৃত হয়েছিল যার সম্বন্ধে কেউ বলেনি, এমনকি ফণিবাবু, যদিও তার সাধুর বিরুদ্ধে মতামত ছিল (Ex. 223); কিন্তু শোকসভায় গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি সবচেয়ে ভাল উত্তর হচ্ছে ঘটনা যেটা সন্ধের পর তার বাহ্যত মৃত্যু প্রমাণ করেছে। এস্টেটের অধিকৃত কাগজপত্রের কিছুই এটা দেখাতে দাখিল করা হয়নি যে জয়দেবপুর জানত মৃত্যুর সময় মধ্যরাত, একটি লেখা ছাড়া, "রাত্রে তার মৃত্যু হয়েছিল,"

ধারণা করা হচ্ছে লেখাটি সত্য। সত্যবাবুর মতে বাঙালি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সময়কে রাত বলে। একটি লেখা ছিল যে মেজকুমারের 'অস্থি' গঙ্গায় অর্পণ করা হয়েছে যেটা শুধু প্রমাণ করে কিছু ছাইকে তার অস্থি হিসাবে আনা হয়েছে---যদিও বীরেন্দ্র বলেছে একটা হাড়ের টুকরো এবং মিঃ আর এন. ব্যানার্জী মতামত দিয়েছে নাভি, 'রবারের মতো সারাংশ'। যাইহোক, এটা বলা যায় বাহ্যত মৃত্যু ঘটেছিল রাতে, দেহকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাতে।

এই বিষয়ে বিচারকের উপসংহার হচ্ছে এটা মেজকুমারের সঙ্গে বাদীর পরিচিতির সম্পর্কিত উপসংহারের কিছুই প্রকাশ করে না। কুমারের বাহ্য মৃত্যু হয়েছিল ৭টার থেকে ৮টার মধ্যে, দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ১০টার সময় এবং দেহ কখনো দাহ করা হয়নি। এটা কারো বক্তব্য নয় এবং সত্যবাবু বলেছে যে এটা ঘটনা নয় যে দেহ খুঁজে পেয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল এবং পরদিন সকালে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদি পরিচিতি গাণিতিক নিশ্চয়তা-সহ প্রমাণিত হয়ে থাকে, এটা পরদিন সকালে একটি বিকল্প দেহের দাহের দ্বারা স্থানচ্যুত হতে পারে না। প্রত্যেকেই এর অত্যধিক অসম্ভাব্যতাকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এটা পরিচিতিকে এবং এর সাথে ঘটনাকে এবং এর প্রতিউক্ত মিথ্যাকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। সত্যবাবু দার্জিলিঙে যায় সাক্ষীদের প্রভাবিত করে দেখাতে যে এটা কোন স্বাভাবিক শেষকৃত্য ছিল না। তার ডায়েরি ও যৌবন থেকে কোন অসম্ভাব্যতা উদিত হয় না। ঘটনা হচ্ছে দেহকে শ্মশানে রেখে আসা হয়েছিল, বৃষ্টি আরম্ভ হলো এবং সেটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না দেহটি জীবিত ছিল এবং এর প্রবৃত্ত প্রমাণ হচ্ছে বাদী একই মানুষ- - তার দেহ, বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন সমূহকে লক্ষ্য করে এবং মানুষের সাক্ষ্য দেখে যারা বলেছে সে একই মানুষ। এগুলি কোন একক যোগ্যতার ভিত্তিতে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। যাইহোক, এই বিষয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্য অবশ্যই বিবৃত করতে হবে যে দেহটি জীবিত ছিল এবং কুমারকে চারজন সন্ন্যাসী উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল এবং যাদের সাথে সে ১২ বছর বাস করেছিল ঢাকা আসার আগে পর্যন্ত। কেউ এই সাক্ষ্যকে গ্রহণ করবে না বা পরিচিতির প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করবে না, যদি না এটা অন্যভাবে প্রমাণিত হয়, কিন্তু পরিচিতি গৃহীত হয়েছিল এবং এটা বাতিল করার কোন কারণ থাকবে না।

বাদী বলেছে যে স্টেপ আসাইডে সে অচেতন হওয়ার পরে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল, যেন সে একটি কুটীরের মধ্যে চেতনা ফিরে পেয়েছে এবং চারজন সন্ন্যাসীর মধ্যে যারা তাকে সেবা করছিল এবং তাদের সঙ্গে দার্জিলিঙ ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। সে বলেছে যে ঐ সন্ন্যাসীরা ছিল ধর্মদাস নাগা যে পরে তার গুরু হয়েছিল এবং অন্য তিনজন পীতম দাস, লোক দাস ও দর্শন দাস; সবাই নাগা এবং পুরোদস্তুর ... সা। শীঘ্রই গল্পের এই অংশে আসা যাবে। কিন্তু দর্শন দাস এই উদ্ধারের বিষয়ে একটি তথ্য দিয়েছিল। এটা তার একক সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল।

তার সাক্ষ্যটি এরকম — "তারা দিনের বেলায় বাজারে কাটাত। কিন্তু রাতের বেলায় একটি নির্জন স্থানে কাটাতে চেয়েছিল এবং সেজন্য তারা শ্মশানের পশ্চিমে পাথরের চাংড়া দ্বারা আবৃত একটি গুহায় কাটাতে মনস্থ করল।

একদিন রাতে ঝড়বৃষ্টির সময়ে একদল লোক হরিধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে এল এবং তারা শুনল হঠাৎ হরিধ্বনির গোলমাল থেমে গেল। তারা বাইরে বেরিয়ে একটি শব্দ শুনে কাপড় দ্বারা আবৃত একটি দেহকে দেখতে পেল। বাবাজী লোকনাথজী দেহটি পরীক্ষা করার পর বলল দেহটি জীবিত। তারা দেহটি গুহায় নিয়ে গিয়ে ভিজে জামাকাপড় ছাড়িয়ে কম্বলে ঢেকে পাহাড়ের নীচে আরেকটি ঘরে নিয়ে যায়। দেহটি শীতে কাঁপছিল ও গোঙাচ্ছিল। তারা তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝের উপর শোয়াল। ......

তথ্যটি এইভাবে এগিয়ে যায় বিস্তৃতভাবে, কোথাও না থেমে, এমনকি স্থানের বিষয়েও নয় — সেখানে নতুন সুধীরকুমারী রোড তৈরি হয়েছে এবং পুরাতন শ্মশানের সমস্ত চিহ্ন মুছে গিয়েছে। লোকটি অস্বীকার করেছে এই ঘটনার পর সে দার্জিলিঙে ছিল। তার তথ্য একটা রূপকথার মতো পড়া যায় এবং যদি বাদীর প্রয়োজন হয় তার পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠা করার, সে ব্যর্থ হবে, কারণ তার সাক্ষ্যে এটা বেশি দৃষ্ট হতে পারে না যে সে কুমার। এটা হতে পারে যে সাক্ষীকে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং কেউ তাকে শিখিয়েছিল। এমনকি তখনো বিচারক আশা করেছিল এই ধরনের সাক্ষী কাঠগড়ায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু তা যে হয়নি। সে শান্ত নির্বিকারভাবে যেন স্মৃতি থেকে তথ্যগুলি বলে গিয়েছে।

তারপরের তথ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই লোক আসতে শুরু করলে তারা অন্য কুটিরে চলে যায় এবং তারপর ১৪/১৫ দিন পরে দার্জিলিং ত্যাগ করে। চেতনা ফিরে পেলেও লোকটি বোবার মত হয়ে যায়, যদিও সে কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করেছিল।

গিরিজাভূষণ রায় নামে কলকাতার একজন কাঠের ব্যবসায়ী ও বণিক, কবিরাজ শ্রীশ গুপ্ত ও বিজয় নামে তার দুই আত্মীয়— এই তিনজন সাক্ষী সাক্ষ্যের এই অংশকে সমর্থন করে। গিরিজাবাবু বলেছে তার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার মামা দার্জিলিঙের উচু বাজারে একটি কবিরাজী দোকান চালাত এবং ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ছিল -- একটি চার কামরার কুটির। গিরিজাবাবুর সাথে তখন তার সম্পর্ক ছিল না, 'ওষুধ কারখানার দায়িত্ব' ছিল তার কুটিরের একটি ঘরে সে বাস করত ও আরেকটি ঘরে গিরিজাবাবু কম্বল বা এই ধরনের জিনিস তৈরি করত। এর সংলগ্ন আরেকটি কুটিরকে মাল গুদাম হিসাবে ব্যবহার করত। গিরিজাবাবু ও বিজয় সন্ন্যাসীদের উপরোক্ত সাক্ষ্যকে সমর্থন করেছে। প্রতিবাদীদের বক্তব্য সেখানে কুটির ছিল না যেখানে কারখানা অবস্থিত ছিল। তারা তিনজন সাক্ষীকে ডেকেছিল যে ১৯০৯ সালে কাগঝোড়া ও বেগুই ঝোরার মধ্যে কোন কুটির ছিল না। এরা হল মিঃ মরগেনস্টেন, সামসুদ্দীন ও অনুপবাবু।

পূর্বোক্ত দর্শন দাস, মতামত দেওয়া হয়েছিল, যাকে একটি গল্প বলতে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং যে আদালতে ফাইলকৃত একটি ছবিতে ছিল — সে এটা অস্বীকার করেছিল -- পরে নিজেকে ধর্মদাসের শিষ্য হিসাবে প্রমাণ করতে এসেছিল এবং সে নিজের সম্বন্ধে, তার ঘর, তার গুরু ধর্মদাসের সম্বন্ধে যে তথ্য দিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ একজন মানুষের দ্বারা আরোপিত যে আদালতে বাদীর গুরু ধর্মদাস নাগা হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। এই বিষয়ে শীঘ্রই আসা হবে।

১৯০৯ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সন্ন্যাসীর জীবন

এই সবচেয়ে কুমারের সম্বন্ধে কিছু শোনা যায়নি বা তার সম্বন্ধে কিছু জানাও যায়নি এবং এই বিষয়ে কেউ বলেনি যে সে জীবিত ছিল, যদিও একটা গুজব ছিল সে জীবিত ছিল। উপরে বর্ণিত এই সময়ের তথ্য প্রদর্শন করে যে তার মৃত্যু ছিল একটা গৃহীত ঘটনা। তার প্রদত্ত তথ্যটি এইরূপ—সে জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি কুটিরে তার চেতনা ফিরে পেয়েছিল এবং নিজেকে চারজন সন্ন্যাসীর মধ্যে দেখেছিল— ১৫/১৬ দিন সেখানে থাকার পর সেখান থেকে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো রেলে রওনা দিল। বেনারস এল। তারা হিন্দীতে কথা বলত। তারপর সেখানে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছে সন্ন্যাসীদের সাথে। তারপর কাশ্মীরের অমরনাথে, কোশীনগরে, নেপালে, তিব্বতে এবং ফিরে এসেছে নেপালে, তারপর নেপাল ত্যাগ করার পূর্বে ছত্রে কিছু একটা ঘটেছিল।

"এখানে আমার মনে পড়েছিল আমার বাড়ি ঢাকায়"

তাকে এই বিষয়ে তার মানসিকতাকে ব্যক্ত করতে বলা হয়েছিল। সে মনে করতে পারেনি সে কী ছিল বা কোথায় তার বাড়ি ছিল বা কারা তার আত্মীয়। তার মনে পড়েছিল তাকে দার্জিলিঙের এক শ্মশানে ভিজে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার গুরু বলেছিল, যখন সময় হবে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। তারপর বাহু ছত্রে তার স্মৃতি ফিরে এল এবং ঢাকায় বাকল্যান্ড বাঁধে এল।

জয়দেবপুরে প্রথম আগমনের সময় থেকেই সব কিছু তার কাছে পরিচিত বোধ হতে শুরু করল। উভয়পক্ষই ডাক্তারকে ডেকেছিল। বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল লেফটাঃ কর্নেল হিল যে বলেছে সে ৩০ বছর যাবৎ মানসিক অচেতনতার কথা পড়েছে ।.প্রতিবাদীর তরফে সাক্ষ্য দিয়েছিল মেজর ধূর্নজিভয়। উভয় লক্ষই ডাঃ টেইলেরের Abnormai psychology and Mental Hygine বইটির উল্লেখ করেছে। উভয় পক্ষের বিশেষজ্ঞের দ্বিমত কোথায় বা আদৌ দ্বিমত আছে কিনা এটা পরে নির্দেশ করা হবে। এটা স্বীকার্য যে এইরূপ বিষয়ে অর্থাৎ মানসিক রোগে স্মৃতি হারানো বা স্মৃতিবিলোপ বাহ্যত কোন শারীরিক বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ সংক্রান্ত বিকৃতির ফলে উৎপন্ন হতে পারে। এই বিশৃঙ্খলাকে মানসিক সূত্রে অভিব্যক্ত করতে হবে এবং এই বিষয়ের বৈচিত্র্য সীমাহীন। এইগুলি হল (১) মনের পশ্চাৎগতি (২) দ্বৈত-সত্তা ইত্যাদি। পশ্চাৎগতিতে এইগুলি হল (১) মনের পশ্চাৎগতি (২) দ্বৈত-সত্তা ইত্যাদি। পশ্চাৎগতিতে ব্যক্তি শৈশবের দিকে ফিরে যেতে শুরু করে। এটি খুব দুর্লভ দ্বৈত সত্তায় মানুষ স্বাভাবিক আচরণ করে, কিন্তু সে ভুলে যায় সে কে। বাদীর তথ্য হচ্ছে যে সে ভুলে গিয়েছিল সে কে ছিল এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে ১২ বছর বাস করছিল যতদিন না সে মনে করতে পেরেছিল তার বাড়ি ঢাকাতে এবং ঢাকাতে তার পুরানো স্মৃতি ফিরে এল। মেজর আমাদের মতামত হচ্ছে যে বাদীর মামলাটি হচ্ছে দ্বৈত-সত্তার মামলা। আবার তার মতে বাদীর মধ্যে এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় ছিল যেগুলি অসম্ভব। এগুলি ব্যক্তির পশ্চাৎগতিও নয়, আবার দ্বৈত সত্তাও নয়। মেজর ধূনজিভয়ও প্রকৃতপক্ষে একই মতামত দিয়েছিল। সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ মিঃ হিল বাদীর তথ্যে কোনকিছুই অসম্ভাব্যতা দেখেনি।

বাদী যদি শৈশবস্থায় থাকে সে স্বাভাবিক হতে পারে না। বাদী বলেনি সে শৈশবস্থায় ছিল। সে বলেছে কী অবস্থায় ছিল এটা এবং এটাকে অচেতনতা এবং এও বলেছে সে বস্তু চিনত, কিন্তু

দার্জিলিং থেকে বেনারসের অসিঘাটের কোন স্মৃতি ছিল না। তার তথ্যকে খাতায় কলমে গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু তার বর্ণনাকে সঠিকভাবে নিলেও বলা যায় এটা শৈশবাবস্থা ছিল না। এটা হচ্ছে পশ্চাৎগতির শেষ সীমা। বিচারক এ বিষয়ে মেজর ধূর্নজিভয়ের সাথে একমত নয়।

এমন কোন নিয়ম বা কারণ নেই যে একজন বা অন্য তেমন কেউ এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতেপারে না। ডাঃ টেইলরের বইয়ের ৩০৮ পাতায় 'চারজন সৈন্যের' একটি তথ্য প্রদত্ত হয়েছে। ১ নং মামলাটি ১৫ মাসের শিশুর অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু সিগারেট ধরাতে পারত সে। পুরো তথ্যটি প্রদর্শন করে যে পশ্চাৎ অপসারণ হচ্ছে তুলনার বিষয়। সংক্ষেপে এমন কোন নিয়ম নেই যার দ্বারা বাদীর তথ্যকে বর্জন করা যেতে পারে।

বাদী কি একজন হিন্দুস্থানী

মেজকুমারের মতো কোন হিন্দুস্থানীকে খোঁজা উচিত নয়, তার দেহ চিহ্ন সমন্বিত, ঢাকা আসার পূর্বে এটা অভ্যাস করে যে কি করে মেজকুমারের নাম লিখতে হয়, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে পাশে সরিয়ে রেখে। যাইহোক, এই বিষয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজনীয়।

সওয়ালের বক্তব্য ছিল যে বাদী একজন পাঞ্জাবী। প্রতিবাদী পক্ষ এর বেশি আব কিছু প্রমাণ করতে বাধ্য ছিল না। তারা প্রমাণ করতে বাধ্য ছিল না যে বাদী এইরূপ এবং এরূপ ব্যক্তি, কিন্তু বিচারের সময় থেকে এটা প্রমাণের উদ্যোগ ছিল যে সে অজলার মাল সিং, পাঞ্জাবের লাহোর জেলার একটি গ্রাম।

বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি সে অজলার মাল সিংহ বা সুন্দর দাস কিনা। এই বিষয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে ১৯২১ সালে ফিরে আসা প্রয়োজনীয়। বাদী ৪ মে তার পরিচিতি ঘোষণা করেছিল। ৬ থেকে ৯ তারিখের মধ্যে সত্যবাবু মিঃ লের্থব্রিজকে দেখেছিল, তার হাতে মৃত্যুব এফিডেবিট অর্পণ করেছিল. ঢাকার কালেকটারের নিকট এর একটি নকল পাঠিয়েছিল এবং মিঃ লিন্ডসের মতানুসারে 'দ্য ইংলিশ ম্যান' -এ সে চিঠি লিখেছিল। দেখা যাচ্ছে এটা প্রকাশিত হয়েছিল ৯ তারিখে এবং ১৫ তারিখের পূর্বে সে দার্জিলিঙে গিয়েছিল ১৯০৯ সালের ৯ মে দাহের বিষয়ে সাক্ষীদের আটকাতে। ২৯ মে বাদী মিঃ লিন্ডসের সামনে আগমন করেছিল এবং তদন্তের প্রার্থনা করেছিল। ৩১ মে সাবইন্সপেক্টর মমতাজউদ্দীন এবং সুরেন্দ্র চক্রবর্তী এস্টেটের একজন স্টুয়ার্ড বাদীর পূর্ব-ইতিহাস খুঁজতে পাঞ্জাবে গমন করেছিল। মিঃ লিন্ডসে জানত এবং সে প্রকৃতপক্ষে আয়োজন করেছিল এই তদন্তের।

১৯২১ সালের ২৭ শে সুরেন্দ্র চক্রবর্তী ভাওয়ালের সহকারী ম্যানেজারের কাছে পাঞ্জাব থেকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। (এক্সি ২৩৪৭)।

সুরেন্দ্র ও মনমোহনবাবু তদন্তের খোঁজে কলকাতায় গিয়েছিল এবং এই স্থান থেকে বিভিন্ন স্থানে, হরিদ্বারে না আসা পর্যন্ত। এখানে সুরেন্দ্র কনখলে হীরানন্দ নামে এক সাধুর কথা জানতে পারল। সে সাধুকে একটা ছবি দেখাতে সাধু বলল, এটা ধর্মদাসের শিষ্য সন্তদাসের ছবি। ঐ দিন সে ও মমতাজ-উদ্দীন অমৃতসরে যাত্রা করে। অমৃতসরে 'সঙবাল্লা' আখড়ায় হীরানন্দের সাথে সাক্ষাৎ

করে এবং সেখানে হীরানন্দ ও তার শিষ্যকে ছবিটি দেখানো হয় — শিষ্য সান্তারামকে এবং দেখা যাচ্ছে সে বলেছিল, "ধর্মদাসের শিষ্য সুন্দরদাস বাবাজীর ছবি এটা।"

তারপর সে ও মমতাজ-উদ্দীন অমৃতসর থেকে ২০ মাইল দূরে 'ছোট সংসারে' গমন করে এবং সেখানে ধর্মদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা জেনেছিল ধর্মদাস সেখানে থাকে।

সরাসরি ধর্মদাস জয়দেবপুর সাধুর ছবি দেখেছিল। সে তাকে চিনেছিল এবং ঐ সময়ে ধর্মদাসের আরেক শিষ্য দেবদাসও সেখানে ছিল এবং বলেছিল বাদীর নাম ছিল সুন্দরদাস। প্রায় ১৫ বছর পূর্বে লাহোরের অভলার নারায়ণ সিংহ ধর্মদাসের কাছে সুন্দর দাসকে এনেছিল এবং তার শিষ্য করে দিয়েছিল, তখন ১৫ বছর বয়স তার। সুন্দর দাসের পিতামাতা মৃত। নারায়ণ সিং বাস করত চক, ১৭, মন্টগোমেরি জেলায়।

ধর্মদাস বলেছিল ৩/৪ বছর আগে এলাহাবাদের কুম্ভ থেকে কলকাতায় ফিরছিল সুন্দর দাস। সুন্দর দাসের বয়স প্রায় ৩০ বছর, কটা গোফ ও দাড়ি। সুন্দর দাস তার সাথে থাকত। ফণিমোহন বসু যে লেংটি পরিহিত সাধুর ছবি দিয়েছিল সেটা যদি জয়দেবপুর-সাধুর হয়, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে সুন্দর দাসের।

এটাই রিপোর্ট। ৪-৭-২১ তারিখে মেজরানী তদন্তের ফলাফল টেলিগ্রাম করে ম্যানেজারের কাছে জানিয়েছিল এবং বার্তায় ছিল— " সবেমাত্র তার পেয়েছি পূর্ব-ইতিহাসের খোঁজ সহ ২-৭-২১ তারিখে ম্যানেজার লিন্ডসের নিকট এই রিপোর্টের একটা ইংরেজি তর্জমা প্রদান করা হয় যাতে উপরোক্ত লেখা ছাড়াও লেখা ছিল যে বার্ড দাহের সম্বন্ধে সমাপ্তিমূলক প্রমাণ পেয়েছে।

উপরোক্ত চিঠিতে যে নোটিশের পরিবর্তনের বিবেচনার কথা বলা হয়েছে সেটা ৩-৬-২১ তারিখে বাদীকে প্রতারক ঘোষিত নোটিশেরই উল্লেখ (এক্সি ২১৮)। এই চিঠির পরে এটা প্রচার করা আদর্শ ছিল যে এই তদন্তের ব্যাপারে সত্যবাবুর কিছুই করার ছিল না। তার কাছে ফলাফলটি প্রথমে এসেছিল যেটা অস্বাভাবিক ছিল না।

২৭-৬-২১ তারিখে জনৈক ধর্মদাস নাগা যাকে ২ নং ধর্মদাস হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে — বাদীর গুরু হিসাবে ১ নং ধর্মদাসকে ১ নং ধর্মদাস হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ২ নং ধর্মদাস অমৃতসার থেকে ৭/৮ মাইল দূরে রাজাসনসি নামক স্থানে লেফটা রঘুবীর সিং নামে এক অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করে—

"যে ছবিটি আমাকে দেখানো হয়েছিল তা আমার শিষ্য সুন্দরদাসের। পূর্বে তার নাম ছিল মালসিং.. ১১ বছর আগে ছিল সে আমার শিষ্য। ৬ বছর আগে সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমি তাকে ৪ বছর আগে কুম্ভমেলায় দেখি। সুন্দর দাসের চোখ বেড়ালের মতন, রঙ ফর্সা।"

পঠিত ও সাধক অনুমোদিত

২৭-৬-২১

লেফটাঃ রঘুবীর সিং এই বিবৃতি সমর্থন করেছে। একই সময়ে ও স্থানে মমতাজ-উদ্দীন আরো তিনজনের বিবৃতি গ্রহণ করেছে যারা একই কথা বলেছে। এই সব সাক্ষ্যের কোনটাই বিবৃতিকারদের না ডেকে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে না।

১৯২১ সালের আগস্ট মাসে এই ধর্মদাস ঢাকায় এসেছিল। মি লিন্ডসে তাকে দেখা করতে

লিখেছিল। কিন্তু বাদীর মতে সে পুলিসের ভয়ে স্থানত্যাগ করে। বাদী তার স্মারকলিপিতে অনুমোদন করেছিল সে পাঞ্জাব পুলিসের সামনে একটি বিবৃতি দিয়েছিল তার প্রতিপক্ষের গুপ্ত চক্রান্তের ফল হিসাবে।

বিচারের সময় বাদী ঢাকাতে ধর্মদাসের বিবৃতি প্রমাণ করতে প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এটা অনুমোদিত হয়নি যেহেতু তাকে না ডাকা হলে সেটা সাক্ষ্যও হবে না এবং সম্ভবত তখনও না। কোন পক্ষ থেকেই প্রস্তাব ছিল না যে তাকে ডাকতে যাওয়া হয়েছিল এবং এ সমস্তই কমিশনের সামনে গৃহীত সাক্ষ্যের পূর্বেই মেনে নেবার জন্য পেশ করা হয়েছিল।

২১-৯-৩৫ তারিখে এ ধর্মদাস নাগা নামে এক ব্যক্তিকে বিচারকের সামনে দাখিল করা হয় যে বাদীর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথা গুলিই বলে। বাদীর বক্তব্য ছিল তার গুরু বলে কথিত ধর্মদাস একজন প্রতারক। কিন্তু এদিকে মোড় নেবার পূর্বে লাহোরে গৃহীত দশজন সাক্ষীর সাক্ষ্য পরীক্ষা করা উচিৎ। এরা হল অজলার মাল সিং (৪৫) ; লাভ সিং (৪৮), উজাগর সিং (৪৪); ভালু সুলতানির মহুয়া সিং (৬৫); অজলাব বাসান সিং (৬৫), হুকুম সিং (৫০); করণদাস (৫০); বাজির সিং (৫২) ; মাখার সিং (৪৬)। ১৯৩৬ সালে এদের পরীক্ষা করা হয়। এরা সমস্ত ছবিকেই (D1,D2,P4,P1,P2) মালসিংয়ের বলে সনাক্ত করে। একজন সাক্ষী মেজকুমারের একটি ছবিকে (P6) মাল সিং বলে সনাক্ত করে।

এটা তাদের সাক্ষ্যে বেরিয়ে আসে যে মাল সিংহের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না এর সাথে জনৈক সুন্দর সিং ছাড়া যে ছিল তার বাবার বোন, আক্কির ছেলে, সে ও বাজীব সিং খানাসিওয়ালাতে বাস করত। যদি বাজীর সাক্ষ্য দিতে আসতে পারে, তবে সুন্দরদাস কেন এল না।

মাল সিংহের সাক্ষ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু এই সব সাক্ষীদের কেউ ডাকেনি। জেরায় লাহোর সাক্ষীরা অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিল মাল সিংয়ের সম্বন্ধে —ফর্সা রঙ, কালো চুল বাবার মত, ছোট বাদামী গোঁফ, মোটা লম্বা দাঁড়ি, চোখ কালো নয়, কিন্তু বেড়ালের মত, নাক মোটা; নাসারন্ধ্র চওড়া ইত্যাদি। মোটা শব্দটি ১৯২১ সালে আদৌ বাদীর প্রতি প্রযোজ্য নয়। যাইহোক, এটা আশ্চর্যজনক নয় মিঃ চৌধুরী বাদীকে অজলার মাল সিংহ হিসাবে উল্লেখ করেছে।

বিচারকের কাছে এটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে যে কারো পক্ষে বাদীকে মাল সিং বলে প্রমাণ করা উচিত। বিচারক মালসিংহের সম্বন্ধে কিছুই বিশ্বাস করেনি। সাব ইন্সপেক্টর মমতাজ উদ্দীনের সম্পূর্ণ অভিযোগই ছিল উপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট করার মিথ্যা ভান, ১৯২১ সালে যে অফিসার সাধুকে দেখেছিল।

সাধু অর্জুন সিংয়ের সাথে এসেছিল, সত্যবাবুর বাড়ির কাছে একটি বাড়িতে অবস্থান করেছিল, তারপর ঢাকায় এসেছিল। সে শুধু পাঞ্জাবী ভাষা বলতে পারত। বিচারককে তার সাথে কথা বলার জন্য মেজর পাটনেকে নিয়োগ করতে হয়েছিল দোভাষী হিসাবে। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছিল মানুষটি হিন্দী, উর্দু, এমনকি সামান্য বাংলাও বোঝে। এ সবই ছিল গুপ্ত ষড়যন্ত্র।

ধর্মদাস এই বলে শুরু করেছিল যে সে লেফটাঃ বঘুবীরের সামনে বিবৃতি দিয়েছিল এবং তার সামনে ছবির (এ (২৪) একটি কপিকে সনাক্ত করেছিল তার শিষ্য সুন্দর দাসের ছবি হিসাবে। এই

ছবিতে বাদী একটি লুঙ্গি পরে বসেছিল। প্রতিবাদী পক্ষের কেউ বলেছিল এটা ছিল দাঁড়ানো ছবি। ধর্মদাসও এটা বলেছিল।

এটা পরিষ্কার কী ঘটেছিল। রঘুবীর সিংয়ের সামনে গৃহীত বিবৃতিকে কোন স্বাক্ষর বা টিপছাপ ছিল না বিবৃতিকারের। ছবি প্রদর্শন ছাড়া এর কোন অর্থ ছিল না। এক্সি পি (১) চিহ্নিত ছবি অবশ্যই কারো ছবি, আদৌ বাদীর নয়। এটা কারো টিপ সাক্ষর বহন করেছে যা ধর্মদাস নাগার নয় আদৌ।

এটা বিশ্বাস করা যায় না পি (১) চিহ্নিত ছবি হারিয়ে গিয়েছে। ২৫-৯-৩৫ তারিখেও এমনটি এটা বলা হয়নি। এটা কৌসুলীব অধিকারে ছিল না। এটা পরবর্তীকালে, কোন সাক্ষীর দ্বারা নয়, কৌসুলীর দ্বারা বিবৃত হয়েছে এটা হারিয়ে গিয়েছে। এটা জানা যায় সাধুর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু বিশেষ ফাইলে সংরক্ষিত ছিল। বিবৃতি রয়ে গিয়েছে, ছবি চলে গেছে।

বিবৃতি চলে যায়, কিন্তু মানুষ রয়ে যায়। যদি সে রঘুবীর সিংয়ের কাছে বিবৃতি না দিয়ে থাকে, সে ধর্মদাস নাগা নয়, প্রতিবাদীদের বক্তব্য অনুসারে বাদীর গুরু নয়। নিম্নোক্ত বিবেচনাগুলির উপরে, শুধু একটি উপসংহার সম্ভব:

১. এটা স্বীকার্য যে এ (২৪) ২৭-৬-২১ তারিখে বিবৃতিকারকে দেখানো হয়নি, কিন্তু লোকটি এই প্রতারণার অংশ হিসাবে কথাটি হলফ করে বলেছিল, যে এটা দেখানো হয়েছিল। সে পরে দাঁড়ানো ছবির কথাও প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল যেটা আদৌ দেখানো হয়নি।

২. যদি সে একই মানুষ হত, প্রদর্শচিহ্ন সমন্বিত ছবিটি দাখিল করা হতো।

৩. সে ভুল করতে যাচ্ছে না যা অজলার সাক্ষীরা করেছিল সে বলেছে যে মাল সিং মোটা নয় এবং তার চুল সোনালী তামার মত, যেরকম পাঞ্জাবের আরেকজন সাক্ষী বলেছিল।

৪. বিবৃতিকার বলেছিল সে গুরুদ্বারের সেবক। কিন্তু সাক্ষী বলেছে সে কোনখানের সেবাদার নয় এবং কখনো এমন বলেনি। ২৭-৬-২১ তারিখে ৫ জন সাক্ষী, ধর্মদাসের শিষ্য দেবদাসসহ, রঘুবীরের সামনে সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিন্তু সাক্ষী এটা জানে না। সে অবশ্যই বিবৃতির সারাংশ বলেছে, কিন্তু সম্পর্কের কথা বলতে সাহস পায়নি। এই সমস্ত বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য থেকে জানা যায় তার সাক্ষ্য মিথ্যা। সে রঘুবীর সিংয়ের সামনে সাক্ষ্য দেয়নি। এবং সে বাদীর গুরু নয়।

একজন শিখ উকীল রঘুবীর সিংকে পাঞ্জাব থেকে নিয়ে আসে। রঘুবীর সিং স্বীকার করেছিল সে ধর্মদাসকে আগে জানত না। সে স্বীকার করেছিল সে একদিনের জন্যও তাকে দ্যাখেনি যতক্ষণ না শিখ উকীল তার সাক্ষ্যের পর ধর্মদাসকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছিল।

ধর্মদাসকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ১৯২১ সালে সে ঢাকায় কী করেছিল, বলেছে সে সুন্দর দাসের সাথে সাক্ষাৎ করেছিল, কিন্তু কোন কথা হয়নি। সে আনন্দ রায়ের বাড়ি গিয়েছিল, তাকে একটা ছবি দেখানো হয়েছিল, কী জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল তা কিছুই বুঝতে পারেনি, সুতরাং পরের দিন আবার সে গিয়েছিল, এবং সেই সময় একজন শিখ দোভাষী ছিল সেখানে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কার ছবি এটা। সে বলেছিল ছবিটি সুন্দর দাসের, কুমারের নয়; ব্যস এটুকু। বাহ্যত মনে করা হয়েছিল সে কাউকে বোঝে না বা কেউ তাকেও বুঝত না। কিন্তু পরে দেখা গেল সকলেই তার কথা বুঝত।

শিখ উকিল আবার ' সন্‌সারে' ছুটে গিয়েছিল চারজন সাক্ষী গুজর সিং, চন্দ্র সিং, বুর সিং ও ভাগৎ সিংকে নিয়ে আসতে যাতে ২৭-৬-২১ তারিখে ধর্মদাসকে খাপ খাওয়ানো যায়। এবং অনেক পরে আসে ইন্সপেক্টর মমতাজ-উদ্দীন ও সুরেন্দ্র চক্রবর্তী। কিন্তু তখন গুরুদ্বারে সেবক দেবদাস ছিল না। এই দলের সাথে আরো দুজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসে শিখ উকিল এবং এদের মধ্যে একজন সাক্ষ্য দিয়েছিল সে ধর্মদাসের গুরু হরনাম দাস যে ধর্মদাসের শিষ্য সুন্দর দাস হিসাবে বাদীকে সনাক্ত করেছিল। ধর্মদাস ও হরনাম দাসের সমস্ত তথ্য বাদীর সাক্ষী দর্শন দাসের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু একটি বিস্তারিত বিষয় হারিয়ে গিয়েছিল। সে বলেছে ধর্মদাস ১০/১২ বছর আগে সুন্দর দাসকে শিষ্য বানিয়েছিল। সে একটি দুঃসাহসিকমিথ্যা বলেছিল যে সে বাকী দলের সাথে আসেনি, সে কলকাতায় ছিল, প্রায় তিনদিন, ঢাকা আসার পূর্বে। কিন্তু ভগৎ সিং বলেছিল সকলেই একসাথে এসেছিল। এটা সঠিকভাবে পরিষ্কার যে মিথ্যা ধর্মদাস অর্জুন সিংয়ের দ্বারা সংগৃহীত হয়েছিল যে পূর্বে অজলার সাক্ষীদের সংগ্রহ করেছিল, যাতে সে আসতে পারে ও ভান করতে পারে যে সে ১৯২১ সালে রঘুবীর সিংয়ের সামনে বিবৃতি দিয়েছিল। সে এসে ছবির পরিবর্তনের দ্বারা বাদীকে আঘাত করতে শুরু করল। ইন্সপেক্টর মমতাজ-উদ্দীনও সায় দিল এতে যে তার সাথে আগে সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং সাধুর সাথে তার পরিচিতি শপথপূর্বক বলল যে ১৯২১ সালে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। এবং দণ্ডায়মান ছবির কথা বলল সেটা তাকে দেখানো হয়েছিল, কৌঁসুলী নির্দেশ দেওয়ায় বলল এটা উপবিষ্ট ছবি এ (২৪)।

বিচারক দেখেছে এই ধর্মদাস ১৯২১ সালে রঘুবীর সিংয়ের সামনে বিবৃতকারী ধর্মদাস নয়, যে ধর্মদাস ঢাকায় সাক্ষ্য দিতে এসেছিল সে ভিন্ন। ধারণা করা হচ্ছে যে সত্যিকারের গুরু বিবৃতি দান করেছিল, তাকে না ডাকলে এটা কোন সাক্ষ্য হবে না এবং এমনকি যদি এটা হয়, ছবিবিহীন এর কোন অর্থ থাকবে না যে ছবি দেখানো হয়েছিল। এটা প্রমাণিত হয়নি যে এটা বাদীর ছবি। যাইহোক এটা বেরিয়ে আসে যে কোর্ট অর্ব ওয়ার্ড সুন্দরদাস নামটি বাদীর উপর চাপাতে এসেছিল, সেটা পরীক্ষা ছাড়া গৃহীত একটি রিপোর্টের ফল। কিন্তু এই পরিকল্পনা অবশ্যই কারো মতলব ছিল যে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডকে প্রভাবিত করতে একটি দ্রুত রিপোর্ট চেয়েছিল এবং এটা জানা যায় যে এই রিপোর্ট মেজরাণীর কাছে এমন একটি মুহূর্তে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল যখন সে বা সত্যবাবু ভয় পাচ্ছিল যে প্রতারক ঘোষণার পরিবর্তন হতে পারে।

বিচারক দেখেছে এটা প্রমাণিত হয়নি যে বাদী মালসিং এবং ধর্মদাস নাগা তার গুরু নয়।

এস্টেট তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও সর্বপ্রকার সরকারী সাহায্য সহ ১২ বছর খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছিল বাদী কে, যদিও সে কলকাতা ও ঢাকায় বাস করছিল এবং একদিনের জন্যও লুকায়নি।

কিন্তু কে সে হতে পারে? একজন হিন্দুস্থানী? প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, দেহ চিহ্ন ও দৃষ্ট সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে . হাতের লেখায় সে কুমার।

প্রতিবাদীপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে বাদী অদ্ভুত ধরনের হিন্দী বলত এবং বাংলা বলতে পারত না। বক্তব্য হচ্ছে সে পরে এটা শিখেছিল। বাদীর বক্তব্য হচ্ছে যে সে ১২ বছর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থাকার সময় শুধু হিন্দী বলত এবং ৪-৫-২১ তারিখে ' আত্মপরিচয়ের' পর সে বাংলা বলতে শুরু করে। মেজকুমার খুব ভাল ভাওয়ালী ভাষা বলত যা সাধারণ লোকে বুঝতে পারত না সাধারণত।

বাদী আদালতে সাক্ষ্যদান কালে বাংলার সাথে কিছু হিন্দী শব্দও বলেছে যা আগে আলোচনা করা হয়েছে। শব্দের উপর ভিত্তি করে পরিচিতি নির্ণয় করা বিপজ্জনক।

বাদী কমপক্ষে ৫০ টি ইংরেজি শব্দ বলেছে যেমন, বিসকিট্, বডি গার্ড, ফ্যামিলি, গুরু, জকি ইত্যাদি। মনে হয় প্রত্যেক ভারতীয়ই কিছু ইংরেজি শব্দ জানে— ট্যাক্স, ট্রেন, রেলওয়ে, গার্ড, ডাবল।

যাইহোক, বাদী যদি ১২ বছর সন্ন্যাসী জীবন যাপন করে থাকে, তাহলে সে মাতৃভাষার মত হিন্দী বলবে। যদি সে পুনরায় বাংলা গ্রহণ করে, এটা আশা করা যায় না, সে হিন্দীতে কথা বলবে না।

এটা কেউ বলেনি এবং এটা বলা বোকামি যে প্রত্যক্ষভাবে সে পরিচিতি ঘোষণা করেছিল, সে হিন্দী ছেড়ে দিল।

যাইহোক এটা দেখতে হবে এই হিন্দী উচ্চারণ , হিন্দীতে কথা বলা, ভাওয়ালের বাংলা বলা হিন্দী উচ্চারণ সহ যেটা একজন বাঙালির মতো বলা হচ্ছে না, একজন হিন্দুস্থানীকেপ্রদর্শন করে যে বাঙলাভাষাকে গ্রহণ করেছিল বা একজন বাঙালিকে যে একটা হিন্দীকথা বলার রীতি অর্জন করেছিল।

এই সূত্রটি বিবেচনা করে দুটি বিষয় এখনই বিচ্যুত করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে কোন বাঙালি হিন্দী উচ্চারণ আয়ত্ত করতে পারে না। বিচারকের কাছে একজন বাঙালি সাক্ষী দিয়েছিল। তার হিন্দী উচ্চারণ ঘেঁষা বাঙলা শুনলে কেউ বুঝতে পারবে না যে সে বাঙালি। তার নাম স্বামী নিত্যানন্দ সরস্বতী (বাঃ সাঃ ৯৯০)।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাদীর কথায় সামান্য তোতলামি ছিল। সাক্ষীরা এগুলি বর্ণনা করেছে 'বাজা. বাজা', 'ভার ভার', 'চিবানো চিবানো', 'আটকা আটকা ', 'ঠেকা ঠেকা', 'চাপা চাপা' বলে। এটা বর্ণনা করা মুশকিল। কিন্তু এটা হচ্ছে এমন কিছু যাতে কারো মুখের মধ্যে কিছু আটকে গেছে কথা বলার সময়। মিঃ রামরতন ছিবা একজন পাঞ্জাবি ইঞ্জিনিয়ার। ১৯২৫ সালে সে বাদীর ৬ নং বোস পার্কে থাকার সময় ৭ নং বোস পার্কে বাস করছিল। সে বাদীর সাথে অনর্গল হিন্দীতে কথা বলেছিল সে বলেছে বাদীর হিন্দী বাঙালীর হিন্দী, এই সাক্ষীকে বিশ্বাস করা যায়।

বাদীর এই তোতলামি জিভের তলায় কোন ক্ষতের জন্য হতে পারে বা বিষ প্রয়োগ বা অন্য কোন কারণে হতে পারে। এটা কেউ জানে না, কিন্তু দেখা গিয়েছিল, প্রান্তস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পর্যাপ্ত দোষ ছাড়া এটা সৃষ্ট হতে পারে না।

বিচারক দেখেছে এই বিশেষ কথ্য বিকৃতি সহজাত বলে প্রমাণিত হয়নি। প্রতিবাদীদের বক্তব্য ছিল এটা এরকম নয়। এটা অর্জিত, এটা ভিন্ন ভাষায় কথা বলার সময় ইতস্তত করার কারণে নয়।

বাদীর তার পরিচিতি ঘোষণার পর বাঙলা বলতে শুরু করে। বোন, আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও অসংখ্য সাক্ষী ১৯২১ সালের সম্বন্ধে কথা বলেছে — রেবতীবাবু (বাঃ সাঃ ৬২), যোগেশ রায় (২৬৩), পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী (৩৫৫) অরুণ নাগ (৩৮৭), মনীন্দ্র বোস (১৫৫), বাবু গোবিন্দ রায়। এছাড়াও আরো অনেক লোক বলেছে বাদী হিন্দী ঘেঁষা উচ্চারণে বাংলা কথা বলে। যেখানে ১৯২১ সালে মামলাতে উত্থাপিত হয় বাদী পাঞ্জাবী ছাড়া একবর্ণ বাঙলা বুঝতে পারে না।

১৯২১ সালে মে মাসে পরিচিতি ঘোষণার পর বাদী হিন্দী ঘেঁষা উচ্চারণে বাংলা বলতে শুরু করে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯-৫-২১ তারিখে জয়দেবপুর থানা রেজিস্টারে এই রিপোর্ট লেখা হয় -

' .... প্রচুর মানুষ সন্ন্যাসীকে দেখতে আসছে এবং ঘোষণা করছে সে মেজকুমার এবং সন্ন্যাসী বাঙলাতে কথা বলছে লোকেদের সাথে।'

থানার সাব-ইন্সপেক্টর আবদুল হাকিম (বাঃ সাঃ ১০২৮) বলেছে, "আমি বাদীর কথা শুনেছি। সে হিন্দী টানে বাংলা কথা বলেছে। ১৯২১ সালের মে মাসে আমি তার এমন কথা শুনেছিলাম যখন আমি জয়দেবপুর থানার একজন অফিসার ছিলাম। তার কথায় এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছিলাম।"

তাকে জেরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এই সূত্রটি ডায়েরীতে লেখার কারণ কি ? বলেছিল, সম্ভবত কারণ সে পূর্বে বাংলায় কথা বলেনি। কিন্তু তার কোন নিজস্ব জ্ঞান নেই যে বাদী বাংলায় কথা বলছে কি না ১৯ মের পূর্বে। তাও সে সঠিক মনে করতে পারে না। এবং তার সাক্ষ্য ছিল বাদী হিন্দী টানে বাংলা কথা বলেছিল।

বাদীর হিন্দী টানে বাংলা উচ্চারণ বেশীর ভাগ গ্রামবাসীর কাছে হিন্দী বলে মনে হত। যে সব সাক্ষী বলেছে ১৯২১ সালের মে তে বাদী বাংলা বলা শুরু করেছিল তাদের অবিশ্বাস করা অসম্ভব। যেমন, ১৯২২ সালে, ১৯২৪ সালে বাদী বাংলা বাংলায় কথা বলেছিল (বাঃ সাঃ ৪৫৮, ৯১৪, ও মিঃ (K.C.Chunder) । কিন্তু প্রত্যেকেই বলেছে হিন্দী ও বাংলার মিশ্রণে। এই সব সাক্ষীদের জেরা করা হয়নি, ১৯২৪ সালে মিঃ ঘোষাল বলেছিল বাদী তার সাথে বাংলায় কথা বলেছিল, কিন্তু হিন্দী টানে নয়। বড়রানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বাদীর উচ্চারণ কেমন ছিল। ১৯২৫ সালে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য মিঃ জে এন গুপ্ত বলেছিল, বাদী একজন ভিনদেশী প্রতারক। সে আদৌ বাংলা বলতে পারে না। মিঃ শরদিন্দু ও মিঃ ও সি গাঙ্গুলিও মিঃ গুপ্তের সাথে একমত। এরা সকলে কলকাতার বাঙালি যারা ভাওয়ালী বাংলা বুঝত না। সেজন্য যে কথা তারা শুনেছিল সেটা একজন মানুষের হিন্দী টানে কলকাতার বাংলা বলার প্রচেষ্টা।

১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে মিঃ এন কে নাগ ও মিঃ রাজেন শেঠের সাথে বাদীর সাক্ষাৎকারে, যেটা আগে বর্ণনা করা হয়েছে, সামান্যতম হিন্দী টানের মতামত বা পার্থক্য উত্থাপিত হয়নি। ১৯২৯ সালে ঢাকার আদালতে বাদী হিন্দীতে সাক্ষ্য দেয়নি। মেজকুমারের সাথে তার গলার স্বরেও কোন পার্থক্য ছিল না। ফণিন্দ্র শুধু এটা অস্বীকার করে।

বাদীকে জেরা করার সময় এক প্রবল প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল যে বাদীর মন অবাঙালির। এই বিষয়ে জেরাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। কতিপয় অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্রুত এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে যেতে পারে। বাদীর প্রতিও জেরাতে এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। যেমন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—

প্রঃ শ্বেতবর্ণের অর্থ কি ?

উঃ সাদা।

প্রঃ রক্তবর্ণ ?

উঃ লাল।

প্রঃ ব্যঞ্জনবর্ণ?

উঃ বেগুন গাছের রঙ।

বাদী ব্যঞ্জনবর্ণের অর্থ 'অক্ষর' এটা জানত না। তার মনের মধ্যে রঙের কথাটা ছিল বলে সে ঐ রকম উত্তর দিয়েছিল।

বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে কোন বাংলা গান বা ছোটদের ছড়া জানে কিনা। বাদী বলেছিল, পারে না এবং ছড়া সম্বন্ধে — " স্ত্রীলোকেরা বারবার উচ্চারণ করে এগুলি "। বিচারক বিবেচনা করেছে এই জেরার কারণ হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে বাদী হিন্দুস্থানী বা একজন অবাঙালী। বিচারকের মতে সে বাঙালী।

উপসংহার

বিচারক এ মামলার সম্পূর্ণ সাক্ষ্যকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার করেছে এবং উভয় পক্ষের কৌসুলীর অত্যন্ত সবল কোন তর্ক কোন উপাদানকেই হারায়নি যা পরিচিতির সপক্ষে বা বিপক্ষে আলোচনা করা যেতে পারে। পরিচিতির প্রশ্নে কোন বড় বিষয় অসমাপ্তিসূচক হতে পারে, আবার কোন ঘটনা নিয়তিমূলকও হতে পারে। সুতরাং বিষয়টির প্রয়োজন ঘনিষ্ঠতম পর্যবেক্ষণ।

বিচারক পরিচিতির সমর্থনে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যকে বিশ্বাস করেছে। এটা হচ্ছে সর্বশ্রেণীর সৎ নারী-পুরুষের সাক্ষ্য, সকল নিকট আত্মীয়-স্বজনসহ এবং তাদের মধ্যে বোন, প্রথম রানী, মেজরানীর নিজের পিসি, এবং তার নিজের খুড়তুতো ভাই বর্তমান। সাক্ষীদের মধ্যে ছিল অনেক শিক্ষিত ও পদমর্যাদার মানুষ, গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, বয়স্ক মানুষ যাদের কাছ থেকে কেউ রোমান্সের আশা করবে না, যারা অন্য সবার মতন ব্যঙ্গের ভয়ে ভীত, যাদের পাওয়া বা হারানোর কিছুই নেই এবং যারা সম্ভবত কুমারকে ভুল করতে পারে না। এটা অসম্ভব যে এরা একজন প্রতারককে সমর্থন করতে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করবে। কিন্তু এই সাক্ষ্য সমূহেরও সাক্ষীদের একক যোগ্যতার উপর নির্ভর করার দরকার নেই। একটা পরীক্ষা হচ্ছে ১৯২১ সালের ৪ মে উদ্ভূত তর্কাতীত অবস্থা যখন ঘোষণা করল সে ভাওয়ালের মেজকুমার, কোনকিছুই ঐ দিনের ঘটনার সাথে খাপ খায় না, শুধু লোকের দ্বারা সৎ সনাক্তকরণ ছাড়া যারা তাকে জানত, এমনকি রায়সাহেবকেও (বাঃ সাঃ ৩১০) স্বীকার করতে হয়েছিল যে সে বিশ্বাস করেছিল ১৯২১ সালের ৪ মে বোন ও বোনের পুত্রেরা তাদের বিশ্বাসে সৎ ছিল যে সাধু হচ্ছে কুমার; সে নিজে বিশ্বাস করতে পারেনি। মিঃ নিডহ্যামের রিপোর্ট যেটা প্রকৃতপক্ষে তার নিজের ছিল সেটা ছিল একজন বিশ্বাসীর রিপোর্ট। বিচারক এই ঘটনা ও তার বিবেচনাগুলি নির্দেশ করেছে একটি আকস্মিক ষড়যন্ত্র এবং একজন পাঞ্জাবীকে আকস্মিক ভাবে আরোপ করা দেখতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং একটি অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে। কুমারের ভূমিকায় অভিনয় করতে, যদিও এটা কিছুই ব্যাখ্যা করে না, যতক্ষণ না বোন পাগল হবে এবং তার সাথে পরগণার বাকী সবাই। যদি বোন সৎ হয়, অন্যান্য সাক্ষীরাও অবশ্যই সমানভাবে তাই।

আরেকটি পরীক্ষা, শরীরের বৈশিষ্ট্য, চিহ্নসমূহের অভিন্নতার প্রমাণ। এগুলির, সামগ্রিকতা সহ, আর দ্বিতীয় সত্তা সৃষ্টি হতে পারে না এবং এমনকি যদি অর্ধেক চিহ্ন সমূহ— আঁশটে পা,

অসমতল ক্ষতচিহ্ন বাঁ পায়ের গোড়ালির উপরে দেহগত বৈশিষ্ট্য সহ, পরিচিতিতে সমান নিশ্চয়তা সহ সমর্থন করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

বাদীর মনের কোন কিছুই এই উপসংহারকে কম্পিত করে না। এর বেশীর ভাগ, যা প্রতিবাদীপক্ষ প্রকাশ করতে চেয়েছিল, এটাকে নিশ্চিত করেছিল। তার হস্তলিপি এটাকে নিশ্চিত করেছিল। দার্জিলিঙে যা ঘটেছিল তার কিছুই এটাকে বিচ্যুত করতে পারেনি বা তার অনুপস্থিতির সম্বন্ধে প্রদত্ত তথ্যের কোন কিছু। এমনকি যদি ফিরে আসত অন্ধ, বোবা হয়েও, উপসংহার দণ্ডায়মান থাকবে। তোতলামি ও হিন্দী উচ্চারণ সমভাবে অপৃথক।

১৯২১ সালের ৪ মে থেকে মামলার দিন পর্যন্ত বাদী একদিনের জন্য লুকায়নি। সব দিকে তার গমন ছিল, অসংখ্য লোক তাকে দেখত এবং ১৯২১ সালের ১৫ মে বিশাল প্রজা সম্প্রদায় তার জয়ধ্বনি দিয়েছিল। ২৯ মে ২৪ দিন পর সে তার পরিচিতি ঘোষণা করেছিল, ঢাকার কালেকটরের সামনে উপস্থিত হয়েছিল, একাকী তার সাথে কথা বলেছিল, তদন্তের প্রার্থনা জানিয়েছিল। ১৯২১ সালের মে থেকে তার বোন ও ঠাকুমা তদন্তের জন্য দরখাস্ত প্রদান করেছিল এবং সে মুখোমুখি হতে ও প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। সে সীমাহীন কষ্ট প্রদান করছিল, খাজনা সংগ্রহ করছিল, চাঁদা সংগ্রহ করছিল। সে মুখোমুখি বা প্রশ্নের সম্মুখীন বা অভিযুক্ত হয়নি। কেউ কেউ চেয়েছিল তার এমন হওয়া উচিত নয় এবং ঢাকার একজন মানুষকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কে এর জন্য দায়ী। কোন সন্দেহ ছিল না এই ব্যক্তি কে।

সে ছিল রায় সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বাহাদুর যে তার সম্পত্তি উপভোগ করছিল এবং যার কাছে কুমারের প্রত্যাবর্তন হয়েছে একটা দুর্যোগের মতন। তার একমাত্র বিপদ ছিল মৃত্যুর উপর মনোসংযোগ করা। সে দ্রুত ছুটে যায় মিঃ লেথব্রিজের কাছে। সে আবেদন করে যে মৃত্যুর নথিপত্র রক্ষা করা উচিত। সে বাদীর পরিচিতি ঘোষণার দুদিন পরেও জানত বাদী কে। সে মিঃ লেথব্রিজের হাতে মৃত্যুর এফিডেভিটের কপি প্রদান করে যা সে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। ১৯২১ সালের ১৫ মের পূর্বে সে দার্জিলিঙে যায় দাহের ব্যাপারে সাক্ষীদের হস্তগত করতে, দাহের ব্যাপারে তাদের স্মৃতি কাজ করতে শুরুর পূর্বে যা মনে হবে অস্বাভাবিক। সে মিঃ লিন্ডসের কাছে মৃত্যুর এফিডেভিট ও সাক্ষ্য পাঠাতে সতর্কতা নিয়েছিল। যারা দ্বারা মিঃ লিন্ডসে প্রভাবিত হয়ে তার ঘোষণা জারী করে যে বাদী একজন প্রতারক। এটা এই ধারণা সৃষ্টি করে যে বিষয়টি ১ম প্রতিবাদী ও বাদীর মধ্যে নয়, বরঞ্চ সরকার ও বাদীর মধ্যে। বাদী এই ঘোষণার দ্বারা অথর্ব হয়ে পড়েছিল। সে লোককে দেখাতে শুরু করল, দর্শনার্থীদের গ্রহণ করতে থাকল, অফিসিয়ালদের ডাকতে লাগল, ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এগুলি কখনো প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি।

মিঃ চৌধুরী, এই সব ঘটনার প্রতি খানিকটা অজ্ঞতার সাথে, মামলা স্থাপনের বিলম্বের প্রতি নির্দেশ করছিল। এবং মতামত দিচ্ছিল যে ভূমিকায় অভিনয়ের সাথে খাপ খাওয়াতে সময়ের প্রয়োজন ছিল। বাদী নিজে মিঃ লিন্ডসেকে তদন্তের জন্য বলেছিল। তদন্তকে কখনো প্রত্যাখ্যান করা হয়নি এবং ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তাকে বলা হয়নি আদালত উন্মুক্ত হয়েছিল। তারপর মামলা ছাড়া পুনবার অধিকার পাওয়ার এক চেষ্টার পর ১৯৩০ সালে মামলা রুজু করা হয়। এস্টেটকে অভিযুক্ত করা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। এবং বাদীর জেরা প্রদর্শন করেছিল সে তালিম

পেয়েছিল কি পায়নি! সে সঠিক যেমন ছিল তাকে সেইভাবেই রাখা হয়েছিল, এমনকি অক্ষরের জ্ঞান ছাড়াই।

রেভেনিউ বোর্ডের প্রতি সত্যবাবুর আচরণ কী ছিল? হতভাগ্য মানুষটি, বাদী, পূর্ণজ্ঞান সহ লড়াই করেছিল যে সে কুমার। আচরণ কথা বলে এবং এটা মিথ্যা বলতে পারে না। সন্ন্যাসীর আতঙ্ক সত্যবাবুকে মিঃ লেথব্রিজের কাছে মৃত্যুর সাক্ষ্য রক্ষা করতে ছুটিয়ে নিয়ে গেছিল। এই আতঙ্কই তাকে দার্জিলিঙে নিয়ে গেছিল সাক্ষীদের মুখ বন্ধ করতে, বীমার ডাক্তারের রিপোর্টের আতঙ্ক। এটা দেখা গেছিল ১৯২১ সালের জুলাইয়ে। প্রতিবাদীপক্ষ প্রতারককে ধ্বংস করতে এটাকে ঠিক মত কাটছাঁট করতে পারেনি। তারা আশা করেছে এটা স্কটল্যান্ডের কোম্পানির অফিসে নিরাপদে গচ্ছিত আছে। অভিযুক্ত প্রতারক এটাকে নিয়ে এসেছিল! হাতের লেখার ক্ষেত্রেও একই আতঙ্ক দেখা গেছে। তদন্ত আরম্ভ করে কোর্ট অব্ ওয়ার্ড স্বাভাবিকভাবে দর্জি ও মুচির কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিল এবং ফলাফল, সত্যবাবুর মতে, কৌসুলীর হাতে তুলে দিয়েছিল। এই সমস্ত উপাদান থেকে কোন বিশদ তথ্য দাখিল বা প্রমাণিত করা হয়নি। শুধু জুতোর মাপ ৬ নং ছাড়া। শিক্ষাকে অযথা কুমারের সত্যকার শিক্ষার মান থেকে উচ্চতায় দেখানো হয়েছিল। শেষত, জেরায় ওজর-আপত্তি তোলা হয়েছিল স্মৃতির বিষয়ে যে বাদীর তালিমের সময় ছিল। এটা পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছিল। আবার বলার প্রয়োজন যে এটা হচ্ছে প্রশ্ন না করার পুরানো নীতি। ১৯২১ সালে এই আপত্তি বিবৃতিযোগ্য ছিল না; কেউ শোনেনি যে তালিম পাওয়া ব্যাপারটি সাক্ষীকে জেরা না করার ভিত্তি হয়। আতঙ্ক ফাঁদে পড়ার নয়, সত্যের। কেউ কোন জটিল মামলায় দীর্ঘদিন সত্যের বিরুদ্ধতা করতে পারে না যেখানে ঘটনা আপনি মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং প্রতিবাদীপক্ষের কেউ কেউ সত্যের মাথা কেটে ফেলেছিল। সে তার বোনেদের দ্বারা নিরাপদ ছিল এবং অন্যজনের দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিল। সে কারো দ্বারা নিরাপদ ছিল না, কিন্তু হঠাৎ একজন ওঝা এসে ঘোষণা করেছিল সে কুমার; পরিবার তাকে ভীতিপ্রদর্শন করেছিল ভয়নক ভাবে। হঠাৎ সে বোনের দ্বারা গৃহীত হয়, প্রস্তুতি ছাড়া, গোপনে নয়, বরঞ্চ প্রকাশ্যে, এবং তার দাবি কালেকটরের কাছে পাঠানো হয়। এইভাবে মামলার পর মামলা গড়ে উঠেছিল। বিস্তৃত ও সতর্কভাবে গঠিত মামলা, যেমন— দার্জিলিঙে অসুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত মামলাকে শুধু আভ্যন্তরীণ মিথ্যা সাক্ষ্যের দ্বারাই ধ্বংস করা হয়নি, বরঞ্চএকক ঘটনা দ্বারাও, যেমন— মৃত্যুর সময় বা বক্ত আমাশা ইত্যাদি ঘটনার দ্বারাও ধ্বংস করা হয়েছে। সকালে দাহ এর প্রকৃতি ইত্যাদি। মিথ্যা বৈশিষ্ট্য; যেমন — ভাল শিক্ষা, ইংরেজি ধারা, ইংরেজি কথা কুমারের প্রতি আরোপিত হয়েছিল। চিঠিগুলি জালিয়াতি করা হয়েছিল শিক্ষাকে প্রমাণ করতে একটা সীমা পর্যন্ত। যদি প্রমাণিত হত, তাহলে মৃত্যুর বিষয়টি যেমন ফলপ্রদ হয়েছিল তেমনি ফলপ্রদ হত। ফলাফল হয়েছিল যে যদিও প্রতিবাদীদের একদল লোক, কর্মচারী বা এরকম লোক তারা যা চাওয়া হয়েছিল তা বলতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তাদের পক্ষে কুমারকে বাস্তবতা থেকে এত বিস্তৃতভাবে ঊর্ধ্বে তুলে রাখা অসম্ভব ছিল। এইগুলি হল এই ধরনের প্রতিকূলতার উদাহরণ যেটা প্রতিবাদীপক্ষকে টপকে যাচ্ছিল।

বাদী ঢাকা, কলকাতায় ও বেশিরভাগ ঢাকায় বাস করছিল। মিঃ লিন্ডসে যে পাঞ্জাবে একটি

তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল সে জানত সেখানে এজেন্টরা কর্মরত এক বিশেষ উদ্দেশ্যে।

এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে মেজরানীর নিজস্ব লোকজন, উত্তরপাড়ার ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তিরা তাকে সমর্থন করত না, শুধুমাত্র অসৎ একজন কর্মচ্যুত কেরানী ছাড়া, এবং একজন ভাইপো যে বাদীকে অস্বীকার করতে এসেছিল। ঐ সব ভদ্রলোকদের এক পাশে রেখে যারা কুমারকে জানত কিন্তু ভুলে গিয়েছিল, এমন একজনও স্বাধীনচেতা লোক নেই যে প্রতিজ্ঞা করবে যে বাদী কুমার নয়।

বিচারক মেজরানীর অবস্থান সম্পূর্ণ রূপে বর্ণনা করেছে। তার দাদা যতদূর জানত তার নিজস্ব কোন উইল ছিল না। সম্পূর্ণ আয় তার দাদার কাছে যাচ্ছিল, এমনকি তার কোন ব্যাঙ্কের আমানতও ছিল না, যদিও আয় ছিল তার ১ লাখ টাকা। এমন কোন কাগজপত্র ছিল না যা প্রমাণ করবে কোন টাকা সে রাখত বা রাখার জন্য অনুমোদন করেছিল। জয়দেবপুরে এই পুত্রহীন মহিলার কিছুই ছিল না এবং সেইদিনগুলির স্মৃতি যার দিকে সে আনন্দের সঙ্গে ফিরে তাকাতে পারে। ১৯২১ সালে মে-তে যখন তার ভাইয়ের প্রতি বিষ প্রয়োগের অভিযোগ এল তখন সে জানত সে তার ভাইয়ের বোন হিসাবে গণ্য হবে ; কুমারের স্ত্রী হিসাবে নয়। তার ভাইয়ের কাছে কুমারের আবির্ভাব হচ্ছে একটি সুন্দর এস্টেটের অধিকার হারানো এবং একটি দুর্যোগ যা সে যে কোন উপায়ে এড়ানোর চেষ্টা করবে এবং বিচারক এটা আশা করেনি যে বোন তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

বিচারক দেখেছে বাদী হচ্ছে ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের পুত্র।

৬ নং ইস্যু

মামলাটি যথাযথভাবে মূল্যায়িত ও স্ট্যাম্প প্রদত্ত হয়েছে।

৭ নং ইস্যু

একটি সংশোধনের জন্য এই ইস্যুটি উত্থাপিত হয়নি মামলা হিসাবে। এটি ঘোষণাভিত্তিক মামলা নয়, বরঞ্চ অধিকারের মামলা।

৮ নং ইস্যু

এই ইস্যুটিকে এইভাবে সাজানো হয়েছিল ; বাদী কি অভিযোগে দাবিকৃত সম্পত্তি মোচনের জন্য বিবেচ্য ? যেটা অভিযোগের শেষাংশের ২য় অনুচ্ছেদে অভিযোগের ভিত্তিতে গঠিত।

অভিযোগ ছিল -- "বাদী তার অতীতের স্মৃতিশক্তি প্রায় হারিয়েছে এবং সন্ন্যাসীদের সাথে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে আরম্ভ করে, তাদের একজন হিসাবে।

এই ঘটনার কোন আইনগত পরিণতি নেই। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়নি সে সম্পূর্ণভাবে পার্থিব উৎসাহ থেকে অবসর নিয়েছিল এবং এটাও বলা হয়েছিল যে জীবন সে যাপন করত সেটা তার স্মৃতিভ্রংশের ফল। এই বিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে যাওয়া উচিত যেহেতু ইস্যুটিশুধু এই অনুচ্ছেদের উপর নির্ভরশীল।

৯ নং ইস্যু

যেভাবে নালিশটি গঠিত করা হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে ইস্যুটি আনা হয়নি।

ইস্যু (২)

সীমা হিসাবে, বাদী দাবী করে ১৯০৯ সালের ৮ মে পর্যন্ত সে সম্পত্তির অধিকারী ছিল যখন সে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং মনে করা হয় সে মৃত। স্ত্রীর অভিপ্রায় ছিল বিধবা হিসাবে সফল হতে। সারমর্ম হচ্ছে যে ১৯০৯, মে থেকে সে মামলার পূর্বে ১২ বছর পর্যন্ত সম্পত্তির অধিকারে ছিল, সুতরাং মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট হয়ে যায়। বাদীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত সে হিন্দু বিধবা হিসাবে সম্পত্তি অধিকার করেছিল এবং সে ধারণা করছিল যে তার অধিকার খর্ব হয়ে গেছে ১৯২১ সালের ৪ মে যেদিন বাদী তার পরিচিতি ঘোষণা করল সে কুমার। মামলাটিকে এই দিন থেকে ১২ বছরের মধ্যে স্থাপন করা হল। মেজরানী তার বিরুদ্ধে একজন বিধবার এস্টেট হিসাবে প্রচার করছিল, সব সময় আচরণ করছিল বাদী মৃত। সে কখনো একটি বিধবা এস্টেটের বেশি কিছু ঘোষণা করেনি, প্রত্যক্ষভাবে সে স্বীকার করেছে যে সে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে এটা ধারণ করছে, যেটা হিন্দুআইনের রীতি। স্বামীর বিরুদ্ধে অধিকারের বিরোধিতা, যার প্রতিনিধিত্ব করা তার অভিপ্রায় ছিল, একটি অসম্ভব ধারণা। এটাতে কেউ এই উপসংহারে আসবে যে তার হস্তান্তরের উপর, স্বামীর উত্তরাধিকারীকে গ্রহণ করা হবে। এটা বিচারকের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এমনকি ৪ বা ৬ মে ১৯২১ সালের পরেও যখন বাদীর বিরোধিতা করা হয়েছিল, তার অধিকারের বিরোধিতা করা যেতে পারত। দেখা যাচ্ছে সে তখনো জোর দিয়ে বলছিল যে সে নিজের এস্টেটকে অধিকারে রেখেছিল, তার বেশী নয়। মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট হয়নি।

বিচারক উভয় পক্ষের কৌসুলীর থেকে গৃহীত মূল্যবান সহযোগিতার কথা নথিভুক্ত করেছে। তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে তাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ সুবিধা পেয়েছিল বিচাবক। বিচারক তাদের সাহায্যের জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছে। অধিকারের নিশ্চয়তা বা পুনরধিকারের প্রার্থনা করা হয়েছিল। যদিও বিচারক দেখেছিল বাদী ১৯৩০ সালে খাজনা আদায় করেনি।

এতে কোন প্রশ্ন নেই যে বাদী ভাওয়ালের মেজকুমার কিনা। সে মামলার সম্পত্তির অবিভাজিত অংশের জন্য বিবেচিত হয়েছিল।

একটি ডিক্রি জারী হবে এই ঘোষণা করে যে বাদী হচ্ছে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে মামলার সম্পত্তির অবিভাজিত এক তৃতীয়াংশ তার অধিকারে থাকবে— শেয়ারটি বর্তমানে ১ম প্রতিবাদীর অধিকারে — অন্যান্য প্রতিবাদীদের সঙ্গে যৌথভাবে থাকবে।

২ নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ও বাদবাকীর বিরুদ্ধে ডিক্রিটি গঠিত।

বাদী বার্ষিক ৬ % সুদের হারে বিপক্ষের প্রতিবাদীদের কাছ থেকে মামলার ব্যয় বাবদ অর্থ পাবে।

স্বাক্ষর

পান্নালাল বাসু

অতিরিক্ত জেলা জজ, ঢাকা

১৯৩৬, ২৪ আগস্ট।